প্রথম প্রতিশ্রুতি

আশাপূর্ণা দেবী

রবীন্দ্র পুরস্কার : ১৩৭২

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৭১
সপ্তম মুদ্রণ

এই গ্রন্থের সমস্ত চরিত্রই কাল্পনিক ॥

প্রচ্ছদপট :
অঙ্কন—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রণ—রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট



মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত।
শ্রীজয়ন্ত বাক্‌চি কর্তৃক পি. এম. বাক্‌চি এণ্ড কোং (প্রাঃ) লিমিটেড,
১৯ গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত

উৎসর্গ

নিভৃত লোকে বসে একদা যাঁরা রেখে গেছেন প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর, সেই বরণীয়া ও স্মরণীয়াদের উদ্দেশে—

এই লেখিকার অন্যান্য বই

সমুদ্র নীল আকাশ নীল
অগ্নিপরীক্ষা
নির্জন পৃথিবী
বলয়গ্রাস
যোগবিয়োগ
নেপথ্যনায়িকা
গল্প-পঞ্চাশৎ
শ্রেষ্ঠগল্প
স্বপ্নশর্বরী
কল্যাণী
অতিক্রান্ত
সাগর শুকায়ে যায়
নবজন্ম
শশীবাবুর সংসার
উড়োপাখী
ছাড়পত্র
পঞ্চমীমহল
উত্তরলিপি
নবনীড়
মুখররাত্রি
কেশবতীকন্যা
আলোর স্বাক্ষর
তিনছন্দ
প্রথম লগ্ন
নদী দিক্‌হারা
সোনার হরিণ
রাণীশহরের কানাগলি
দিনান্তের রং
মিত্তিরবাড়ী

সুবর্ণলতা
জনম্ জনম্‌কে সাথী
উন্মোচন
মেঘ পাহাড়
জল আর আগুন
একটি সন্ধ্যা একটি সকাল
আর এক ঝড়
যুগে যুগে প্রেম
স্বনির্বাচিত গল্প
পূর্ণপাত্র
সরস গল্প
মনোনয়ন
অতলান্তিক
সোনালী সন্ধ্যা
দোলনা
ছায়াসূর্য
প্রেম ও প্রয়োজন
সাজবদল
বহিরঙ্গ
জীবনস্বাদ
জলছবি
বেগবতী
উত্তরণ
দুয়ে মিলে এক
শুক্তি সাগর
মায়াজাল
লঘু ত্রিপদী
জনতার মুখ
আবহসঙ্গীত

—ছোটদের—

ছোট্‌ঠাকুর্দার কাশীযাত্রা
হাফ্-হলিডে
এক সমুদ্দুর অনেক ঢেউ
বলবার মতন নয়
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
শোনো শোনো গল্প শোনো
গল্প ভালো আবার বলো

কনকদীপ
ছোটদের ভালো ভালো গল্প
ভাগ্যি যুদ্ধ বেধেছিল
গল্প হলো শুরু
রঙিন মলাট
শুধু হাসির গল্প
সেই সব গল্প

বহির্বিশ্বের ভাঙাগড়ার কাহিনী নিয়ে রচিত হয় বিগত কালের ইতিহাস। আলো আর অন্ধকারের পৃষ্ঠপটে উচ্চকিত সেই ধ্বনিমুখর ইতিহাস পরবর্তী-কালের জন্য সঞ্চিত রাখে প্রেরণা, উন্মাদনা, রোমাঞ্চ। কিন্তু স্তিমিত অন্তঃপুরের অন্তরালেও কি চলে না ভাঙাগড়ার কাজ? যেখান থেকে রং বদল হয় সমাজের, যুগের, সমাজমানুষের মানসিকতার। চোখ ফেললে দেখা যায় সেখানেও অনেক সঞ্চয়। তবু রচিত ইতিহাসগুলি চিরদিনই এই অন্তঃপুরের ভাঙাগড়ার প্রতি উদাসীন! অন্তঃপুর চিরদিনই অবহেলিত। বাংলাদেশের সেই অবজ্ঞাত অন্তঃপুরের নিভৃতে প্রথম যাঁরা বহন করে এনেছেন প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর, এ গ্রন্থ সেই অনামী মেয়েদের একজনের কাহিনী।

তুচ্ছ দৈনন্দিনের পৃষ্ঠপটে আঁকা এই ছবি যদি বহন করে রাখতে পেরে থাকে বিগত কালের সামান্যতম একটি টুকরোকে, সেইটুকুই হবে আমার শ্রমের সার্থকতা।

লেখিকা

॥ এই গ্রন্থে বর্ণিত চরিত্রগুলির পরিচয় ॥

সত্যবতী

রামকালী—	সত্যবতীর বাবা
জয়কালী—	" ঠাকুর্দা
কুঞ্জ—	" জ্যাঠামশায়
জটা	" পিসির ছেলে
নবকুমার—	" স্বামী
নীলাম্বর বাঁড়ুয্যে—	" শ্বশুর
সাধন—	" বড়ছেলে
সরল—	" ছোটছেলে
রাসবিহারী—	কুঞ্জর বড়ছেলে
নেড়ু—	" ছোটছেলে
ভবতোষ—	নবকুমারের শিক্ষক
নিতাই—	" বন্ধু
লক্ষ্মীকান্ত বাঁড়ুয্যে—	পাটমহলের জমিদার
শ্যামকান্ত—	ঐ জমিদার-পুত্র
রাখহরি ঘোষাল দয়াল মুখুয্যে } —	ঐ প্রতিবেশী
নগেন—	কাটোয়ার যুবক
বিদ্যারত্ন—	রামকালীর ভক্তিভাজন পণ্ডিত
গোবিন্দ গুপ্ত—	" আশ্রয়দাতা
ফেলু বাঁড়ুয্যে—	" শ্বশুর
পটলা ঘোষাল বিপিন লাহিড়ী }	" প্রতিবেশী
মুকুন্দ মুখুয্যে —	সৌদামিনীর স্বামী
তুষ্টু—	গোয়ালা
রঘু—	তুষ্টুর নাতি
বিন্দে—	ওঝা
গোপেন—	রাখাল

ভুবনেশ্বরী—	সত্যবতীর মা
দীনতারিণী—	" ঠাকুমা
কাশীশ্বরী মোক্ষদা }	" পিসঠাকুমা
শিবজায়া নন্দরাণী }	" জ্যাতিঠাকুমা
নিভাননী সুকুমারী }	" মামী
পুণ্যি —	সত্যবতীর সমবয়সী পিসি
খেঁদি—	" বাল্যবান্ধবী
সুবর্ণ—	" মেয়ে
সেজপিসি—	" জটার মা
শশীতারা—	কুঞ্জর বোন
অভয়া—	" স্ত্রী
সারদা—	রাসুর বৌ
পটলী—	রাসুর দ্বিতীয় স্ত্রী
শঙ্করী (কাটোয়ার বৌ)—	কাশীশ্বরীর নাতবৌ
বেহুলা—	শ্যামকান্তের স্ত্রী
ভাবিনী—	নিতাইয়ের স্ত্রী
এলোকেশী—	সত্যবতীর শাশুড়ী
মুক্তকেশী—	এলোকেশীর সইয়ের মেয়ে
সৌদামিনী—	এলোকেশীর ভাগ্নী
সুহাস—	শঙ্করীর মেয়ে

সাবিপিসি, রাখুর মা, নাপিত-বৌ, দত্তগিন্নী, ক্ষ্যান্তঠাকরুন ইত্যাদি।

প্রথম প্রতিশ্রুতি

সত্যবতীর গল্প আমার লেখা নয়। এ গল্প বকুলের খাতা থেকে নেওয়া। বকুল বলেছিল, "একে গল্প বলতে চাও গল্প, সত্যি বলতে চাও সত্যি।"

বকুলকে আমি ছেলেবেলা থেকে দেখছি। এখনও দেখছি। বরাবরই বলি, "বকুল, তোমাকে নিয়ে গল্প লেখা যায়।" বকুল হাসে। অবিশ্বাস আর কৌতুকের হাসি। না, বকুল নিজে কোনদিন ভাবে না—তাকে নিয়েও গল্প লেখা যায়। নিজের সম্বন্ধে কোন মূল্যবোধ নেই বকুলের, কোন চেতনাই নেই।

বকুলও যে সত্যিই পৃথিবীর একজন, এ কথা যেন মানতেই পারে না বকুল। সে শুধু জানে, সে কিছুই নয়, কেউই নয়। অতি সাধারণের এক-জন, একেবারে সাধারণ!—যাদের নিয়ে গল্প লিখতে গেলে কিছুই লেখবার থাকে না।

বকুলের এ ধারণা গড়ে ওঠার মূলে হয়তো ওর জীবনের বনেদের তুচ্ছতা! হয়তো এখন অনেক পেয়েও শৈশবের সেই অনেক কিছু না-পাওয়ার ক্ষোভটা আজও রয়ে গেছে তার মনে। সেই ক্ষোভই স্তিমিত করে রেখেছে তার মনকে। কুণ্ঠিত করে রেখেছে তার সত্তাকে।

বকুল সুবর্ণলতার অনেকগুলো ছেলেমেয়ের মধ্যে একজন। সুবর্ণলতার শেষদিকের মেয়ে।

সুবর্ণলতার সংসারে বকুলের ভূমিকা ছিল অপরাধীর।

অজানা কোন এক অপরাধে সব সময় সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হবে বকুলকে, এ যেন বিধি-নির্দেশিত বিধান।

বকুলের শৈশব-মন গঠিত হয়েছিল তাই অদ্ভুত এক আলোছায়ার পরিমণ্ডলে। যার কতকাংশ শুধু ভয় সন্দেহ আতঙ্ক ঘৃণা, আর কতকাংশ জ্যোতির্ময় রহস্যপুরীর উজ্জ্বল চেতনায় উদ্ভাসিত। তবু মানুষকে ভাল না বেসে পারে না বকুল। মানুষকে ভালবাসে বলেই তো—

কিন্তু থাক, এটা তো বকুলের গল্প নয়। বকুল বলেছে, "আমার গল্প যদি লিখতেই হয় তো সে আজ নয়। পরে।" জীবনের দীর্ঘপথ পার হয়ে এসে বুঝতে শিখেছে বকুল, পিতামহী প্রপিতামহীর ঋণশোধ না করে নিজের কথা বলতে নেই।

নিভৃত গ্রামের ছায়ান্ধকার পুষ্করিণীই ভরা বর্ষায় উপচে উঠে নদীতে গিয়ে মিশে স্রোত হয়ে ছোটে। সেই ধারাই ছুটে ছুটে একদিন সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। সেই ছায়ান্ধকারের প্রথম ধারাকে স্বীকৃতি দিতে হবে বৈকি।

আজকের বাংলাদেশের অজস্র বকুল-পারুলদের পিছনে রয়েছে অনেক বছরের সংগ্রামের ইতিহাস। বকুল-পারুলদের মা দিদিমা পিতামহী আর প্রপিতামহীদের সংগ্রামের ইতিহাস। তারা সংখ্যায় অজস্র ছিল না, তারা অনেকের মধ্যে মাত্র এক-একজন। তারা একলা এগিয়েছে। এগিয়েছে খানা ডোবা ডিঙিয়ে; পাথর ভেঙে, কাঁটাঝোপ উপড়ে। পথ কাটতে কাটতে হয়তো দিশেহারা হয়েছে, বসে পড়েছে নিজেরই-কাটা-পথের পথ জুড়ে। আবার এসেছে আর একজন; তার আরব্ধ কর্মভার তুলে নিয়েছে নিজের হাতে। এমনি করেই তো তৈরি হল রাস্তা। যেখান দিয়ে আজ বকুল-পারুলরা এগিয়ে চলেছে। বকুলরাও খাটছে বৈকি। না খাটলে চলবে কেন? শুধু তো পায়ে-চলার পথ হলেই কাজ শেষ হল না।

রথ চলবার পথ চাই যে।

সে পথ কে কাটবে কে জানে? সে রথ কারা চালাবে কে জানে?

যারা চালাবে তারা হয়তো অলস কৌতূহলে অতীত ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখতে দেখতে সত্যবতীকে দেখে হেসে উঠবে।

নাকে নোলক, আর পায়ে মল পরা আট বছরের সত্যবতীকে।

বকুলও একসময় হাসত।

এখন হাসে না। অনেকটা পথ পার হয়ে এসে বকুল পথের মর্মকথা বুঝতে শিখেছে। তাই যে সত্যবতীকে বকুল কোনদিন চোখেও দেখে নি, তাকে দেখতে পেয়েছে স্বপ্নে আর কল্পনায়, মমতায় আর শ্রদ্ধায়।

তাই তো বকুলের খাতায় সত্যবতীর এমন স্পষ্ট চেহারা আঁকা রয়েছে।

নাকে নোলক, কানে 'সার' মাকড়ি, পায়ে ঝাঁজর মল, বৃন্দাবনী-ছাপের আটহাতি শাড়ীপরা আট বছরের সত্যবতী। বিয়ে হয়ে গেছে বছরখানেক আগে—এখনও ঘরবসত হয় নি। অপ্রতিহত প্রতাপে পাড়াসুদ্ধ ছেলেমেয়ের দলনেত্রী হয়ে যথেচ্ছ খেলে বেড়ায়! সত্যবতীর মা ঠাকুমা জেঠী পিসি এঁটে উঠতে পারে না ওকে!

পারে না হয়তো সত্যবতীর যথেচ্ছাচারের ওপর ওর বাপের কিছু প্রশ্রয় আছে বলে।

সত্যবতীর বাপ রামকালী চাটুয্যে, চাটুয্যে বামুনের ঘরের ছেলে হলেও ব্রাহ্মণজনোচিত পেশা তাঁর নয়। অন্য শাস্ত্রপালা বেদ-বেদান্ত বাদ দিয়ে তিনি বেছে নিয়েছেন আয়ুর্বেদ। ব্রাহ্মণের ছেলে হয়েও কবিরাজি করেন রামকালী। তাই গ্রামে ওঁর নাম 'নাড়িটেপা বামুন'। ওঁর বাড়ির নাম 'নাড়িটেপার বাড়ি'।

রামকালীর প্রথম জীবনটা ওঁর অন্য সব ভাই আর অন্যান্য জ্ঞাতি-গোত্রদের চাইতে ভিন্ন। কিছুটা হয়তো বিচিত্রও। নইলে ওই আধাবয়সী লোকটার ওইটুকু মেয়ে কেন? সতবতী তো রামকালীর প্রথম সন্তান। সে যুগের হিসেবে বিয়ের বয়স একেবারে পার করে ফেলে, তবে বিয়ে করেছিলেন রামকালী। সত্যবতী সেই পার-হয়ে-যাওয়া বয়সের ফল।

শোনা যায় নিতান্ত কিশোর বয়সে বাপের ওপর অভিমান করে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন রামকালী! কারণটা যদিও খুব একটা ঘোরালো নয়, কিন্তু কিশোর রামকালীর মনে বোধ করি সেটাই বেশ জোরালো ছাপ মেরেছিল!

কি একটা অসুবিধেয় পড়ে রামকালীর বাবা জয়কালী একদিনের জন্যে সদ্য উপবীতধারী পুত্র রামকালীর উপর ভার দিয়েছিলেন, গৃহদেবতা জনার্দনের পূজা-আরতির। মহোৎসাহে সে ভার নিয়েছিল রামকালী। তার আরতির ঘণ্টাধ্বনিতে সেদিন বাড়িসুদ্ধ লোক 'ত্রাহি জনার্দন' ডাক ছেড়েছিল। কিন্তু উৎসাহের চোটে ভয়ঙ্কর একটা ভুল ঘটে গেল। মারাত্মক ভুল।

রামকালীর ঠাকুমা ঠাকুরঘর মার্জনা করতে এসে টের পেলেন সে ভুল! টের পেয়ে ন্যাড়া মাথার উপর কদমছাঁট চুল সজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে উঠল তাঁর। ছুটে গিয়ে ভাইপোর অর্থাৎ রামকালীর বাবা জয়কালীর কাছে প্রায় আছড়ে পড়লেন।

"সর্বনাশ হয়েছে জয়!"

জয়কালী চমকে উঠলেন, "কি হয়েছে পিসি?"

"ছেলেপুলেকে দিয়ে ঠাকুরসেবা করালে যা হয় তাই হয়েছে। সেবা-অপরাধ ঘটেছে। রেমো জনার্দনকে ফল-বাতাসা দিয়েছে, জল দেয় নি।"

চড়াং করে সমস্ত শরীরের রক্ত মাথায় গিয়ে উঠল জয়কালীর! "য়্যা" করে একটা আর্তনাদ-ধ্বনি তুললেন তিনি।

পিসী একটা হতাশ নিশ্বাস ফেলে সেই সুরেই সুর মিলিয়ে বললেন, "হ্যাঁ! জানি না এখন কার কি অদৃষ্টে আছে। ফুল তুলসীর ভুল নয়, একেবারে তেষ্টার জল।"

সহসা জয়কালী পায়ের খড়মটা খুলে হাতে নিয়ে চীৎকার করে উঠলেন, "রেমো! রেমো!"

চীৎকারে রামকালী প্রথমটায় বিশেষ আশঙ্কিত হয় নি, কারণ পুত্র-পরিজনদের প্রতি স্নেহ-সম্ভাষণও জলকালীর এর চাইতে খুব বেশী নিম্নগ্রামের নয়। অতএব সে বেলের আঠার হাতটা মাথায় মুছতে মুছতে পিতৃসকাশে এসে দাঁড়াল।

কিন্তু এ কী! জয়কালীর হাতে খড়ম!

রামকালীর চোখের সামনে কতকগুলো হলুদ রঙের ফুল ভিড় করে দাঁড়াল।

"ভগবানকে স্মরণ কর্ রেমো," জয়কালী ভীষণ মুখে বললেন, "তোর কপালে আজ মৃত্যু আছে।"

রামকালীর চোখের সামনে থেকে হলুদ রঙের ফুলগুলোও লুপ্ত হয়ে গেল, রইল শুধু নীরন্ধ্র অন্ধকার। সেই অন্ধকার হাতড়ে একবার খুঁজতে চেষ্টা করল রামকালী, কোন্ অপরাধে বিধাতা আজ তার কপালে মৃত্যুদণ্ড লিখেছেন। খুঁজে পেল না, খোঁজবার সামর্থ্যও রইল না। সেই অন্ধকারটা ক্রমশঃ রামকালীর চৈতন্যর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

"জনার্দনের ঘরে আজ পূজো করেছিলি তুই না?"

রামকালী নীরব।

পূজোর ঘরেই তা হলে কোন অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু কই? কি? যথারীতি হাত-পা ধুয়ে তার পৈতের পাওয়া চেলির জোড়টা পরেই তো ঘরে ঢুকেছিল রামকালী! তারপর? আসন। তারপর? আচমন। তারপর? আরতি। তারপর—ঠাঁই করে মাথায় একটা ধাক্কা লাগল।

"জল দিয়েছিলি ভোগের সময়?"

এই প্রশ্নটি পুত্রকে করেছেন জয়কালী খড়মের মাধ্যমে।

দিশেহারা রামকালী আরও দু-দশটা ধাক্কার ভয়ে বলে বসল—"হ্যাঁ। দিয়েছি তো।"

"দিয়েছিলি? জল দিয়েছিলি?" জয়কালীর পিসী যশোদা একেবারে

নামের বিপরীত ভঙ্গীতে বলে উঠলেন, "দিয়েছিলি তো সে জল গেল কোথায় রে হতভাগা ? গেলাস একেবারে শুকনো ?"

প্রশ্নকর্ত্রী ঠাকুমা।

বুকের গুরু-গুরু ভাবটা কিঞ্চিৎ হাল্‌কা মনে হল, রামকালী ক্ষীণস্বরে বলে বসল, "ঠাকুর খেয়ে নিয়েছে বোধ হয়।"

"কী ? কী বললি ?" আর একবার ঠক করে একটা শব্দ, আর চোখে অন্ধকার হয়ে যাওয়ার আরও গভীরতম অনুভূতি।

"লক্ষ্মীছাড়া, শুয়োর, বন্‌বরা! ঠাকুর জল খেয়ে নিয়েছে ? শুধু ভূত হও নি তুমি, শয়তানও হয়েছ। ভয় নেই প্রাণে তোমার ? ঠাকুরের নামে মিছে কথা ?"

অর্থাৎ মিথ্যা কথাটা যত না অপরাধ হোক, ঠাকুরের নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে ভীষণ অপরাধে পরিণত হয়েছে। রামকালী ভয়ের বশে আবারও মিছে কথা বলে বসে, "হ্যাঁ, সত্যি বলছি! ঠাকুরের নামে দিব্যি! দিয়েছিলাম জল।"

"বটে রে হারামজাদা! বামুনের ঘরের চাঁড়াল! ঠাকুরের নামে দিব্যি ? জল দিয়েছিস তুই ? ঠাকুর জল খেয়ে ফেলেছে ? ঠাকুর খায় জল ?"

মাথার মধ্যে জ্বলছে!

রামকালী মাথার জ্বালায় অস্থির হয়ে সমস্ত ভয়-ডর ভুলে বলে বসল, "খায় না জানো তো দাও কেন ?"

"ও, আবার মুখে মুখে চোপা ?" জয়কালী আর একবার শেষবেশ খড়মটার সদ্ব্যবহার করলেন। করে বললেন, "যা দূর হ, বামুনের ঘরের গরু! দূর হয়ে যা আমার সুমুখ থেকে!"

এই!

এর বেশী আর কিছুই করেন নি জয়কালী! আর এরকম ব্যবহার তো তিনি সর্বদাই সকলের সঙ্গে করে থাকেন! কিন্তু কিসে যে কি হয়!

রামকালীর চোখের সামনে থেকে যেন একটা পর্দা খসে গেল।

চিরদিন জেনে আসছে জনার্দন বেশ একটি দয়ালু ব্যক্তি, কারণ কারণে-অকারণে উঠতে-বসতে বাড়ির সকলেই বলে 'জনার্দন, দয়া করো।' কিন্তু কোথায় সেই দয়ার কণিকামাত্র!

রামকালী যে মনে মনে প্রাণ ফাটিয়ে চীৎকার করে প্রার্থনা করল, "ঠাকুর!

এই অবিশ্বাসীদের সামনে একবার নিজমূর্তি প্রকাশ করো, একবার অলক্ষ্য থেকে দৈববাণী করো, "ওরে জয়কালী, বৃথা ওকে উৎপীড়ন করছিস! জল আমি সত্যিই খেয়ে ফেলেছি! এক মুঠো বাতাসা খেয়ে ফেলে বড্ড তেষ্টা পেয়ে গিয়েছিল!"

নাঃ। দৈববাণীর ছায়ামাত্র নেই।

সেই মুহূর্তে আবিষ্কার করল রামকালী, ঠাকুর মিথ্যে, দেবতা মিথ্যে, পূজো-পাঠ-প্রার্থনা—সবই মিথ্যে, অমোঘ সত্য শুধু খড়ম।

পৈতের সময় তারও একজোড়া খড়ম হয়েছে। তার উপযুক্ত ব্যবহার কবে করতে পারবে রামকালী কে জানে।

অথচ এই দণ্ডে সমস্ত পৃথিবীর উপরই সে ব্যবহারটা করতে ইচ্ছে করছে।

"পৃথিবীতে আর থাকব না আমি!"

প্রথমে সংকল্প করল রামকালী।

তার পর ক্রমশঃ পৃথিবীটা ছেড়ে চলে যাবার কোন উপায় আবিষ্কার করতে না পেরে মনের সঙ্গে রফা করল।

পৃথিবীটা আপাততঃ হাতে থাক্, ওটা তো যখন ইচ্ছেই ছাড়া যাবে। ছাড়বার মত আরও একটা জিনিস রয়েছে, পৃথিবীরই প্রতীক যেটা।

বাড়ি!

বাড়িই ছাড়বে রামকালী।

জন্মে আর কখনও জনার্দনের পূজো যাতে না করতে হয়।

তখনও 'নাড়িটেপার বাড়ি' নাম হয় নি, আদি ও অকৃত্রিম 'চাটুয্যে বাড়ি'ই ছিল। সকলের শ্রদ্ধা-সমীহেরও আধার ছিল। কাজেই বেশ কিছুদিন গ্রামে সাড়া পড়ে রইল, চাটুয্যেদের ছেলে হারিয়ে যাওয়া নিয়ে।

গ্রামের সমস্ত পুকুরে জাল ফেলা হল। গ্রামের সকল দেবদেবীর কাছে মানসিক মানা হল। রামকালীর মা রোজ নিয়ম করে ছেলের নামে ঘাটে প্রদীপ ভাসাতে লাগল, জয়কালী নিয়ম করে জনার্দনের ঘরে তুলসী চড়াতে লাগলেন, কিছুই হল না।

ক্রমশঃ সকলে প্রায় যখন ভুলেই গেল চাটুয্যেদের রামকালী বলে একটা ছেলে ছিল, তখন গ্রামের কোন একটি যুবক একদিন ঘোষণা করল 'রামকালী আছে'। সে মুকশুদাবাদে গিয়েছিল, সেখানে নিজের চোখে দেখে এসেছে

রামকালী নবাব-বাড়ির কবরেজ গোবিন্দ গুপ্তর বাড়িতে রয়েছে, তার সাকরেদি করে কবরেজি শিখছে।

শুনে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন জয়কালী। ছেলের বেঁচে থাকার খবর, আর ছেলের জাত যাওয়ার খবর, যুগপৎ উল্টোপাল্টা দুটো খবরে তিনি ভুলে গেলেন, আনন্দে হৈহৈকার করতে হবে কি, শোকে হাহাকার করতে হবে।

ছেলে বদ্যিবাড়ির ভাত খাচ্ছে, বদ্যিবাড়ির আশ্রয় গ্রহণ করেছে, এ তো মৃত্যু-সংবাদেরই সামিল।

অথচ রামকালী এযাবৎ মরে নি, একথা জেনে প্রাণের মধ্যে কী যেন ঠেলে ঠেলে উঠছে। কী সে? আনন্দ? আবেগ? অনুতাপের যন্ত্রণামুক্তির সুখ?

গ্রামের সকলের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন জয়কালী। অবশেষে রায় বেরোলো, জয়কালীর নিজের একবার যাওয়া দরকার। সরেজমিনে তদন্ত করে দেখে আসুন প্রকৃত অবস্থাটা কি! তা ছাড়া—সে লোক প্রকৃতই রামকালী কি না—তাই বা কে জানে! যে দেখেছে সে তো নিকট আত্মীয় নয়, চোখের ভ্রম হতে কতক্ষণ?

কিন্তু পরামর্শ শুনে জয়কালী আকাশ থেকে পড়লেন, "আমি যাব? আমি কি করে যাব? জনার্দনের সেবা ফেলে আমার কি নড়বার জো আছে?"

রামকালীর মা, জয়কালীর দ্বিতীয় পক্ষ দীনতারিণী শুনে কেঁদে ভাসাল। মুখে এসেছিল বলে 'জনার্দনই তোমার এত বড় হল?'

বলতে পারল না সাহস করে, শুধু চোখের জল ফেলতে লাগল।

অবশেষে অনেক পরিকল্পনান্তে স্থির হল, জয়কালীর এক ভাগ্নে যাবে, বয়স্থ ভাগ্নে। তার সঙ্গে জয়কালীর প্রথম পক্ষের বড় ছেলে, কুঞ্জকালী যাবে।

কিন্তু এই গণ্ডগ্রাম থেকে মুকশুদাবাদে যাওয়া তো সোজা নয়! গরুর গাড়ি করে গঞ্জয় গিয়ে খোঁজ নিতে হবে কবে নৌকা যাবে মুকশুদাবাদে। তার পর আবার চাল চিঁড়ে বেঁধে নিয়ে গরুর গাড়িতে তিন ক্রোশ রাস্তা ভেঙে নৌকোর কিনারে গিয়ে ধর্না পাড়া।

খরচও কম নয়।

জয়কালী ভাবলেন, খরচের খাতায় বসানো সংখ্যা আবার জমার খাতায় বসাতে গেলে ঝঞ্ঝাট বড় কম নয়। এত ঝঞ্ঝাটের দরকারই বা কি ছিল?

রাগ হল সেই ফাজিল ছোক্‌রাটার ওপর; যে এসে খবর দিয়েছে। যে এত ঝঞ্ঝাট বাধানোর নায়ক।

রামকালী তো খরচ হয়েই গিয়েছিল! ওই ফাজিলটা এসে খবর না দিলে আর—

কিন্তু দরকার ছিল রামকালীর মার দিক থেকে, তাই সব ঝঞ্ঝাট পুইয়ে ভাগ্নেকে আর ছেলেকে পাঠালেন জয়কালী। আর কদিন পরে তারা এসে জানাল, খবর ঠিক। রামকালী নিঃসন্তান গোবিন্দ বদ্যির পুষ্যি হয়ে রাজার হালে আছে, এর পর নাকি পাটনা যাবে। এদের কাছে বলেছে একেবারে রাজবদ্যি হয়ে, টাকার মোট নিয়ে দেশে যাবে, তার আগে নয়।

শুনে যাদের বেশী ঈর্ষা হল, তারা বলল, "এমন কুলাঙ্গার ছেলের মুখদর্শন করতে নেই। তা ছাড়া, ও তো জাতিচ্যুত।"

যাদের একটু কম ঈর্ষা হল, তারা বলল, "তবু বলতে হবে উদ্যোগী পুরুষ! আর জাতিচ্যুতই বা হবে কেন? কুঞ্জ তো বলছে নাকি জেনে এসেছে গোবিন্দ গুপ্ত রামকালী চাটুর্য্যের জন্যে কোন এক বামুনবাড়িতে ভাতের ব্যবস্থা করে রেখেছে!"

গ্রামে আবার কিছুদিন এই নিয়ে খুব আলোচনা চলল। এবং যখন এসব আলোচনা ঝিমিয়ে গিয়ে ক্রমশঃ আবার সবাই রামকালীর নাম ভুলতে বসল, তখন একদিন রামকালী সশরীরে এসে হাজির হল টাকার বস্তা নিয়ে!

গোবিন্দ গুপ্ত পরামর্শ দিয়েছেন, "তোমার আর রাজবদ্যি হয়ে কাজ নেই বাপু, রাজ্যে এখন ভেতরে ভেতরে ঘুণ ধরতে বসেছে, নবাবের নবাবী তো শিকেয় উঠেছে। আমার এই দীর্ঘকালের সঞ্চিত অর্থরাশি নিয়ে দেশে পালিয়ে গিয়ে নিজে নবাবি করো গে! আমরা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে কাশীবাসে মনঃস্থির করেছি।"

অগত্যা চলে এসেছে রামকালী।

গঞ্জের ঘাট থেকে নিজের পাল্‌কি করে।

গোবিন্দ গুপ্তর পাল্‌কিটাও পেয়েছে রামকালী, নৌকোয় চাপিয়ে নিয়ে এসেছে।

কিন্তু তখন জয়কালী মারা গেছেন এই এক মস্ত আপসোস।

বাবাকে একবার দেখাতে পারল না রামকালী,—সেই তাড়িয়ে দেওয়া ছেলেটা মানুষ হয়ে ফিরল।

দুই

গঞ্জের মেলায় যেমন লোকে দল বেঁধে ‘পাঁচপেয়ে গরু’ দেখতে ছোটে, তেমনি করে দেশের সমস্ত লোক আসতে লাগল রামকালীকে দেখতে! রামকালী মনে মনে বিব্রত হলেও সকলকে যথোচিত মান্য করল, এবং বয়োজ্যেষ্ঠ সকলকে একজোড়া করে ধুতি ও নগদ দু টাকা দিয়ে প্রণাম করল।

ঘরে ঘরে সবাই বলাবলি করতে লাগল, ‘উঃ, কী উঁচু নজরটাই হয়ে এসেছে!’ অনেকে নিজের নিজের চিরদিন বাড়ি বসে থাকা ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নিশ্বাস ফেলল!

তবু কিছুদিন একটু জাতে-ঠেলা জাতে-ঠেলা হয়ে থাকতে হয়েছিল বৈ কি রামকালীকে! বারবাড়িতে শুত খেত, বাড়ির ছোট ছেলেপুলে দৈবাৎ কেউ রামকালীকে ছুঁয়ে ফেললে তাকে কাপড় ছাড়ানো হত। কিন্তু রামকালীই একদিন গ্রামকর্তাদের ডেকে সালিশ মানল।

এটা কেন হবে?

একটি দিনের জন্যে সে বৈদ্যের অন্ন গ্রহণ করে নি, এক দিনের জন্য কোন অনাচার করে নি! শুধু শুধু পতিত হয়ে থাকতে হবে কেন তাঁকে?

গ্রামকর্তারা মাথা চুলকে হেঁ হেঁ করতে লাগলেন, স্পষ্ট কিছু বলতে পারলেন না। কারণ ছোঁড়াটা নাকি রাজবদ্যি গোবিন্দ গুপ্তর সমস্ত বিদ্যে আর সমস্ত টাকা হাতিয়ে নিয়ে এসেছে!

তা ছাড়া ছোঁড়ার হাতটাও দরাজ।

শোনা যাচ্ছে শীগগিরই পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করবে।

কর্তাদের হেঁ হেঁ করার অবসরে রামকালী নিজের বক্তব্য ব্যক্ত করল, “দেখুন আমার গুরুর ওষুধ ডেকে কথা কয়। আমি তাঁর কিছু কিঞ্চিৎ আশীর্বাদও তো পেয়েছি? সে বিদ্যে, আমার জন্মভূমির, আমার পাড়াপড়শীর, আমার জ্ঞাতিগোত্তরের কাজে লাগুক এই আমি চাই। তবে যদি আপনারা তা না চান, তা হলে আবার আমাকে গ্রামের বাস উঠিয়ে চলে যেতে হবে।”

এবার গ্রামকর্তারা হাঁ হাঁ করে উঠলেন। সত্যিই তো, কথাটা তো উড়িয়ে দেবার নয়! সকলেরই একদিন না একদিন ‘নিদেনকাল’ আছে!

ওদের “হাঁ-হাঁ’র অবসরে রামকালী বললে, এই যে একটি পুকুর কাটাবার ইচ্ছে হয়েছে, সেই উপলক্ষ্যে একদিন ‘গ্রাম-ভোজন’ দেব আশা করে বসে আছি, সে আশা তা হ’লে পূরণ হবে না?”—

এঁরা আবার দ্বিধাশূন্য হয়ে 'সে কি ? সে কি ?' করে উঠলেন।

আর ইত্যবসরে ফেলু বাঁড়ুয্যে এক চাল চেলে বসলেন। কি এক সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে বললেন হেসে হেসে, "জানো তো, উপযুক্ত বয়সে বিবাহ-সংস্কার না হলে কন্যা যেমন অরক্ষণীয়া হয়, পুরুষও তেমনি পতিত হয়।"

রামকালী মাথা নীচু করে বলল, "বয়স প্রায় ত্রিশ পার হতে চলল, এ বয়সে কে আমাকে কন্যাদান করবে ?"

ফেলু বাঁড়ুয্যে বীরদর্পে বলে উঠলেন, "আমি করব! এতে আমার ভায়রা আমাকে জাতে ঠেলেন তো ঠেলুন।"

ফেলু বাঁড়ুয্যেকে জাতে ঠেলা!

জাতের যিনি মাথা!

"হাঁ-হাঁ"র স্রোত বইতে লাগল সভায়।

আর ফেলুর চালাকি দেখে মনে মনে সবাই নিজেদের গালে মুখে চড়াতে লাগল। মেয়ে আর কার ঘরে নেই ?

এরই কিছু দিন পরে ফেলু বাঁড়ুয্যের ন বছরের মেয়ে 'ভুবি' বা ভুবনেশ্বরীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল রামকালীর।

বহুদিন এত ঘটার বিয়ে হয় নি গ্রামে।

কারণ রামকালী নাকি নিজে পাঁচ-পাঁচ শ টাকা লুকিয়ে ওর মা দীনতারিণীর হাতে গুঁজে দিয়েছিল ঘটা করতে।

এই বেহায়ামিটা যথেষ্ট নিন্দনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু ঘটার 'মাছ মোণ্ডা'গুলো অনিন্দনীয় ছিল।

অতএব রামকালী পুনশ্চ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল! অনুমতি পেল বাড়ির মধ্যে গিয়ে খাবার শোবার!

যাক্, তার পরও তো কাটল কতকাল।

সেই 'ভুবি' বড় হল, ঘর-বসত হল, পনেরো ষোলো বছরের 'ভরা-নদী' হল। তার পর তো সত্যবতী!

বুড়ো বয়সের প্রথম সন্তান বলেই হয়তো বাপের কাছে কিছু প্রশ্রয় আছে সত্যবতীর!

তিন

দীনতারিণী নিরামিষ ঘরে রান্না করছিলেন, সত্যবতী দাওয়ার নিচেত 'ছাঁচতলা'য় এসে দাঁড়াল। উঁচু পোতার ঘর। দাওয়ার কিনারাটা সত্যবতীর নাকের কাছাকাছি, পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর সমস্ত দেহভারটা দিয়ে ডিঙি মেরে গলা বাড়িয়ে সত্যবতী তার স্বভাবসিদ্ধ মাজাগলায় ডাক দিল, "অ ঠাকুমা, ঠাকুমা!"

নিরামিষ হেঁসেলের দাওয়ায় ওঠবার অধিকার সত্যবতীর কেন, বাড়ির কারোরই নেই, কেবলমাত্র যাঁরা নিরামিষে অধিকারী তাঁদেরই আছে। মেটে দাওয়ার একপেশে কোণটা থেকে খাঁজ কেটে কেটে সিঁড়ি বানানো হয়েছে, আর সে সিঁড়ি থেকে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাওয়া পথ হয়েছে একেবারে 'ঘাট' বরাবর। দীনতারিণী, দীনতারিণীর সেজজা শিবজায়া, দীনতারিণীর দুই ননদ কাশীশ্বরী আর মোক্ষদা, মাত্র এঁরাই এই পথে পদক্ষেপের অধিকারিণী। ঘড়া নিয়ে ঘাটে যান, এবং স্নান সেরে ঘড়া ভরে ভিজে কাপড়ে পায়ে পায়ে এসে একেবারে ওই সিঁড়ি কটি দিয়ে স্বর্গে উঠে পড়েন। ওই রান্নাঘরের দেওয়ালেই তাঁদের কাচাকাপড় শুকোয়, কারণ রাত্রে তো আর এ ঘরে রান্নার পাট নেই। ঘর নিকোনোর কাজেও কিছু আর অছুৎরা কেউ এসে ঢুকবে না। সে কাজ মোক্ষদার। এঁটোসকড়ির ব্যাপারে মোক্ষদা বোধ করি স্বয়ং ভগবানকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন না। কাজেই সে কাজ নিজের হাতে রাখেন। তা ছাড়া মোক্ষদাই বয়সে সব চেয়ে ছোট, অন্যান্যরা সকলেই তাঁর গুরুজন, অতএব সকলের খাওয়ার শেষে তাঁরই 'ডিউটি'।

রান্নার দায়িত্ব দীনতারিণীর, মোক্ষদার উপর সে রান্নার বিশুদ্ধতা রক্ষার দায়িত্ব। বাকী দু'জন 'যোগাড়ে'। তা অবিশ্যি যোগাড়ের কাজটাও কম না। প্রয়োজনটা চারজনের হলেও আয়োজনটা অন্ততঃ দশজনের মত হয়।

কিন্তু ওসব কথা থাক।

আসলে ছেলেপুলের এ উঠোনে পা দেবারও হুকুম নেই, কিন্তু সত্যবতীকে কেউ এঁটে উঠতে পারে না। ও যখন-তখন এই দাওয়ার নিচে থেকে নাক বাড়িয়ে হাঁক পাড়ে, "অ ঠাকুমা", অথবা "অ পিসঠাকুমা!"

দীনতারিণী ওর গলা পেয়েই নিজের গলাটা বাড়িয়ে দরজা দিয়ে উঁকি

মেরে বলেন, "এই মলো যা, এ ছুঁড়ি কী দস্যি গো ! আবার এসেছিস ? বেরো বেরো, ছোট ঠাকুরঝি দেখতে পেলে আর রক্ষে রাখবে না।"

সত্যবতী ঠোঁট উল্টে বলে, "ছোটঠাকুমার কথা বাদ দাও। তুমি শোন না একটু।"

সত্যবতী দীনতারিণীর 'উপায়ী' ছেলের মেয়ে ; তা'ছাড়া সত্যর বিয়ে হয়ে গেছে, কাজেই খুব 'দূর-ছাইটা' ওর কপালে জোটে না। তাই ওর আবদারে অগত্যাই দীনতারিণী একটু ডিঙি মেরে দাওয়ায় এসে দাঁড়ালেন। ইশারায় বললেন, "কি চাই ?"

সত্যবতী পিঠের দিকে গোটানো হাতটা ঘুরিয়ে একখানা ছোট মাপের কচি মানপাতা মেলে ধরে চুপি চুপি বলে, "একটা জিনিস দাও না।"

"এই মরেছে, এখন আবার জিনিস কি রে ? এখন কি কিছু রান্না হয়েছে ? আর হলেও তোর সেজঠাকুমার 'গোপালে'র ভোগের আগ্ আগে দিয়েছি, টের পেলে কুলুক্ষেত্তর করবে না ?"

"আগ্ চাই নি, আগ্ চাই নি, ভাল মন্দ রেঁধে নিজেরাই খেয়ো বাবা, আমাকে এক মুঠো পান্তাভাত দাও দিকি।"

"পান্তাভাত !"

দীনতারিণী আকাশ থেকে পড়লেন। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন পাতাল ফুঁড়ে উঠলেন মোক্ষদা। পরনে সপসপে ভিজে থান, কাঁখে ভরন্ত কলসী।

এইটা বোধ করি মোক্ষদার তৃতীয় দফা স্নান।

যে কোন কারণেই হোক, চাল ধুতে কি শাক ধুতে ঘাটে গেলেই মোক্ষদা একবার সবস্ত্র স্নান সেরে নেন। দাওয়ার পৈঠে দিয়ে কখন যে উঠে এসেছেন, ঠাকুমা নাতনী কারো চোখে পড়ে নি, চোখ পড়লো একেবারে সশরীরিণীর উপর।

দীনতারিণী অপ্রতিভের একশেষ, সত্যবতী বিরক্ত।

আর মোক্ষদা ?

তিনি হাতেনাতে চোর ধরে ফেলা ডিটেকটিভের মতই উল্লসিত।

"আবার তুই এখেনে ?" খনখনে গলায় প্রশ্ন করেন মোক্ষদা।

সত্যবতী ঈষৎ আমতা আমতা করে বলে, "বাঃ রে, আমি কি তোমাদের দাওয়ায় উঠেছি ?"

"দাওয়ায় উঠিস নি, বলি সত্যিক রাস্তা মাড়িয়ে এসে সেই পায়ে ওই উঠোনে তো পা দিয়েছিস? তুলসী গাছে জল দিতে উঠোনে নামতে হবে না আমাদের?"

সত্যবতী গোঁজ গোঁজ করে বলে, "নাববার সময় তো দশঘড়া জল না ঢেলে নাবো না, তবে আবার অত কি?"

"মুখে মুখে চোপা করিসনে সত্য, অব্যেস ভাল কর," মোক্ষদা ঘড়াটাকে দুম্ করে রান্নাঘরের চৌকাঠের ওপিঠে বসিয়ে আঁচল নিংড়ে নিংড়ে পায়ের কাদা ধুতে ধুতে বলেন, "বাপের সোহাগে সোহাগে যে একেবারে ধিঙ্গী পদ পেয়ে বসে আছিস, বলি শ্বশুরঘর করতে হবে না? পরের বাড়ি যেতে হবে না? আর ক'দিন ধিঙ্গী নাচ নেচে বেড়াবি? মেরে কেটে আর দুটো-চারটে বছর, তা'পর গলায় রসুড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে না? তখন করবি কি?"

প্রতিকথায় এই 'পরের ঘরে' যাওয়ার বিভীষিকা দেখিয়ে দেখিয়ে জব্দ করার চেষ্টাটা দু-চক্ষের বিষ সত্যবতীর। বরং তাকে ওরা ধরে দু ঘা মারুক, সহ্য হবে। কিন্তু ওই পরের ঘরের খোঁটা সয় না। অথচ ওইটিই যেন এদের প্রধান ব্রহ্মাস্ত্র। সত্যবতী তাই বিরক্তভাবে বলে, "করবো আবার কি!"

"কি আর করবি? উঠতে বসতে শাউড়ীর ঠোনা খাবি। ওই পটলা ঘোষালের ভাইপো-বৌটার মতন ঠোনা খেতে খেতে গালে কালসিটে পড়ে যাবে।"

সত্যবতী বয়েস-ছাড়া ভঙ্গীতে ঝঙ্কার দিয়ে বলে ওঠে, "ছিষ্টি সংসারের লোক তো আর পটলকাকার ভেজের মতন দজ্জাল নয়!

"ওমা ওমা, শোন কথা মেয়ের," মোক্ষদা হস্তেলের রং নিটোল টাইট হাত দু'খানা নেড়ে বললেন, "তা বলবি বৈকি! বো'র দোষ হলো না, দোষ হলো শাউড়ীর! অবাধ্য চোপাবাজ বৌকে কি করবে শুনি? টাটে বসিয়ে ফুল-চন্নন দিয়ে পূজো করবে?"

"আহা, পূজো করা ছাড়া আর কথা নেই যেন! একটু ভাল চোখে চাইতে পারে না? দুটো মিষ্টি কথা বলতে পারে না?"

"ও মাগো!" মোক্ষদা খনখনে গলায় হেসে উঠে বলেন, "ভেতরে ভেতরে মেয়ে পাকার ধাড়ি হয়েছেন! দেখবো লো দেখবো তোর শাউড়ী কি মধু-

ঢালা কথা কইবে! কত সোনার চক্ষে দেখবে।…সে যাক, বলি পান্তাভাতের কথা কি বলছিলি?"

এতক্ষণ চুপ ছিলেন, এবারে দীনতারিণী হাসেন।

হেসে ফেলে বলেন, "ও আমার কাছে এসেছে পান্তাভাত চাইতে।"

"পান্তাভাত চাইতে এসেছে!" মোক্ষদা সহসা যেন ফেটে পড়েন, "আমাদের হেঁসেলে পান্তো চাইছে, আর তুমি সেই শুনে গা পাতলা করে হাসছ নতুন মেজবৌ? আর কত আহ্লাদ দেবে নাতনীকে? পরকাল যে ঝরঝরে হয়ে যাচ্ছে। বলি শ্বশুরবাড়ি গিয়ে যদি বিধবার হেঁসেল থেকে দুটো পান্তো চেয়ে বসে, তারা বলবে কি? একথা ভাববে না যে, আমরা বুঝি গপ্ গপ্ করে বাসিহাঁড়ির ভাতগুলো গিলি! বলো বলবে কি না।"

"তাই কখনো কেউ বলে ছোটঠাকুরঝি?" দীনতারিণী কথাটা হাল্কা করতে একটু কষ্টহাসি হেসে বলেন, "ছেলে-বুদ্ধি অজ্ঞানে কী না বলে!"

"ছেলে-বুদ্ধি! ও মা লো! সোয়ামীর ঘর করতে পাঠালে ও এখন ছেলের মা হতে পারে, বুঝলে নতুন মেজবৌ!" মোক্ষদা কাঁধ থেকে গামছাখানা নিয়ে জোরে জোরে ঝাড়তে ঝাড়তে বলেন, "মেয়ের বাক্যি-বুলি শোন না তো কান দিয়ে! সোহাগেই অন্ধ। এই তোকে সাবধান করে দিচ্ছি সত্য, খবরদার পাঁচজনের সামনে এমনি বেফাঁস কথা বলে বসবি না। পাড়াপড়শী উনুনমুখীরা তো মজা দেখতেই আছে, এমন কথাটা শুনলে ঠিক বলবে আমরা বাসি হাঁড়িতে খাই।"

হঠাৎ হি-হি করে হেসে ওঠে সত্যবতী, হেসে বলে, "লোকে বললেই বা! বললে কি তোমার গায়ে ফোস্কা পড়বে?"

মোক্ষদা নেহাৎ মেয়েটাকে ছুঁতে পারবেন না, তাই নিজের গালেই একটা চড় মেরে বলেন, "শুনলে? শুনলে নতুন মেজবৌ, তোমার নাতনীর আসপদ্দার কথা! বলে কি না 'লোকে বললেই বা!' ডাক্ শাস্তরের কথা, 'যাকে বললো ছি, তার রইলো কি?' আর বলে কি না—"

সেরেছে!

দীনতারিণী ভাবেন মোক্ষদা একবার মুখ ধরলে তো আর রক্ষে নেই! দুর্দান্ত স্বাস্থ্য মোক্ষদার, দুরন্ত ক্ষিদে-তেষ্টা, সেই খিদে-তেষ্টা চেপে রেখে তিন পহর বেলায় জল খায়, বেলা গড়িয়ে অপরাহ্ণ বেলায় ভাত, সকালের দিকে

শরীরের মধ্যে ওর খাঁ খাঁ ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে। তাই কথার চোটে থরহরি করে ছাড়ে সবাইকে।

প্রসঙ্গটা তাই তাড়াতাড়ি পরিবর্তন করেন দীনতারিণী, "হ্যাঁ লা সত্য, সকাল বেলা জলপান খাস নি? অসময়ে এখন পান্তাভাতের খোঁজ?"

"আহা কী বুদ্ধির ছিরি!" সত্য ঝেঁজে ওঠে, "আমিই যেন খাবো! কেঁচো আর পান্তাভাত দিয়ে টোপ্ ফেলবো।"

"কী করবি?" দীনতারিণীর আগেই মোক্ষদা দুই চোখ কপালে তোলেন, "কী করবি?"

"টোপ ফেলবো, টোপ। মাছের টোপ। পেয়েছ শুনতে? নেড়ু আমায় কঞ্চি চেঁচে খু—ব ভালো একটা ছিপ্ করে দিয়েছে, খিড়কির পুকুরে মাছ ধরবো!"

"সত্য!" মোক্ষদা যেন ছিটপিটিয়ে ওঠেন, "ছিপ ফেলে মাছ ধরবি তুই? খুব নয় বাপসোহাগী আছিস, তাই বলে কি সাপের পাঁচ পা দেখেছিস? মেয়েমানুষ ছিপ ফেলে মাছ ধরবি?"

সত্য ঝাঁকড়া চুলে ভরা মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলে, "আহা! ছোটঠাকুমার কী বাক্যির ছিরি। মেয়েমানুষ মাছ ধরে না? রাঙা খুড়িমারা ধরে না? ও বাড়ীর পিসিরা ধরে না?"

"আ মরণ মুখপোড়া মেয়ে! ওরা ছিপ ফেলে মাছ ধরে? ওরা তো গামছা ছাঁকা দিয়ে চুনোপুঁটি তোলে।"

"তাতে কি!" সত্য হাতের মানপাতাখানা দাওয়ার গায়ে আছড়াতে আছড়াতে বলে, "গামছা দিয়ে ধরলে দোষ হয় না, ছিপ দিয়ে ধরলেই দোষ? চুনোপুঁটি ধরলে দোষ হয় না, বড় মাছ ধরলেই দোষ? তোমাদের এসব দোষের শাস্তর কে লিখেছে গা!"

"সত্য!" দীনতারিণী কড়াস্বরে বলেন, "এক ফোঁটা মেয়ে অত বাক্যি কেন লা? ঠিকই বলেছে ছোট্‌ঠাকুরঝি, পরের ঘরে গিয়ে হাড়ির হাল হবে এর পর।"

"বাবা! বাবা! দুটো পান্তো চাইতে এসে কী খোয়ার! যাচ্ছি আমি আঁশ হেঁসেলের ওদের কাছে। যাবো কি! সেখানে তো আবার বড় জেঠি! গুলি ভাঁটার মতন চাউনি! খেঁদিদের বাড়ি থেকে নিলেই হত তার চেয়ে।"

"কী বললি! খেঁদিদের বাড়ি থেকে ভাত? কায়েত-বাড়ির ভাত নিয়ে ঘাঁটবি তুই?"

"ঘেঁটেছি নাকি! বাবাঃ বাবাঃ! ফি হাত তোমাদের খালি দোষ, আর দোষ! আচ্ছা, যাচ্ছি আমি ও হেঁসেলেই। কিন্তু যখন ইয়াবড় মাছ ধরবো, তখন দেখো!"

বলে সত্য আছড়ানোর চোটে চিরে চিরে যাওয়া মানপাতাটা হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যায় দাওয়ার কোণ-বরাবর ধরে ও মহলে।

সেখানে বিরাট এক কর্মযজ্ঞের কাণ্ড চলেছে অহরহ। দিন দু বেলায় দুশো আড়াইশো পাত পড়ে।

সেখানেও এমনিই উঁচু পোতার রান্নাঘর, তবে দাওয়ায় উঠতে তেমন বাধা নেই। বেপরোয়া উঠে গেল সত্য। আর এদিক ওদিক তাকিয়ে দাওয়ার কোণ থেকে একখানা খালি নারকেলের মালা কুড়িয়ে নিয়ে রন্ধনশালার দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে সাহসে ভর করে ডাকল, "বড় জেঠি!"

চার

সারাদিন গুমোটের পর হঠাৎ এক চিলতে ঠাণ্ডা হাওয়া উঠল। গা জুড়িয়ে এল, কিন্তু প্রাণে জাগছে আতঙ্ক। সময়টা খারাপ, চৈত্রের শেষ। ঈশান-কোণে মেঘ জমেছে, তার কালো ছায়া আধখানা আকাশকে যেন ঘোমটা পরিয়ে দিল। যেন একটা দুরন্ত দৈত্য হঠাৎ পৃথিবীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার আগের মুহূর্তে পাঁয়তাড়া কষছে।

মাঠে ঘাটে পথে পুকুরে যে যেখানে বাইরে ছিল, তারা ঘন ঘন আকাশের দিকে তাকাতে তাকাতে হাতের কাজ চটপট সারতে শুরু করল।

আর বাতাসে বাতাসে তরঙ্গ তুলে গ্রামের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি ছড়িয়ে পড়ল একখানা একটা সানুনাসিক স্বরের ধুয়ো। সে স্বর

ধাপে ধাপে চড়ছে, মাঝে মাঝে খাদে নামছে। তার ভাষাটা এই—"বুধী আঁ—য়! সুন্দরী আঁ—য়! মুংলী আঁয়—! লক্ষ্মী আঁ—য়!"

ঝড়ের আশঙ্কায় গৃহপালিত অবোলা জীবগুলিকে গোচারণ ভূমি থেকে গোহালে ফেরবার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

সত্যবতী জানে না ঝড়ের আগের মুহূর্তে কিংবা সন্ধ্যার আগে গরুগুলোকে যখন ডাক দেওয়া হয়, অমন নাকি নাকি সুরে ডাকা হয় কেন। ও জানে এই নিয়ম। অবিশ্যি যারা ডাকে, তারা নিজেরাই বা আট বছরের সত্যবতীর চাইতে বেশী কী জানে? তারাও জ্ঞানাবধি দেখে আসছে গরুকে সাঁঝ-সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিয়ে আনবার সময় আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে যে আহ্বানটা জানানো হয়, সেটার সুর সানুনাসিক। কে জানে কোনকালে কোন 'বরপ্রাপ্ত' গরু মানুষের ভাষা শিখে ফেলে, মানুষের কাছে তার পছন্দ-অপছন্দর নমুনাটা জানিয়েছে কিনা। বলেছে কিনা "এই সানুনাসিক স্বরটাই আমার রুচিকর।"

আপাততঃ দেখা যাচ্ছে ওই অবোলা জীবগুলি এই এ প্রান্ত ও প্রান্ত ধুয়োতে সচকিত হয়ে দ্রুতগতিতে গোহালমুখী হচ্ছে। তারাও গলা তুলে আকাশটাকে দেখে নিচ্ছে একবার একবার।

সত্যবতী একটা সংবাদ বহন করে দ্রুতগতিতে বাঁড়ুয্যে-পাড়া থেকে বাড়ির দিকে আসছিল, তবু আশেপাশে ধুয়ো শুনে অভ্যাসবশে গলার সুর চড়িয়ে হাঁক পাড়ল, "শামলী আঁ—য়! ধবলী আঁ—য়।"

আমবাগানের ওদিক দিয়ে রামকালী ফিরছিলেন রায়পাড়া থেকে পায়ে হেঁটে।

পাল্‌কিটি ধার দিয়ে আসতে হয়েছে রায়পাড়ায়।

গ্রাম-বৃদ্ধ রায়মশায়ের অবস্থা খারাপ, খবর পেয়ে নাড়ী দেখতে গিয়েছিলেন রামকালী। নাড়ীর অবস্থা দেখে গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা দিলেন, আর ব্যবস্থা দিয়েই পড়লেন বিপাকে।

রায়মশায়ের ছেলেরা দুজনেই গত হয়েছে, আছে তিন নাতি, কিন্তু তাদের এমন সঙ্গতি নেই যে পাল্‌কিভাড়া দিয়ে আর চারটে বেহারাকে মজুরি জলপানি দিয়ে ঠাকুরদার গঙ্গাযাত্রা করাবে! অথচ অমন নিষ্ঠাবান সদাচারী প্রাচীন মানুষটা ঘরে পড়ে মরবে? এটাই বা চোখে দেখে সহ্য করা যায় কি করে? আর গেলে ত্রিবেণীর গঙ্গাই উত্তম। 'গঙ্গাযাত্রা'র

ঘোষণা শুনেই রায়মশাইয়ের নাতিরা যেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল, সঙ্গে সঙ্গেই বলতে হল রামকালীকে, "পাল্‌কির জন্যে চিন্তা ক'রো না, আমার পাল্‌কিতেই যাবেন রায়-কাকা।"

নাতিরা অস্ফুটে একবার বলল, "আপনাকে রোগী দেখতে দূরে দূরে যেতে হয়, পাল্‌কিটা দিলে—"

রামকালী গম্ভীর হাস্যে বললেন, "তবে নয় ঠাকুরদাকে কাঁধে করেই নিয়ে যাও। তিন নাতি রয়েছ উপযুক্ত।"

বয়োজ্যেষ্ঠের পরিহাস বাক্যে হেসে ফেলবে এমন বেয়াদবির কথা অবশ্য ভাবাই যায় না, কাজে কাজেই তিনজনে ঘাড় চুলকোতে লাগল। আর ওরই মধ্যে যে বড়, সে সাহসে ভর করে বলল, "ভাবছিলাম গো-গাড়ি করে—"

"ভাবাটা খুব উচিত হয় নি বাপু!" রামকালী বলেন, "গো-গাড়ি চড়িয়ে নিয়ে গেলে ওই বিরেনব্বই বছরের জীর্ণ খাঁচাখানা কি আর প্রাণপাখি-সমেত গঙ্গা পর্যন্ত পৌঁছবে? পাখি খাঁচাছাড়া হয়ে উড়ে যাবে। আমিও ওঁর সন্তানতুল্য বাপু, তোমাদের সঙ্কোচ করবার কিছু নেই। তা ছাড়া চটপট ব্যবস্থার দরকার, কখন কি হয় বলা যায় না।"

রায়মশাইয়ের ঘোলাটে চোখ দুটো থেকে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। তিনি শিরাবহুল শীর্ণ ডান হাতখানা আশীর্বাদের ভঙ্গীতে তুলে বললেন, "জয়স্তু।"

বাইরে এসে রামকালী পাল্‌কিবেহারা কটাকে নির্দেশ দিলেন, "পাল্‌কিটা আর মিথ্যে বয়ে নিয়ে যাবি কেন, ওটা এখানেই থাক, তোরা বাড়ি গিয়ে খেয়েদেয়ে নে গে। শেষরাত্তে উঠে চলে আসবি। আর দেখ্‌ বাড়ি থেকে কালকের সারাদিনের মতন জলপান নিয়ে আসবি বুঝলি? আর শোন্‌ তোরা এখন এখানে কিছু কাজ-কর্মের প্রয়োজন আছে কি না দেখ্‌। আমি বাড়ি ফিরছি।"

জোর পায়েই ফিরছিলেন রামকালী, কারণ বেরিয়েই দেখেছিলেন ঈশান কোণে মেঘ। পাল্‌কি চড়ে রুগী দেখতে যান বলে যে রামকালী হাঁটতে অনভ্যস্ত, তা নয়। প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে, প্রাতঃকৃত্য সেরে ক্রোশ দুই হেঁটে আসা তাঁর নিত্য-কর্মের প্রথম কর্ম। তবে হ্যাঁ, রোগীর বাড়ি যাওয়ার কথা আলাদা, সেখানে মান-মর্যাদার প্রশ্ন।

পথ সংক্ষেপের জন্য বাগানের পথ ধরেছিলেন, কিন্তু আমবাগানের কাছ

বরাবর আসতেই ঝরাপাতা আর ধুলোর ঝড় উঠল। রামকালী তাড়াতাড়ি বাগানের মাঝামাঝি থেকে বেরিয়ে কিনারায় এলেন, আর আসতে না আসতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। গলা কার?

সত্যর না?

হ্যাঁ, সত্যরই তো মনে হচ্ছে।

যদিও ঝড়ের সোঁ সোঁ শব্দের বিপরীতে শব্দটা হওয়ায় বুঝতে সামান্য সময় লেগেছিল, কিন্তু সে সামান্যই। তা ছাড়া গরু দুটোর নামও পরিচিত। শ্যামলী ধবলী রামকালীর বাড়িরই গরু। গরু অবিশ্যি চাটুয্যেদের এক-গোহাল আছে, কিন্তু এই গরু দুটি বিশেষ সুলক্ষণযুক্ত বলে রামকালীর বড়ই প্রিয়। সময় পেলেই রামকালী নিজে হাতে ওদের মুখে ঘাস ধরে দেন, গায়ে হাত বুলোন। বাড়ির কুমারী মেয়েরা শ্যামলী ধবলীকে নিয়েই "গোকাল ব্রত" করে, আর মোক্ষদা ওদের কাছ থেকে সংগৃহীত গোময় দ্বারাই সম্যক বিশুদ্ধতা রক্ষা করে চলেন।

কান খাড়া করে ধ্বনির মূল উৎসের দিকটা অনুমান করে নিলেন রামকালী, তার পর দ্রুতপায়ে এগিয়ে গিয়ে ধরে ফেললেন কন্যাকে। সত্যবতী তখন ধুলোর আচোট থেকে চোখ রক্ষা করতে আঁচলের কোণটা দু হাতে মুখের সামনে তুলে ধরে ছুটছিল।

"যাচ্ছিস কোথায়?"

জলদগম্ভীর স্বরে হাঁক পাড়লেন রামকালী।

সত্যবতী চমকে মুখের ঢাকা খুলে থ।

যদিও সকলেই সত্যবতীকে 'বাপ-সোহাগী' আখ্যা দেয় এবং সত্যিই সত্যবতী রামকালীর বিশেষ আদরিণী,—তা ছাড়া পয়মন্ত মেয়ে বলে রামকালী মনে মনে বেশ একটু সমীহও করেন তাকে, তাই বলে সামনাসামনি যে কোন আদর-আদিখ্যেতার পাট আছে তা নয়। কাজেই বাবার গলা শুনেই সত্যবতীর 'হয়ে গেছে।'

রামকালী আর একবার প্রশ্ন করেন, "এমন সময় একা গিয়েছিলি কোথায়?"

সত্যবতী ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, "সেজপিসীর বাড়ি।"

সত্যবতী যাকে সেজপিসী আখ্যা দিল, তিনি হচ্ছেন রামকালীর খুড়তুতো বোন, এ গ্রামেই শ্বশুরবাড়ি। এ গ্রামেই বাস।

রামকালী ভুরু কুঁচকে বলেন, "অত দূরে আবার একা একা যাবার দরকার কি? সঙ্গে কেউ নেই কেন?"

এই, এই জন্যেই সত্যবতীর 'বাপসোহাগী' আখ্যা।

চড় নয়, চাপড় নয়, নিদেন একটা কানমলাও নয়। শুধু একটু কৈফিয়ত তলব।

সত্যবতী এবার সাহস পেয়ে বলে, "না একা কেন, পুণ্যিপিসী আর নেড়ু ছিল সঙ্গে। তারপর আমি এই তোমাকে ডাকতে ছুটতে ছুটতে আসছি।"

"আমাকে ডাকতে ছুটতে ছুটতে আসছিস?" রামকালী ভুরু কুঁচকে বলেন, "কেন? আমায় কি দরকার?"

সত্যবতী এবার পূর্ণ সাহসে ভর করে সোৎসাহে বলে, "জটাদার বৌ যে মর-মর। নাড়ি ছেড়ে গেছে। তাই সেজপিসী কেঁদে বসল, 'যা সত্য এক বার মেজদাকে ডেকে নিয়ে আয়, যেখানে পাস।' তা আমি রায়পাড়া গিয়ে শুনলাম তুমি এইমাত্তর চলে এসেছ।"

"আবার রায়পাড়াও গিছলি? নাঃ বিপদ করলে দেখছি। জটার বৌয়ের আবার হঠাৎ কি হল যে নাড়ী ছেড়ে যাচ্ছে?"

"যাচ্ছে কি বাবা", সত্য আরও উৎসাহ সহকারে বলে, "গেছে! সেজপিসী চেঁচাচ্ছে, বুক চাপড়াচ্ছে, আর বালিশ বিছানা সরিয়ে নিচ্ছে।"

"আঃ, কী যে বলে! চল দেখি গে।" রামকালী বলেন, "ঝড় উঠে পড়ল এখুনি বিষ্টি আসবে, কী মুশকিল! হয়েছিল কি?"

"কিছু নয়। সেজপিসী বললে, রান্নাবান্না সেরে যেই খেতে বসেছে জটাদার বৌ, আর অমনি জটাদা পান চেয়েছে। জটাদার বৌ বলেছে 'পান ফুরিয়ে গেছে', ব্যস, বাবু মহারাজের রাগ হয়ে গেছে। দিয়েছেন ঠাঁই ঠাঁই করে পিঠের ওপর লাথি। আর অমনি জটা বৌঠান কাঁসিতে মুখ থুবড়ে—" হঠাৎ খুক খুক করে হেসে ওঠে সত্যবতী।

"হাসছিস যে?"

ধমকে উঠলেন রামকালী। বিরক্তও হলেন। কী অসভ্য হচ্ছে মেয়েটা! হাসির কি সময় অসময় নেই? বললেন, "মানুষ মরছে দেখে হাসতে হয়? এই শিক্ষা-দীক্ষা হচ্ছে?"

সত্যবতী নিতান্তই হেসে ফেলেছিল, এখন বাপের ধমকে সামলে নিয়ে মুখটা ম্লান করবার চেষ্টা করে বলে, "সেজপিসী বলছিল, যেই না ধাক্কা

খাওয়া অমনি কুমড়ো গড়াগড়ি হয়ে দাওয়া থেকে উঠোনে পড়ে গেল!"

কষ্টে হাসি চেপে ফের বলে সত্যবতী, "জটাদার বৌ অনেক ভাত খায় না বাবা? তাই অত মোটা?"

"আঃ!" বলে বিরক্তি প্রকাশ করে তাড়াতাড়ি এগোতে থাকেন রামকালী।

সত্যবতীও হাঁটায় কিছু কম দড় নয়। বাপের সঙ্গে সমানই এগোতে থাকে।

রামকালীর জটার বৌয়ের জন্য সহানুভূতিতে যতটা না হোক, জটার ব্যবহারে মনে মনে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করেন। হতভাগা বামুনের-ঘরের গরু, পেটে 'ক' অক্ষরের আঁচড় নেই, গাঁজা-গুলি সবেতেই ওস্তাদ। আবার বংশছাড়া বিত্তে হয়েছে, বৌ-ঠেঙানো! 'জটা' 'ফটা'র বাপ তো অমন ছিল না! বরং রামকালীর গুণবতী বোনই লোকটাকে সারাজীবন জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খেয়েছেন।

কে জানে কী ভাবে বেটক্করে লেগেছে, সত্যিই যদি মরে-টরে যায়, দস্তুরমত ফ্যাসাদে পড়তে হবে।

সত্যবতীর কথা ভুলে গিয়ে আরও জোরে পা চালান রামকালী। সত্যবতী এবার দৌড়তে শুরু করে। হেরে যাবে না সে।

চোখ কপালে উঠে স্থির হয়ে গেছে, মুখে ফেনা ভেঙে সে ফেনা শুকিয়ে উঠেছে। হাত পা ঠাণ্ডা পাথর।

সন্দেহ আর নেই, সমস্ত লক্ষণই স্পষ্ট। তুলসীতলায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যেই। অবশ্য কষ্ট করে আর ঘর থেকে বয়ে আনতে হয় নি, লাথি খেয়ে গড়িয়ে তো উঠোনেই পড়েছিল তুলসীতলার কাছ বরাবর। দণ্ড খানেকের মধ্যেই বেতারবার্তায় সারা পাড়ায় সংবাদ রটে গেছে, এবং পাড়া ঝেঁটিয়ে মহিলাবৃন্দ এসে জড়ো হয়েছেন, আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কা তুচ্ছ করে।

ব্যাপারটা তো কম রংদার নয়, দৈনন্দিন বৈচিত্র্যশূন্য জীবননাট্যের মধ্যে এমন একটা জোরালো দৃশ্য দর্শনের সৌভাগ্য জীবনে কবার আসে?

প্রথমে সমস্ত জনতার মধ্যে উঠল একটা চাপা উত্তেজনার আলোড়ন, "জটা নাকি বৌটাকে একেবারে শেষ করে ফেলেছে?" তার পর 'হায় হায়'। জটা সম্পর্কে মন্তব্যগুলিও এখন আর জটার মার কান বাঁচিয়ে হচ্ছে না।

কারণ স্পষ্ট কথা বলে নেবার মত এ-হেন সুযোগই বা কার জীবনে কবার আসে ?

"সত্যি শেষ হয়ে গেছে ? ছি ছি ছি, কী খুনে দস্যি ছেলে গো !" ··"ধন্যি সন্তান পেটে ধরেছিল মাগী ! আচ্ছা জটাটাই বা এত গোঁয়ার হল কোথা থেকে ? ওদের বাপ তো মহা ভালমানুষ ছিল।"···"হল কোত্থেকে। তুমি আর জালিও না ঠাকুরঝি, বলি গর্ভধারিণীটি কেমন ? এ হচ্ছে খোলের গুণ!"..."আহা হাবা গোবা নিপাট ভালমানুষ বৌটা, মা-বাপের বাছা, বেঘোরে প্রাণটা গেল !" এমনি নানাবিধ আলোচনা চলতে থাকে। একটা মেয়েমানুষের জন্যে এর চাইতে আর কত বেশী দরদ আশা করা যায় ?

প্রতিবেশিনীদের আক্ষেপোক্তিগুলো নীরবে হজম করতে বাধ্য হচ্ছিলেন জটার মা, কারণ আজ তিনি বড়ই বেকায়দায় পড়ে গেছেন। তাই সমস্ত মন্তব্য চাপা পড়ে যায় এমন সুরে মড়াকান্নাটা জুড়ে দেন তিনি, বুক চাপড়ে চাপড়ে মর্মভেদী হৃদয়বিদারক ভাষায় ইনিয়ে বিনিয়ে।

বাড়ির কাছাকাছি আসতে না আসতেই শুনতে পেলেন রামকালী খুড়তুতো ছোটবোনের সেই পাঁজরভাঙা শোকগাথা, "ওরে আমার ঘরের লক্ষ্মী ঘর ছেড়ে আজ কোথায় গেল রে ! ওরে সোনার পিতিমেকে বিসজ্জন দিয়ে আমি কোন্ প্রাণে ফের সংসার করব রে ? ওরে জটা, তোর যে নগরে না উঠতেই বাজারে আগুন লাগল রে !"

সত্যবতী বলে উঠল, "যাঃ, সর্বনাশ হয়ে গেল।"

দ্রুত পদক্ষেপটা হঠাৎ স্তিমিত হল, ভুরুটা একবার কুঁচকোলেন রামকালী। যাক, তা হলে হয়েই গেছে ! তবে আর তিনি গিয়ে কি করবেন ? এখন জটা হতভাগার কপালে কত দুর্গতি আছে কে জানে !

হঠাৎ ভয়ানক রকমের একটা চীৎকার উঠল, বোধ করি ফিনিশিং টাচ্। "ওরে বাবারে, আমার কী সর্বনাশ হল রে ! কী রাঙের রাধা বৌ এনেছিলাম রে !"

রামকালী পায়ে পায়ে এগোতে এগোতে সহসা দরজার কাছাকাছি এসেই ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "যাক, সত্যিই শেষ হয়ে গেছে তা হলে। সত্য তুই বাড়ি যা।"

সত্যবতী কাঠ !

"বাড়ি! একলা ?"

"কেন একলা কেন, নেড়ু আর পুণ্যি এসেছিল বলিনি না ?"

সত্যবতী ভয়ে ভয়ে বলে, "এসেছিল তো, আর কি এখন যাবে তারা ?"

"যাবে না ? যাবে না মানে ? ওদের ঘাড় যাবে। দেখ কোথায় আছে। আমাকে তো আবার এদের এদিক দেখতে হবে।"

কৈফিয়ত দিয়ে কথা রামকালী কদাচ কাউকে বলেন না, কিন্তু সত্যর কাছে সামান্য একটু সহজ রামকালী।

সত্যবতী গুটি গুটি এগিয়ে একবার পিসীর উঠোনের ভিতর গিয়ে দাঁড়ায়, এদিক ওদিক তাকিয়ে নেড়ু পুণ্যি কারও দেখা না পেয়ে ফিরে এসে ম্লান মুখে বলে, "ওদের কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।"

"কেন, গেল কোথায় সব ?"

"কি জানি।" সত্য আস্তে আস্তে সাহসে ভর করে প্রাণের কথাটা বলে ফেলে, "বাবা, তুমি তো মরা বাঁচাতে পার ?"

"মরা বাঁচাতে! দূর পাগলী!"

সত্য ম্রিয়মাণ ভাবে বলে, "তবে যে লোকে বলে।"

"লোকে বলে ? কি বলে ?" অন্যমনস্ক ভাবে মেয়ের কথায় জবাব দিয়ে রামকালী এদিক ওদিক তাকাতে থাকেন যদি একটা বেটাছেলের মুখ চোখে পড়ে। এসে যখন পড়েছেন তিনি, দায়িত্ব এড়িয়ে চলে যেতে তো পারেন না। জটাদের তেমন বাঁশঝাড় না থাকে, রামকালীর বাগান থেকেই বাঁশ কেটে আনতে হুকুম দেবেন। কিন্তু কই ? কে কোথায় ? বাড়ির ভিতর থেকে সুর উঠেছে নানা রকম, বাইরেটা শূন্য স্তব্ধ!

ভালর মধ্যে আকাশটা হঠাৎ মেঘ উড়ে গিয়ে দিব্যি পরিষ্কার হয়ে উঠেছে, আর বোঝা যাচ্ছে সন্ধ্যার এখনো দেরি আছে।

হঠাৎ সত্যবতী একটা অসমসাহসিক কাণ্ড করে বসে, বাপের একখানা হাত দুহাতে চেপে ধরে রুদ্ধকণ্ঠে বলে ওঠে, "বলে যে কবরেজ মশাই মরা বাঁচাতে পারেন। দাও না বাবা একটুখানি ওষুধ জটাদার বৌকে।"

রামকালী এই অবোধ বিশ্বাসের সামনে থতমত খেয়ে সহসা কেমন অসহায় অনুভব করেন। তাই ধমকে ওঠার পরিবর্তে মাথা নেড়ে বলেন, "ভুল বলে মা! কিছুই পারি নে। মিথ্যে অহঙ্কারে কতকগুলো শেকড়-বাকড় নিয়ে নাড়ি, আর লোক ঠকাই।"

সত্যবতী এ কথার সুর ধরতে পারল না, পারার কথাও নয়, বুঝল এ হচ্ছে বাবার রাগের কথা। কিন্তু আপাতত সে মরীয়া। যা থাকে কপালে, বাবার হাতে যদি ঠেঙানি খাওয়া থাকে তাই খাবে, সত্য, কিন্তু সত্যবতীর চেষ্টায় জটাদার বৌটা যদি বাঁচে! তাই চোখ-কান বুজে সে বাবার গায়ের চাদরের খুঁটটা টেনে বলে ফেলে, "তোমার পায়ে পড়ি বাবা, জন্মের শোধ একটু ওষুধ দাও না! আহা বিনি চিকিচ্ছেয় মারা যাবে জটাদার বৌ!"

মরার পর যে আর চিকিচ্ছে চলে না এ কথা আর মেয়ের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারলেন না রামকালী। শুধু একটা নিশ্বাস ফেলে ফের ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "চল দেখি।"

জমজমাট নাটকের মধ্যিখানে যেন হঠাৎ আসরের চাঁদোয়া ছিঁড়ে পড়ল।

কবরেজ মশাইয়ের গলা-খাঁকারি না?

হ্যাঁ, তাই বটে। বিশালকায় সুকান্তি পুরুষ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সত্যর শানানো গলা বেজে উঠেছে, "বাবা বলছেন ভিড় ছাড়তে হবে।"

পাড়ার মহিলারা মাথার কাপড় টেনে চুপ করে গেলেন। শুধু জটা-জননী ডুকরে উঠলেন, "ও মেজদা গো, আমার জটা আজ লক্ষ্মীছাড়া হল গো!"

"থাম্!" যেন একটা বাঘ হুঙ্কার দিল, "তোর জটা আবার লক্ষ্মীছাড়া না ছিল কবে? একেবারে শেষ করে ফেলেছে তো?"

ভিড় সরে গেছে, কবরেজ মশাই ভাগ্নে-বৌয়ের কাছে গিয়েও যতটা সম্ভব ছোঁওয়া বাঁচিয়ে হেঁট হয়ে দু আঙুলে নাড়িটা টিপে ধরেন, আর মুহূর্তকাল পরেই চমকে ওঠেন।

যাক্, সব রং তামাশা ফক্কিকার!

শুধু নাটকের একটা দৃশ্যই জখম নয়, আগাগোড়া নাটকটাই খতম! 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া'র এহেন উদাহরণ আর কখনও কেউ দেখেছে না শুনেছে? জটার বৌয়ের এই আচরণটা যেন ধাষ্টামোর চরম, ক্ষমার অযোগ্য। ছি ছি, মেয়েমানুষের প্রাণ বলে কি এমনই কাঠ-পরমায়ু হতে হয় গা? তবে এ মেয়েমানুষের কপালে যে অশেষ দুঃখ তোলা আছে, তাতে আর কারও মতভেদ থাকে না। মরে গিয়ে তুলসীতলায় শুয়ে আবার চার দণ্ড পরে ঘরে

উঠে শোয়, ঢক ঢক করে এক বাটি গরম দুধ গেলে, এমন মেয়েমানুষের খবর এর আগে এঁরা অন্তত কেউ পান নি।

"ছি ছি, কী ঘেন্না! পুরুষের প্রাণ হলে আর ওই স্বর্ণসিঁদুরটুকু জিভে ঠেকিয়েই চোখ খুলতে হত না।"…"যাই বল জটার বৌ খুব খেল্ দেখালো বটে!"…"এইবার শাশুড়ী মাগীর হাতে যা খোয়ার হবে টের পাচ্ছি, মাগীর যা অপমান্যি হয়েছে আজ!"…"কিন্তু যাই বলো তুলসীতলা থেকে অমন হুট্ করে ঘরে তোলাটা ঠিক হয় নি, একটা অঙ্গ প্রাচিত্তির-টাচিত্তির করা কোর্তব্য ছিল।"…"কে জানে বাবা, সত্যি বেঁচে ছিল না কোন অপদেবতায় ভর করল! আমার তো কেমন সন্দ হচ্ছে।"…"থাম সেজ বৌ, সাঁজ সন্ধ্যেয় একা ঘাটে পথে যাই, ভাবলে গা ছম্ ছম্ করবে। কিন্তু চাউনিটা একটু কেমন কেমনই লাগল।"…"না না, ওসব কিছু না, কবরেজ মশাই তো বললেনই, আচমকা ধাক্কা খেয়ে ভির্মি গেছল।"

"নে বাবা চল চল, ছিষ্টি সংসারের কাজ পড়ে, নাহক পাঁচ দণ্ড সময় বৃথা নষ্ট হল।"…"জটার মার আদিখ্যেতাটা দেখলি? যেন বৌ মরে বুক একেবারে ফেটে যাচ্ছিল!"…"দেখেছি! দেখতে আর বাকী কিছু নেই। বুক যদি ফেটেছে তো বৌ জীইয়ে ওঠায়! বড় আশায় ছাই পড়ল। ভাবছিল তো বেটা তার 'ভাগ্যিমান' হল! আবার এখুনি তার বে দিয়ে, দানসামগ্রী গয়নাপত্তর ঘরে তুলবে!"

বাক্যের স্রোত আর থামে না।

ঘাটে পথে, আপন আপন বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে বাক্যের বৃন্দাবন বসে যায়। এত বড় একটা ঘটনাকে এত সহজে জুড়িয়ে ফেলতে ইচ্ছে কারুরই হচ্ছে না; জটার মাকে 'পেড়ে ফেলবার' এত বড় সুবর্ণ-সুযোগটাও মাঠে মারা গেল। জটার বৌয়ের উপর কিছুতেই আর প্রসন্ন হতে পারছেন না কেউ, বৌটা যেন সবাইকে বড় রকমের একটা ঠকিয়েছে। জ্ঞাতি খুড়শাশুড়ী খবর পেয়েই আঁচলের তলায় লুকিয়ে আলতা পাতা আর সিঁদুর গোলা এনেছিলেন, যাতে প্রথম সিঁদুর দেওয়ার বাহাদুরিটা তাঁরই হয়। সেগুলো এখন ঘাটে ভাসিয়ে এলেন। যতই হোক, মড়ার জন্যে আনা তো। তা রাগটা তাঁরই বেশী হচ্ছে জটার বউয়ের ওপর!

না, নাম কেউ জানে না, জানবার চেষ্টাও করে না 'জটার বৌ' এই তার একমাত্র পরিচয়, এরপর শেষ পরিচয় হবে, 'অমুকের মা।' তবে আর নামে

দরকার কি? নামে দরকার নেই কিন্তু তার কথায় সকলেরই দরকার আছে। সেই দরকারী কথাগুলোর মধ্যে হঠাৎ জ্ঞাতি খুড়শাশুড়ী বলে উঠলেন, "আমাদের বাপের বাড়ির দেশ হলে ও বৌকে আর ঘরে উঠতে হত না, ওই গোয়ালে কি ঢেঁকিশেলে জীবন কাটাতে হত।"

দু-একজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন, 'জীবন' নিয়ে বিচারটা কেন?

খুড়শাশুড়ী ফের রায় দেন, "একে তো তুলসীতলায় বার করা, তা'পর আবার কত বড় অনাচার ভাব, মামাশ্বশুরের ছোঁয়াচ খাওয়া! কবরেজ মশাই যখন নির্ভরসায় নাড়ি টিপে ধরলেন, তখনই তো আমি 'হাঁ'! অবিশ্যি উনি ভেবেছিলেন মরেই গেছে। আর মরে গেলে সৎকারের আগে দেহশুদ্ধু তো একটা করতেই হত। কিন্তু এ যে একেবারে জলজ্যান্ত জীইয়ে উঠল! প্রাচিত্তির না করলে কি করে চলবে।"

বহু গবেষণান্তে স্থির হল মামাশ্বশুর স্পর্শের পাতকস্বরূপ একটা প্রায়শ্চিত্ত জটার বৌকে করতেই হবে, তা ছাড়া মরে বাঁচার পাতকে আর একটা। নইলে জটার মাকে 'পতিত' থাকতে হবে।

বেচারা অপরাধিনী তো অচৈতন্য। জটার মাও জটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কাজেই একতরফা ডিক্রী হয়ে যায়।

কিন্তু সত্যবতী এসবের কিছুই জানে না। ও এক অদ্ভুত গৌরবের আনন্দে ছলছল করতে করতে বাবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ফেরে।

উঃ, রাগ করে বাবা কী উলটো কথাই বলছিলেন। বলছিলেন কি না "চিকিচ্ছে-টিকিচ্ছে কিচ্ছু জানি না—" সাধে কি আর সত্য অত দুঃসাহস করে বাবাকে হাতে ধরে বলেছিল, একটু ওষুধ দিতে, তাই না বেচারী বৌটা বাঁচল। আহা সত্য যখন শ্বশুরবাড়ি যাবে, তখন যদি সত্যর বর (মুখে অলক্ষ্যে একটু হাসি ফুটে ওঠে) অমনি মেরে সত্যকে মেরে ফেলে বেশ হয়। বাবা খবর পেয়ে গিয়ে একটি মাত্রা স্বর্ণসিঁদুর মধু দিয়ে মেড়ে খাইয়ে দেবেন, আর একটু পরেই সত্য চোখ খুলে সবাইকে দেখে তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টেনে ফেলবে।

উঃ, কী মজাই হবে তা হলে!

দেশসুদ্ধু লোকের তাক্ লেগে যাবে সত্যর বাবা রামকালী কবরেজের গুণের মহিমায়। বাপ রে বাপ, সোজা বাবা তার? গাঁয়ের আর কোন্ মেয়েটার এমন বাপ আছে?

হাসির কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সশব্দে হেসে ফেলা সত্যর বরাবরের রোগ।

রামকালী চমকে প্রশ্ন করলেন, "কী হল? হাসলি যে?"

সত্য কষ্টে সামলে নিয়ে ঢোক গিলে বলল, "এমনি!"

"তোর ওই 'এমনি' হাসিটা একটু কমা দিকি," প্রায় সহাস্যেই বলেন রামকালী, "নইলে এর পর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ওই জটার বৌয়ের দশা হবে তোর।"

মনটা বড় প্রসন্ন রয়েছে, এই সামনে রাত, না হক্ কতগুলো ঝঞ্ঝাট-ঝামেলায় পড়তে হত, জটার বৌ তার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। বাপের মনের প্রসন্নতার কারণটা অনুমান করতে না পারলেও প্রসন্নতাটুকু অনুধাবন করতে পারে সত্যবতী, এবং তারই সাহসে প্রায় উচ্ছ্বসিত ভাবে বলে, "ওই জন্যেই হাসলাম। আমি মরে গেলে তুমি বেশ গিয়ে বাঁচিয়ে দেবে।"

"হুঁ, বটে!" স্বল্পভাষী রামকালী।

রামকালী নিঃশব্দে হন হন করে খানিকটা অগ্রসর হয়ে যান, এবং সত্যবতী বাপের সঙ্গে তাল রাখতে প্রায় ছুটতেই থাকে।

হঠাৎ একসময় থেমে রামকালী বলেন, "মরে গেলে স্বয়ং ভগবান এসেও কিছু করতে পারেন না বুঝলি? জটার বৌ মরে নি।"

"মরে নি!" সত্য একটু আনমনা হয়ে যায়, মরাটা তা হলে আর কোন্ রকম? হঠাৎ চিন্তার গতি বদলায়, সত্য সোৎসুকে বলে, "কিন্তু বাবা, তুমি গিয়ে নাড়ি দেখে স্বর্ণসিঁদুর না কি না খাওয়ালে, ওই রকম মরা-মরা হয়েই তো থাকত জটাদার বৌ? আর সবাই মিলে বাঁশ বেঁধে নিয়ে গিয়ে পাকুড়তলার শ্মশানে পুড়িয়ে দিয়ে আসত!"

রামকালী একটু চমকালেন।

আশ্চর্য! এতটুকু মেয়ে, এত তলিয়ে ভাবে কি করে? আহা মেয়েমানুষ, তাই সবই বৃথা। এ মগজটা যদি নেড়ুটার হত! তা হল না—আট বছরের হাতী এখনও 'অ আ ই'তে দাগা বুলোচ্ছে। নেড়ু রামকালীর দাদা কুঞ্জর শেষ কুড়োন্তি। তেরোটা ছেলেমেয়ে মানুষ করার পরে চৌদ্দটার বেলায় রাশ একেবারে শিথিল হয়ে গেছে কুঞ্জ আর তার পরিবারের। ছেলেটা বামুনের গরু হবে আর কি!

কিন্তু মেয়ে-সন্তানের বোধ করি এত বেশী তলিয়ে ভাবতে শেখাও ভাল

নয়, তাই রামকালী ঈষৎ ধমকের সুরে বলেন, "থাম থাম, মেলা বকিস নি, পা চালিয়ে চল। গহীন অন্ধকার হয়ে গেছে দেখছিস্ ?"

"অন্ধকার! হুঁ"!" সত্যবতী স-তাচ্ছিল্যে বলে, "অন্ধকারকে আমি ভয় করি নাকি? এর চাইতে আরও অনেক অনেক অন্ধকারে বাগানে গিয়ে পেঁচার চোখ গুনি না?"

"অন্ধকারে কী করিস ?"

চমকে ওঠেন রামকালী।

সত্য থতমত খেয়ে বলে, "ইয়ে—আমি একলা নয়, নেড়ু আর পুণ্যিপিসীও থাকে। পেঁচার চোখ গুনি।"

হঠাৎ রামকালী হা হা করে হেসে ওঠেন।

অনেকক্ষণ ধরে দরাজ গলায়। এই মেয়েকে আবার ধমকাবেন কি, শাসন করবেন কি!

নির্জন পথে অন্ধকারের গায়ে সেই গম্ভীর গলায় দরাজ হাসি যেন স্তরে স্তরে ধ্বনিত হতে থাকে।

বাঁড়ুয্যেদের চণ্ডীমণ্ডপ থেকে উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন দু-একটি গ্রাম্য প্রৌঢ়।

"বদ্দি চাটুয্যের গলা না ?"

"হ্যাঁ তাই তো মনে হচ্ছে।"

"একলা অমন অন্ধকারে হাসি কেন ?"

"একলা কি আর? নিশ্চয় ধিঙ্গী মেয়েটা সঙ্গে আছে। নইলে আর—"

"ওই এক মেয়ে তৈরি করেছেন রামকালী। ও মেয়ে নিয়ে কপালে দুঃখু আছে।"

"আর দুঃখু! টাকার ছালা ঘরে, ওর আবার দুঃখু! শুনছি নাকি বর্ধমানের রাজার কাছ থেকে লোক এসেছিল কাল, রাজার সভা-কবরেজ হবার জন্যে সাধতে।"

"তাই না কি? কই শুনি নি তো? তা হলে গাঁয়ের মায়া কাটাল এবার চাটুয্যে?"

"না না, শুনছি যাবে না।"

"বটে? তবু ভাল। তোমায় বললে কে?"

"কুঞ্জর বড় ছেলেটা বলছিল।"

"হুঁ ভালই, এ বয়সে আবার বিদেশে গিয়ে রাজদরবারে চাকরি! তবে

রামকালীর মতিগতি বড় বেয়াড়া, অত বড় ধিঙ্গী মেয়েকে এতটা বাড় বাড়তে দেওয়া উচিত হয় না, পাড়ার ছেলেগুলো হচ্ছে ওর খেলুড়ি।"

"হ্যাঁ, গাছে চড়তে, সাঁতার কাটতে, মাছ ধরতে বেটাছেলের দশগুণ ওপরে যায়!"

"এটা একটা গৌরবের কথা নয় খুড়ো! যতই হোক মেয়েছেলে, তায় আবার একটা মান্যিমান ঘরের বৌ হয়েছে। তারা টের পেলে ও বৌকে ঘরে নিতে বেঁকে বসবে না?"

"একটা কলঙ্ক রটিয়ে দিতেই বা কতক্ষণ?"

বদ্দি চাটুয্যের ও তার ধিঙ্গী মেয়ের আলোচনায় চণ্ডীমণ্ডপ ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। যাকে সামনে সমীহ করতে বাধ্য হতে হয়, তাকে আড়ালে নিন্দে করতে না পেলে বাঁচবে কেমন করে মানুষ?

এইসব সমালোচনার প্রধানা পাত্রী তখন বাবার পিছন পিছন ছুটছে আর মনে মনে আকুল প্রার্থনা করছে, 'হেই ভগবান, আমার পাটা বাবার মতন লম্বা করে দাও না গো, তা হলে বাবার মতন হাঁটি। হেরে যাই না।'

হেরে যেতে একান্ত আপত্তি সত্যবতীর!

কোন ক্ষেত্রে কোথাও হার মানবে না এই পণ!

"এই পুণ্যি, ছড়া বাঁধতে পারিস?"

চিলেকোঠার ছাদের ওপর সত্যবতীর 'খেলাঘর'! প্রধানা খেলুড়ি রামকালীর জ্ঞাতি খুড়োর মেয়ে পুণ্যবতী! সত্য তাকে পাঁচজনের সামনে সভ্যতা করে 'পুণ্যিপিসী' বললেও নিজের এলাকায় পুণ্যিই বলে।

"বাবুই পাখীর বাসা আনতে পারিস?" অথবা "কাঁচপোকা ধরতে পারিস?" কিংবা "সাঁতরে তিনবার বড় দীঘি পারাপার হতে পারিস?" এ ধরনের পরীক্ষা-মূলক প্রশ্ন প্রায়ই করে সত্য, কিন্তু ছড়া বাঁধতে পারিস কিনা, এহেন প্রশ্ন একেবারে আনকোরা নতুন।

পুণ্যি বিমূঢ়ভাবে বলে, "ছড়া? কিসের ছড়া?"

"জটাদার নামে ছড়া। বুঝলি? ছড়া বেঁধে গাঁ সুদ্ধু সব ছেলেমেয়েকে শিখিয়ে দেব, জটাদাকে দেখলেই তারা হাততালি দিয়ে ছড়া কাটবে।"

"হি হি হি!"

জটাধরের দুর্দশার চিত্র কল্পনা করে দুজনে দুলে দুলে হাসতে থাকে।

অতঃপর পুণ্যবতী একটি পাল্টা প্রশ্ন করে, "খুব তো বললি, বলি মেয়েমানুষকে আবার ছড়া বাঁধতে আছে না কি ?"

"বাঁধতে নেই ?" সহসা অগ্নিমূর্তি ধ'রে বসে সত্য, "কে বলেছে তোকে নেই ? মেয়েমানুষ ! মেয়েমানুষ ! মেয়েমানুষ যেন মায়ের পেটে জন্মায় না, বানের জলে ভেসে আসে। অত যদি মেয়েমানুষ মেয়েমানুষ করবি তো আমার সঙ্গে খেলতে আসিস নে।"

পুণ্যি মুচকি হেসে বলে, "আহা মশাই রে ! আর তোর বর যখন বলবে ?"

"কি বলবে ?"

"ওই মেয়েমানুষ।"

"ইস ! বলবে বৈকি ! দেখিয়ে দেব না। আমি ওই জটাদার বৌয়ের মত হব ভেবেছিস ? কক্ষনো না। দেখ না, ছড়া বেঁধে জটাদাকে কী উৎখাত করি।"

পুণ্যি ঈষৎ সমীহ ভাবে বলে, "কিন্তু কি করে বাঁধবি ?"

"কি করে আবার ? কথক ঠাকুর যেমন আখর দেন তেমনি করে। একটু-খানি তো বেঁধেছি, শুনবি ?"

"বেঁধেছিস ? অ্যাঁ ! বল না ভাই, বল না।"

সত্য আত্মস্থ ভাবে চেখে চেখে তেঁতুল খাওয়ার ভঙ্গীতে বলে—

"জটাদাদা, পা গোদা
যেন ভোঁদা-হাতী,
বৌ-ঠেঙানো দাদার পিঠে
ব্যাঙে মারুক লাথি।"

"ওরে সত্য !" পুণ্যি সহসা ডুকরে উঠে সত্যকে জড়িয়ে ধরে, "তুই কী রে ? এর পর তো তুই পয়ার বাঁধতে শিখবি রে।"

সেটাও যেন সত্যর কাছে কিছু নয় এমন ভাবে বলে, "সে যখন শিখব তখন শিখব, এখন এটা যে-যেখানে আছে সব্বাইকে শিখোতে হবে বুঝলি ? আর জটাদাকে দেখলেই—হি হি হি হি।"

পাঁচ

রোদে পিঠটা চিন্‌চিন্‌ করছে অনেকক্ষণ থেকে, হঠাৎ যেন হু হু করে জ্বলে উঠল। ওঃ, বকুলগাছের ছায়াটা দাওয়া থেকে সরে গেছে। বেলা তা হলে কম হয় নি। বিপদে পড়লেন মোক্ষদা, দুহাত জোড়া অথচ পিঠের কাপড়টা সরে গিয়ে সরাসরি রোদটা পিঠের চামড়ায় লাগছে; নিজে দেখতে পাচ্ছেন্‌ না মোক্ষদা, আর কেউ কাছে থাকলে দেখতে পেত মোক্ষদার হত্তেলরঙা পিঠটার কতকাংশ ফোস্কাপড়ার মত লাল হয়ে উঠেছে।

নাঃ, তসর থানখানা না পরে ভিজে থানখানা পরে আমতেল মাখতে বসলেই হত। ভিজে কাপড়ে যেন দেহের দাহ অনেকটা নিবারণ হয়। কানাউঁচু ভারী ভারী পাথরের খোরা দুখানা খানিকটা টেনে নিয়ে সরে গিয়ে দাওয়ার খুঁটির ছায়াটুকুতে পৃষ্ঠরক্ষা করতে গেলেন মোক্ষদা।

সমুদ্রে তৃণখণ্ড! তাছাড়া রোদ এখন দৌড়চ্ছে, এখুনি খুঁটির ছায়া সরবে।

হঠাৎ মোক্ষদা একটা সত্য আবিষ্কার করে বসলেন। সারা বছরটাই রোদে পুড়ে পুড়ে মলেন তিনি। এই তো কচি আমের আমতেল, এর পরই বাখড়া বাঁধা আমের গুড়আম, মসলা-আম, তার পরই পড়ে যাবে আমসত্ত্বর মরশুম। আর সে মরশুমকে সামলে তোলা তো সোজা নয়। আমসত্ত্বর পালা চুকতে চুকতেই অবশ্য বর্ষা নামে, সেই দু-তিনটে মাসই শুধু রোদে পোড়ার ছুটি, বর্ষা শেষ হতেই দুর্গোৎসবের সুর ওঠে। দুর্গোৎসবের আগে সারা ভাঁড়ারটাতেই তো ঝাড়া বাছা রোদে দেওয়ার ধুম চলে, তারপর পড়ে তিলের নাড়ুর ধুম।

বড়ি চাটুয্যের বাড়ির দুর্গোৎসবের তিলের নাড়ু একটা বিখ্যাত ব্যাপার, হাতে বাগিয়ে ধরে কামড় দিতে পারা যায় না এত বড় নাড়ু। পক্কান্ন আনন্দনাড়ু মুড়কির মোয়া সবই কবরেজ বাড়ির বখ্যাত, কিন্তু সে সব তো তবু পাঁচহাতের ব্যাপার, নিতান্ত প্রতিমার ভোগের উপযুক্ত সেরকতক জিনিস গঙ্গাজলে ভোগের ঘরে তৈরি হলেও বাকী বিরাট অংশটায় অনেকে হাত লাগায়। কিন্তু তিলের নাড়ুটি সম্পূর্ণ মোক্ষদার ডিপার্টমেণ্ট। কারণ তিলের নাড়ুর অমন হাত নাকি—শুধু এ গ্রামে কেন—এ তল্লাটে নেই। তা সেই নাম কি আর অমনি হয়েছে, আগাগোড়া নিজের হাতে ...খেন বলেই না এদিক ওদিক হতে পায় না। বস্তা বস্তা তিল তো এসে হাজির হল, তার

পর ? সেই তিল ঝাড়া-বাছা, নিখুঁত করে ধুয়ে নিপাট করে রোদে শুকিয়ে ঝনো করা, ঢেঁকিতে কোটা, প্রকাণ্ড পেতলের সরা চড়িয়ে গুড় জ্বাল দিয়ে দিয়ে নিটুট নিশ্ছিদ্দির ধামায় সেই তিলচুর মেখে মেখে তাড়াতাড়ি গরম থাকতে থাকতে নাড়ু পাকিয়ে ফেলা, এর কোনটা নিজের হাতে না করলে চলে ? একবার বুঝি তিলটা কুটেছিল সেজ বৌতে আর বড় বৌমাতে, সেবার তো নাড়ু 'দয়ে' মজ্‌ল। আগাগোড়া খোসায় ভর্তি। রঙ্‌ও হল তেমনি কেলে-কিষ্টি। রামকালী নাড় দেখে হেসেছিলেন, প্রশ্ন করেছিলেন, 'এ নাড়ু কার তৈরি ?'

সেই থেকে সাবধান হয়ে গেছেন মোক্ষদা। ঢেঁকির গড়ের কাছে কাউকে একটু বসানো ছাড়া আর সব একা করেন।

দুর্গাপুজোয় রোদে পোড়া তো শুধুই তিলের নাড়ু নয়, বাড়ি বাড়ি নেমন্তন্নর কথা বলতে যাওয়া, গুরুপুরুতের বাড়ি সিধে দিতে যাওয়া, সে সবও তো মোক্ষদার ডিউটির মধ্যেই। কারণ তিনি ঝিউড়ি মেয়ে। কাশীশ্বরীও কতকটা করেছেন আগে আগে কিন্তু ইদানীং তিনি রোগে কেমন জবুথবু হয়ে গেছেন। মাঠ ঘাট ভেঙে রোদে রোদে ঘুরে কাজ উদ্ধার করার সামর্থ্য নেই। মোক্ষদাই সব করেন, আর দিনে অন্তত বার চোদ্দ-পনেরো স্নান করেন।

কেন কে জানে, আজ রোদের কথাটাই বার বার মনে পড়ছে মোক্ষদার। মনে হল পুজোর ঝঞ্ঝাট কাটতে না কাটতেই তো বড়ির মরশুম। বছরে বারো-চোদ্দ মণ বড়ি লাগে। আঁশ-নিরামিষ দুদিকের প্রয়োজনের দায়টা পোহানো হয় এই দিকেই, কারণ বড়িও তো আম-কাসুন্দির মতই শুদ্ধাচারের বস্তু। আর শুদ্ধাচারের ব্যাপারে কাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন মোক্ষদা নিজেকে ছাড়া ?

বড়ি দিতে দিতে মোক্ষদার হল্তেল রঙ কালসিটে মেরে যায়। তবে জিনিস যা হয় দেখে তাক্ লাগবার মত। ডাকসাইটে হাত। সাবধানীও খুব মোক্ষদা, কাউকে ছুঁতেই দেন না সাধ্যপক্ষে, বড় বড় তিজেলে ভরে সরাচাপা দিয়ে 'সাঙা'য় তুলে রাখেন, সময়মত বার করে দেন। কত তার স্বাদ, কুমড়ো বড়ি, খাস্তা বড়ি, পোস্ত বড়ি, তিলের বড়ি, জিরের বড়ি, ঝালমশলার বড়ি, টকে-সুক্তয় দিতে মটর খেঁসারির বড়ি, বাহার অনেক।

ওরই মধ্যে মুলোর বড়িটা আবার আলাদা রাখতে হয়, মাঘ মাসে পাছে

ভুলে খাওয়া হয়ে যায়। মাঘ মাসে মুলো খাওয়া আর গোমাংস খাওয়ায় তো তফাৎ কিছু নেই।...খুঁটির রোদটা সরে গেছে, পিঠটা আবার চিনচিন করছে। মনটাও যেন চিনচিন করছে।

বড়িপর্ব সারা হতেই আসে কুল, আসে তেঁতুল।

কবে তবে রোদে পোড়ার ছুটি?

সারা বছর ধরে এই রোদে পোড়ার দায়িত্ব মোক্ষদাকে দিয়েছে কে, এ কথা কে বলবে? তবে মোক্ষদা জানেন এটা তাঁরই দায়িত্ব।

আমতেল মাখা একটা সময়সাপেক্ষ কাজ। চটকে চটকে তেলে আমে মিশোতে হবে তো? হয়েছে এতক্ষণে, এবার রাইসরষের মিহিগুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে ক্রমাগত রোদ খাওয়ানো।

কোমরটা টান করে উঠে পড়লেন মোক্ষদা, পিঠের জ্বালা-করা জায়গাটা নড়াচড়া পেয়ে আর একবার হু-হু করে উঠল। কিন্তু কী আশ্চর্য, সরষে গুঁড়োবার জন্যে রান্নাঘরে এসে ঢুকতেই মনটা 'হু-হু' করে উঠল কেন?

ঘরে ঢুকেই হঠাৎ কেমন বোকার মত দাঁড়িয়ে পড়লেন মোক্ষদা। ঘরটা আজ এত বড় দেখাচ্ছে কেন? কই এমন তো কোন দিন দেখায় না। বরং ভাত বাড়ার সময় পরস্পরের গা বাঁচিয়ে ব্যবধান রেখে ঠাঁই করতে তো জায়গার অকুলানই লাগে।

ঘরের মধ্যে তো রোদ নেই, তবু এই ছায়াশীতল প্রকাণ্ড লম্বা ঘরখানা যেন ওই রোদে খাঁ খাঁ প্রকাণ্ড উঠোনটার মতই ঝাঁ ঝাঁ খাঁ খাঁ করছে। আর সেই খাঁ খাঁ করা ঘরের এক প্রান্তে বড় বড় দুটো উনুন তাদের মাজাঘষা নিকোনো চুকোনো চেহারা নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে বহু অকথিত শূন্যতার প্রতীকের মত।

উনুন দুটোকে আজ আগুনের দাহ সহ্য করতে হবে না। ওরা হয়তো এই নিরালা ঘরে স্তব্ধ হয়ে বসে নিজেদের শূন্যতার পরিমাণ করবার অবকাশ পাবে।

আজ ওদের ছুটি। আজ এদের একাদশী।

মোক্ষদার ছুটি নেই কেন?

ঘরের নর্দমার কাছ বরাবর একটা জলভর্তি ঘড়া বসানো থাকে—নেহাৎ সময় অসময়ের জন্যে। মোক্ষদাই শেষবারের স্নানের পর এনে রেখে দেন।

তেল-তেল হাতটা ঘড়া কাৎ করে ধুয়ে নিয়ে মোক্ষদা হঠাৎ আছড়া আছড়া জল নিয়ে সজোরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগলেন, পিঠের রোদে চিন্‌চিনে জায়গাটায় জ্বলুনি একটু ঠাণ্ডা হোক। দূর ছাই, হাত ধুতে পুকুরে গেলেই হত, তবু একবার গা-মাথা ভিজিয়ে আসা যেত। গায়ের চামড়াটা খানিক ভিজলেও যেন ভেতরের তেষ্টাটা খানিক কমে।

একাদশীর দিন 'তেষ্টা' কথাটা মনে আনাও পাপ। এ কি আর জানেন না মোক্ষদা? তায় আবার তাঁর মত বয়স-ভাঁটিয়ে-যাওয়া শক্তপোক্ত মজবুত বিধবার। কিন্তু 'মনে করব না' বললেও মনে যদি এসে যায়, সে পাপকে তাড়ানো যায় কোন্ অস্ত্রে?

রোদ লাগলে বোশেখ-জষ্টির দুপুরে তেষ্টাটা জানান দেয় বেশী, কিন্তু উপায় কি? আজকেই যে যত রাজ্যের বাড়তি কাজ করবার পরম দিন। আজকের মতন এমন অখণ্ড অবসর আর ক'দিন জোটে?

রাইসরষের সন্ধানে কুলুঙ্গীতে তুলে রাখা রঙিন ফুলকাটা ছোট ছোট ছোবা হাঁড়ির একটা পাড়লেন মোক্ষদা। সব হাঁড়িতে একেবারে সম্বৎসরের মশলা ঝেড়ে বেছে তুলে রাখা হয়, আর নিত্য প্রয়োজনে দুটি দুটি বার করে কাচা ন্যাকড়ার কোণে কোণে পুঁটুলি বেঁধে রাখা হয়। শুধু এরকম অ-নিত্য প্রয়োজনেই মূল ভাঁড়ারে হাত পড়ে।

একটা পাথরবাটিতে আন্দাজ মত সরষে ঢেলে নিয়ে শিল পেতে বসতে যাচ্ছিলেন মোক্ষদা, হঠাৎ দরজার কাছে শিবজায়ার গলা বেজে উঠল, "কালে কালে কি হল গো, এ যে কলির চার পো পুরল দেখছি। আমাদের ধিঙ্গী অবতার মেয়ের আস্‌পদ্দার কথাটা শুনেছ ছোটঠাকুরঝি?"

ধিঙ্গী অবতার মেয়ের আস্‌পদ্দার ইতিহাস শোনার আগেই ভাজের আস-পদ্দায় রে রে করে ওঠেন মোক্ষদা, "উঠোনের পায়ে তুমি দাওয়ায় উঠলে সেজবৌ? আর ওইখানেই আমার আচারের খোরা! বলি তোমরা সুদ্ধ যদি এ রকম যবন হও—"

শিবজায়া ঈষৎ রুষ্টভাবে বলেন, "তোমার এক কথা ছোটঠাকুরঝি, উঠোনের পায়ে দাওয়ায় উঠে আসব আমি অমনি অমনি? এই দেখ পায়ে গোবর লেগে। হাতে করে এক নাদ এনে পৈঠের নীচেয় ফেলে সেই গোবর দু পায়ে মাড়িয়ে তবেই না উঠেছি!"

নিতান্তপক্ষে পুকুরে নেমে পা ধুয়ে আসা যদি অসম্ভব হয়, তা হলে অনুকল্প হিসেবে এই ব্যবস্থা দিয়ে রেখেছেন মোক্ষদা। তবু সেজবৌয়ের আশ্বাসবাণীতে তেমন নিশ্চিন্ত হলেন না। সন্দিগ্ধ সুরে বললেন, "বলি গোবরটা নিজেদের তো? না কি আর কারুদের ঘরের এঁটোকাটা খাওয়া গরুর?"

"শোন কথা—" জেরা থামানোর চেষ্টায় বলে ওঠেন শিবজায়া, "আমাদের উঠোনে আবার অপরের গরুর গোবর আসবে কোথ্ থেকে?"

কিন্তু থামাতে চাইলেই কি সব জিনিস থামে? মোক্ষদার জেরাও থামল না। তিনি একটু কটুহাস্যে বলে উঠলেন, "ও মা লো! আমাদের উঠোনে অন্যের গরুর গোবর আসবে কোথ্ থেকে! তোমার কথা শুনে মাঝে মাঝে মনে হয় সেজবৌ, তুমি যেন এই মাত্তর মায়ের পেট থেকে পড়লে!"

শিবজায়া ননদকে খুব ভয় করলেও, তবু ছোট ননদ। তাই বিরক্ত স্বরে বলে ফেলেন, "নাও বাবা, তোমার কাছে আসাই দেখছি ঝকমারি। গোবিন্দ-বাড়ি থেকে ফিরতে পথে আমাদের কীত্তিমান মেয়ের কীত্তির কথা শুনে হাঁ হয়ে গেলাম তাই, থাক গে—"

মোক্ষদা এতক্ষণে একটু নরম হন। প্রায় সন্ধির সুরেই বলেন, "কেন, কী আবার করল কে? সত্য বুঝি?"

"তবে আবার কে!" শিবজায়া ঔদাসীন্য ত্যাগ করে মহোৎসাহে পুরনো সুর ধরেন, "সত্য ছাড়া আর কার এত বুকের পাটা হবে? হারামজাদী নাকি জটার নামে ছড়া বেঁধে পাড়ার গুষ্টিসুদ্ধ ছেলেমেয়েকে শিখিয়ে দিয়েছে, আর গাঁসুদ্ধ ছেলেপিলে জটাকে কি জটার মাকে দেখলেই ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে শুনিয়ে শুনিয়ে তাই আওড়াচ্ছে। জটার মা তো রেগে গাল দিয়ে শাপশাপান্ত করে একাকার।"

শেষ পর্যন্ত সবটুকু শোনবার জন্যে ধৈর্য ধরে চুপ করে তাকিয়েছিলেন মোক্ষদা, এবার ভুরু কুঁচকে তীক্ষ্ণস্বরে বলে ওঠেন, "ছড়া বেঁধেছে মানে কি?"

"মানে কি, তাই কি ছাই আমিই আগে বুঝতে পেরেছিলাম? মেয়েমানুষ যে আবার ছড়া বাঁধে বাপের জন্মেও শুনি নি। তা'পর পথে আসতে আসতে দেখি একপাল ছোঁড়া হি হি করে হাসতে হাসতে বলছে 'জটা মোটা পা

গোদা—' ভেঙচি কেটে আরও সব কত কি পয়ার ছন্দ বলতে বলতে যাচ্ছে।"

মোক্ষদা আরও ভুরু কুঁচকে বলেন, "ছড়া বেঁধেছে সত্য?"

"তবে আর বলছি কি?"

"ওই মেয়ে হতেই এ বংশের মুখে চুনকালি পড়বে"—মোক্ষদা এবার শিলটা পাততে পাততে বলেন, "রামকালী চন্দর এখন বুঝছেন না, এর পর টের পাবেন, যখন শ্বশুরঘর থেকে ফেরত দিয়ে যাবে। ভেঙ্চি কাটা ছড়া বোধ হয় জটা বৌ ঠেঙিয়েছিল বলে?"

"তবে না তো কি? বলি পরিবারকে আবার না মারে কোন্ মদ্দ? ঢলানি বৌ অমনি তিলকে তাল করে, দাঁতকপাটি লাগিয়ে পাড়ার লোক জানাজানি করে ছাড়লেন। জটার মা বলছে ছোঁড়াগুলোর জ্বালায় নাকি জটা বেচারা ঘরের বার হতে পারছে না। কি গেরো বল দেখি?"

মোক্ষদা ঘস ঘস করে শিলে সরষে রগড়াতে রগড়াতে বলেন, "হাতের কাজটা মিটিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমি বৌমার কাছে। ভাল করে সমঝে দিয়ে আসছি। মায়ের আশকারা না থাকলে মেয়ে কখনও এত বড় বেয়াড়া হয়? পাড়ার ছোঁড়াদের সঙ্গেই বা রাতদিন এত মস্করা কিসের? একটা কলঙ্ক রটে গেলে তখন রামকালীর মুখটা থাকবে কোথায়? পয়সাওলা বলে তো আর সমাজ রেয়াৎ করবে না?"

শিবজায়ার কাজ কিছুটা সিদ্ধ হল।

বড়জায়ের নাতনীর বিরুদ্ধে ছোট ননদকে কিছুটা তাতাতে পেরেছেন। শেষবেশ বলেন, "তুমি যাই আছ ছোট্‌ঠাকুরঝি, তাই এখনও সংসারে একটা হক্ কথা হয়; নইলে আমরা তো ভয়ে কাঁটা।"

"ভয় আবার কিসের!"

মোক্ষদা দুম্ করে শিলটা তুলে ফেলে বলেন, "ভয় আবার কিসের? ভয় করব ভূতকে, ভয় করব ভগবানকে। মানুষকে ভয় করতে যাব কেন? বিধবা পিসীকে ভাত দিয়ে পুষছে বলে যে হক্ কথা শুনতে হবে না রামকালীকে, এ তুমি ভেবো না সেজবৌ। সে যাক, জটার বো'র প্রাচিত্তিরের কিছু ব্যবস্থা হয়েছে?"

"ওমা, তুমি শোন নি সে কথা? প্রাচিত্তির তো করবে না।"

"করবে না!"

"না। রামকালী নাকি ভটচায্‌কে শাসিয়েছে প্রাচিত্তিরের বিধেন দিলে তাকে গাঁ ছাড়া করবে।"

"তার মানে?" আকাশ থেকে পড়লেন মোক্ষদা।

"মানে বোঝ! অহমিকা আর কি! আমি গাঁয়ের মাথা, আমি যা খুশি তাই করব।"

"হুঁ।"

মোক্ষদা সরষে-গুড়ো-ছড়ানো আচারের খোরা দুটো দুম দুম করে ঘরে তুলে, ঘরের কপাটটা টেনে শেকল তুলে দিয়ে বলেন, "যাচ্ছি। দেখছি পয়সার বাড় কত বেড়েছে রামকালীর। সত্য আছে বাড়ি?"

"বাড়ি? দুপুরবেলা বাড়ি থাকবারই মেয়ে বটে সে! কোথায় আগানে-বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বে'ওলা মেয়ের এত বুকের পাটা, এতখানি বয়সে দেখি নি কখনও।"

তসরখানা গুছিয়ে পরে উঠোন পার হয়ে খর খর পায়ে বেড়ার দরজা খুলে পথে পড়লেন মোক্ষদা। ফিরে তো স্নান করতেই হবে, একবার কেন, কত বার, কিন্তু এসবের একটা হেস্তনেস্ত দরকার।

জগতের কোথাও কোন অনাচার ঘটবে, এ মোক্ষদা বরদাস্ত করতে পারবেন না।

কিন্তু ও কী!

একটু এগোতেই থমকে দাঁড়াতে হল।

বজ্রাহতের মতই থমকানি।

দেখলেন একখানা তেপেড়ে শাড়িতে গাছকোমর বেঁধে, একরাশ রুক্ষ চুল উড়িয়ে, একহাঁটু ধুলো মেখে একদল ছেলেমেয়ের সঙ্গে আমবাগানের মাঝখান দিয়ে চলেছে সত্য হি হি করতে করতে, আর সমস্বরে কি যেন একটা ছড়ার মতই আওড়াতে আওড়াতে।

দাঁতে দাঁত চেপে আরও একটু এগিয়ে গেলেন মোক্ষদা, দলের পিছন দিকে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সবটা শুনতে চেষ্টা করলেন। হি হি হাসির চোটে সব কি শোনাই যায় ছাই? তবু বালকণ্ঠের শানানো সুর, আর বার বার উচ্চারণ করছে, কাজেই ক্রমশঃ সবটাই কর্ণগোচর থেকে মর্মগোচর হয়ে যায়।

শুনতে পেলেন খাঁজে খাঁজে হাসি ছড়ানো সেই ছড়া—

"জটাদাদা পা গোদা
যেন ভোঁদা হাতী,
বৌ-ঠেঙানো দাদার পিঠে
ব্যাঙে মারে লাথি।
জটা জটা পেট মোটা—
ভাত মারবার ধাড়ী,
দেখব মজা কেমন সাজা
যাও না শ্বশুরবাড়ি।"

বলতে বলতে চলে গেল ওরা।

মোক্ষদা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

না, ভাইপোর মেয়ের কবিত্বশক্তির পরিচয়ে অভিভূত হয়ে নয়, স্তম্ভিত হলেন এ মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে। একে তিনি শাসন করতে এসেছেন! এর পরে আর একে শাসন করে শায়েস্তা করবার সাধ তাঁর নেই; শুধু এইটে মনে মনে অনুধাবন করলেন—একে নিয়ে চিরকাল জ্বলে-পুড়ে মরতে হবে তাঁদেরই, কারণ শ্বশুরবাড়ি থেকে তো মারতে মারতে খেদিয়ে দেবেই।

কাগজের চিলতেয় মোড়া গোটাকতক ওষুধের বড়ি আঁচলের গিঁট থেকে খুলতে খুলতে সত্য তার শানানো গলাটাকে কিঞ্চিৎ নামিয়ে বলল, "এই নাও বৌ, কি যেন বটিকা। বাবা বলে দিলেন সকাল সন্ধ্যে একটা করে বটিকা পানের রস দিয়ে খেতে। গায়ে বল পাবে।"

আর গায়ে বল!

মনের বল তো সমুদ্রের তলায়। ভয়ে বুক কেঁপে থর-থর। জটার বৌ কাতর করুণ কণ্ঠে ফিস্‌ফিস্ করে বলে, "হেই ঠাকুরঝি, তোমার পায়ে ধরি, ওষুধ তুমি নিয়ে যাও। ওষুধ খাচ্ছি দেখলে ঠাকরুন আর আমাকে আস্ত রাখবেন না।"

সত্য গিন্নীর মত গালে হাত দিয়ে বলে, "ওমা! শোনো বিত্তান্ত! দেহ দুব্বল হয়েছে, মিনি মাগ্‌নায় ওযুধ পাচ্ছ, খেলে শাউড়ী তোমায় মেরে ফেলবে? তুমি যে তাজ্জব করলে গা!"

"দোহাই গো ঠাকুরঝি, একটু আস্তে—" প্রায় কাঁদো কাঁদো মুখে বলে

জটার বৌ, "তোমার দুটি পায়ে পড়ছি, ঠাকরুনের কানে গেলে পুকুরে ডুবে মরা ছাড়া আর গতি থাকবে না আমার।"

সত্য এবার একটু গুছিয়ে বসে, বসে অবাক গলায় আস্তে আস্তে বলে, "কী শুনলে গো ?"

"ওই যে মেরে ফেলার কথা বললে। জানো তো ভাই সমস্ত ? মামাঠাকুর ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছেন, আর সেই ওষুধ আমি খাচ্ছি! ওরে বাপরে! এই দেখ ঠাকুরঝি আমার বুকের ভেতর কেমনতর ঢেঁকির পাড় পড়ছে।"

জটার বৌয়ের ওই ব্যাধের তাড়া খাওয়া হরিণের চোখের মত চোখ আর ঘুঁটের ছাইয়ের মত পাঁশুটে-রঙা মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ কেমন চিন্তাশীল দেখায় সত্যবতীকে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ওষুধগুলো ফের আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে বলে, "আচ্ছা, তা হলে ফেরত নে যাই।"

ফেরত!

মামাঠাকুরের কাছে!

আর এক ভয়ে বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে জটার বৌয়ের। আর এবার আর কাঁদো কাঁদো নয়, ভ্যাঁক্ করে কেঁদেই ফেলে।—"ও সত্য ঠাকুরঝি, তোমার পা-ধোওয়া জল খাই, তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকি, ও বড়ি মামাঠাকুরকে ফেরত দিতে যেও না।"

ফেরত দিতে যেও না!

হঠাৎ সত্য তার নিজের স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে ওঠে, "এই সেরেছে! ব্যায়রামে পড়ে দেখছি তোমার ভিমরতি ধরেছে বৌ! শাউড়ীর ভয়ে ওষুধ খাবেও না আবার ফেরতও দেবে না, তবে বড়িগুলো কি আমি খেয়ে নেব ? দাও, তা হলে একখোরা পানের রস করে দাও, সবগুলো একসঙ্গে গুলে গিলে ফেলি।"

জটার বৌ এবার মনের কথা খুলে বলে। শাশুড়ীর অসাক্ষাতে ওষুধ খাবার সাহস তার নেই, বলে কয়ে সাক্ষাতে খাবার তো আরোই নেই, অতএব—

অতএব পুকুরের জলে।

"পুকুরে ?"

সত্যর চোখে আগুন জ্বলে ওঠে। "বাবার দেওয়া স্বয়ং ধন্বন্তরী, তা জান ? এ বড়ির অপমান করলে, ধন্বন্তরীর অপমান তা জান ?"

"তবে আমি কী করি ?"

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে জটার বৌ।

সত্য ওর অবস্থা দেখে কাতর না হয়ে পারে না, একটু ভেবেচিন্তে বলে, "তা হলে নয় এক কাজ করি, পিসীকেই দিয়ে যাই, বলি বাবা পাঠিয়ে দিয়েছেন। বাবা অবশ্যি বলেছিলেন পিসীকে দিস নি, তা হলে খেতে দেবে না, ফেলে দেবে। তুতিয়ে পাতিয়ে কাকুতি-মিনুতি করে বলে যাই।"

উঠে দাঁড়ায় সত্য, আর সঙ্গে সঙ্গে ওর কাপড়ের একটা খুঁট ধরে হুমড়ে পায় ওর পায়ে পড়ে জটার বৌ, "ও ঠাকুরঝি, তার চাইতে তুমি আমার গলায় পা দিয়ে মেরে রেখে যাও, আঁশবটি দে' কেটে রেখে যাও আমায়।"

সত্য আবার বসে পড়ে।

একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, "আচ্ছা বৌ, তোমাদের এত ভয় কিসের বলতে পার ?"

ছয়

হুম্ হুম্ হুম্ !

শুধু হাঁটু পর্যন্ত আটফাটা পাগুলোই নয়, জিভে মুখেও ধুলো বেটে যাচ্ছে বেহারাগুলোর। জ্যৈষ্ঠের আর দুরন্ত মেঠো রাস্তা। খানিক খানিক পথ তো একেবারে ধূ-ধূ প্রান্তর, গাছ নেই ছায়া নেই। পথ সংক্ষেপের জন্য মাঝে মাঝে মাঠ ভাঙতে হচ্ছে বলেই লোকগুলো যেন আরো একেবারে জেরবার হয়ে যাচ্ছে। চারটে লোক পালা করে কাঁধ বদলে বদলে ছুটছে, তবু থেকে থেকে ঝিমিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু রামকালীরও তো আর এখন পাল্‌কি-বেহারাগুলোর ওপর দরদ দেখাবার উপায় নেই। আজ চার দিন গাঁ ছাড়া, "তো ধর মো ধর" না হলেও হাতে কটা রুগী ছিল, কে জানে কেমন আছে সে কটা।

গিয়েছিলেন জীরেটের জমিদারবাড়িতে রুগী দেখতে। শুধু তো এক-আধখানা গাঁয়ে নয়, দশখানা গাঁ অবধি নামডাক্ বদ্যি চাটুয্যের।

রাজার আদরে রেখেছিল ওরা, আর পায়ে ধরে সাধছিল আরও দুটো দিন থেকে যাবার জন্যে। রাজী হন নি রামকালী। বলে এসেছেন, "প্রয়োজন নেই, যে ওষুধ দিয়ে গেলাম এতেই রুগী তিন দিনে উঠে বসবে। তবে পথ্যাপথ্যের যা ব্যবস্থা দিয়ে যাচ্ছি সেটি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা চাই।"

কবিরাজ মশাই পথে খাবেন বলে ওরা এক ঝুড়ি "কলমের আম" ওঁর পাল্কির মধ্যে তুলে দিয়েছে, আপত্তি শোনে নি। পা ছড়াতে অনবরত ঝুড়িটা পায়ে ঠেকছে আর বিরক্তি বোধ করছেন রামকালী। এই এক আপদ! পথে তিনি কিছু খান না, একথা ওরা মানতে চাইল না। স্বয়ং জমিদার মশাই দাঁড়িয়ে তুলিয়ে দিলেন। তবু মুখ কাটা ডাব গোটাচারেক পাল্কিতে তুলতে দেন নি রামকালী, বলেছিলেন, "ব্যায়রাগুলো তা হলে আপনার বাগানের ওই ফলটলগুলোই বয়ে নিয়ে যাক রায়মশাই, আমি পদব্রজেই যাই।"

সম্পূর্ণ তৈরি আম, জ্যৈষ্ঠের দুপুরের ঝলসানি হাওয়ায় একেবারে শেষ তৈরি হয়ে উঠে, থেকে থেকে মিষ্ট সুবাস ছড়াচ্ছিল। রামকালী বিরক্ত হচ্ছিলেন, আর বেহারাগুলো যেন অন্তর দিয়ে সেই সুবাসটুকুই লেহন করছিল। আর ভাবছিল ডাব-চারটে পাল্কির বাঁকে বাঁকে নিলেই বা ক্ষতি কি ছিল? তবু তো "কেষ্টর জীবে"র ভোগে লাগত!

অন্যমনস্ক হয়ে বোধ হয় একটু ঝিমিয়ে এসেছিল তারা। হঠাৎ চমকে উঠল কর্তার হাঁকে।

পাল্কি থেকে মুখ বাড়িয়ে রামকালী হাঁকছেন, "ওরে বাবা সকল, ঘুমিয়ে পড়িস নে, একটু পা চালা।"

কথাটা শেষ করেই হঠাৎ সুর-ফের্তা ধরলেন কবরেজ। "এই দাঁড়া দাঁড়া, আস্তে কর, পেছনে হঠাৎ যেন আর একটা পাল্কির শব্দ পাচ্ছি।"

চার বেহারার আটখানা পা থমকে দাঁড়াল।

হ্যাঁ, শব্দ একটা আসছে বটে পিছন থেকে। হঠাৎই আসছে। হুম্ হুম্ আওয়াজটা ক্রমশই স্পষ্ট হচ্ছে।

প্রধান বেহারা গদাই ভুঁইমালী পাল্কির বাঁক থেকে ঘাড় সরিয়ে পিছন সড়কের দিকে তাকিয়ে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে ওঠে, "আজ্ঞে কর্তামশাই, নিযাস বলেছেন বটে! পালকিই একটা আসছে, মনে নিচ্ছে কোন বিয়ের বর আসছে।"

বিয়ের বর!

রামকালী পাল্‌কি থেকে গলাটা আরও একটু বাড়িয়ে এবং সে গলার স্বরটাকে অনেকখানি বাড়িয়ে বলেন, "বিয়ের বর এ খবরটা আবার চট্ করে কে দিয়ে গেল তোকে ?"

গদাই ভুঁইমালী মাথা চুলকে বলে, "পাল্‌কির কপাটে হলুদ ছোপানো ন্যাকড়া ঝুলছে দেখতে পাচ্ছি কর্তা, ব্যায়রাগুলোর পরনে লালছোপ্ খেঁটে !"

'খেঁটে'টা হচ্ছে ধুতির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। আরও অনেক শ্রমজীবীদের মত পালকি বেহারাদেরও পুরো ধুতি পরা চলে না। জোটেই বা কই ? ছালার মত মোটা সাতহাতি খেঁটেই তাদের জাতীয় পোশাক। লোকের বাড়ি কাজে-কর্মে বিয়ে-পৈতেয় লাল রঙে ছোপানো ওই ধুতি মাঝে মাঝে তাদের জোটে। এতে সুবিধেটা খুব। মাস তিন-চার 'ক্ষার' না কেচে চালানো যায়।

লাল হলুদ রঙটাই শুধু নয়, ক্রমশ মানুষগুলোও স্পষ্ট হচ্ছে। গদাই আরও একটা উৎফুল্ল আবিষ্কার করে, "পশ্চাতে গো-গাড়িও আসছে কত্তা, বলদের গলার ঘন্টি শুনতে পাচ্ছি। এ আর বরযাত্তীর না হয়ে যায় না। ইদিকেই কোথাও বে। উই পাশের গাঁর সড়ক দিয়ে বেরিয়েছে।"

"পাল্‌কি নামা !"

গম্ভীর কণ্ঠে হুকুম করেন রামকালী !

দেখা দরকার প্রকৃত ঘটনা গদাইয়ের আন্দাজ অনুযায়ীই কিনা। আর এও জানা দরকার যদি সত্যিই তাই হয়, কে এমন দুর্বিনীত আছে তাঁর গ্রামে, যে ব্যক্তি মেয়ের বিয়ে দিতে বসেছে, অথচ রামকালীকে জানায় নি ! আর এ গ্রামের যদি নাও হয়, খোঁজ নেওয়াও চাই, গ্রামের ওপর দিয়ে বর-বরযাত্রী নিয়ে যাচ্ছে কোথায় !

রামকালীর মনে যাই থাক্, বেহারাগুলো একটুখানির জন্যেও বাঁচল। একটা পাকুড় গাছতলায় পাল্‌কি নামিয়ে, খানিক তফাতে গিয়ে কাঁধের গামছা ঘুরিয়ে বাতাস খেতে লাগল।

কত্তামশায়ের চোখের সামনে তো আর বাতাস খাওয়া চলে না।

কিছুক্ষণ পরেই দূরবর্তী পাল্‌কি অদূরবর্তী, এবং ক্রমশঃ নিকটবর্তী হল।

রামকালী বেরিয়ে পড়ে কাঁধের মটকার চাদরখানা গুছিয়ে কাঁধে ফেলে রাজোচিত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে জলদগম্ভীর কণ্ঠে হাঁক দিলেন, "কে যায় ?"

পাল্‌কি থামল। না থেমে এগিয়ে যাবার সাধ্য কার আছে, এই কণ্ঠকে উপেক্ষা করে ?

পাল্‌কি থামল।

বর আর বরকর্তা এতে সমাসীন। বরকর্তার সঙ্গে সঙ্গে কিশোর বরটিও সভয়ে একটু মুখ বাড়াল।

ওই দীর্ঘকায় গৌরকান্তি পুরুষ মাটিতে নেমে দাঁড়িয়ে, অতএব কে পাল্‌কি চড়ে বসে থাকতে পারে তাঁর সামনে ?

সে পাল্‌কি থেকেও নামলেন বরকর্তা।

করজোড়ে বললেন, "আপনি আজ্ঞে ?"

রামকালীর কিন্তু তখন ভুরু কুঁচকেছে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টির শরসন্ধান চলছে পাল্‌কির মধ্যে। অভ্যাসবশতঃই দুই হাত তুলে প্রতি-নমস্কারের ভঙ্গীতে বললেন, "আমি রামকালী চাটুয্যে!"

"রামকালী চাটুয্যে!"

ভদ্রসন্তান বিহ্বল হয়ে—না আত্মগত, না প্রশ্নসূচক, কেমন যেন আল্‌গা ভাবে উচ্চারণ করলেন, "কবরেজ!"

"হ্যাঁ! ছেলেটির কপালে চন্দন দেখলাম মনে হল, বিবাহ না কি!"

সে ভদ্রলোক রামকালীর চাইতে বয়সে ছোট না হলেও বিনয়ে কীটানুকীটের মত ছোট হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে বলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ। ওঃ, কী পরম ভাগ্য আমার যে এই শুভযাত্রায় আপনার দর্শন পেলাম।"

রামকালীর দৃষ্টির সেই শরসন্ধান বন্ধ হল না, তবু মৃদু হেসে বললেন, "চেনেন আমায় ?"

"আহাহা! আপনাকে চেনে না এ তল্লাটে এমন অভাগা কে আছে ? তবে নাকি চাক্ষুষ দর্শনের সৌভাগ্য ইতিপূর্বে হয় নি। রাজু বেরিয়ে এসে পায়ের ধুলো নাও।"

"থাক থাক, বিয়ের বর!" রামকালী স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন, "আপনার পুত্র ?"

"আজ্ঞে না, ভ্রাতুষ্পুত্র! পুত্র আমার কনিষ্ঠ সহোদরের। সে আছে পেছনে গো-যানে। আরও সব আত্মকুটুম্ব আসছেন তো!"

"হুঁ। কন্যাটি কোথাকার ?"

"আজ্ঞে এই যে 'পাটমহলে'র। পাটমহলের লক্ষ্মীকান্ত বাঁড়ুয্যের পৌত্রী –"

"লক্ষ্মীকান্ত বাঁড়ুয্যের পৌত্রী?" রামকালী যেন সহসা সচেতন হলেন, "তাই নাকি? আপনারা কোথাকার? আপনার ঠাকুরের নাম?"

"আমরা বলাগড়ের। ঠাকুরের নাম ঈশ্বর গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়, পিতামহের নাম ঈশ্বর গুণধর মুখোপাধ্যায়, আমার নাম—"

"থাক আপনার নামে প্রয়োজন নেই। তা হলে আপনারা মুখুটি কুলীন? তা হাবভাব এমন যজমেনে ভট্চাযের মতন কেন? কিন্তু সে যাক্, দুটো কথা আছে আপনার সঙ্গে। বর নিয়ে বেরিয়েছেন কখন?"

'যজমেনে ভটচায্' শব্দটায় ঈষৎ ক্ষুব্ধ হয়ে পাত্রের জেঠা গম্ভীর ভাবে বলেন, "আভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধের পর।"

"সে তো বুঝলাম, কিন্তু সেটা কত বেলায়?"

"এই এক প্রহরটাক্ আগে হবে।"

"হুঁ! পাত্রের কপালের ওই চন্দনরেখা কি সেই তখনকারই নাকি?"

চন্দনরেখা!

এ আবার কেমন প্রশ্ন!

পাত্রের জেঠা নানাবিধ প্রশ্নের সম্মুখীন হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, কিন্তু পাত্রের কপালের চন্দনরেখাঙ্কনের কালনির্ণয়ের মত এমন অদ্ভুত প্রশ্নের জন্য নিশ্চয়ই প্রস্তুত ছিলেন না। তাই অবোধের মত বলেন, "কি বলছেন?"

"বলছি, ছেলের কপালে ওই যে চন্দন পরানো হয়েছে, ওটা কি সেই যাত্রাকালেই?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো নিশ্চয়ই!" পাত্রের জেঠা সোৎসাহে বলেন, "যাত্রাকালে মেয়েরা যেমন পরিয়ে দেয় তেমনি দেওয়া হয়েছে, আমাদের বাড়ির মেয়েদের বুঝলেন কিনা এসব ব্যাপারে খুব নামডাক আছে। পাড়া থেকে ডাকতে আসে পিঁড়ি আলপনা দিতে, শ্রী গড়তে, বরকনে সাজাতে—"

রামকালী ওই পালকির দিকে তাকাতে তাকাতে আবার কেমন অন্যমনা হয়ে পড়েছিলেন, ইত্যবসরে পশ্চাৎবর্তী গোরুর গাড়ি দুখানা এসে পড়েছে। পাল্কি নামানো এবং অপর এক পাল্কির আরোহীর সঙ্গে বাক্যবিন্যাসের ব্যাপার দেখে ঈষৎ ঘাবড়ে গিয়ে বরের বাপও নেমে এসে দাঁড়িয়েছেন।

অন্যমনা রামকালী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গাঢ় স্বরে বলেন, "আমি আপনাকে একটি অনুরোধ করছি মুখুয্যে মশাই, আপনি যাত্রা স্থগিত করুন।"

যাত্রা স্থগিত করুন!

বিবাহযাত্রা! হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন বরের জেঠা আর বরের বাপ! লোকটা পাগল না শয়তান! না কনের বাড়ির সঙ্গে গভীরতম কোন শক্রতা আছে!

ওদিকে ঘাম ছুটে যাচ্ছে বেহারাদের, রোদ্দুরটা অসহনীয় হয়ে উঠেছে। দু পাল্‌কির বেহারারা অদূরে দাঁড়িয়ে পরস্পর বাক্য বিনিময় করে ব্যাপারটা অনুধাবন করার চেষ্টা করতে ঘন ঘন এদিকে তাকাচ্ছে কখন পাল্‌কি তোলার ডাক পড়ে।

ব্যাপারটা যে একটা কিছু হচ্ছে এ অনুমান করে ইত্যবসরে গরুর গাড়ি থেকে এক ব্যক্তি লাফিয়ে নেমে পড়েছেন, যিনি হচ্ছেন বরের পিসে; গাড়ির ছইয়ের মধ্যে গলদঘর্ম হয়ে আসতে আসতে এমনিতেই মেজাজ তাঁর চড়ে উঠেছিল, নেমেই যাত্রা স্থগিতের কথা শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, "কে মশাই আপনি? ভাঙ্‌চি দেবার আর জায়গা খুঁজে পান নি? যাত্রা করে বর বেরিয়েছে, পথের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে ভাঙ্‌চি দিচ্ছেন?"

মুখুজ্যে ভ্রাতৃদ্বয় ভগ্নীপতির এ হেন দুর্বিনয়ে বিচলিত হয়ে তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, "আঃ গাঙ্গুলী মশাই, কাকে কি বলছেন? ইনি কে তা জানেন?"

"জানতে চাইনে মুখুজ্যে, থামো তুমি। যে ব্যক্তি এ হেন অর্বাচীনের ন্যায় কথা কয়—"

"চোপ্‌রাও।" হঠাৎ যেন ঘুমন্ত বাঘ জেগে উঠে গর্জে উঠল, "চোপ্‌রাও বামুনের ঘরের কুষ্মাণ্ড!"

"মুখুয্যে!" চেঁচিয়ে উঠল বাঘের পর খেঁক্‌শিয়াল, "দাঁড়িয়ে অপমানিত হবার জন্যে তোমার ছেলের বিয়ের বরযাত্তর আসি নি। ইটি বোধ হয় তোমার কোন বড় কুটুম্ব? তা এঁকে নিয়েই বিয়ে দেওয়াও গে, আমি চললাম।"

"আহাহা, করেন কি গাঙ্গুলী মশাই। ইনি হচ্ছেন আমাদের সাতখানা গাঁয়ের মাথা, কবিরাজ চাটুয্যে মশাই! অবশ্যই অনিবার্য কোন কারণে ইনি যাত্রা স্থগিতের আদেশ—"

গহ্বরে নিক্ষেপ করে মূঢ়ের মত 'যাত্রা-করা' বর নিয়ে ফিরে যাবেন! বাঁড়ুয্যেদের হবে কি? কন্যা ভ্রষ্টলগ্না হওয়া মৃত্যুর চাইতে কি কিছু কম?

না এ অসম্ভব! নিশ্চয় এ কোন চক্রান্ত!

হয় এই চাটুয্যের সঙ্গে লক্ষ্মীকান্ত বাঁড়ুয্যের ঘোরতর কোন শত্রুতা আছে, নচেৎ এই লোকটা আদৌ কবরেজ চাটুয্যেই নয়! কোন ক্ষ্যাপাটে বামুন! তবু এই ব্যক্তিত্বের প্রভাবের সামনে কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। আর সন্তানের সম্পর্কে অত বড় অভিশাপ সদৃশ বাণী!

ছোট মুখুয্যে একবার অদূরবর্তী পাল্‌কির দিকে তাকিয়ে রুদ্ধশ্বাস-বক্ষে বলেন, "আমি তো রোগের কোন লক্ষণ দেখছি না কবরেজ মশাই।"

রামকালী একটু বিষাদব্যঞ্জক হাসি হাসেন, "তা দেখতে পেলে তো আমার সঙ্গে আপনার কোন প্রভেদই থাকত না মুখুয্যে মশাই। আসুন, এদিকে সরে আসুন। দেখছেন তাকিয়ে ছেলের ললাটে ওই চন্দনরেখা? সদ্য চন্দনের মত আর্দ্র। অথচ বলছেন এক প্রহরকাল আগে চন্দন পরানো হয়েছে! তা হলে সে চন্দন এতক্ষণে শুকিয়ে খড়ি হয়ে যাবার কথা। হয় নি। কারণ চোরা সান্নিপাতিকে সর্বশরীর রসস্থ হয়ে উঠেছে—"

"এই কথা!" হঠাৎ পাত্রের জেঠা হেসে ওঠেন, "কবিরাজ মশাই, খুব সম্ভব পথশ্রমে আপনি কিছু অধিক ক্লান্ত, তাই লক্ষণনির্ণয়ে ভুল করছেন। গ্রীষ্মকালে ঘর্ম-নির্গমের দরুন চন্দন শুকিয়ে ওঠবার অবকাশ পায় নি, এই তো কথা! ওহে বেয়ারারা, চল চল। পালকি ওঠাও। শুভযাত্রায় এ কী বিপত্তি!"

লক্ষণনির্ণয়ে ভুল করেছেন রামকালী! রামকালীর নিজেরই মাথার শিরা ফেটে যাবে নাকি!

একবার নিজের পাল্‌কির দিকে অগ্রসর হতে উদ্যত হলেন রামকালী, কিন্তু আবার কি ভেবে থমকে দাঁড়িয়ে আরও ভারী গলায় বললেন, "শুনুন মুখুয্যে মশাই, রামকালী চাটুয্যের লক্ষণনির্ণয়ে ভুল হয়েছে, এ কথা যদি অন্য কোন ক্ষেত্রে উচ্চারণ করতেন, সে ঔদ্ধত্যের সমুচিত উত্তর পেতেন। কিন্তু এখন আপনার সঙ্কট সময়, ওদিকে বাঁড়ুয্যেরাও বিপন্ন, তাই মার্জনা পেয়ে গেলেন। লক্ষ্মীকান্ত বাঁড়ুয্যের বাড়ি এখনই সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন, এবং সে কাজ আমাকেই করতে হবে। প্রয়োজন হলে পাল্‌কি ছেড়ে দিয়ে ঘোড়া নিতে হবে। তবে আপনাকে শেষ সাবধানের কথা জানিয়ে যাচ্ছি, ছেলেটির মাথার

শিরা ছিঁড়ে ভিতরে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে, চোখের শিরার রং এবং রগের শিরার স্ফীতির দিকে লক্ষ্য করলে আপনিও ধরতে পারবেন। মনে হচ্ছে খানিক বাদেই বিকার শুরু হবে। জানানো আমার কর্তব্য বলেই জানিয়ে দিলাম। বলেছিলেন না লক্ষণনির্ণয়ে ভুল? ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, রামকালী কবরেজের বিচারে যেন ভুলই হয়ে থাকে। রোদের ঘামকে 'কালঘাম' ভাবার ভ্রান্তিই তার হয়েছে, এই যেন হয়। আর কি বলব! আচ্ছা নমস্কার। ···ওরে গদাই তোল পাল্‌কি। পা চালিয়ে একবার বসিরের ওখানে চল দিকি, ঘোড়াটাকে নিতে হবে।"

পাল্‌কি চলতে শুরু করেছে হঠাৎ ছুটে এলেন ছোট মুখুয্যে, প্রায় ডুকরে কেঁদে চীৎকার করে উঠলেন, "কবরেজ মশাই, এত বড় সর্বনাশের কথা বললেন যদি তো একটু ওষুধ দিলেন না?"

রামকালী গম্ভীর বিষণ্ণ ভাবে হাতটা একটু নেড়ে সে হাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন, "দেবার হলে আপনাকে বলতে হত না, আমি নিজেই দিতাম। কিন্তু এখন আর স্বয়ং ধন্বন্তরীর বাবারও সাধ্য নেই।"

ও পাল্‌কিতে তখন বড় মুখুয্যে উঠে পড়ে বিরক্তভাবে বলে ওঠেন, 'দুর্গা দুর্গা, যত সব বিঘ্ন। যাত্রাকালে কার মুখ দেখে বেরোনো হয়েছিল! কোথা থেকে এক উৎপাত জুটে—এই রাজু, অমন ঢুলছিস কেন? গরমে কষ্ট হচ্ছে?"

রাজু রক্তবর্ণ দুটি চোখ মেলে বলে, "না জেঠামশাই, শুধু বড্ড শীত করছে।"

সাত

আঁচল ডুবিয়ে নাড়া দিয়ে দিয়ে তলার জল ওপরে আর ওপরের জল তলায় করছিল ওরা তপ্ত জল শেতল করতে। বেলা পড়ে এসেছে, তবু পুকুরের জল টগবগিয়ে ফুটছে। এ জলে নেমে ঝাঁপাই ঝুড়লে গা ঠাণ্ডা হবার বদলে দাহই হয়, তবু জলের আকর্ষণ বড় আকর্ষণ, তাই বেলা পড়তেই জলে পড়া চাই পাড়ার নবীনাকুলের।

চাটুয্যে-পুকুরের জল 'তোল মাটি ঘোল' করছিল পুণ্যি টেঁপি পুঁটি খেঁদি প্রমুখ নবীনারা। সত্য কেন এখনো এসে হাজির হয় নি তাই ভাবছে ওরা, আর অনুপস্থিত সত্যর সন্তোষ বিধানের জন্যেই বোধ করি জল শেতল করার অভিযানটা এত জোর কদমে চালাচ্ছে। সত্য ওদের প্রাণপুতুল।

সত্য কি শুধুই তাদের দলনেত্রী?

ভগবান জানেন কোন্ গুণে সত্য সকলের হৃদয়নেত্রীও। 'সত্য'-বিহীন খেলা ওদের শিবহীন দক্ষযজ্ঞেরই সামিল। পুকুরে ঝাঁপাই ঝোড়ার ব্যাপারে সত্যই রোজ অগ্রণী, তাই ওরা বার বার ফুটন্ত জলকে তলা-ওপর করতে করতে এ ওকে প্রশ্ন করছিল, "সত্যর কি হল রে?" "ঘরে তো দেখলাম না?" "বলেছিল তো ঠিক সময় দেখা হবে।" "বাগানে কোথাও আছে নাকি এখনো?" "দূর, একা একা কি আর বাগানে ঘুরবে? বে'ওলা মেয়ে, ভয় নেই পরাণে?" "ভয়! সত্যর আবার ভয়! দেখিস ও শ্বশুরবাড়ী গিয়ে শাউড়ী পিস্‌শাউড়ীকেও ভয় করবে না!" "তা আশ্চয্যি নেই, ও যা মেয়ে!"

সত্য যে তার সমস্ত সখী-সঙ্গিনীদের প্রাণের দেবতা, তার প্রধান কারণ বোধ হয় সত্যর এই নির্ভীকতা। নিজের মধ্যে যে গুণ নেই, যে সাহস নেই, সে গুণ সে সাহস অন্যের মধ্যে দেখতে পেলে মোহিত হওয়া মানুষের স্বভাবধর্ম। নির্ভীকতা ব্যতীতও আরও কত গুণ আছে সত্যর। খেলাধুলোর ব্যাপারে সত্যর উদ্ভাবনী শক্তির জুড়ি নেই, বল আর কৌশল দুইই তার অন্যের চাইতে একশ' গুণ। মোটাসোটা একটা গাছের কাটা গুঁড়িকে দড়ি বেঁধে একা টেনে আনা সত্যবতীর পক্ষে আদৌ অসম্ভব নয়, আবার সেই গাছের গুঁড়িকে গড়িয়ে পুকুরের জলে ফেলে ডিঙি বানানোও সত্যর কৌশলেই সম্ভব।

এর ওপর আবার 'পয়ার' বাঁধা!

পয়ার বাঁধার পর থেকে পাড়ার সমস্ত ছোট ছেলে-মেয়েই তো সত্যর পায়ে বাঁধা পড়েছে।

সেই সত্যর জন্য জল শেতল করছে ওরা এ আর বেশী কথা কি। কিন্তু সত্যর এত দেরি কেন? এদিকে যে এদের মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে। ঠাকুমা-পিসীরা একবার চৈতন্য পেয়ে খোঁজ করলেই তো 'হয়ে' গেল!

নেহাৎ নাকি ঠিক এই সময়টুকুই অভিভাবিকা দলের কিঞ্চিৎ দিবানিদ্রার সময়, তাই এদের এই অবাধ স্বাধীনতা। হ্যাঁ, এই পড়ন্ত বেলাতেই গিন্নীরা

একটু গড়িয়ে পড়েন। সারা বছর তো নয়, (মেয়েমানুষের দিবানিদ্রার মত অলুক্ষুণে ব্যাপার আর কি আছে সংসারে?) নেহাৎ এই আমের সময়টা।

আমের যে একটা 'নেশা' আছে।

গিন্নীরা বলেন, 'আমের মদ'।

আম খাও বা না খাও, এ সময়ে শরীর টিস্ টিস্ করবেই। অবশ্য না খাওয়ার প্রশ্ন ওঠেই না। আম-কাঁটাল আবার কে না খায়? হরু ভট্চাযের মার মত কে আর আম-হেন বস্তুকে জগন্নাথের নামে উৎসর্গ করতে পারে? হরু ভট্চাযের মা সেবার শ্রীক্ষেত্তর গিয়ে এই কাণ্ড করে এসেছেন, 'ক্ষেত্তর করার' পর জগন্নাথকে ফল দিতে হয় বলে আম ফলটি দিয়ে এসেছেন। মনের আক্ষেপে সেবার হরু ভট্চায আমবাগান বেচে দিতে চেয়েছিলেন, বলেছিলেন, "মার ভোগেই যদি না লাগল তো, আমবাগানে আমার দরকার?" তা ভট্চাযের মা ছেলেকে হাতে ধরে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করেছিলেন, বলেছিলেন "বাবা আজন্মকাল তো খেয়ে এলাম, তবু খাওয়ার লালস ঘোচে না, তাই বলি যে দব্যিতে এত আসক্তি, সেই দব্যিই জগন্নাথকে উচ্ছুগ্যু করব। তাই বলে তুই বাগান নষ্ট করবি? ছেলেপুলে খাবে না?"

ছেলেপুলে বুড়ো যুবো আমের ভক্ত সবাই। আমের মরশুমে দিনে এক কুড়ি দেড় কুড়ি আম খাওয়া তো কিছুই না।

অবশ্য সব আম সবাই খায় না।

অর্থাৎ পায় না।

সংসারে সদস্যদের শ্রেণীহিসেবেই আমের শ্রেণীহিসেব করে ভাগ হয়। কর্তাদের নৈবেদ্যে লাগে "জোড় কলম" গোলাপখাস, ক্ষীরসাপাতি, নবাব পসন্দ, বাদশা ভোগ, ঢাউশ্ ফজলী ইত্যাদি, গিন্নীদের ভোগের জন্যে সরানো থাকে পেয়ারাফুলি, বেলসুবাসী, কাশীর চিনি, সিঁদুরেমেঘ।

আর বৌ ঝি ছেলেপুলের ভাগ্যে জোটে 'রাশি'র আম। তা রাশি রাশি না পেলে যাদের আশ মিটবে না তাদের জন্যে রাশির বরাদ্দ ছাড়া আর কি বরাদ্দ হতে পারে? বাড়ির ঝুড়ি ঝুড়িতেই কি ওদের আশা মেটে? দু বেলাই জলখাবারের ঝুড়ি ঝুড়ি তো পায়, কারণ গিন্নীরা প্রকৃতির এই দাক্ষিণ্যের সময় মুড়িভাজা পর্বটি থেকে কিঞ্চিৎ রেহাই নেন। কিন্তু হলে কি হবে, বাড়ি থেকে 'মধুকুলকুলি' আমের পাহাড় শেষ করেই ওরা তক্ষুণি ছোটে হয়তো বা "বৌ পালানে" কি "বাঁদর ভ্যাবাচাকা" আমের বাগানে। বাঘা

তেঁতুলের বাবা জাতীয় সেই আমগুলি পার করার সহায় হচ্ছে মুঠো মুঠো নুন। অবিশ্যি তুচ্ছ হলেও বস্তুটা সংগ্রহ করতে বালকবাহিনীকে বিশেষ বেগ পেতে হয়, কারণ ওর আশ্রয়স্থল যে একেবারে রান্না-ভাঁড়ার। যেন নাকি সম্পূর্ণ গিন্নীদের এলাকা। আর যে গিন্নীরা হচ্ছেন একেবারে সহানুভূতিহীনতার প্রতীক। ছেলেপুলেদের সব কিছুতেই তো তাঁরা খড়্গহস্ত। নুন একটু চাইতে গেলেই প্রথমটা একেবারে তেড়ে মারতে আসবেন জানা কথা! তবে নাকি ছেলেগুলোর খুব ভাগ্যের জোর যে, প্রায় সব সময়ই ওরা ওনাদের অস্পৃশ্য। কাজেই মারতে আসলেও মারতে পারেন না। তার পর বহুবিধ কাকুতি-মিনতির পর যদি বা দেবেন তো, সে একেবারে সোনার ওজনে। দেবেন আর সঙ্গে সঙ্গে বলবেন, "যাচ্ছিস তো আবার টক্ বিষ আমগুলো গিলতে? ঘরে এত খায় তবু আশ মেটে না গা! কী রাক্ষুসে পেট গো, কী লক্ষ্মীছাড়া দিশে! মরবি মরবি রক্ত-আমাশা হয়ে মরবি। সবগুলো একসঙ্গে 'মনসা তলা'য় যাবি। যত সব পাপগুলো একত্তর জুটেছে।"

গালমন্দ-বিহীন লবণ?

সে ওরা কল্পনাও করতে পারে না।

তবে সত্য আগে আগে চরণ মুদির দোকান থেকে বেশ খানিকটা সংগ্রহ করে আনতে পারত, কিন্তু ইদানীং অর্থাৎ বড় হয়ে ইস্তক মুদির দোকানে ভিক্ষে করতে যেতে ওর লজ্জা করে। বড় জোর দূরে দাঁড়িয়ে থেকে নিতান্ত একটা শিশুকে লেলিয়ে দেয়।

কবরেজের মেয়ে বলে সমাজে সত্যর কিছুটা প্রতিষ্ঠা আছে।

সে প্রতিষ্ঠার মর্যাদাটাও তো রাখতে হয়?

আজ দুপুরে আমবাগান পর্বে সত্য ছিল, তার পর কখন একসময়ে যেন বাড়ি চলে গিয়েছিল।

খেঁদি একটু কল্পনা-প্রবণ, তাই সে বলে, "সত্যর শ্বশুরবাড়ি থেকে কেউ আসে নি তো?"

"দূর! শ্বশুরবাড়ি থেকে আবার শুধু শুধু কেউ আসবে কেন? আর আসেও যদি, সত্যর সঙ্গে কি? যে আসবে সে তো চণ্ডীমণ্ডপে বসবে।"

সহসা পুঁটি চেঁচিয়ে ওঠে, "আসছে, আসছে!"

"আসছে! বাবা, ধড়ে পেরাণ পাই।"

"এত দেরি কেন রে সত্য? আমরা সেই কখন থেকে জল ঠাণ্ডা করছি।"

সত্য বিনাবাক্যে গম্ভীর ভাবে ঘাটের পৈঠের ভাঙাচোরা বাঁচিয়ে জলে নামে।

"কি রে সত্য, মুখে কথা নেই যে? বাবা, আজ এত পায়া-ভারী কেন রে তোর?"

সত্য একমুখ জল নিয়ে কুলকুচো করে ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে, "পায়া-ভারী আবার কি! মনিষ্যির রীত-চরিত্তির দেখে ঘেন্না ধরে গেছে।"

"ওমা, কেন রে? কাকে দেখে? কার কথা বলছিস?"

সত্য জ্বলন্ত স্বরে বলে, "বলছি আমাদের জটাদার বৌয়ের কথা! গলায় দড়ি! গলায় দড়ি! মেয়েজাতের কলঙ্ক!"

সত্যর বয়েস ন বছর, অতএব সত্যর পক্ষে এ ধরনের বাক্যবিন্যাস অসম্ভব, এমন কথা ভাববার হেতু নেই। শুধু সত্য কেন—নেহাৎ হ্যাকাহাবা মেয়ে ছাড়া, সে আমলে আট-ন বছরের মেয়েরা এ ধরনের বাক্যবিন্যাসে পোক্তই হত! না হবে কেন? চার বছর বয়স থেকেই যে তাকে পরের বাড়ি যাওয়ার তালিম দেওয়া হত, আর বয়স্থাদের মহলেই বিচরণের ক্ষেত্র নির্বাচন করা হত। সে ক্ষেত্রে 'শিশু' বলে কোন কথাই বাদ দেওয়া হত না তাদের সামনে।

কাজেই সত্য যদি কারো উপর খাপ্পা হয়ে তাকে 'মেয়েজাতের কলঙ্ক' বলে অভিহিত করে থাকে, আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

পুণ্যি তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করে ওঠে, "কেন রে, কি হয়েছে?"

"যম জানে!" বলে প্রথমটা খানিকক্ষণ যমের উপর ভার ফেলে রেখে, অতঃপর সত্য মুখ খোলে, "জন্মে আর ওর মুখ দেখছি না! ছি ছি! গেছলাম! বলি আহা, সোয়ামী শাউড়ীর ভয়ে রোগের ওষুধটুকু পর্যন্ত খেতে পায় না, যাই একবার দেখে আসি কেমন আছে। সেজপিসী তারকেশ্বর গেছে শুনেছি, মনটা তাতেই আরও খোলসা ছিল। ওমা গিয়ে ঘেন্নায় মরে যাই, কী ঢুষ্ পিবিত্তি, কী ঢুষ্ পিবিত্তি!"

এরা শঙ্কিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে, না-জানি কোন্ ভয়ঙ্কর কাহিনী উদ্‌ঘাটন করে বসে সত্য।

শুধু পুণ্যি ভয়ে ভয়ে বলে, "কি দেখলি রে ?"

"কি দেখলাম ? বললে পেত্যয় করবি ? দেখি কিনা ঘরে জটাদা বসে, আর বৌ কিনা তাকে পান সেজে দিচ্ছে, আর হাসি-মস্করা করছে।"

জটাদা ?

খেঁদি পুঁটি টেঁপি সকলে একযোগে বলে ওঠে, "ও হরি! এতেই তোর এত রাগ! শাউড়ী বাড়ি নেই, তাতেই বুকের পাটাটা বেড়েছে আর কি।"

"বুকের পাটা বেড়েছে বলে পান সেজে খাওয়াবে ? হাসি-মস্করা করবে ?" সত্য যেন ফুলতে থাকে।

পুণ্যি আরও ভয়ে ভয়ে বলে, "তা পরপুরুষ তো আর নয় ? নিজের সোয়ামী—"

"নিজের সোয়ামী !" সত্য ঝটপট বার-দুই কুলকুচো করে বলে, "খ্যাংরা মারো অমন সোয়ামীর মুখে! যে সোয়ামী লাথি মেরে যমের দক্ষিণ দোরে পাঠায় তার সঙ্গে আবার হাসি-গপ্‌প ? গলায় দিতে দড়ি জোটে না ? আবার আমায় কি বলেছে জানিস ? 'আমার সোয়ামী আমায় মেরেছে, তোমায় তো মারতে যায় নি ঠাকুরঝি ? তোমার এত গায়ে জ্বালা কেন যে ছড়া বেঁধে গালমন্দ করতে আস ?' এর পর আবার আমি ওর মুখ দেখব ?"

আঁচলটাকে গা থেকে খুলে জোরে জোরে জলের ওপর আছড়াতে থাকে সত্য।

সখীবাহিনী কিঞ্চিৎ বিপদে পড়ে।

ওরা অভিযুক্ত আসামীনীকে খুব একটা দোষ দিতে পারে না, কারণ স্বামী একদা একদিন বেদম মেরেছে বলে যে জন্মে আর সে স্বামীকে পান সেজে খাওয়ানো চলবে না, এতটা কঠোর ক্ষমাহীন মনোভাব তাদের পক্ষে আয়ত্ত করা শক্ত। অথচ সত্যের কথার প্রতিবাদ চলে না, সত্যর কথায় সমর্থন না করলে চলে না।

কিন্তু ও কি! ও কি! ও কিসের শব্দ!

হঠাৎ বুঝি ওদের বিপদে রক্ষা করলেন মধুসূদন। পুকুরপাড়ের রাস্তায় তালগাছের সারির ওদিকে যেন অশ্বক্ষুরধ্বনি ধ্বনিত হল।

ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ না ?

ঘোড়ায় চড়ে কে আসে ?

পুণ্যি তড়বড় করে ঘাটে উঠে এগিয়ে দেখে পড়ি তো মরি করে ছুটে আসে, "এই সত্য, মেজদা !"

মেজদা !

অর্থাৎ রামকালী !

সত্য অবিশ্বাসের হাসি হেসে মুখ ভেঙিয়ে বলে ওঠে, "স্বপ্ন দেখছিস না কি ? বাবা না জীরেটে গেছে ?"

"আহা, তা সেখেনে তো আর বাস করতে যায় নি ? আসবে না ?"

ইত্যবসরে ক্ষুরধ্বনি একবার কিছুটা নিকটবর্তী হয়েই, ক্রমশঃ দূরবর্তী হয়ে যায়।

সত্য গলা বাড়িয়ে একবার দেখতে চেষ্টা করে, তার পর নির্লিপ্তভাবে বলে, "যেমন তোমার বুদ্ধি। বাবা বুঝি ঘোড়ায় চড়ে জীরেটে গেছল ? নাকি পাল্‌কিটা মাঝরাস্তায় ঘোড়া হয়ে গেল !"

পাল্‌কি ! তাও তো বটে। পুণ্যি দ্বিধাযুক্ত স্বরে বলে, "আমি কিন্তু সত্য দেখলাম মেজদা আর মেজদার ঘোড়াটা। বাড়ির দিকেই তো গেল।"

তা গেল বটে। তবে কি হঠাৎ জীরেটের সেই রুগীর 'নেয়-দেয়' অবস্থা ঘটেছে ? তাই হঠাৎই কোন মোক্ষম ওষুধের দরকার পড়েছে ? যার জন্যে পাল্‌কি রেখে ঘোড়ায় চড়ে ছুটে আসতে হয়েছে চিকিৎসক রামকালীকে ?

খেঁদি বলে, "যাই হোক বাপু সত্য, তুই বাড়ি যা। কবরেজ জ্যাঠা ভেন্ন এ গেরামে ঘোড়াতেই বা চড়বে কে ?"

এ কথাটাও খাঁটি।

ঘোড়া আর আছেই বা কার ? এ অঞ্চলে কালেকস্মিনে বর্ধমান রাজ্যের কোন কর্মচারী কি কোম্পানির কোন লোক, ঘোড়ার পিঠে চড়ে আসে, নইলে ঘোড়া কে কোথায় পাচ্ছে ?

ঘাট থেকে উঠে পড়ে সত্য-বাহিনী।

এখন প্রথমটা সকলেরই সত্য-ভবনে অভিযান। কারণ ঘোড়া-রহস্য ভেদ না করে কে স্থির থাকতে পারবে ?

ভিজে কাপড়ে জল সপ্‌সপিয়ে আর মলের গোছা বাজিয়ে ওরা রওনা হল, কিন্তু এ কী তাজ্জব ! এ যে একেবারে রূপকথার গল্পের মত।

সত্যদের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতে না পৌঁছতে হাঁ হয়ে দেখে ওরা রামকালী ফের ফিরে যাচ্ছেন ঘোড়া হাঁকিয়ে, শুধু এবারে বাড়তির মধ্যে তাঁর পিছনে পিঠ আঁকড়ে আর একজন বসে।

সে জনটি হচ্ছে, সত্যর বড়দা।

রামকালী চাটুয্যের বৈমাত্র ভাই কুঞ্জবেহারীর বড় ছেলে রাসবেহারী!

পুণ্যির কথাই সত্যি বটে। অশ্বারোহী ব্যক্তি রামকালীই। কিন্তু এ নিয়ে এখন আর বাহাদুরি ফলায় না পুণ্যি, শুধু হাঁ করে অনেকক্ষণ ঘোড়ার পায়ের দাপটে ঠিকরে ওঠা ধুলোর ঝড়ের দিকে তাকিয়ে থেকে নিশ্বাস ফেলে বলে, "ব্যাপার কি বল তো?"

"আমিও তো তাই ইন্‌তাম করছি।" সত্য অবাক ভাবে বলে, "ওষুধ নিতে আসবে যদি বাবা, তো বড়দাকে পিঠে বেঁধে নিয়ে যাবে কেন?"

"সেই তো কথা!"

প্রচণ্ড গরম, তবু জল সপ্‌সপে ভিজে কাপড়ের ওপর হাওয়ার ডানা বুলিয়ে যাওয়ার দরুন গাটা কেমন সিরসির করে এল। সত্য এবার 'হাঁ-করা' ভাব ত্যাগ করে বিচক্ষণের সুরে বলে, "নে নে চল, দোরে দাঁড়িয়ে গুলতুনি করে আর কি হবে? বাড়ি গেলেই টের পাব, কি হয়েছে! তোরা যা, ভিজে কাপড় ছেড়ে আয়। আমি দেখি গিয়ে কি হয়েছে!"

কি হয়েছে!

যা হয়েছে তা একেবারে সত্যর হিসেবের বাইরে। শুধু সত্যর কেন সকলেরই হিসেবের বাইরে। ঘোড়ায় চড়ে ঝড়ের বেগে এসে সমগ্র সংসারটার উপর যেন প্রকাণ্ড একখানা পাথর ছুঁড়ে মেরে ফের ফিরে গেছেন রামকালী। সেই পাথরের আঘাত সহজে কেউ সামলাতে পারছে না।

সত্য ভেতরবাড়ির উঠোনে ঢুকে দেখল, উঠোনের মাঝখানে বসানো মরাই দুটোর মাঝখানে যে সরু জমিটুকু, সেইখানে দাঁড়িয়ে আছে বড়জেঠী, ঠিক যেন কাঠের পুতুলটি, আর দাওয়ার পৈঠেয় গালে হাত দিয়ে কাঠ হয়ে বসে তার ঠাকুমা। এবং দাওয়ার ওপর জটলা বেঁধে বাড়ির আর সবাই। শুধু যা পিসঠাকুমাই অনুপস্থিত।

অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক, কারণ তিনি এই যবনাচারী দাওয়ায় কখনো পা ঠেকান না। এ দাওয়ায় রাস্তা-বেড়ানে ছেলেপুলে ওঠে, কর্তাদের খড়ম ওঠে।

পিস্ঠাকুমা না থাক্, আর সবাই তো জটলা করছে। কেন করছে? অথচ কারো মুখে বাক্যি নেই কেন? ফিস ফিস কথা, ঘোমটার ভেতর হাত-মুখ নাড়ানাড়ি। সত্য ঠাকুমার যতটা সম্ভব গা বাঁচিয়ে গা ঘেঁষে বসে পড়ে সাবধানে ইশারায় প্রশ্ন করে, "কি হয়েছে গো ঠাক্মা?"

দীনতারিণী নীরব।

অতঃপর সত্য সরব।

"ও ঠাক্মা, বাবা অমন করে ছুটে এসেই আবার কোথায় গেল?"

দীনতারিণী মৌন।

"কী গেরো! কথার উত্তুর দিচ্ছ না কেন গো? ও ঠাক্মা, বাবা জীরেট থেকে অমন হাঁপাতে হাঁপাতে ঘোড়া ছুটিয়ে এলই বা কেন, আবার ছুটলই বা কেন, অ ঠাক্মা, বলি তোমাদের সব বাক্যি হরে গেল কেন?"

এবারও দীনতারিণীর ঠোঁট নড়ে না, তবে ঠোঁট নাড়েন তাঁর সেজজা শিবজায়া। শুধু ঠোঁট নয়, সহসা পা মুখ সব নড়িয়ে তিনি বলে ওঠেন, "বাক্যি হরে যাবার মতন কাণ্ড ঘটলে আর হরবে না? তোর বাবা যা অভাব্‌নী কাণ্ড করে গেল?"

"বাবা, বাবা খুলেই বল না স্পষ্ট করে। বাবা জীরেট থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেই তক্ষুনি আবার কোথায় গেল?"

"অ, তবে তো দেখেইছিস। তবে আর ন্যাকা সাজছিস কেন? রাসুকে নে গেল তোর বাবা বে দিতে।"

"বে দিতে! ধ্যেৎ!" সত্য পরিস্থিতির মর্যাদা ভুলে হি হি করে হেসে গড়িয়ে পড়ে, "আহা আমায় যেন ন্যাকা পেয়েছে সেজঠাকুমা তাই পাগল বোঝাচ্ছে। বড়দার বুঝি বে দিতে বাকি আছে? বলে ছেলের বাবাই হয়ে গেল বড়দা।"

"গেল তায় কি?" এবার হঠাৎ দীনতারিণী মৌন ভঙ্গ করে নাতনীকে ধমকে ওঠেন, "বড্ড তো দেখছি ট্যাঁকটেঁকে কথা হয়েছে তোর? ছেলের বাবা হলে আর বে করতে নেই? মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?"

সত্য উত্তর দেবার আগে শিবজায়াই সাংসারিক মাৎস্যন্যায় ভুলে ফস্ করে

বড়জায়ের মুখের ওপর বলে বসেন, "মহাভারত অশুদ্ধর কথা হচ্ছে না দিদি, তবে এও বলি রামকালী যে একেবারে কাউকে চোখে কানে দেখতে দিলে না, চিলের মত ছোঁ মেরে নে গেল ছেলেটাকে, বালস-পোয়াতি বৌটা, যাত্রাকালে সোয়ামিকে একবার দূর থেকে চোখের দেখাটুকু পর্যন্ত দেখতে পেল না, এটা কি ভাল হল ?"

কখন যে ইতিমধ্যে মোক্ষদা এসে দাঁড়িয়েছেন এপাশের বেড়ার দরজা দিয়ে, এবং আলোচনার শেষাংশটুকু শুনে নিয়েছেন, সে আর কেউ টের পায় নি। মোক্ষদার থান ধুতি গুটিয়ে হাঁটুর ওপর তোলা, কাঁধে গামছা অর্থাৎ স্নানে যাচ্ছেন মোক্ষদা। অবিশ্যি স্নানে যাচ্ছেন বলেই যে এই 'ভেতর-বাড়ির' অর্থাৎ শয়নবাড়ির উঠোনে তিনি পা দিতেন তা নয়, তবে আজকের কথা স্বতন্ত্র। আজকের উত্তেজনায় অত মরণ-বাঁচন জ্ঞান রাখলে চলে না, আজ নয় ঘাটে দু-দশটা ডুব দিয়ে ফের দীঘিতে ডুব দিতে যাবেন, তবে এদের মজলিশে যোগ দেওয়াটা দরকার।

মোক্ষদা সেজভাজের কথাটুকু শুনতে পেয়েছেন, এবং তাতেই সমগ্র নাটকটি অনুধাবন করে ফেলেছেন। তাই তিনি তিন আঙুলে হেঁটে খানিকটা এগিয়ে এসে গলা বাড়িয়ে বলে ওঠেন, "কী বললে সেজবৌ, কী বললে ? আর একবার বল তো শুনি ?"

শিবজায়া অবশ্য আরও একবার বললেন না, শুধু মাথার কাপড়টা অল্প টেনে মুখটা একটু ফেরালেন।

মোক্ষদা একটু বিষ-হাসি হেসে বলেন, "বলতে অবিশ্যি আর হবে না, কানে প্রেবেশ করেছে সবই। তবে ভাবছি সেজবৌ তুমি হঠাৎ এমন ভট্চায্যি হয়ে উঠলে কবে থেকে ? যাত্রাকালে রাস্সুর আমাদের, পরিবারের সঙ্গে চোখাচোখি হয় নি এই আক্ষেপে মরে যাচ্ছ তুমি ? কলি আর কত পুন্ন হবে ? চারকাল হয়ে তো কলি এখন উপচোচ্চে। শুভকাজে যাত্রাকালে লোকে ঠাকুর-দেবতার পট দেখে বেরোয়, গুরুজনের চরণ দর্শন করে বেরোয় এই তো জানি, জেনে এসেছি এতকাল ! পরিবারের বদন দর্শন না করে বেরোলে জাত যায়, এটা তুমিই প্রেথম্ শোনালে সেজবৌ।"

শিবজায়া ননদকে ভয় করলেও এতজনের মাঝখানে হেরে যেতে রাজী হন না, তাই বলে ওঠেন, "রাস্সুর কথা আমি বলি নি ছোট্ঠাকুরঝি, বড় নাত-বৌয়ের কথা বলছি। আবাগী জানল না শুনল না আচমকা মাথায়

পাহাড় পড়ল, আপনার সোয়ামী একা আপনার থাকতে থাকতে একবার শেষ দেখাও দেখতে পেল না ; সেই কথা হচ্ছে।"

মোক্ষদা সহসা খলখলিয়ে হেসে ওঠেন, "অ সেজবৌ, আর কেন ঘরে বসে আছ? যাত্রার পালা বাঁধ না! সত্য পয়ার বেঁধেছে—তুমিই বা বাকী থাক কেন? যা তোমাদের মতিগতি দেখছি, এ আর গেরস্ত-ঘরের যুগ্যি নয়। বুড়োমাগী তুমি, চারকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, লজ্জা এল না ও কথা মুখে আনতে? সোয়ামী কি মণ্ডা মেঠাই, যে একলা আস্তটা না খেতে পেলে পেট ভরবে না, ভাগ হয়ে গেলে প্রাণ ফেটে যাবে? ছি ছি! একটা ভদ্দরলোকের কত বড় বিপদ থেকে উদ্ধার করতে ছুটল রামকালী, আর তার কাজের কিনা ব্যাখ্যানা বসেছে!"

বড়দের এই বাক্‌যুদ্ধের মাঝখানে সত্য হাঁ করে তাকিয়েছিল, মোক্ষদার কথা শেষ হতেই হঠাৎ ঠাকুমার কোলের গোড়া থেকে উঠে সরে এসে বলে বসে, "সেজঠাকুমা তো ঠিকই বলেছে পিস্‌ঠাকুমা। নিয্যস বাবার অন্যাই হয়েছে!"

বাবার অন্যায়! সন্দেহযুক্ত নয়, একেবারে 'নিয্যস'!

উঠোনে কি বাজ পড়ল!

কলিকাল শেষ হয়ে কি প্রলয় এল?

আট

দুঃসংবাদের সঙ্গে সঙ্গেই অন্দরে কান্নার রোল উঠল। এ কী হরিষে বিষাদ! এ কী বিনামেঘে বজ্রাঘাত! এমন দুর্ঘটনা আর কবে কার সংসারে ঘটেছে? এত বড় সর্বনাশের কল্পনা দুঃস্বপ্নেও কে কবে করেছে?

এই তো এইমাত্র মেয়ে কলাতলায় শিলে দাঁড়িয়ে স্নান করে 'আইবুড়ো মুচি' ভেঙে, গায়ে-হলুদের দরুন কোরা লালপাড় শাড়িটুকু পরে চুল বাঁধতে বসেছে, পাড়ার শিল্পী মহিলার ঝাঁক 'কনে'র কেশ-রচনায় কে কত নৈপুণ্য দেখাতে পারেন তারই আলোচনায় অন্দরের দালান মুখর করে তুলেছেন, হঠাৎ বাইরের মহল থেকে আগুনের হল্‌কার মত এই সংবাদ এসে ছড়িয়ে পড়ল।

পরিণামে? দাবানল!

অতি বড় অবিশ্বাস্য হলেও এ যে বিশ্বাস না করে উপায় নেই। কারণ সংবাদ এনেছেন আর কেউ নয়, স্বয়ং রামকালী! যাঁর সম্পর্কে হিন্দুমাত্রও সন্দেহ পোষণ করা অসম্ভব। নচেৎ মিথ্যা দুঃসংবাদ রটনা করে বিয়ে ভণ্ডুল করে দিয়ে মজা দেখবে এমন আত্মীয়েরও অভাব নেই। কিন্তু ইনি হচ্ছেন রামকালী!

কাজেই সংবাদ মিথ্যা হতে পারে, এমন আশার কণিকামাত্রও নেই। নাঃ, কোন আশাই নেই। তা ছাড়া কবরেজ নিজের চোখে দেখে এসেছেন পাত্রের শিয়রে শমন।

অতএব কোরা শাড়ি জড়ানো বছর আষ্টেকের সেই হতভম্ব মেয়েটাকে ঘিরে প্রবল দাপটে কান্নার যা রোল উঠেছে তাতে ভয়ে মেয়েটার নাড়ি ছেড়ে যাবার যোগাড় হচ্ছে।

বিয়ের দিন যাত্রা-করা-বর মৃত্যুরোগ নিয়ে যাত্রা ভঙ্গ করে বাড়ি ফিরে গেলে এবং বিয়ের লগ্ন ভ্রষ্ট হলে, এমন কি সর্বনাশ সংগঠিত হতে পারে, সেটা বেচারার বুদ্ধির অগম্য, অনিষ্ট যদি কিছু হয় সে নয় তার ঠাকুর্দার হবে, তার কি?

কিন্তু তার কি, সে কথা সে নিজে কিছু না বুঝলেও মহিলার দল তাকে ধরে নাড়া দিয়ে দিয়েই তারস্বরে চেঁচিয়ে চলেছেন, "ওরে পটলী, তোর কপালে এমন ছাই পোরা ছিল, একথা তো কেউ কখনও চিন্তে করি নি রে! ওরে লগন-ভ্রেষ্ট মেয়ে গলায় নিয়ে আমরা কী করব রে? ওরে এর চাইতে তোকেই কেন শমনে ধরল না রে, সে যে এর থেকে ছিল ভাল!" ওঁরা লুটোপুটি করতে থাকেন, আর পটলী কাঠ হয়ে বসে থাকে। বসে বসে শুধু এইটুকু বিচার করতে পারে সে যে এত সব কাণ্ডকারখানা কিছুই হত না, যদি পটলীই রাতারাতি ওলাউঠো হয়ে মরত!

ওদিকে চণ্ডীমণ্ডপে লক্ষ্মীকান্ত বাঁড়ুয্যে মাথায় হাত দিয়ে পাথরের পুতুলের মত বসে আছেন, আর সেই পুতুলের মস্তিষ্কের কোষে কোষে ধ্বনিত হচ্ছে, 'এ কী করলে ভগবান! এ কী করলে ভগবান!'

রামকালী চলে যাওয়ার পর থেকে লক্ষ্মীকান্ত আর একটিও কথা বলেন নি, অপর কেউও তাঁকে সম্বোধন করতে সাহস পায় নি। ওদিকে বড়ছেলে শ্যামকান্তও বিশুষ্ক মুখে ঘাটের ধারে শিবতলায় গিয়ে বসে আছে চুপচাপ,

বাপের দিকে যাবার সাহস তার নেই। তার জামাই হচ্ছে বটে কিন্তু বয়সটা আর তার কি? এখনও তো তিরিশের নিচে। বাপকে সে যমের মত ভয় করে।

পটলীর মা বেহুলাও মুখ লুকিয়েছে ভাঁড়ার ঘরের কোণে। নিজেকেই তার সব চেয়ে অপরাধিনী মনে হচ্ছে। নিশ্চয়ই মহাপাপিষ্ঠা সে, নইলে তার মেয়ের বিয়ের ব্যাপারেই এত বড় দুর্লক্ষণ দুর্ঘটনা! সকলেই ফিসফাস বলাবলি করছে মেয়েটা নাকি তার আস্ত রাক্ষুসী, তাই বাসয়ে না উঠতেই সোয়ামীটার মাথা কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খেল। থাকুক এখন বেহুলা চিরজন্ম ওই দ' পড়া সর্বনাশী মেয়েকে গলায় গেঁথে। জাত ধর্ম কুল মান সবই গেল, রইল শুধু আমরণ যম-যন্ত্রণা।...

হ্যাঁ, বিয়ের রাত্রে বর-বিভ্রাট কি আর হয় না? ছাঁদনাতলা থেকেও বর উঠে যেতে দেখেছে অনেকে, কিন্তু সে সব অন্য কারণে। হয়তো 'পণে'র টাকা ঠিক সময়ে হাজির করতে না পারার জন্যে বচসার ফলে, নয়তো বা কোন হিতৈষীর দ্বারা কোন পক্ষের 'কুলে'র ঘাটতির কথা প্রকাশ হয়ে পড়ায়, অথবা কন্যাপক্ষের কনেকে বদলে ফেলে কালো কুশ্রী কনে গছিয়ে দেবার চেষ্টার ফলে, বচসা থেকে হাতাহাতি মারামারি হতে হতে বরপক্ষ রেগে-টেগে বর উঠিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু তখনি তার পারাপারও হয়ে যায়।

কারণ লগ্নভ্রষ্ট হয়ে গেলেই মেয়ে চিরকালের মত আধাবিধবা হয়ে বাপের ঘরে বসে থাকবে, এই আক্ষেপে পাড়ার কেউ না কেউ করুণাপরবশ হয়ে কোমর বেঁধে লেগে গিয়ে রাতারাতি অন্য পাত্তর যোগাড় করে আনেন। অতএব ভদ্রলোকের জাত মান রক্ষা পায়।

কিন্তু এ যে একেবারে বিপরীত কাজ! এ যে সদ্য রাক্ষসী-কন্যা।

এ হেন পতিঘাতিনী মেয়ের জন্যে আপনার ছেলেকে ধরে দেবে এমন মহানুভব ত্রিজগতে কে আছে?

না, বেহুলার এই মেয়ের জন্যে রাতারাতি পাত্রসংগ্রহ হওয়ার আশা দুরাশা। রামকালী কবরেজ অবশ্য একটু নাকি আশ্বাস দিয়ে গেছেন "চেষ্টা দেখছি" বলে, কিন্তু বোঝাই তো যাচ্ছে সেটা সম্পূর্ণ স্তোকবাক্য! এত বড় দুঃসংবাদটা বাড়ি বয়ে এসে দিয়ে গেলেন, মুখটা একটু হেঁট হল তো, তাই একটা অলীক স্তোক দিয়ে পালিয়ে গেলেন!

বেহুলা বোকা হতে পারে, কিন্তু এটুকু বুদ্ধি ধরে।

হায় মা ভগবতী, পটলী যে এত বড় অপয়া মেয়ে এ কথা তো কোনদিন বুঝতে দাও নি? ফুলের মত দেখতে মেয়ে, বাড়ির প্রথম সন্তান, সকলের আদরের আদরিনী আগানে-বাগানে হেসে খেলে বেড়িয়েছে এতদিন, ইদানীং সম্প্রতি ডাগরটি হয়েছে বলেই যা বাড়ির মধ্যে আটক ছিল, তা যেমন সুন্দরী তেমনি হাস্যবদনী, কে বলতে পেরেছে এ মেয়ে সর্বনাশী রাক্ষসী?

শ্বশুরঠাকুর তো বলেন পটলীর নাকি দেবগণ, তবে? দেবগণ কন্তে এমন রাক্ষসগণের কপাল পেল কি করে? আর শুধুই কি আজ? ও মেয়ে যদি ঘরে থাকে সংসার তো ছারেখারে যাবে।

মানদার পিসী তো স্পষ্টই বললেন সে কথা, "কে নেবে মা ও মেয়েকে? কার বাসনা হবে সংসারটা ছারে-গোল্লায় দিই? ও চিরটা কাল এই দ'পড়া হয়ে পড়ে থাকবে আর ঠাকুদ্দার সংসারটা চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে, এই আর কি!"

বেহুলা ডুকরে কেঁদে ওঠে।

কাঁদতে কাঁদতে বলে, "হে মা ওলাই বিবি, হে মা শেতলা, পটলীকে তোমরা নাও, ওর যেন আর এ ভিটেতে তেরাত্তির না পোহায়।"

মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে বেহুলা।

কাঁদছে সবাই।

বাড়ির গিন্নী থেকে শুরু করে বিচুলি কাটুনি বাগ্দী মাগীটা পর্যন্ত। পরের দুঃখে কাঁদবার এত বড় সুযোগ জীবনে ক'বার আসে?

কাঁদছে না শুধু পটলী, যে হচ্ছে এই বিবাহবিভ্রাট নাটকের প্রধানা নায়িকা। সে শুধু অনেকক্ষণ কাঠ হয়ে বসে থেকে সবে এইমাত্র ভাবতে শুরু করেছে বিয়েটাই যদি না হয়, তা হলে এখনও পটলীকে উপুসী রেখেছে কেন এরা? কেন কেউ একবারও বলছে না, "ওরে তোরা তবে এখন পটলীকে দুটো মতিচুর কি দেদোমণ্ডা দিয়ে জল খেতে দে।" পটলীর বুক থেকে পেট অবধি যেন মাঠের ধুলোর মতো শুকনো লাগছে।

কিন্তু পটলীর মুখে বুকে ধুলো বেটে যাচ্ছে, এ তুচ্ছ খবরটুকু ভাবতে বসবার সময় কার আছে? বরং পটলীর ওপর রাগে ঘৃণায় রি রি করছে সবাই!

শ্যামকান্ত বার দুই-তিন পুকুরপাড়ের দিক থেকে এসে উঁকি মেরে বাবাকে দেখে গেছে এবং যতবারই দেখেছে বাবা তামাক খাচ্ছেন না, বাবার হাতে হুঁকো নেই, ততবারই তার প্রাণটা ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সাহস করে তামাক সেজে এনে সামনে ধরে দেবে এত বুকের বল নেই, অপেক্ষা শুধু যদি পাড়ার কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি এসে পড়েন। হয়তো তেমন কেউ এলে লক্ষ্মীকান্তের মৌনভঙ্গ হবে।

নিজের যত বড় বিপত্তিই হোক, মানীর মান অবশ্যই রাখবেন লক্ষ্মীকান্ত।

কিন্তু পাড়ার ভদ্রলোকেদের আর আসতে বাকী আছে কার? তাঁরা তো সবাই একে একে এসে গেছেন।

বেলা পড়ে এল।

অর্থাৎ সর্বনাশের সময় ঘনিয়ে এল।

এ হেন সময় শ্যামাকান্তর প্রার্থনা পূর্ণ হল। এলেন রাখহরি ঘোষাল। রীতিমত বয়স্ক ব্যক্তি, অপেক্ষাকৃত দূরের পাল্লায় থাকেন, তাই এতক্ষণ এসে উঠতে পারেন নি। তিনি এসে নীরবে খড়ম খুলে ফরাসে উঠে বসলেন, ট্যাঁক থেকে শামুকের খোলের নস্যদানি বার করে দু'টিপ নিলেন, তার পর ধীরেসুস্থে বললেন, "ব্যাপার তো সবই শুনলাম লক্ষ্মীকান্ত, কিন্তু তুমি এভাবে মচ্ছিভঙ্গ হয়ে বসে থাকলে তো চলবে না।"

লক্ষ্মীকান্ত বাঁড়ুয্যে বয়সের সম্মান রাখতে জানলেও ঘোষাল-ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলো তো আর নেবেন না, তাই মাথাটা একটু নিচু ভাব করে ক্লান্ত স্বরে নেপথ্যের দিকে গলা বাড়িয়ে বলেন, "ওরে কে আছিস, ঘোষাল মশাইকে তামাক দিয়ে যা।"

"থাক থাক, ব্যস্ত হতে হবে না।" রাখহরি ঘোষাল বলেন, "সন্ধ্যা তো আগতপ্রায়, এখন কি করবে স্থির করলে?"

"স্থির আর আমি কি করব ঘোষাল মশাই", লক্ষ্মীকান্ত হতাশভাবে বলেন, "স্বয়ং যজ্ঞেশ্বরই যে যজ্ঞ পণ্ড করতে বসলেন—"

"তা বলে তো ভেঙে পড়লে চলবে না লক্ষ্মীকান্ত, কোমর বাঁধতে হবে। কন্যাকে নির্দিষ্ট লগ্নে পাত্রস্থা করতেই হবে। লগ্ন কখন?"

"মধ্যরাত্রের পর।"

"উত্তম কথা। সময় কিছু পাচ্ছ তুমি। আমি বলি কি তুমি আমার সঙ্গে একবার দয়ালের ওখানে চল—"

"দয়াল? দয়াল মুখুয্যে?"

"হ্যাঁ, দেখ যদি হাতেপায়ে ধরে রাজী করাতে পারো। এমনিতেই তো কালবিলম্ব হয়ে গেছে।"

লক্ষ্মীকান্ত বিস্মিত দৃষ্টি মেলে বলেন, "মুখুয্যে মশায়ের কাছে কার আশায় যাব ঠিক বুঝতে পারছি না তো ঘোষাল মশাই?"

"কার আশায় আবার লক্ষ্মীকান্ত, তুমি নেহাৎ শিশু সাজছ দেখছি। মুখুয্যের আশাতেই যাবে। নইলে রাতারাতি আর তোমার স্ব ঘর পাত্র পাচ্ছ কোথায়?"

লক্ষ্মীকান্ত কাতর মুখে বললেন, "মুখুয্যে মশায়ের সঙ্গে পটলীর বিয়ে? পটলীকে আপনি দেখেছেন ঘোষাল মশাই?"

"দেখেছি বৈকি", রাখহরি একটু রসিকহাসি হাসেন, "নাতনীকে তোমার দেখলে, ওর নাম গিয়ে মুনিরও মন টলে, 'ঘরে' মিললে আমিই এই বয়সে টোপর মাথায় দিতে চাইতাম। মুখুয্যেও তো তোমার গিয়ে বয়েস হলে কি হয়, রসিক ব্যক্তি। এই সেদিনও পথে পটলীকে দেখে বলছিল—"

রাখহরি একটু থামেন।

লক্ষ্মীকান্ত কিঞ্চিৎ বিরক্তভাবে বলেন, "কি বলছিলেন?"

"আহা তুচ্ছ কিছু নয়, তামাশা করে বলছিল, 'বাঁড়ুয্যের নাতনীটিকে দেখলে ইচ্ছে হয় আমার তৃতীয় পক্ষটিকে ত্যাগ করে ফেলে ফের ছাঁদনাতলায় গিয়ে দাঁড়াই'।"

লক্ষ্মীকান্ত এবার ঘোরতর বিরক্তির স্বরে বলেন, "এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করুন ঘোষাল মশাই।"

"বটে! ও!" রাখহরি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ান, "বুঝতে পারি নি! কলি পূর্ণ হতে এখনও কিছু বিলম্ব আছে ভেবেছিলাম। যাক শিক্ষা হয়ে গেল। আর যাই করি, কারুর হিত করবার চেষ্টা করব না।"

লক্ষ্মীকান্ত এবার ত্রস্ত কাতরতায় বলে ওঠেন, "আপনি অযথা কুপিত হবেন না ঘোষাল মশাই, আমার অবস্থাটা বিবেচনা করুন। মুখুয্যে মশাই আমার চাইতেও প্রায় চার-পাঁচ বৎসরের বয়োধিক, তা ছাড়া হাঁপানি-রোগগ্রস্ত।"

"হাপানিটা যমরোগ নয় লক্ষ্মীকান্ত," রাখহরি সতেজে বলেন, "আয়ুর্বেদ মতে ওটা হচ্ছে জীওজ ব্যাধি। তাছাড়া বয়সের কথা যা বলছ ওটা কোন কথাই নয়, পুরুষের আবার বয়েস! বরং মুখুয্যের আর দুটি পত্নীর ভাগ্য-প্রভাবে তোমার ঐ অলক্ষণা পৌত্রীটির বৈধব্য-যোগ খণ্ডন হয়েও যেতে পারে।"

"কিন্তু ঘোষাল মশাই—"

"থাক, 'কিন্তু'তে আর কাজ কি লক্ষ্মীকান্ত? তবে এটা জেনো, নিজেকে সমাজের শিরোমণি ভেবে যতই তুমি নির্ভয় থাক, এর পর অর্থাৎ তোমার ওই পৌত্রীকে নির্দিষ্ট লগ্নে পাত্রস্থ করতে না পারলে, সদ্‌ব্রাহ্মণরা তোমার গৃহে জলগ্রহণ করবেন কিনা সন্দেহ। এই দুঃসময়ে অপোগণ্ড একটা ছুঁড়ির বুড়োবর-যুবোবরের ভাবনা তুমি ভাবতে বসছ, কুলমর্যাদা ধর্ম-সংস্কার জাতি-মান এসব বিস্মৃত হচ্ছ, এ একটা তাজ্জব বটে!"

"ঘোষাল মশাই আপনি আমায় মার্জনা করুন, বরং পটলীকে নিয়ে আমি কাশীবাসী হব—"

"তা হবে বৈকি," রাখহরি একটু বিষহাসি হেসে বলেন, "বে-মালিক সুন্দরী যুবতীর পক্ষে কাশীর মত উপযুক্ত স্থান আর কোথায় আছে? নাতনী হতে কাশীবাসের সংস্থানটাও তোমার হয়ে যাবে লক্ষ্মীকান্ত।"

"ঘোষাল মশাই!" লক্ষ্মীকান্ত বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, "আপনি আমার গুরুজনতুল্য তাই এযাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলেন। নচেৎ—"

"নচেৎ কি করতে লক্ষ্মীকান্ত," বিদ্রূপহাস্যে মুখ কুঁচকে রাখহরি বলে ওঠেন, "নচেৎ কি মারতে নাকি?"

শোধ নেবার দিন এসেছে, শোধ নেবেন বৈকি ঘোষাল। ঘোষাল বামুনদের প্রতি লক্ষ্মীকান্ত বাঁড়ুয্যের অন্তঃসলিলা তাচ্ছিল্য ভাবটা তো আর অবিদিত নেই রাখহরির! যতই বিনয়ের ভাব দেখাক বাঁড়ুয্যে, ওর চোখের দৃষ্টিতেই সেই উচ্চ-নীচ ভেদাভেদটা ধরা পড়ে যায়। আজ সেই প্রতিশোধ নেবার সময় এসেছে, ছাড়বেন কেন রাখহরি?

"ঘোষাল মশাই, আমাকে রেহাই দিন," দুই হাত জোড় করে লক্ষ্মীকান্ত বলেন, "ভগবান যদি আমার জাতিধর্ম রক্ষা করিতে ইচ্ছুক থাকেন, লগ্নের আগেই উপযুক্ত পাত্র পেয়ে যাব, নচেৎ মনে করব—"

"লগ্নের আগেই উপযুক্ত পাত্র!" রাখহরি আর একবার বিদ্রূপ-হাস্যে

মুখ বাঁকিয়ে বলেন, "পাত্রটিকে বোধ হয় স্বয়ং তিনি বৈকুণ্ঠ থেকে পাঠিয়ে দেবেন ?"

লক্ষ্মীকান্ত কী একটা উত্তর দিতে উদ্যত হচ্ছিলেন, সহসা শ্যামকান্ত নিজের স্বভাববিরুদ্ধ উত্তেজনায় ছুটে এসে বলে—"বাবা, কবরেজ চাটুয্যে মশাই আসছেন। ঘোড়ায় চেপে পিছনে কাকে যেন নিয়ে।"

"অঁ্যা! নারায়ণ!"

লক্ষ্মীকান্ত উঠে দাঁড়াতে গিয়ে বসে পড়েন।

নয়

আসর-সাজানো বরাসনে বসবার সময় আর ছিল না, হুড়মুড়িয়ে একেবারে কলাতলায় খেউরী করিয়ে স্নান করিয়ে নিয়ে সোজা নিয়ে যেতে হবে সম্প্রদানের পিঁড়িতে। সেই পিঁড়িতেই ধানদূর্বো আর আংটি দিয়ে 'পাকা দেখা' অনুষ্ঠানের প্রথাটা পালন করে নিতে হবে।

অবিশ্যি সারাদিনে অন্ততঃ বার পাঁচ-ছয় চর্বচোষ্য করে খেয়েছে রাসু, কিন্তু কি আর করা যাবে! এরকম আকস্মিক ব্যাপারে ওসব মানার উপায় কোথায়? বলে কত মেয়েরই বিয়ে হয়ে যাচ্ছে 'ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বিয়ে' করে। এই তো লক্ষ্মীকান্তরই এক জ্ঞাতি ভাইপোর মেয়ের বিয়ে হল সেবার ঘুমন্ত মেয়েটাকে মাঝরাতে টেনে তুলে। গ্রামের আর কার বাড়িতে বর এসেছিল বিয়ে করতে, তার পর যা হয়! কোথা থেকে যেন উঠে পড়ল কন্যেপক্ষর কুলের খোঁটা, তা থেকে বচসা অপমান, পাত্র উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া।

যাক সে কথা,, মূল কথা হচ্ছে, আকস্মিকের ক্ষেত্রে চর্বচোষ্য খেয়েও বিয়ের পিঁড়িতে বসা যায়।

কথা হচ্ছে—এখন রাসুকে নিয়ে।

রাসুর অবস্থাটা কি?

সে কি এখন খুব একটা অন্তর্দ্বন্দ্বে পীড়িত হচ্ছে?

তীব্র একটা যন্ত্রণা, ভয়ঙ্কর একটা অনুতাপ, প্রবল একটা মানসিক

বিদ্রোহের আলোড়ন কি রাসুকে ছিন্নভিন্ন করছিল? বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ এই চিলের মত ছোঁ মেরে উড়িয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এনে আরও একটা সাতপাকের বন্ধনে বন্দী করে ফেলবার চক্রান্তে কাকার ওপর কি রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিল রাসু?

না, রাসুর মুখ দেখে তা মনে হচ্ছে না।

বলির পাঁঠার অবস্থা ঘটলেও ভয়ে বলির পাঁঠার মত কাঁপছিলও না রাসু, শুধু কেমন একটা ভাবশূন্য ফ্যালফেলে মুখে নিজের নির্দেশিত ভূমিকা পালন করে চলছিল সে।

হ্যাঁ, এই আকস্মিকতার আঘাতে বেচারা রাসুর শুধু মুখটাই নয়, মনটাও কেমন ভাবশূন্য ফ্যালফেলে হয়ে গিয়েছে। সেখানে সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কোন কিছুরই সাড় নেই।

সে-মনে ধাক্কা লাগল স্ত্রী-আচারের সময়। সে ধাক্কায় খানিকটা সাড় ফিরল।

সেই সাড়ে মনের মধ্যে একটা ভয়ানক কষ্টবোধ করতে থাকল রাসু।

সাত এয়োতে মিলে যখন মাথায় করে শ্রী, কুলো, বরণডালা, আইহাঁড়ি চিতের কাঠি, ধুতরো ফলের প্রদীপ সাজানো থালা ইত্যাদি নিয়ে বর-কনেকে প্রদক্ষিণ করছিল, ধাক্কাটা লাগল ঠিক তখন।

এয়োদের অবশ্য একগলা করে ঘোমটা, কিন্তু তার মধ্যেও 'আদল' বলে একটা কথা আছে। যে বৌটির মাথায় বরণডালা, তার আদলটা ঠিক সারদার মতন। যদিও দিনের বেলা হঠাৎ সারদার মুখটা দেখলে রাসু ঠিক চিনতে পারবে কিনা সন্দেহ, তবু আদলটা চেনে। ওই রকম বেগ্‌নী রঙের জমকালো একখানা চেলিও যেন সারদাকে মাঝে মাঝে পরতে দেখেছে রাসু। পাড়ার কারুর বিয়েটিয়েতে, কি সিংহবাহিনীর অঞ্জলি দেবার সময়।

দেখেছে অবিশ্যি নিতান্ত দূর থেকে, আর ভাল করে তাকাবার সাহসও হয় নি। কারণ রাতদুপুরের আগে, সমস্ত বাড়ি নিশুতি না হওয়া পর্যন্ত কাছাকাছি আসবার উপায় কোথা? আর তখন তো সাঁরদা সাজসজ্জা গহনাগাঁটির ভারমুক্ত। তা ছাড়া সারদা ঘরে ঢুকেই ঘরের কোণের প্রদীপটা দেয় নিভিয়ে। বলে, "কে কমনে থেকে দেখে ফেলে যদি!"

অবিশ্যি দেখবার পথ বলতে কিছুই নেই। রামকালী চাটুয্যের বাড়ির

দরজা-কপাট তো আর পাড়ার পাঁচজনদের মত আমকাঠের নয় যে, ফাটাফুটো থাকবে, মজবুত কাঁটালকাঠের লোহার পাতমারা দরজা। দরজার কড়া-ছেকলগুলোই বোধ করি ওজনে দু-পাঁচ সের। আর জানলা? সে তো জানলা নয় গবাক্ষ। মানুষের মাথা ছাড়ানো উঁচুতে ছোট্ট ছোট্ট খুপরি জানলা, সেখানে আর কে চোখ ফেলবে? তবু সাবধানের মার নেই।

গ্রীষ্মকালে অবশ্য পুরুষরা এ রকম চাপা ঘরে শুতে পারেন না, তাঁদের জন্যে চণ্ডীমণ্ডপে কিংবা ছাতে শেতলপাটি বিছিয়ে রাখা হয় ভিজে গামছা দিয়ে মুছে মুছে। সেখানে তাকিয়া যায়, হাতপাখা যায়, গাড়ু গামছা যায়, 'বয়ে' নিয়ে যায় রাখাল ছেলেটা কি মুনিষটা। কর্তাদের অসুবিধে নেই।

প্রাণ যায় বাড়ির মহিলাদের, আর নববিবাহিত যুবকদের। তারা প্রাণ ধরে বারবাড়িতে শুতে যেতে পারে না, অথচ ভেতরবাড়ির ঘরের ভিতরের গুমোটও প্রাণান্তকর।

তবে সারদার মত বৌ হলে আলাদা। সারদা এই গ্রীষ্মকালে সারারাত্তির পাখা ভিজিয়ে বাতাস করে রাসুকে।

প্রাণের ভেতরটা হঠাৎ কেমন মোচড় দিয়ে উঠল রাসুর। গতকাল রাত্রেও সারদা সেই পতিসেবার ব্যতিক্রম করে নি। রাসু মায়া করে বার বার বারণ করছিল বলে, কচি ছেলেটার গরমের ছুতো করে পাখা নেড়েছে সারদা। আর সব চেয়ে মারাত্মক কথা, যেটা মনে করে হঠাৎ বুকটা এমন মুচড়ে মুচড়ে উঠছে রাসুর, মাত্র কাল রাত্তিরেই সারদা তাকে ভয়ানক একটা সত্যবদ্ধ করিয়ে নিয়েছিল।

বাতাস দিতে বারণ করার কথায় চুপি চুপি হেসে বলেছিল সারদা, "এত তো মায়া, এ মায়ার পরিচয় প্রকাশ করতে পারবে চেরকাল?"

রাসু ঠিক বুঝতে পারে নি, একটু অবাক হাসি হেসে বলেছিল, "চিরকাল কি গরম থাকবে?"

"আহা তা বলছি নে। বলছি—", রাসুর বুকের একেবারে কাছে সরে এসে সারদা বলেছিল, "সতীনজ্বালার কথা বলছি। তখন কি আর মায়া করবে? বলবে কি 'আহা ওর সতীনে বড় ভয়'!"

রাসু যতটা নিঃশব্দে সম্ভব হেসে উঠেছিল, হেসে উঠে বলেছিল, "হঠাৎ দিবা-স্বপ্ন দেখছ নাকি? সতীনজ্বালা আবার কে দিলে তোমায়?"

"দেয় নি, দিতে কতক্ষণ?"

"অনেকক্ষণ! আমার অমন দু-চারটে বৌ ভাল লাগে না। দরকারও নেই।"

সারদা তবু জেরা ছাড়ে নি, "আর আমি বুড়ো হয়ে গেলে? তখন তো দরকার হবে?"

রাসু ভারি কৌতুক অনুভব করেছিল, আবার হেসে ফেলে বলেছিল, "এ যে দেখি 'হাওয়ার সঙ্গে মনান্তর'। তুমি বুড়ো হয়ে যাবে, আর আমি বুঝি জোয়ান থাকব?"

"আহা, পুরুষছেলে কি আর সহজে বুড়ো হয়? তা ছাড়া ঠাকুরের তুমি জ্যেষ্ঠ ছেলে, দেখতে সোন্দর। এত পয়সাওলা মানুষ তোমরা, কত ভাল ভাল সম্বন্ধ আসবে তোমার, তখন কি আর আমার কথা—"

হঠাৎ আবেগে কেঁদে ফেলেছিল সারদা।

অগত্যাই নিবিড় করে কাছে টেনে নিয়ে বৌকে আদর সোহাগ করে ভোলাতে হয়েছে রাসুকে। বলতে হয়েছে, "সাধে কি আর বলছি, হাওয়ার সঙ্গে মনান্তর। কোথায় সতীন তার ঠিক নেই, কাঁদতে বসলো। ওসব ভয় করো না।"

আরও অনেক বাক্য বিনিময়ের পর পতিব্রতা সারদা স্বামীকে আশ্বাস দিয়েছিল, "তা বলে তোমাকে আমি এমন সত্যিবন্দী করে রাখছি নে যে আমি মরে গেলেও ফের বে' করতে পারবে না। আমি মলে তুমি একটা কেন একশটা বে' করো, কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে নয়।"

"নয়, নয়, নয়! হল তো?" তিন-সত্যি করেছিল রাসু।

মাত্র গতরাত্রে।

আর আজ সেই রাসু এই টোপর চেলি পরে কলাতলায় দাঁড়িয়ে আছে, এই মাত্তর যে গিন্নী মানুষটা বরণ করছিল, সে বলে উঠেছে, "কড়ি দিয়ে কিনলাম, দড়ি দিয়ে বাঁধলাম, হাতে দিলাম মাকু, একবার 'ভ্যা' কর তো বাপু।"

একটা মানুষকে কতবার কেনা যায়?

বাঁধা জিনিসটাকে আবার কি ভাবে বাঁধা যায়?

হায় ভগবান, রাসুকে এমন বিড়ম্বনায় ফেলে কি সুখ হল তোমার?

আহা, রাসু যদি ঠিক আজকেই গাঁয়ে না থাকত। রুগী দিদিমাকে

দেখতে এমন তো মাঝে মাঝে গাঁ ছেড়ে ভিন্‌গাঁয়ে যায় রাসু। আজই যদি তাই হত! যদি দিদিমা বুড়ী টেঁসে গিয়ে ওখানেই আজ আটকে ফেলত রাসুকে!

যদি ঠিক এইসময় জ্ঞাতিগোত্তর কেউ মরে গিয়ে অশৌচ ঘটিয়ে রাখত রাসুদের! যদি রাসুরও এদের সেই বরটার মতন আচমকা একটা শক্ত অসুখ করে বসত!

তেমন কোন কিছু ঘটলে তো আর বিয়ে হতে পারত না!

কন্যাদায়গ্রস্ত বিপন্ন ভদ্রলোকের বিপদের কথা মনের কোণেও আসে না রাসুর, মরুক চুলোয় যাক ওরা, রাসুর এ কী বিপদ হল!

এ যদি কাকা রামকালী না হয়ে বাবা কুঞ্জবেহারী হত! বাবা যদি বলত "ভদ্রলোকের বিপদ উপস্থিত রাসু, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সময় আর নেই, চল ওঠ্।" তা হলেও হয়ত বা রাসু খানিক মাথা চুলকোতে বসত!

কিন্তু এ হচ্ছে যার নাম মেজকাকা। যার হুকুমের ওপর আর কথা চলে না।

অনেক 'যদি'র শেষে অবশেষে হতাশচিত্ত রাসু এ কথাও ভাবল, "আর কিছুও না হোক, যদি গতরাত্রে রাসু গ্রীষ্মের কারণে 'বারবাড়িতে' শুতে যেত। তা হলে তো ওই সত্যবন্দীর দায়ে পড়তে হত না তাকে!

এর পর কি আর জন্মে কোন দিন কোন ব্যাপারে রাসুকে বিশ্বাস করতে পারবে সারদা? বিশ্বাস করতে পারবে এক্ষেত্রে রাসু বেচারাও সারদার মতই নিরুপায়? কোন হাত ছিল না তার? নাঃ, বিশ্বাস করবে না সারদা, বলবে, "বোঝা গেছে বোঝা গেছে! বেটাছেলেদের আবার মন-মায়া! বেট্যাছেলের আবার তিন-সত্যি!"

কিন্তু কথাই কি আর কখনো কইবে সারদা? হয়তো জীবনে আর কথা কইবে না রাসুর সঙ্গে, নয়তো দুঃখে অভিমানে মনের ঘেন্নায়—হঠাৎ রাসুর মনশ্চক্ষে বিশালকায় "চাটুয্যেপুকুরের" কাকচক্ষু জলটার দৃশ্য ভেসে ওঠে।

মনের ঘেন্নায় আজ রাত্তিরেই সারদা কিছু একটা করে বসছে না তো?

বুকের ভেতরটা কে যেন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে চিরে চিরে নুন দিচ্ছে। রাসু বুঝি আর চুপ করে থাকতে পারবে না, বুঝি হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠবে।

না, চেঁচিয়ে ওঠে নি রাসু, তবে মুখের চেহারা দেখে কন্যাপক্ষের কে

একজন বলে উঠল, "বাবাজীর কি শরীর অসুস্থবোধ হচ্ছে?"

আবার বিয়ের বরের শরীর অসুস্থ!

লক্ষ্মীকান্ত একবার এই হিতৈষী-সাজা দুর্মুখটার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন, তার পর গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ দিলেন, "ওরে কে আছিস, আর একখানা হাতপাখা নিয়ে আয় দিকি, নতুন নাতজামাইয়ের মাথার দিকে বাতাসটা একটু জোরে জোরে দে।"

জোর জোর বাতাসে মুখের চেহারাটা রাসুর সত্যি একটু ভাল দেখাল। আর না দেখালেই বা কি, ততক্ষণে তো বিয়ে সাঙ্গ হয়ে গেছে, বরকনেকে "লক্ষ্মীর ঘরে" প্রণাম করিয়ে বাসরে বসাতে নিয়ে যাচ্ছে সবাই ধরে ধরে, পায়ের গোড়ায় ঘটি ঘটি জল ঢালতে ঢালতে।

সেখানে আবারও তো সেই সেবারের মতন উপদ্রব হবে? সারদার বাপের বাড়ির সেই সব মেয়েমানুষদের বাক্যি আর বাচালতা মনে করলে রাসুর এখনো হৃৎকম্প হয়।

আবার তেমনি ভয়ঙ্কর একটা অবস্থার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে এখন রাসুকে!

সম্পূর্ণ অসহায়, সম্পূর্ণ নিরস্ত্র।

হঠাৎ রাসু দার্শনিকের মত নিজের ব্যক্তিগত দুঃখজ্বালা ভুলে একটা বিরাট দর্শনের সত্য আবিষ্কার করে বসে।

মানুষ কি অদ্ভুত নির্বোধ জীব!

এই কুশ্রী কদর্যতাকে ইচ্ছে করে জীবনে বারবার সেধে নিয়ে আসে! বারবার নিজেকে কানাকড়িতে বিকোয়!

পরদিন সকালে এখানে 'বৌছত্র' আঁকা হচ্ছিল।

ইচ্ছে-শখের বিয়ের মত নিখুঁত করে বাহার করে না হোক, নিয়মপালাটা তো বজায় রাখতে হবে?

আর এত বড় উঠোনটায় যেমন তেমন করে একটু আলপনা ঠেকাতেও এক সের পাঁচপো চাল না ভিজোলে চলবে না।

তা' সেই পাঁচপো চালই ভিজিয়ে দিয়েছিলেন রামকালীর খুড়ী নন্দরাণী। রামকালীর নিজের খুড়ী নয়, জেঠতুতো খুড়ী। সংসারের যত কিছু নিয়ম

লক্ষণ নিতকিতের কাজের ভার নন্দরাণী আর কুঞ্জর বৌয়ের উপর। কারণ ওরাই দুজন হচ্ছে একেবারে 'অখণ্ডপোয়াতি'। কুঞ্জর বৌয়ের তো সাতটি ছেলেমেয়েই ষেটের কোলে খোসমেজাজে বাহাল তবিয়তে টিঁকে আছে।

নন্দরাণীর অবশ্য মাত্র দু-তিনটিই।

সে যাক, বিয়ের ব্যাপারে নিয়মপালার কাজের সব কিছুই যখন নন্দরাণীর দখলে—তখন এক্ষেত্রেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন? কাজেই রাসুর এই বিয়েটাকে মনে মনে যতই অসমর্থন করুন নন্দরাণী, পুরো পাঁচপো আতপ চালই ভিজিয়ে দিয়েছিলেন তিনি উঠোনে 'বৌছত্তর' আঁকতে। দুধে-আলতার প্রকাণ্ড পাথর বসিয়ে তাকে কেন্দ্র করে আর ঘিরে ঘিরে দ্রুতহস্তে ফুল লতা শাঁখ পদ্ম এঁকে চলেছিলেন নন্দরাণী; সাঙ্গ হতে কিছু-কিঞ্চিৎ দেরি আছে এখনও, সহসা রাখাল ছোঁড়া ঘর্মাক্ত কলেবরে ছুটতে ছুটতে এসে উঠোনের দরজায় দাঁড়িয়ে আকর্ণবিস্তৃত হাস্যে জানান দিল, "বরকনে এয়েলো গো! আমি উই-ই দীঘির পাড় থেকে দেখতে পেয়েই ছুটে ছুটে বলতে এনু।"

"তা তো এলো—" নন্দরাণী বিপন্নমুখে এদিক ওদিক তাকিয়ে ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠেন, "দিদি, অ দিদি, বরকনে এসে পড়ল শুনছি—"

বরকনে! এসে পড়ল!

দীনতারিণী কুটনো ফেলে ছুটে এলেন, "এখুনি এসে পড়ল? রামকালীর কি এতও তাড়াহুড়ো?"

"বারবেলা পড়বার আগেই বোধ করি নিয়ে এসেছেন রামকালী।"

যদিচ ভাসুরপো, তথাপি ধনে মানে এবং সর্বোপরি বয়সে বড়। কাজেই নন্দরাণী রামকালী সম্পর্কে 'ছেন' দিয়েই বাক্যবিন্যাস করেন। এখনো করলেন।

দীনতারিণী 'বারবেলা' শব্দটায় মনকে স্থির করে নিয়ে বললেন, "তা হবে। তা তোমাদের 'নেমকম্মর' সব প্রস্তুত?"

নন্দরাণী আরও ব্যস্ত হাতে হাতের কাজ সারতে সারতে বলেন, "প্রস্তুত তো একরকম সবই, কিন্তু দুধটা যে ওথলাতে হবে! সেটা আবার এখন কে করবে?"

দুধ! তাই তো!

ওথলানোর দরকার বটে।

বৌ এসে সদ্য উথলে-পড়া দুধ দেখলে, সংসার নাকি ধন-ধান্যে উথলে ওঠে।

দীনতারিণী উদ্বিগ্ন মুখে প্রশ্ন করলেন, "বড় বৌমা কোথায় গেলেন?"

"বড় বৌমা? সে তো রান্নাশালে। তাড়াহুড়ো করে একঘর রেঁধে রাখতে হবে তো? বৌ এসে দৃষ্টি দেবে।"

বড় বৌমা অর্থে রাসুর মা! তাকে তাই বলে তো নন্দরাণী।

কারণ নন্দরাণী বয়সে রাসুর মার সমবয়সী হলেও মান্যে বড়, সম্পর্কে খুড়শাশুড়ী. কাজেই 'বৌমা'!

যাই হোক, কুঞ্জর বৌ রান্নাশালে।

অতএব দুধ ওথলাতে আর কাউকে দরকার। ওদিকে বরকনে আগতপ্রায়।

দীনতারিণী মনশ্চক্ষে চারিদিক তাকিয়ে নেন, আর কে আছে? অখণ্ড-পোয়াতি, সোয়ামীর প্রথম পক্ষ।

দ্বিতীয় তৃতীয় পক্ষ দিয়ে তো আর পুণ্যকর্ম হবে না?

কে আছে?

ওমা, ভাববার কি আছে?

সারদাই তো আছে।

তাকেই ডাক্ দেওয়া হোক তবে। একা ঘরের কোণে বসে রয়েছে মনমরা হয়ে, কাজেকর্মে ডাকলে তবু মনটা অন্যমনস্ক হয়ে, তা ছাড়া নতুন লোক নির্বাচনের সময়ই বা কোথা?

সত্য উঠোন পার হচ্ছিল তীরবেগে, দীনতারিণী তাকেই ডাক দিলেন, "এই সত্য, ধিঙ্গী অবতার! যা দিকিন, বড় নাতবৌমাকে ডেকে আন দিকিন শীগগির, বরকনে এসে পড়ল পেরায়, দুধ ওথলাতে হবে।"

"বৌকে? বড়দার বৌকে ডেকে দেব?" সত্য দুই হাত উল্টে বলে, "বৌ কি আর বৌতে আছে? ভোর থেকে মাটিতে পড়ে কেঁদে কেঁদে মরছে!"

"কেঁদে কেঁদে মরছে?" দীনতারিণী বিরক্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন, "একেবারে মরছেন, কেন এত মরবার কি হল? ওমা, শুভদিনে ইকি অলক্ষুণে কাণ্ড! যা শীগগির ডেকে আন।"

সত্য এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে, "কে বাবা ডাকতে যায়। তুমি তো বললে কাঁদবার কি হয়েছে? বলি নিজের যদি হত? সতীন আসছে কাঁদবে না,

আহ্লাদে উর্ধ্ববাহু হয়ে নাচবে মানুষ! হুঁঃ! কই কোথায় কি আছে তোমাদের? আমিই দিচ্ছি দুধ জ্বাল দিয়ে।"

"তুই? তুই দিবি দুধ জ্বাল।"

"কেন, দিলেই বা?" সত্য সোৎসাহে বলে, "পিস্ঠাকুমা যে সেবার খুন্তির দিদির বিয়েতে বলল, সত্যর বছর ঘুরে গেছে, এখন এয়োডালার হাত দিতে পারে!"

বছর ঘুরে অর্থাৎ বিয়ের বছর ঘুরে।

সেটা আর স্পষ্টাস্পষ্টি উচ্চারণ করল না সত্য।

দীনতারিণী সন্দিগ্ধ স্বরে বলেন, "বছর ঘুরলেই বুঝি হল? ঘরবসত না হলে—"

"জানি নে বাবা। রাখো তোমাদের সন্দ! আমি এই হাত দিলাম।"

বলেই সত্য দাওয়ার পাশে দুখানা ইঁট পাতা উনুনের উপর জ্বালে বসানো ছোট্ট সরা চাপা মাটির হাঁড়িটার নিচে ফুঁ দিতে শুরু করে।

ঘুঁটের আগুন জ্বলছে ধিকি ধিকি, ফুঁ পেড়ে দু-চারখানা নারকেল পাতা ঠেলে দিলেই জ্বলে উঠবে দাউ দাউ করে। তা গোছালো মেয়ে নন্দরাণী নারকেল পাতার গোছাও এনে রেখেছেন পাশে।

সত্যর সকল কাজই উদ্দাম।

তার ফুঁয়ের দাপটে বরকনে আসার আগেই দুধ ওথলাতে শুরু করল। উথলে ধোঁয়া ছড়িয়ে ভেসে গেল গড়িয়ে পড়ে।

দীনতারিণী হাঁ হাঁ করে উঠলেন, "ওরে একটু রয়ে বসে, নতুন বৌ ঢোকা মাত্তর যেন দেখতে পায়।"

কথা শেষ হবার আগে বাইরের উঠোনে শাঁখ বেজে উঠল।

অর্থাৎ শুভাগমন ঘটেছে নতুন বৌয়ের।

মোক্ষদা শাঁখ হাতে দাঁড়িয়েছিলেন বাইরে। আজ পূর্ণিমা, বিধবাদের ঘরে রান্নার ঝামেলা নেই, কোন একসময় আমকাঁঠাল ফলমিষ্টি খেলেই হবে। কাজেই আজ ছুটি মোক্ষদাদের।

ছুটিই যদি, তবে ছুটোছুটি না করবেন কেন মোক্ষদা? স্নান তো করতেই হবে জল খাবার আগে?

তাই মোক্ষদাই অগ্রণী হয়ে বারবাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে আছেন। আছেন শাঁখ হাতে নিয়ে।

শুভকর্মে বিধবারা সমস্ত কর্মে অনধিকারী হলেও, এই একটি কর্মে তাদের অধিকার আছে, সমাজ অথবা সমাজপতিরা বোধ করি এটুকু আর কেড়ে নেন নি, ক্ষ্যামা-ঘেন্না করে ছেড়ে দিয়েছেন। শাঁখ আর উলু।

অতএব সেই অধিকারটুকুর সম্যক সদ্ব্যবহার করতে থাকেন মোক্ষদা রাসুর দ্বিতীয় অভিযানান্তে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে।

দীনতারিণী উদ্গ্রীব হয়ে এগিয়ে যেতে যেতে চমকে উঠে বলেন, "অমন করে হাতে ফুঁ দিচ্ছিস যে সত্য? পোড়ালি বুঝি?"

সত্য তাড়াতাড়ি সত্য গোপন করে ফেলে বলে, "পোড়াবো কেন, হুঁঃ।"

"তবে হাতে ফুঃ পাড়ছিস কেন?"

"এমনি।"

"যাক এবার উনুনে ফুঁ পাড়, ঢোকার সময় যেন আর একবার দুধটা ফেঁপে ওঠে, তা উঠেছে, বৌ পয়মন্ত হবে। সেবারে বরং—"

কথা শেষ হবার আগেই রামকালীর গম্ভীর কণ্ঠনিনাদ ধ্বনিত হল, "তোমাদের ওই সব বরণ-টরণ তাড়াতাড়ি সেরে ফেলো ছোটপিসী, বারবেলা পড়তে আর বেশী দেরি নেই।"

মুহুর্মুহু শঙ্খনিনাদে রামকালীর কণ্ঠনিনাদও ম্লান হয়ে গেল।

বরকনে ঢুকল ভিতরবাড়ির উঠোনে। পিছনে পিছনে পাড়া ঝেটিয়ে অবগুণ্ঠনবতীর দল।

বিয়েটা যেভাবে আর যে অবস্থাতেই ঘটে থাকুক বৌভাতের যজ্ঞি একটা করতেই হবে। আমোদ-আহ্লাদের প্রয়োজনে নয়, 'সমাজ-জানিত' করবার প্রয়োজনে। খামকা একদিন "হুট" করে লক্ষ্মীকান্ত বাঁড়ুয্যের পৌত্রী এসে চাটুয্যেবাড়ির অন্দরে সামিল হল, কাকে-পক্ষীতে টের পেল না, এটা তো আর কাজের কথা নয়। তার প্রবেশটা যে বৈধ, এ খবরটুকুর একটা পাকা দলিল তো থাকা চাই।

দলিল আর কি। লিখিত্ পড়িত্ তো কিছু নয়, সই-সাবুদও নয়, মানুষের স্মরণ-সাক্ষ্যই দলিল। তা সেই স্মরণ-সাক্ষ্য আদায় করতে হলে, গ্রাম-সমাজকে একদিন গলবস্ত্রে ডেকে এনে উত্তম ফলার খাইয়ে দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় কি?

তা ছাড়া বাঁড়ুয্যেদের মেয়ে যে চাটুয্যে-পরিবারভুক্ত হল, তার স্বীকৃতিটাও তো দিতে হবে? 'বৌভাতে'র যজ্ঞিতে নতুন বৌয়ের হাত দিয়ে ভাত পরিবেশন করিয়ে জ্ঞাতিকুটুমের কাছ থেকে সেই স্বীকৃতি নেওয়া।

অতএব বিয়েতে যজ্ঞির আয়োজন না করলেই নয়। আগে থেকে বিলি বন্দেজ নেই, হুটুক্কারি করে বিয়ে, তাই ভোজের আয়োজনেও হুড়োহুড়ি লেগে গেছে। অনুগত জনের অভাব নেই রামকালীর, দিকে দিকে লোক ছুটিয়ে দিয়েছেন। জনাইতে মনোহরার বায়না গেছে, বর্ধমানে মিহিদানার। তুষ্টু গয়লাকে ভার দেওয়া হয়েছে দৈএর, আর ভীমে জেলেকে ডেকে পাঠিয়েছেন মাছের ব্যবস্থা করতে। কোন্ পুকুরে জাল ফেলবে, ক-মণ তোলা হবে, এইসব নির্দেশ দিচ্ছিলেন রামকালী, সহসা সেই আসরে এসে উপস্থিত হলেন মোক্ষদা।

এ তল্লাটে রামকালীকে ভয় করে না এমন কেউ নেই, বাদে মোক্ষদা। রামকালীর মুখের ওপর হক কথা শুনিয়ে দেবার ক্ষমতা একা মোক্ষদাই রাখেন। নইলে দীনতারিণী পর্যন্ত তো ছেলেকে সমীহ করে চলেন।

অবশ্যি ভাবা যেতে পারে রামকালীকে হক কথা শুনিয়ে দেবার সুযোগটা আসে কখন? যে মানুষ কর্তব্যপালনে প্রায় ত্রুটিহীন, তাকে দু কথা শুনিয়ে দেবার কথা উঠছে কি করে?

কিন্তু ওঠে।

মোক্ষদা ওঠান। কারণ মোক্ষদার বিচার নিজের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে। রামকালীর মতে যেটা নিশ্চিত কর্তব্য, প্রায়শই মোক্ষদার মতে সেটা অনর্থক বাড়াবাড়ি।

তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই—'হক কথা'র মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায় সত্যবতী। হবে না-ই বা কেন? রামকালী যদি এমন মেয়ে গড়ে তোলেন যেমন মেয়ে ভূ-ভারতে নেই, তা হলে আর কথা শোনানোয় মোক্ষদার দোষটা কি? সৃষ্টিছাড়া ওই মেয়েটাকে তাই যখন তখন তার বাপের সামনে হাজির করে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি করতেই হয় মোক্ষদাকে।

আজও তাই রামকালীর দরবারে একা আসেন নি মোক্ষদা, এনেছেন সত্যবতীকে সঙ্গে করে। সত্যবতীও এসেছে বিনা প্রতিবাদেই। অবশ্য প্রতিবাদে লাভ নেই বলেই হয় তো এই অপ্রতিবাদ। অথবা হয়তো এটা তার নির্ভীকতা।

ভীমে জেলের উপস্থিতির কালটুকু অবশ্য নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিলেন মোক্ষদা, কথার শেষে ভীমে রামকালীকে 'দণ্ডবৎ হয়ে প্রেণাম' করে চলে যাবার পরক্ষণেই মোক্ষদা যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

"এই স্থাও রামকালী, তোমার গুণের অবতার কন্যের হাতের চিকিচ্ছে করো এবার। আর চেরটাকালই করতে হবে তোমাকে, এ মেয়েকে তো আর শ্বশুরঘর থেকে নেবে না।" একটু দম নিলেন মোক্ষদা।

মোক্ষদার দম নেবার অবকাশে রামকালী মৃদু হেসে বলেন, "কি ? কি হল আবার ?"

"হয়েই তো আছে সমস্তক্ষণ", মোক্ষদা দুই হাত নেড়ে বলেন, "উঠতে বসতেই তো হচ্ছে। কাটছে ছিঁড়ছে ছড়ছে। এই আজ দেখ মেয়ের হাতের অবস্থা। পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে এতখানি এক ফোস্কা। আবার বলে কি 'বলতে হবে না বাবাকে, এমনি সেরে যাবে'। দেখ তুমি, নিজের চক্ষে।"

ইত্যবসরে রামকালী মেয়ের হাতখানা তুলে ধরে শিহরিত হয়েছেন।

"কী ব্যাপার ? এ কি করে হল ?"

"কি করে হয়েছে, শুধোও, ওকেই শুধোও। মেয়ের গুণের কথা এত বলি, কথা কানে করো না তো ? তবে তোমাকে এই বলে রাখছি রামকালী, এই মেয়ে হতেই তোমার ললাটে দুঃখু আছে।"

কথাটা নতুন নয়, বহু ব্যবহৃত। কাজেই রামকালী যে বিশেষ বিচলিত হন এমন নয়। তবে বাইরে গুরুজনকে সমীহ করবার শিক্ষা রামকালীর আছে, তাই বিচলিত ভাবটা দেখান।

"নাঃ, মেয়েটাকে নিয়ে—! আবার কি করলি ? এত বড় ফোস্কা পড়ল কিসে ?"

"দুধ ওথলানো হচ্ছিল গো। কালকে যখন রেসো বৌ নিয়ে এসে ঢুকল, উনি গেলেন পাতা জেলে দুধ ওথলাতে! আর এও বলি, এত বড় বুড়ো ধিঙ্গী মেয়ে এটুকু করতে হাতই বা পোড়ালি কি বলে ?"

রামকালী মেয়ের হাতের অবস্থাটা নিরীক্ষণ করে ঈষৎ গম্ভীর হয়ে মেয়ের উদ্দেশেই বলেন, "আগুনের কাজ তুমি করতে গেলে কেন ? বাড়িতে আর লোক ছিল না ?"

সত্য ঘাড় নিচু করে বলে, "বেশী জ্বালা করছে না বাবা।"

"জ্বালা করার কথা হচ্ছে না, করলেও সে জ্বালা নিবারণের ওষুধ অনেক আছে। জিজ্ঞেস করছি তুমি আগুনে হাত দিতে গেলে কেন?"

সত্য এবার ঘাড় তোলে। তুলে সহসা নিজস্ব ভঙ্গীতে তড়বড় করে বলে ওঠে, "আমি কি আর সাধে আগুনে হাত দিয়েছি বাবা, বড়বৌয়ের মুখ চেয়েই দিয়েছি। আহা বেচারী, একেই তার সতীনকাঁটার জ্বালা, তার ওপর আবার দুধ ওথলাবার হুকুম। মানুষের প্রাণ তো!"

সত্যের এই পরিষ্কার উত্তরপ্রদানে একা রামকালীই নয়, মোক্ষদাও তাজ্জব বনে যান। এ কী সর্বনেশে মেয়ে গো! ওই হোমরাচোমরা বাপের মুখের ওপর এই চোটপাট উত্তর! গালে হাত দিয়ে নির্বাক হয়ে যান মোক্ষদা। কথা বলেন রামকালীই। দুই ভ্রূ কুঁচকে ঝাঁজালো গলায় বলেন, "সতীনকাঁটার জ্বালাটা কী জিনিস?"

"কি জিনিস সে কথা তুমি তোমার মেয়ের কাছেই এবার শেখো রামকালী," মোক্ষদা সত্যবতীর আগেই তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের স্বরে বলেন, "আমরা এতখানি বয়সে যা কথা না শিখেছি, এই পুঁটকে ছুঁড়ী তা শিখেছে। কথার ধুকড়ি!"

সত্য এইসব উল্‌টোপাল্‌টা কথাগুলো দু চক্ষের বিষ দেখে। কেন রে বাপু, যখন যা সুবিধে তখন তাই বলবি কেন? এই এক্ষুণি সত্যকে বলা হলো 'বুড়ো ধিঙ্গী', আবার এখন বলা হচ্ছে 'পুঁটকে ছুঁড়ী'! সবই যেন ইচ্ছে-খুশি।

রামকালী পিসীর দিকে একনজর তাকিয়ে নিয়ে জলদগম্ভীর স্বরে কন্যাকে পুনঃ প্রশ্ন করেন, "কই আমার কথায় জবাব দিলে না? বললে না সতীনকাঁটা কি জিনিস, আর তার জ্বালাটাই বা কী বস্তু?"

কি বস্তু সে কথা কি ছাই সত্য জানে? তবে বস্তুটা যে খুব একটা মর্ম-বিদারী দুঃখজনক, সেটা বোধ করি জন্মাবার আগে থাকতেই জানে। তাই মুখটা যথাসম্ভব করুণ করে তুলে বলে, "সতীন মানেই তো কাঁটা বাবা। আর কাঁটা থাকলেই তার জ্বালা আছে। বড় বৌএর প্রাণে তো এখন তুমি সেই জ্বালা ধরিয়ে দিলে—"

"থামো!" হঠাৎ ধমকে উঠলেন রামকালী। বিচলিত হয়েছেন তিনি, বাস্তবিকই বিচলিত হয়েছেন এতক্ষণে। বিচলিত হয়েছেন মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে নয়, সহসা মেয়ের অন্তরের মলিনতার পরিচয় পেয়ে।

এ কী!

এ রকম তো ধারণা ছিল না তাঁর, ছিল না হিসাবের মধ্যে। এটা হল কোন্ ফাঁকে? সত্যবতীর বহুবিধ নিন্দাবাদ তাঁর কানে এসে ঢোকে সে সব তিনি কখনোই বড় একটা গ্রাহ্য করেন না। করেন না শুধু মেয়ের স্বভাবে প্রকৃতিতে একটা নির্মল তেজের প্রকাশ লক্ষ্য করে। সত্যর হৃদয়ে হিংসা-দ্বেষের ছায়ামাত্র নেই, এইটাই জমা ছিল হিসেবের খাতায়, এহেন নীচ হিংসুটে কথাবার্তা শিখে ফেলল সে কখন? কিন্তু বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়, শাসনের দরকার।

তাই আরো বাঘা-গর্জনে বলে ওঠেন, "কেন সতীন কিসে এত ভয়ঙ্করী হল? সে এসে ধরে মারছে তোমাদের বড়বৌকে?"

বাবার বাঘা-হুমকিতে সত্যবতীর চোখে জল উপচে এসে পড়ছিল, কিন্তু সহজে হার মানে না সে। আর কাঁদার দৈন্যটা প্রকাশ হয়ে পড়বার ভয়ে কষ্টে ঘাড় নিচু করে ধরা গলায় বলে, "হাতে না মারুক ভাতে মারছে তো? বড়বৌ একলা একেশ্বরী ছিল, নতুন বৌ হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসল—"

"আ ছি ছি ছি!"

রামকালী শিউরে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। মুখ দেখে মনে হল, সত্যবতী যেন সহসা তাঁর যত্নে আঁকা একখানি ছবিকে মুচড়ে দুমড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

এই ফাঁকে মোক্ষদা আবার একহাত নেন, "ওই শোনো! শোনো মেয়ের কথার ভঙ্গিমে! সাধে বলি কথার ভশ্চায্যি। বুড়ো মাগীদের মতন কথা, আর ছেলেপেলের মতন দস্যিচাল্লি! হরঘড়ি অবাক করে দিচ্ছে কথার জ্বালায়।"

রামকালী পিসীর আক্ষেপে কান না দিয়ে তিক্তবিরক্ত স্বরে বললেন, "এমন ইতর কথাবার্তা কোথা থেকে শিখেছ? ছি ছি ছি! লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে আমার। উড়ে এসে জুড়ে বসা মানে কি? এক বাড়িতে দুটি বোন থাকে না? সতীনকে 'কাঁটা' না ভেবে বোন বলে ভাবা যায় না?"

বাবা এত ঘেন্না দেওয়ার পর অবশ্য সত্যবতীর সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। একসঙ্গে অগুন্তি ফোঁটা ঝর ঝর করে ঝরে পড়ে চোখ থেকে গালে, গাল থেকে মাটিতে। পড়তেই থাকে, হাত তুলে মোছে না সত্য।

রামকালী চাটুয্যে আর একবার বিচলিত হন। সত্যবতীর চোখে জল! এটা যেন একটা অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্য মনে হচ্ছে। মনে হল ঘেন্নাটা বোধ করি একটু বেশী দেওয়া হয়ে গেছে।

ঔষধে মাত্রাধিক্য, রামকালীর পক্ষে শোচনীয় অপরাধ। মনে পড়ল, মেয়েটার হাতের ফোস্কাটাও কম জ্বালাদায়ক নয়। এখুনি প্রতিকার করা দরকার। তাই ঈষৎ নরম গলায় বলেন, "এ রকম নীচ কথা আর বলো না বুঝলে? মনেও এনো না। সংসারে যেমন ভাইবোন ননদ দেওর জা ভাসুর সব থাকে, তেমনি সতীনও থাকে, বুঝলে? কই দেখি হাতটা।"

হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে সত্যবতী নিজের উদ্বেল হৃদয়ভারকে সামলাতে চেষ্টা করে দাঁতে ঠোঁট চেপে।

মোক্ষদা বোঝেন মেঘ উড়ে গেল। হয়ে গেল রামকালীর মেয়ে শাসন করা! ছি ছি ছি! আর দাঁড়াতে ইচ্ছে হল না, বললেন, "যাক গে, শাস্তি শাসন হয়ে গেছে তো? এবার মেয়েকে সোহাগ করো বসে বসে। তুমিই দেখালে বটে বাবা!"

রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নেন মোক্ষদা।

রামকালী আশু প্রতিকার হিসেবে একটি প্রলেপ মেয়ের ফোস্কা ঘায়ে লাগাতে লাগাতে সহসা আবার বলেন, "আজকের কথা মনে থাকবে তো? আর কোন দিন এ রকম কথা বলো না, বুঝলে? মানুষ তো বনের জানোয়ার নয় যে খালি হিংসেহিংসি কামড়াকামড়ি করবে? সকলের সঙ্গে মিলেমিশে, সবাইকে ভালবেসে পৃথিবীতে থাকতে হয়।"

বাবার গলায় আপসের সুর।

অতএব ফের একটু সাহস সঞ্চয় হয় সত্যবতীর। তা ছাড়া প্রাণটা তো কেটে যাচ্ছে বাবার ধিক্কারে। কিন্তু তারই বা দোষ কোথায় বুঝে উঠতে পারে না সত্যবতী। সবাইকে ভালবেসে থাকাই যদি এত ধম্মো হয়, তা হলে 'সেঁজুতি' বত্তটি করতে হয় কেন?

মনের চিন্তা মুখে প্রকাশ হয়ে পড়ে সত্যর, "তাই যদি, তা হলে সেঁজুতি বত্ত করতে হয় কেন বাবা? পিসঠাকুমা তো এ বছর থেকে আমাকে ফেস্তুকে আর পুণ্যিকে ধরিয়েছে।"

রামকালী এবার বিরক্তির বদলে বিস্মিত হন। 'সেঁজুতি বত্ত' সম্পর্কে অবশ্য তিনি সম্যক অবহিত নন, কিন্তু যাই হোক, কোনও একটি ব্রত যে

মানবতাবোধ-বিরোধী হওয়া সম্ভব, সেটা ঠিক ধারণা করতে পারেন না। তাই প্রলেপের হাতটা ঘরের কোণে রক্ষিত মাটির জালার জলে ধুতে ধুতে বলেন, "ব্রতের সঙ্গে কি ?"

"কি নয় তাই বলো না কেন বাবা ?" চোখের জল শুকোবার আগেই সত্যর গলার সুর শুকনো খটখটে হয়ে ওঠে, "সেঁজুতি বত্তর যত মন্তর সব সতীনকাঁটা উদ্ধারের জন্যে নয় ?"

রামকালী একটুক্ষণ চুপ করে থাকেন।

কোথায় যেন একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন। হুঁ, এই রকমই একটা কিছু গোলমেলে ব্যাপার ঢুকে গিয়েছে মেয়ের মাথায়। নচেৎ সত্যর মুখে অমন কথা।

হাতে অনেক কাজ।

তবু রামকালী বিবেচনা করলেন, সদুপদেশের দ্বারা কন্যার হৃদয়-কানন হতে 'সতীন-কণ্টকে'র মূলোৎপাটন করা কর্তব্য; তাই ভুরু কুঁচকেই বললেন, "তাই নাকি ? সে মন্তরটা কি ?"

"মন্তর কি একটা বাবা ?" সত্যবতী মহোৎসাহে বলে, "গাদা গাদা মন্তর। সব কি ছাই মনেই আছে ? ভেবে ভেবে বলছি রোসো। প্রেথমে তো আলপনা আঁকা ? ফুল-লতার নক্শা কেটে তার ধারে কোণে হাতা বেড়ি হাঁড়িকুঁড়ি এস্তক করে ঘর-সংসারির প্রেত্যেকটি জিনিস এঁকে নেওয়া। তা পর একোটা একোটা ধরে ধরে মন্তর পড়তে হয়। হাতায় হাত দিলাম, বললাম—

'হাতা হাতা, হাতা,
খা সতীনের মাথা।'

খোরায় হাত দিয়ে—

'খোরা খোরা খোরা,
সতীনের মাকে ধরে নিয়ে যাক
তিন মিনসে গোরা।'

তা'পর— বেড়ি বেড়ি বেড়ি
'সতীন মাগী চেড়ী।
বঁটি বঁটি বঁটি,
সতীনের ছেরাদ্দর কুটনো কুটি।

হাঁড়ি হাঁড়ি হাঁড়ি,
আমি যেন হই জন্ম-এয়োস্ত্রী,
সতীন কড়ে রাঁড়ী'।"

"চুপ চুপ!"

রামকালী জলদ্গম্ভীর স্বরে বলেন, "এইসব তোমাদের ব্রতের মন্তর?"

এইসব যে ব্রতের মন্ত্র হওয়ার উপযুক্ত নয়, সেই সত্যটা যেন সত্যর বোধের জগতে সহসা এই মুহূর্তে একটা চকিতে আলোক ফেলে যায়। সে উৎসাহের বদলে মৃদুস্বরে বলে, "আরও তো কত আছে—"

"আরও আছে? বটে! আচ্ছা বলো তো শুনি আরও কি কি আছে। দেখি কিভাবে তোমাদের মাথাগুলো চিবোনো হচ্ছে। জানো আরও?"

"হ্যাঁ।" সত্য বড় করে ঘাড় কাত করে বলে, "আর হচ্ছে—
'ঢেঁকি ঢেঁকি ঢেঁকি,
সতীন মরে নিচেয় আমি উপুর থেকে দেখি!'

"তা' পর গে—'অশ্বথ্ কেটে বসত করি,
সতীন কেটে আলতা পরি।
ময়না ময়না ময়না,
সতীন যেন হয় না।'

"তা' পর এক মুঠো দুব্বো ঘাস নিয়ে বলতে হয়, 'ঘাস মুঠি ঘাস মুঠি, সতীন হোক কানা কুষ্ঠি।' গয়না এঁকেও ছুঁয়ে ছুঁয়ে মন্তর আছে—
'বাজু বন্দ পৈঁছে খাড়ু,
সতীনের মুখে সাত ঝাড়ু।'

"পান এঁকে বলতে হয়—
ছাঁচি পান এলাচি গুয়ো—
আমি সোহাগী, সতীন দুয়ো—'"

"আচ্ছা থাক হয়েছে। আর বলতে হবে না।"

রামকালী হাত নেড়ে নিবৃত্ত করেন, "এসব গালমন্দকে তোমরা পুজোর মন্তর বল?"

"আমরা বলি কি গো বাবা?" সত্যবতী তার পণ্ডিত বাপের এহেন অজ্ঞতায় আকাশ থেকে পড়ে চোখ গোল গোল করে বলে, "জগৎ সুদ্ধু সবাই বলে যে। সতীন যদি বোনের মত হবে, তবে এত মন্তরের প্রেয়জন হবে

কেন? বোনের খোয়ারের জন্যে কি কেউ বত্ত করে? আসল কথা বেটাছেলেরা তো আর সতীনের মর্ম বোঝে না, তাই—" একটা ঢোঁক গিলে নেয় সত্য, কারণ বেটাছেলে সম্পর্কে পরবর্তী যে বাক্যটি জিভের আগায় এসে যাচ্ছিল, সেটা বাবার প্রতি প্রয়োগ করা সমীচীন কিনা বুঝতে না পেরে দ্বিধা এল।

রামকালী গম্ভীর মুখে বলেন, "তা হোক এ ব্রত তোমরা আর ক'রো না।"

করো না!

ব্রত করো না!

মাথায় বজ্রপাত হল সত্যর।

এ কী আদেশ! এখন উপায়?

একদিকে পিতৃআজ্ঞে, অপর দিকে 'ব্রেতোপতিত'। ব্রেতোপতিত হলে তো জলজ্যান্তে নরক, আর পিতৃআজ্ঞে পালন না করার পাতকটা ঠিক কত দূর গর্হিত না জানা থাকলেও, সেই পাতকের পাতকীকেও যে নরকের কাছাকাছি পৌছতে হবে এ বিষয়ে সত্য নিঃসন্দেহ।

অনেকক্ষণ দুজনেই স্তব্ধ।

তার পর আস্তে আস্তে কথাটা তোলে সত্য, "ধরা বত্ত উজ্জাপন না করে ছেড়ে দিলে যে নরকগামিন হতে হবে বাবা!"

"না হবে না। এসব ব্রত করলেই নরকগামী হতে হয়।"

"পিসঠাকুমাকে তা হলে তাই বলব?"

"কি বলবে?"

"এই ইয়ে—সেঁজুতি করতে তুমি মানা করেছ!"

"আচ্ছা থাক, এখুনি তাড়াতাড়ি তোমার কিছু বলবার দরকার নেই। যা বলবার আমিই বলব এখন। তুমি যাও এখন। হাতটা সাবধান, কোথাও ঘষটে ফেলো না।"

সত্যবতীর অবস্থাটা দাঁড়ায় অনেকটা ন যযৌ, ন তস্থৌ।

বাবার হুকুম চলে যাওয়ার, অথচ মনের মধ্যে প্রশ্নের সমুদ্র। সে সমুদ্রের ঢেউ আর কার পায়ের কাছে আছড়ে পড়লে সুরাহা হবে—বাবা ছাড়া?

"বাবা!"

"কি? আবার কি?"

"বস্তুটা যদি অন্যাই, সতীন যদি ভাল বস্তু, তা হলে বড়বৌয়ের অত কষ্ট হচ্ছে কেন?"

"বড়বৌ? রাসুর বৌ? কষ্ট হচ্ছে? সে তোমাকে বলেছে তারকষ্ট হচ্ছে?"

রামকালীর কণ্ঠে ফের ধমকের সুর ছায়া ফেলে।

কিন্তু সত্যবতী দমে না।

ধিক্কারে দমে বটে সত্য, কিন্তু ধমকে নয়। তাই বাক্‌ভঙ্গীতে সতেজতা এনে মোক্ষদার ভাষায় 'কথার ভশ্চায্যি'র মতই তড়বড় করে বলে, "বলতে যাবে কেন বা? সবই কি আর মুখ ফুটে বলতে হয়? চেহারা দেখে বোঝা যায় না? কেঁদে কেঁদে চোখ-মুখ বসে গেছে, অমন যে সোনার বর্ণ, যেন কালি মেড়ে দিয়েছে। পর্শু থেকে মুখে একবিন্দু জল দেয় নি। নোকনজ্জায় বলছে বটে 'পেটব্যথা করছে তাতেই খিদে নেই, তাতেই কাঁদছি', কিন্তু বুঝতে সবাই পারছে। কে আর ঘাসের ভাত খায় বল? মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা, তার ওপর আবার আজ নতুন বো'র হাতের সুতো খোলা! কেউ বলছে বড়বৌকে অন্য ঘরে দিয়ে ওই ঘরেই নেমকর্ম হবে, কেউ বলছে 'আহা থাক।' বড়বৌ নাকি ও-বাড়ির সাবি পিসীকে বলেছে, 'অত ধন্দয় কাজ নেই, চাটুয্যে পুকুরে অনেক জায়গা আছে তাতেই আমার ঠাঁই হবে।"

সর্বনাশ!

প্রমাদ গণেন রামকালী।

মেয়েমানুষের অসাধ্য কাজ নেই।

কে বলতে পারে মেয়েটা সত্যিই ওইরকম কোন দুর্মতি করে বসবে কি না। এও তো মহাজ্বালা। কোথায় ভদ্রলোকের জাত-মান উদ্ধারের কথা ভেবে আনন্দ করবি, তা নয় এই সব প্যাঁচ।...কেন, ত্রিভুবনে আর কারো সতীন হয় না?

হয়েছে আর কি, ওইসব অখন্তে ব্রতপার্বণ করিয়ে শিশুকাল থেকে মেয়েগুলোর পরকাল ঝরঝরে করে রাখা হয়েছে কিনা!

মেয়েমানুষ জাতই কুয়ের গোড়া।

'ঘরের লক্ষ্মী' বলে সৌজন্য দেখালে কি হবে, এক-একটি মহা অলক্ষ্মী!

নইলে রেসোর ওই বৌটা, কিবা বয়স, তার কিনা এত বড় বড় কথা! জলে ডুবে মরবার সংকল্প! ছি ছি!

"এই কথা বলেছেন বড় বৌমা ?"

অন্ধকার-মুখে বলেন রামকালী।

"সাবি পিসী তো বলছিল।"

বাবার মুখ দেখে এবার একটু ভয়-ভয় করে সত্যর। কিন্তু ভয় করলে তো চলবে না। তারও যে কর্তব্য রয়েছে—বাবাকে চৈতন্য করাবার।

এত বোধবুদ্ধি বাবার, অথচ সোয়ামী আর একটা বিয়ে করে আনলে মেয়েমানুষের প্রাণ ফেটে যায় কিনা সে জ্ঞান নেই! আর যদি না ফাটবে, তা হলে কৈকেয়ী কেন তিনযুগে হেয় হয়েও রামকে বনবাসে পাঠিয়েছিলেন ? কথক ঠাকুরের কথাতেই তো শুনেছে সত্য।

রাজার রাণী তিনি, তাও মনে এত রিষ!

আর বড়বৌ বেচারী নিরীহ ভালমানুষ, শুধু মনের ঘেন্নায় নিজে মরতে চেয়েছে।

সত্যের প্রাণে এত দাগা লাগার আরও একটা কারণ, বড়বৌকে দুটো সান্ত্বনার কথা বলবার মুখ তার নেই। নেই তার কারণ, এই মর্মান্তিক হৃদয়-বিদারক নাটকের নায়ক হচ্ছেন স্বয়ং সত্যবতীরই বাবা। ইশারায় ইঙ্গিতে ঘরে-পরে সকলেই তো রামকালীকে দুষছে।

দুষবার কথাও। ছেলের মায়ের যে গৌরব আলাদা। বড়বৌ যদি ছেলের মা না হত তা হলেও বা কথা ছিল। কেঁদে কেঁদে ওর যদি বুকের দুধ শুকিয়ে যায়, ছেলে বাঁচবে কিসে ?

•

এদিকে রামকালী ভাবছেন বৌটাকে শায়েস্তা করার উপায় কি ? গ্রাম-সুদ্ধু লোক নেমন্তন্ন করেছেন, রাত পোহালেই যজ্ঞি, ও যদি সত্যিই কিছু একটা অঘটন ঘটিয়ে বসে! অনেক ভেবে গলাটা ঝেড়ে বললেন, "ওসব হচ্ছে ছেলে-বুদ্ধির কথা! তুমি আমার হয়ে বৌমাকে গিয়ে বলো গে, ওসব ছেলেমানুষী বুদ্ধি ছেড়ে দিতে। বলো গে, 'বাবা বললেন, মন ভাল করব ভাবলেই মন ভাল করা যায়। বলো গে, উঠুন কাজকর্ম করুন, ভাল করে খান-দান, মনের গলদ কেটে যাবে'।"

সত্য আর একবার বাবার অজ্ঞতায় কাতর হয়। তবে শুধু কাতর হয়ে চুপ করেও থাকে না। একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে, "তা যদি কেটে যেত, তা হলে তো মাটির প্রিথিবীটা সগগো হত বাবা! রুগীর চেহারা

দেখে তুমি ওপর থেকে বলে দিতে পারো, তার শরীরের মধ্যে কোথায় কি হচ্ছে, আর মানুষের মুখ দেখে বুঝতে পারো না তার প্রাণের ভেতরটায় কি হচ্ছে? নিজের চোক্ষে প্রেত্যক্ষ একবার দেখবে চল তা হলে!"

সহসা কেন কে জানে রামকালীর গায়ে কি রকম কাঁটা দিয়ে উঠল। চুপ করে গেলেন তিনি। তার অনেকক্ষণ পর হাত নেড়ে মেয়েকে ইশারা করলেন চলে যেতে।

এর পর আর চলে যাওয়া ছাড়া উপায় কি? সত্য মাথা হেঁট করে আস্তে আস্তে ঘর থেকে চলে যায়।

কিন্তু এবারের ডাকের পালা রামকালীরই। "আচ্ছা শোনো!"

সত্যবতী ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়।

"শোনো, বৌমাকে তোমার কিছু বলবার দরকার নেই, তুমি শুধু, মানে ইয়ে তোমাকে খালি একটা কাজ দিচ্ছি—"

রামকালী ইতস্তত: করছেন!

সত্যবতী অবাক হয়ে যায়।

নাঃ, আর যাই হোক বাবাকে কখনো এমন ইতস্তত: করতে দেখে নি সত্য!

কিন্তু এ হেন পরিস্থিতিতেই বা কবে পড়েছেন রামকালী?

সত্যিই কি সত্যবতী তাঁর চৈতন্য করিয়ে দিল নাকি? তাই রামকালী অমন বিব্রত বিচলিত।

"বাবা কি করতে বলছিলে?"

"ও হ্যাঁ, বলছিলাম যে তুমি তোমাদের বড়বৌএর একটু কাছে কাছে থাকো গে, যাতে তিনি ওই পুকুরের দিকেটিকে যেতে না পারেন।"

সত্যবতী মুহূর্তকাল স্তব্ধ থাকে। বোধ করি বাপের আদেশের তাৎপর্যটা অনুধাবন করতে চেষ্টা করে। তার পর খুব সম্ভব অনুধাবন করেই নম্রগলায় বলে, "বুঝেছি, বৌকে চোখে চোখে রেখে পাহারা দিতে বলছ।"

পাহারা!

রামকালী যেন মরমে মরে যান।

তাঁর আদেশের ব্যাখ্যা এই!

বিরক্তি দেখিয়ে বলেন রামকালী, "পাহারা মানে কি? কাছে কাছে থাকবে, খেলাধুলো করবে, যাতে তাঁর মনটা ভাল থাকে—"

সত্যবতী সনিশ্বাসে বলে, "ওই হল, একই কথা! কথায় বলে, 'যার নাম ভাজা চাল তার নাম মুড়ি, যার মাথায় পাকা চুল তারেই বলে বুড়ী।' কিন্তু বাবা, পাহারা নয় দিলাম, ক'দিন ক'রাত দেব বলো? কেউ যদি আপ্তঘাতী হব বলে প্রিতিজ্ঞে করে, কারুর সাধ্যি আছে আটকাতে? শুধুই তো চাটুয্যে পুকুরের জল নয়, ধুতরো ফল আছে, কুঁচ ফল আছে, কলকে ফুলের বিচি আছে—"

"চুপ চুপ!"

রামকালী আতপ্ত নিশ্বাসের দাহ ছড়িয়ে বলে ওঠেন, "চুপ করো! তোমার সেজঠাকুমা দেখছি ঠিকই বলেন। এত কথা শিখলে কোথা থেকে তুমি? যাও, তোমাকে কিছু করতে হবে না। যাও।"

দশ

'যাও' বলে মানুষকে তাড়ানো যায়, চিন্তাকে তাড়ানো যায় না। তাড়ানো যায় না মানসিক দ্বন্দ্বকে। সত্যবতীকে 'যাও' বলে ঘর থেকে সরিয়ে দিলেন রামকালী, কিন্তু মন থেকে সরাতে পারছেন না সহসা উদ্বেলিত-হয়ে-ওঠা এই চিন্তাটাকে, তাড়াতে পারছেন না এই দ্বন্দ্বটাকে।

তা হলে কি ঠিক করি নি?

তবে কি ভুল করলাম?

চিন্তার এই দ্বন্দ্ব রামকালীকেই তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, ঘর থেকে চণ্ডীমণ্ডপে, চণ্ডীমণ্ডপ থেকে বারবাড়ির উঠোনে, সেখান থেকে বাগান বরাবর কি জানি কেন একেবারে চাটুয্যে পুকুরের ধারে। পুকুরের ধারে ধারে পায়চারি করতে থাকেন রামকালী।

দীর্ঘায়ত শরীর সামনের দিকে ঈষৎ ঝোঁকা, দুই হাত পিঠের দিকে জোড় করা, চলনে মন্থরতা। রামকালীর এ ভঙ্গীটা লোকের প্রায় অপরিচিত। দৈবাৎ কখনো কোন জটিল রোগের রোগীর মরণ-বাঁচন অবস্থায় চিন্তিত রামকালী এইভাবে পায়চারি করেন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের পুঁথি নেড়ে ঔষধ নির্বাচন করেন না রামকালী, এইভাবে বেড়িয়ে বেড়িয়েই মনে মনে করেন।

হয়তো বা পুঁথির পৃষ্ঠাগুলো মুখস্থ বলেই সেগুলো আর না নাড়লেও চলে। শুধু ভেবে দেখলেই চলে।

কিন্তু সে তো দৈবাৎ।

ঔষধ নির্বাচনের জন্য চিন্তার সময় বেশী নিতে হয় না কবরেজ চাটুয্যেকে, রোগীর চেহারা দেখলেই মুহূর্তে রোগ এবং তার নিরাকরণ ব্যবস্থা দুইই তাঁর অনুভূতির বাতায়নে এসে দাঁড়ায়। তাই চিন্তিত মূর্তিটা তাঁর কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। ঋজু দীর্ঘদেহ—শালগাছের মত সোজা সতেজ, দুই হাত বুকের উপর আড়াআড়ি করে রাখা, প্রশস্ত কপাল, খড়্গনাসা, আর দৃঢ়নিবদ্ধ ওষ্ঠাধরের ঈষৎ বঙ্কিম রেখায় আত্মপ্রত্যয়ের সুস্পষ্ট ছাপ। এই চেহারাই রামকালীর পরিচিত চেহারা। কিন্তু আজ তার ব্যতিক্রম ঘটেছে, আজ রামকালীর মুখের রেখায় আত্মজিজ্ঞাসার তীক্ষ্ণতা।

তবে কি ভুল করলাম?

তবে কি ঠিক করি নি? তবে কি আরও বিবেচনা করা উচিত ছিল? কিন্তু সময় ছিল কোথা?

বার বার ভাবতে চেষ্টা করছেন রামকালী, তিনি কি বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছেন? তাই একটা অবোধ শিশুর এলোমেলো কথার উপর এতটা মূল্য আরোপ করে এতখানি বিচলিত হচ্ছেন? কি আছে এত বিচলিত হবার? সত্যিই তো, ত্রিভুবনে সতীন কি কারও হয় না? অসংখ্যই তো হচ্ছে। বরং নিঃসপত্ন স্বামীসুখ কটা মেয়ের ভাগ্যে জোটে, সেটাই আঙুল গুনে বলতে হয়। কিন্তু এ চিন্তা দাঁড়াচ্ছে না। চেষ্টা করে আনা যুক্তি ভেসে যাচ্ছে হৃদয়-তরঙ্গের ওঠাপড়ায়। কিছুতেই উড়িয়ে দিতে পারছেন না এক ফোঁটা একটা মেয়ের কথাগুলোকে।

বহুবিধ গুণের সমাবেশে উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য চরিত্র রামকালীর, পুরুষের আদর্শস্থল, তবু যে চরিত্রের গাঁথনিতে একটু বুঝি খুঁত আছে। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দেবার শিক্ষা আছে তাঁর, শিক্ষা আছে বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান সমীহ করবার, কিন্তু সমগ্র 'মেয়েমানুষ' জাতটার প্রতি নেই তেমন সম্ভ্রমবোধ, নেই সম্যক মূল্যবোধ।

যে জাতটার ভূমিকা হচ্ছে শুধু ভাত-সেদ্ধ করবার, ছেলে ঠেঙাবার, পাড়া বেড়াবার, পরচর্চা করবার, কোঁদল করে অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ করবার, দুঃখে কেঁদে মাটি ভেজাবার আর শোকে উন্মাদ হয়ে বুক চাপড়াবার, তাদের

প্রতি প্রচ্ছন্ন একটা অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছু আসে না রামকালীর। অবশ্য আচারে-আচরণে ধরা পড়ে না, ধরা পড়ে না হয়তো নিজের কাছে—তবু অবজ্ঞাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু সম্প্রতি ক্ষুদে একটা মেয়ে যেন মাঝে মাঝে তাঁকে ভাবিয়ে তুলছে, চমকে দিচ্ছে, বিচলিত করছে, 'মেয়েমানুষ' সম্পর্কে আর একটু বিবেচনাশীল হওয়া উচিত কিনা এ প্রশ্নের সৃষ্টি করছে।

আকাশে সন্ধ্যা নামে নি, কিন্তু তাল-নারকেলের সারি-ঘেরা পুকুরের কোলে কোলে সন্ধ্যার ছায়া! এই প্রায়ান্ধকার পথটুকুতে পায়চারি করতে করতে সহসা রামকালীর চোখের দৃষ্টি ঈগলের মত তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। কে? ঘাটের পৈঠের একেবারে শেষধাপে অমন করে বসে ও কে? কই এতক্ষণ তো ছিল না, কখন এল? কোন্ পথ দিয়েই বা এল? আর কেনই বা এল এমন ভরা ভরা সন্ধ্যায় একা? এ সময় ঘাটে পথে এমন একা মেয়েরা কদাচিৎ আসে, অবশ্য মোক্ষদা বাদে। কিন্তু দূর থেকে কে তা ঠিক বুঝতে না পারলেও মোক্ষদা যে নয়, সেটা বুঝতে পারলেন রামকালী।

তবে কে?

অভূতপূর্ব একটা ভয়ের অনুভূতিতে বুকের ভেতরটা কেমন সিরসির করে উঠল। রামকালীর পক্ষে এ অনুভূতি নিতান্তই নতুন।

অন্ধকার দ্রুত গাঢ় হয়ে আসছে, দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণতর করেও ফল হচ্ছে না, অথচ এর চেয়ে কাছাকাছি গিয়ে ভাল করে নিরীক্ষণ করবার মত অসঙ্গত কাজও রামকালীর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু একেবারে অগ্রাহ্য করাই বা চলে কি করে? সন্দেহ যে ঘনীভূত হচ্ছে। এ আর কেউ নয়, নির্ঘাৎ রাসুর বৌ।

কিন্তু সত্য কি করল? সত্যবতী? পাহারা দেওয়ার নির্দেশটা পালন করল কই?

দিব্যি বড়সড় একটা কলসী ওর সঙ্গে রয়েছে মনে হচ্ছে।

যারা সাঁতার জানে, তাদের পক্ষে জলে ডুবে মরতে কলসীটা নাকি সহায়-সহায়ক। আর ছেলেমানুষ একটা মেয়ে যদি ওই কলসীটা গলায় বেঁধে—

চিন্তার ধারা ওই একটা দুশ্চিন্তার শিলাপাথরকে ঘিরেই পাক খেতে

থাকে। কিছুতেই মনে আসে না অসময়ে জলের প্রয়োজনেও কলসী নিয়ে পুকুরে আসতে পারে লোকে।

তবে এটা ঠিক, জল ভরবার তাগিদ কিছু দেখা যাচ্ছে না ওর ভঙ্গীতে। কলসীর কানাটা ধরে চুপচাপ বসে থাকাকে কি তাগিদ বলে? নাঃ, জলের জন্যে অন্য কেউ নয়, এ নির্ঘাৎ রাসুর বৌ! মরবার সংকল্প নিয়ে ভরসন্ধ্যায় একা পুকুরে এসেছে, তবু চট্ করে বুঝি সব শেষ করে দিতে পারছে না, শেষবারের মত পৃথিবীর রূপ রস শব্দ স্পর্শের দিকে তাকিয়ে নিতে চাইছে।

শুধুই কি তাই?

তাকিয়ে নিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে ভাবছে না কি কার জন্যে তাকে এই শোভা-সম্পদ, এই সুখভোগ থেকে বঞ্চিত হতে হল—?

হঠাৎ চোখ দুটো জ্বালা করে এল রামকালীর।

এই জ্বালা করাকে রামকালী চেনেন না। এ অনুভূতি সম্পূর্ণ নতুন, সম্পূর্ণ আকস্মিক।

কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে তো চলবে না, এখুনি একটা বিহিত করতে হবে। নিবৃত্ত করতে হবে মেয়েটাকে। অথচ উপায় বা কি? রামকালী তো আর মেয়ে-ঘাটে নেমে হাত ধরে তুলে আনতে পারেন না! পারেন না ওকে সদুপদেশ দিয়ে এই সর্বনাশা সংকল্প থেকে ফেরাতে! ডাকবেনই বা কি বলে? কোন্ নামে? রামকালী যে শ্বশুর।

অথচ এখান থেকে সরে গিয়ে কোনও মেয়েমানুষকে ডেকে নিয়ে আসবার চিন্তাটাও মনে সায় দিচ্ছে না। যদি ইত্যবসরে—

আরে, আরে, স্থিরচিত্রটা চঞ্চল হয়ে উঠল যে!

কলসীটা জলে ডুবিয়ে জল কাটছে যে মেয়েটা! ঈগল-দৃষ্টি ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, নিজের অজ্ঞাতসারেই মেয়ে-ঘাটের দিকে এগিয়ে যান রামকালী, এমন সংকট-মুহূর্তে ন্যায় অন্যায় উচিত অনুচিত নিয়ম অনিয়ম মানা চলে না। আর একটু ইতস্তত করলেই বুঝি ঘটে যাবে সেই সাংঘাতিক কাণ্ডটা।

দ্রুতপদে একেবারে ঘাটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন রামকালী, প্রায় আর্তনাদের মত চীৎকার করে উঠলেন, "কে ওখানে? সন্ধ্যেবেলা জলের ধারে কে?"

রামকালী আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিলেন তাঁর চীৎকারের ফলটা

কি দাঁড়াল। ওই যে সাদা কাপড়ের অংশটুকু দেখা যাচ্ছিল এতক্ষণ, সেটা কি এই আকস্মিক ডাকের আঘাতে সহসা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল? যেটুকু দ্বিধা ছিল সেটুকু আর রইল না। ওই তো বসে রয়েছে জলের মধ্যে পায়ের পাতা ডুবিয়ে, জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান শুধু একটি লহমার, একটি ডুবের। তার পরই তো ওর সব দুঃখের অবসান, সব জ্বালার শান্তি! ওইখানেই তো ওর হাতে রয়েছে সব ভয় জয় করবার শক্তি, তবে আর রামকালীর শাসনকে ভয় করতে যাবে কোন্ দুঃখে?

সাদা কাপড়টা দেখা যাচ্ছে এখনও, একটু যেন নড়ছে। রুদ্ধশ্বাস বক্ষে অপেক্ষা করতে থাকেন রামকালী। অথচ এই বিমূঢ়ের ভূমিকা অভিনয় করা ছাড়া ঠিক এই মুহূর্তে আর কি করার আছে রামকালীর? যতক্ষণ না সত্যি মরণের প্রশ্ন আসছে, ততক্ষণ বাঁচানোর ভূমিকা আসবে কি করে? জলে পড়ার আগে জল থেকে তুললে যাওয়ার উপায় কোথা?

যতই ভয় পেয়ে থাকুন রামকালী, এমন কাণ্ডজ্ঞান হারান নি যে শুধু ঘাটের ধারে বসে থাকা মেয়েটাকে হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসবেন, মেয়েটা মরতে যাচ্ছে ভেবে।

কি করবেন তবে? সাদা রংটা এখনো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি, এখনও কিছু করা যাবে।

সহসা আত্মস্থ হয়ে উঠলেন রামকালী, সহসাই যেন ফিরে পেলেন নিজেকে। কী আশ্চর্য! কেন বৃথা আতঙ্কিত হচ্ছেন তিনি? এখুনি তেমন হাঁক পাড়লেই তো অঞ্চলের দশ-বিশটা লোক ছুটে আসবে। তখন আর চিন্তাটা কি? নিজের ওপর আস্থা হারাচ্ছিলেন কেন?

অতএব হাঁক পাড়লেন।

তেমনি ধারাই হাঁক বটে। 'মৃত্যুপথবর্তিনী'ও যাতে ভয়ে গুরগুরিয়ে ওঠে। জলদগম্ভীর স্বরে অভ্যস্ত আদেশের ভঙ্গীতেই হাঁক পাড়লেন রামকালী, "যে হও জল থেকে উঠে এসো। আমি বলছি উঠে এসো। ভরাসন্ধ্যায় জলের ধারে থাকবার দরকার নেই।" 'আমি'টার ওপর বিশেষ একটু জোর দিলেন।

না, হিসাবের ভুল হয় নি রামকালীর।

কাজ হল। এই ভরাট ভারী আদেশের সুরে কাজ হল। কলসীটা ভরে নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে এল মেয়েটা একগলা ঘোমটা টেনে। সাদা

রংটার গতিবিধি লক্ষ্য করে বুঝতে পারলেন রামকালী, ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে ও।

আর একবার চিন্তা করলেন রামকালী, পাশ কাটিয়ে চলে যাবেন? না কি নির্বুদ্ধি মেয়েটাকে একটু সদুপদেশ দিয়ে দেবেন?

সাধারণতঃ শ্বশুর-বৌ সম্পর্কে কথা কওয়ার কথা ভাবাই যায় না, কিন্তু চিকিৎসক হিসেবে রামকালীর কিছুটা ছাড়পত্র আছে। বাড়ির বৌ-ঝির অসুখবিসুখ করলে মোক্ষদা কি দীনতারিণী রামকালীকে খবর দিয়ে ডেকে নিয়ে যান, এবং তাঁদের মাধ্যমে হলেও পরোক্ষে অনেক সময় রোগিণীকে উদ্দেশ করে কথা বলতে হয় রামকালীকে। যথা ঠাণ্ডা না লাগানো বা কুপথ্য না করার নির্দেশ। তেমন বাড়াবাড়ি না হলে অবশ্য রোগী 'দেখা'র প্রশ্ন ওঠে না, লক্ষণ শুনেই ঔষধ নির্বাচন করে দেন। কিন্তু বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে বলতে হয় বৈকি। অবশ্য যথাসাধ্য দূরত্ব ও সম্ভ্রম বজায় রেখেই বলেন। পুত্রবধূ অথবা ভ্রাতৃবধূ সম্পর্কীয়াদের 'আপনি' ভিন্ন তুমি বলেন না কখনও রামকালী।

বিধি একেবারে লঙ্ঘন করলেন না রামকালী, তবু কিছুটা করলেন। পাশ কাটিয়ে চলে না গিয়ে একটা গলাখাঁকারি দিয়ে বলে উঠলেন, "এ সময় এরকম একা ঘাটে কেন? আর এ রকম আসবেন না। আমি নিষেধ করছি।" আর একবার 'আমি'টার ওপর জোর দিলেন রামকালী।

সম্মুখবর্তিনী অবশ্য কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ। রামকালীর সামনে দিয়ে হেঁটে চলে যাবে, এমন ক্ষমতা অবশ্য থাকবার কথাও নয়।

রামকালী কথা শেষ করলেন, "বাড়িতে শুভকাজ হচ্ছে, মন ভাল করতে হয়। এমন তো হয়েই থাকে।"

দ্রুতপদক্ষেপে এবার চলে গেলেন রামকালী।

রামকালী চলে গেলেও কাঠের পুতুলখানা আরও কিছুক্ষণ কাঠপাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে, কী ঘটনা ঘটে গেল যেন বুঝতেই পারে না। কি হল? এটা কি করে সম্ভব হল?

'এমন তো হয়েই থাকে' মানে কি?

উনি কি তা হলে সব জেনেছেন? জেনেও ক্ষমা করে গেলেন? মাথা ঠাণ্ডা রেখে সদুপদেশ দিয়ে গেলেন মন ভাল করতে। সত্যিই কি

তবে উনি দেবতা? দেবতা ভেবেও বুকের কাঁপুনি আর কমতে চায় না শঙ্করীর?

হ্যাঁ, শঙ্করী!

রাসুর বৌ সারদা নয়, কাশীশ্বরীর বিধবা নাতবৌ শঙ্করী। চিরদিন পিত্রালয়-বাসিনী কাশীশ্বরীর একটা মেয়েসন্তান, তাও মরেছিল অকালে। মা-মরা দৌত্তুরটাকে বুকে করে এক বছরেরটি থেকে আঠারো বছরেরটি করে তুলে সাধ করে সুন্দরী মেয়ে দেখে বিয়ে দিয়েছিলেন কাশীশ্বরী, কিন্তু এমন রাক্ষসী বৌ যে বছর ঘুরল না, দ্বিরাগমন হল না। তা বাপের বাড়ীতেই ছিল এযাবৎ, কিন্তু এমনি মন্দকপাল শঙ্করীর যে, মা-বাপকেও খেয়ে বসল। ছিল কাকা, সে এই সেদিন ভাইঝিকে ঘাড়ে করে বয়ে দিয়ে গেছে চাটুয্যেদের এই সদাব্রতর সংসারে। না দিয়েই বা করবে কি? শুধুই তো ভাতকাপড় যোগানো নয়, নজরে রাখে কে? শ্বশুরকুলে থাকলে তবু সহজেই দাবে থাকবে। আর কপাল যার মন্দ, তার পক্ষে শ্বশুরবাড়ির উঠোন ঝাঁট দিয়েও একবেলা একমুঠো ভাত খেয়ে পড়ে থাকা মান্যের। বাপ-কাকার ভাত হল অপমান্যির ভাত!

এইসব বুঝিয়ে-বাঝিয়ে কাকা সেই যে ছেড়ে দিয়ে গেছে, ব্যস্। বছর কাবার হতে চলল উদ্দিশ নেই। অথচ এখানে শঙ্করীর উঠতে বসতে খোঁটা খেতে হচ্ছে 'চালচলনের' অভব্যতায়। উনিশ বছরের আগুনের খাপরা এতখানি বয়স অবধি বাপের ঘরে কাটিয়েছে, তাকে বিশ্বাসই বা কি? বিধবার আচার-আচরণই তো শেখে নি ভাল করে। নইলে বামুনের বিধবা এটুকু জানে না যে রাতে চালভাজার সঙ্গে শশা খেতে হলে আলাদা পাত্রে নিতে হয়, এক পাত্রে রাখলে ফলার হয়! এমন কি কামড়ে কামড়েও তো খেতে নেই, আলগোছে টুকরো করে মুখের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে তবে চালভাজার সঙ্গে খাওয়া চলে। তা নয়, সুন্দরী দিব্যি করে একদিন শশা কেটে চাল্‌ভাজার পাশে নিয়ে খেতে বসেছেন! যা-ই ভাগ্যিস মোক্ষদার চোখে পড়ে গেল, তাই না জাত-ধর্ম রক্ষে!

কিন্তু সেই একটাই নয়, পদে পদে অনাচার ধরা পড়ে শঙ্করীর, আর প্রতিপদে উপর মহলে সন্দেহ ঘনীভূত হয়—এ মেয়ের রীত-চরিত্তির ভাল কিনা।

তা রামকালীর এত তথ্য জানবার কথা নয়। কবে কোনদিন কোন্

অনাথা অবীরা চাটুয্যেদের সংসারে ভর্তি হচ্ছে, সে কথা মনে রাখার অবকাশ কোথায় তাঁর? কাজে কাজেই রামুর বৌয়ের প্রশ্ন নিয়েই চিন্তাকে প্রবাহিত করেছেন। তা ছাড়া পুকুরের উঁচু পাড় থেকে ঠিক ঠাহরও হয় নি সাদা ওই বস্ত্রখণ্ডটুকুর কিনারায় একটু রঙের রেখা আছে কি নেই।

কিন্তু না, সারদা মরতে আসে নি। সত্যবতী পিতৃ-আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই তাকে কড়া পাহারায় রাখতে শুরু করেছে। আর পাহারা না দিলেও মরা এত সোজা নয়। 'মরব' বলেছে বলেই যে সত্যিই সদ্য আগত সতীনের হাতে স্বামী-পুত্র দুই তুলে দিয়ে পুকুরের তলায় আশ্রয় খুঁজতে যাবে সে, তা নয়। জ্বালা নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে তাকে, অন্যকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাবার ব্রত নিয়ে।

মরতে এসেছিল শঙ্করী।

মরতে এসেছিল তবু মরতে পারছিল না।

বসে বসে ভাবছিল মরণের দশা যখন ঘটেছে তার, তখন মৃত্যু ছাড়া পথ নেই। কিন্তু কোন্ মৃত্যুটা শ্রেয়? এই রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ-সুধাময় পৃথিবী থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া, না সমাজ সংস্কার সম্ভ্রম সভ্যতা মান মর্যাদার রাজ্য থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া।

শেষের মৃত্যুটা যেন প্রতিনিয়ত কী এক দুর্নিবার আকর্ষণে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে শঙ্করীকে! কিন্তু শঙ্করী তো জানে সেখানে অনন্ত নরক। তাই না যে পৃথিবী সকরুণ মিনতির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে ভোরের সূর্য আর সন্ধ্যার মাধুরীর মধ্যে, তার কাছ থেকেই বিদায় নিতে এসেছিল শঙ্করী!

কিন্তু পারল কই?

শুধুই কি মামাঠাকুরের দুর্লঙ্ঘ্য আদেশ? ঘাটের পৈঠাগুলোই কি তাকে দুর্লঙ্ঘ্য বাঁধনে বেঁধে রাখে নি?

তবে কি শঙ্করীর মৃত্যু বিধাতার অভিপ্রেত নয়? তাই দেবতার মূর্তিতে উনি এসে দাঁড়ালেন মৃত্যুর পথ রোধ করে?

হঠাৎ এমনও মনে হল শঙ্করীর, সত্যিই মামাঠাকুর তো? নাকি কোন দেবতার ছল? ঠাকুর-দেবতারা মানুষের ছদ্মবেশে এসে মানুষকে ভুল-ঠিক বুঝিয়ে দিয়ে যান, অভয় দিয়ে যান, এমন তো কত শোনা যায়।

বাড়ি ফিরে শঙ্করী যদি কোনপ্রকারে টের পায় রামকালী এখন কোথায় রয়েছেন, তা হলেই সন্দেহ ভঞ্জন হয়। ভাবতে ভাবতে ক্রমশঃ শঙ্করীর এমন

ধারণাই গড়ে উঠতে থাকে, নিশ্চয় খোঁজ নিলে দেখা যাবে মামাঠাকুর এখন এ গ্রামেই নেই, রোগী দেখতে দূরান্তরে গেছেন। নিশ্চয় এ কোন দেবতার ছল। নইলে সত্যিই তো, মামাঠাকুর এমন ঘুলঘুলি সন্ধ্যেয় মেয়েঘাটের কিনারায় ঘুরবেনই বা কেন ?

আর সেই হাঁকপাড়াটা ?

সেটাই কি ঠিক মামাঠাকুরের কণ্ঠস্বর ? মাঝে মাঝে তো ভেতরবাড়িতে আসেন মামাঠাকুর, কথাবার্তাও কন মার সঙ্গে, খুড়ীর সঙ্গে, পিসীদের সঙ্গে, কই গলার শব্দে এতটা চড়া স্বর শোনা যায় না তো ? মৃদুগম্ভীর ভারী ভরাট গলা, আর কথাগুলিও দৃঢ়গম্ভীর।

এ মামাঠাকুরকে দেখলে পুণ্যি হয়।

বড় মামাঠাকুরের মতন নয় ইনি। বড় মামাঠাকুরকে দেখলে ভক্তি-ছেদ্দা ছুটে পালায়। কিন্তু কথা হচ্ছে দেবতার ছদ্মবেশ সম্বন্ধে একেবারে নিঃসংশয় হবার উপায়টা কি ? কোথায় মেয়েমহল আর কোথায় পুরুষমহল ! চাটুয্যেদের এই শতখানেক সদস্য সম্বলিত সংসারে স্ত্রীরাই সহজে স্বামীদের তত্ত্ব পান না, তা আর কেউ ! অবিশ্যি পুরুষের তত্ত্ববার্তা নেবার প্রয়োজনটাই বা কি মেয়েদের ? দুজনের জীবনযাত্রার ধারা তো সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। পুরুষের কর্মধারার চেহারা যেমন মেয়েদের অজানা, সেদিকে উঁকি মারবার সাহস মেয়েদের নেই, তেমনি পুরুষের নেই অবকাশ মেয়েদের কর্মকাণ্ডের দিকে অবহেলার দৃষ্টিটুকুও নিক্ষেপ করবার।

একই ভিটেয় বাস করলেও উভয়ে ভিন্ন আকাশের তারা।

তবু মনে হতে লাগল শঙ্করীর, কোন উপায়ে একবার খোঁজ করা যায় না মামাঠাকুর বাড়িতে আছেন কিনা, থাকলে কি অবস্থায় আছেন ? এইমাত্র ফিরলেন, না অনেকক্ষণ থেকে বসে আছেন ?

আহা, মামাঠাকুরের সঙ্গে যদি কথা কইতে পারা যেত ! তা হলে বোধ করি ভগবানকে দেখতে পাওয়ার আশাটা মিটত শঙ্করীর। তা ওঁকে ভগবানের সঙ্গে তুলনা করবে না তো করবে কি শঙ্করী ? এত ক্ষমা আর কোন্ মানুষের মধ্যে সম্ভব ? এত করুণা আর কার প্রাণে আছে ? শঙ্করীর মর্মকথা জানতে পারলে ত্রিজগতের কেউ কি অমন দয়া অমন সহানুভূতি দিয়ে কথা বলতে পারত ? নাঃ ! তারা মাথা মুড়িয়ে মাথায় ঘোল ঢেলে গাঁয়ের বার করে দিত শঙ্করীকে। আর পিছনে ঘৃণার হাততালি দিতে দিতে

বলত, "ছি ছি ছি, গলায় দড়ি! তুই না হিন্দুর মেয়ে! তুই না বামুনের ঘরের বিধবা!"

আচ্ছা কিন্তু—হঠাৎ যেন সর্বশরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে শঙ্করীর, মামাঠাকুর টের পেলেন কি করে? কে বলবে? কে জানে? তাও যদি বা কোন প্রকারে সন্ধান পেয়ে থাকেন, যদি সেই পরম শত্রুটাই এসে কোন ছলে ভয়ে ডরে ফাঁস করে দিয়ে গিয়ে থাকে, শঙ্করী যে আজ এই সন্ধ্যায় ডুবে মরবার সংকল্প নিয়ে ঘাটে এসেছিল, এ কথা জানতে পারলেন কি করে তিনি?

মাত্র আজই তো দণ্ডকয়েক আগে সংকল্পটা স্থির করেছে শঙ্করী, অনেক ভেবে, অনেক নিশ্বাস ফেলে, অনেক চোখের জলে মাটি ভিজিয়ে। বিয়ে-বাড়ি, শাশুড়ী দিদিশাশুড়ীর দল বাড়তি কাজে ব্যস্ত, কে কোথায় কি করছে না করছে কেউ লক্ষ্য করবে না, আজই ঠিক উপযুক্ত সময়। তা ছাড়া আসছে কাল বাড়িতে যজ্ঞি, আত্মকুটুম্বর ভিড় লাগবে বাড়িতে। কে জানে কোন্ ছুতোয় কে শঙ্করীর রীতিনীতের ব্যাখ্যানা করবে, শঙ্করীর চালচলনের নিন্দে করবে, ঢি-ঢি পড়ে যাবে বাড়িতে।

না না, মরতেই যদি হয়, আজকেই হচ্ছে তার শ্রেষ্ঠ সময়। এইসব সাত-সতেরো ভাবনার বোঝা মাথায় করে ঘাটে এসেছিল শঙ্করী, জীবনের সমস্ত বোঝা নামিয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু—আবার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল শঙ্করীর, কিন্তু বিধাতা নিষেধ করলেন।

মরণের দরজা থেকে জীবনের রাজ্যে ফিরিয়ে আনলেন শঙ্করীকে।

তবে আর দ্বিধা কেন?

শঙ্করী বিধবা হলেও ওর আনা জল নিরামিষ ঘরে চলে না। ও 'অনাচারে', ওর অদীক্ষিত শরীর। জলের কলসীটাকে তাই মাঝের দালানে এনে বসাল শঙ্করী, ছেলেপুলেদের খাওয়ার দরকারে লাগবে।

কলসী নামানোর শব্দে কোথা থেকে যেন এসে হাজির হল সত্যবতী। এসেই এদিক ওদিক তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, "সব্বনাশ করেছ 'কাটোয়ার বৌ', তোমার নামে ঢি-ঢিক্কার পড়ে গেছে।" বাড়ীতে অনেক বৌ, কাজেই আশপাশের বৌদের তাদের বাপের বাড়ির দেশের নাম ধরে 'অমুক বৌ', 'তমুক বৌ' বলতে হয়। তা ছাড়া শঙ্করী নবাগতা, ওর আর পর্যায়ক্রমে মেজ-সেজ দিয়ে নামকরণ হয় নি।

বুকটা ধড়াস করে উঠল শঙ্করীর ?

কিসের সব্বনাশ।

তবে কি সব ধরা পড়ে গেছে ?

ঘরের কোণে রাখা মাটির প্রদীপের আলোয় মুখের রং গড়ন দেখা গেল না ; শুধু গলার স্বরটা শোনা গেল, কাঁপা কাঁপা ঝাপসা ঝাপসা।

"কিসের সব্বনাশ রাঙা ঠাকুরঝি ?"

"আজ না তোমার লক্ষ্মীর ঘরে সন্ধ্যে দেবার 'পালা' ছিল ?" সত্যর কণ্ঠস্বরে বিস্ময় আর সহানুভূতি।

লক্ষ্মীর ঘরে সন্ধ্যে দেখানোর পালা !

ওঃ ! শুধু এই !

বুকের পাথরটা নেমে গেল শঙ্করীর, হালকা হল বুক। হোক এটা ভয়ানক মারাত্মক একটা অপরাধ ; আর তার জন্যে যত কঠিন শাস্তিই হোক, মাথা পেতে নেবে শঙ্করা !

অবশ্য এই দরদের ধিক্কারে চোখে জল এসে গিয়েছিল তার।

সত্য গলাটা আরও একটু খাটো করে বলে, "আর তাও বলি কাটোয়ার বৌ, এই ভরসন্ধ্যে পযন্ত ঘাটে থাকার তোমার দরকারটাই বা কি ছিল ? সাপখোপ আছে, আনাচেকানাচে কু-লোক আছে—"

শঙ্করী সাহসে বুক বেঁধে বলে, "দিদিমা খুব রাগ করেছিলেন বুঝি ?"

"রাগ ? রাগ হলে তো কিছুই না। হচ্ছিল গিয়ে তোমার ব্যাখ্যানা !" সত্যবতী হাত-মুখ নেড়ে বলে, "আর সত্যিও বলি কাটোয়ার বৌ, তোমারই বা এত বুকের পাটা কেন ? ভর-সন্ধ্যেবেলা একা ঘাটে গিয়ে যুগযুগান্তর কাটিয়ে আসা কেন ? আবার আজই সন্ধ্যে দেখানোর পালা ! ঠাক্‌মারা তো তোমায় পাঁশ পেড়ে কাটতে চাইছিল।"

"তাই কাটো না ভাই তোমরা আমায়—" শঙ্করী ব্যগ্র কণ্ঠে বলে, "তা হলে তোমরাও বাঁচো, আমারও মনস্কামনা সিদ্ধি হয়।"

সত্য ভ্রূভঙ্গী করে গালে হাত দিয়ে বলে, "ওমা ! তোমার আবার কিসের মনস্কামনা ? তুমি আবার বড়বৌয়ের মতন বোল ধরছ কেন ? বড় বৌও যে এতক্ষণ আমায় বলছিল, আমায় একটু বিষ এনে দাও ঠাকুরঝি, খাই। তোমার দাদার হাতের সুতো খোলার আগেই যেন আমার মরণ হয়, সে দিশ্য দেখতে না হয়।"

সত্যি বলতে কি, সারদার সঙ্গে শঙ্করীর এখনও তেমন ভাব হয় নি। প্রথম তো বয়সের ব্যবধান, তা ছাড়া সারদা ছিল স্বামী-সোহাগিনী নবপুত্রবতী, আর শঙ্করী ছাইফেলার ভাঙাকুলো। আরও একটা কথা—দুজনের এলাকা আলাদা। শঙ্করীকে থাকতে হয় বিধবামহলে, তাঁদের হাতে হাতে মুখে মুখে ফাই-ফরমাশ খাটতে—সারদা সধবামহলের জীব। খাওয়া শোওয়া বসা সব কিছুর মধ্যেই আকাশ-মাটির পার্থক্য।

কিন্তু আপাততঃ সারদা অনেকটা নেমে পড়েছে, এখন শঙ্করীও তাকে করুণা করতে পারে। তাই করে শঙ্করী। দরদের সুরে বলে, "তা বলতে পারে বটে আবাগী।"

"বলি সে নয় বলতে পারল, তোমার কি হল? তোমার অকস্মাৎ কিসের জ্বালা উথলে উঠল?"

"আমার পোড়াকপালে তো সব্বদাই জ্বালা ঠাকুরঝি।" শঙ্করী নিঃশ্বাস ফেলে।

সত্য হাত নেড়ে বলে, "আহা, কপাল তো আর তোমার আজ পোড়ে নি গো? ঠাকুমারা তো সেই কথাই বলছিল, সোয়ামীকে তো কোন্ জন্মে ভুলে মেরে দিয়েছে, তবে আবার তোমার সদাই মন উচাটন কিসের? কিসের চিন্তে করো রাতদিন?"

"মরণের!" শঙ্করী দালানের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে পড়ে বলে, "ও ছাড়া আমার আর চিন্তা নেই।"

"তা ভাল!" সত্য আবার দুই হাত নেড়ে কথার সমাপ্তি টেনে মল বাজিয়ে চলে যায়, "সব মেয়েমানুষের মুখে দেখি এক রা, 'মরব' 'মরছি' 'মরণ হয় তো বাঁচি।' এ তো আচ্ছা ফ্যাসাদ।"

শঙ্করী আর এ কথার উত্তর দেয় না, বসে বসে হাঁপাতে থাকে। আসুক ঝড়, আসুক বজ্রাঘাত, এখানে বসে বসেই মাথা পেতে নেবে সে, উঠে গিয়ে পায়ে হেঁটে ঝড়ের মুখে পড়বার শক্তি নেই।

তা একটু বসে থাকতে থাকতেই ঝড় এল।

কিংবা শুধু ঝড় নয়, বৃষ্টি-বজ্রাঘাতও তার সঙ্গী হয়েছে।

শঙ্করী ফিরেছে শুনে খোঁজ করতে এসেছেন কাশীশ্বরী আর মোক্ষদা।

পিছনে দর্শকের ভূমিকা নিয়ে ভুবনেশ্বরী, রামকালীর স্ত্রী।

এগারো

অপরাধটা হচ্ছে লক্ষ্মীর ঘরে যথাসময়ে প্রদীপ না দেওয়ার, কিন্তু শাস্তির আশঙ্কায় সমস্ত শরীর কণ্টকিত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করীর মনের পটে যে ছবি ভেসে উঠল, সেটা লক্ষ্মীর ঘট অথবা গৃহদেবতার পটগুলির নয়, নিজের যে অপরাধের শাস্তির আশঙ্কাটা সমস্ত দেহমন শিথিল করে দিল শঙ্করীর, সে অপরাধের সঙ্গে এ বাড়ির, এমন কি এ গ্রামেরও কোন সম্পর্ক নেই।

অপরাধের জায়গাটা হচ্ছে শঙ্করীর বাপের বাড়ির আমবাগান! সময়টা গা ঝিমঝিমে ভরদুপুর।

নতুন ফাল্গুনের থেকে থেকে ঝিরিঝিরি আর থেকে থেকে দমকা বাতাস বইছে, আর নতুন 'গুটি বাঁধা' আমগাছগুলো সে বাতাসে যেন মাতলামির খেলা জুড়েছে। কিছু কিছু গাছ কিন্তু খানিকটা পিছিয়ে আছে, তাদের এখনো বোল্ ঝরে আম ধরে নি। পাতার ফাঁকে ফাঁকে মঞ্জরীর সমারোহ।

নির্জন দুপুরে, সেই বাগানে শঙ্করী আর নগেন!

নগেনের হাতের মধ্যে শঙ্করীর হাত।

আল্‌গা করে এলিয়ে পড়ে থাকা নয়, হাতখানা বজ্রমুষ্টিতে ধরে রেখেছে নগেন, পাছে শঙ্করী পালিয়ে যায়! যতক্ষণ না নগেনের বক্তব্যটা সম্পূর্ণ শেষ হবে, ততক্ষণ শঙ্করীর ছাড়ান নেই।

অনেকদিন ধরে, অনেক ছোটখাটো কথা, অনেক ইশারা-ইঙ্গিতের দূত মারফৎ নিজের বক্তব্য জানিয়েছে নগেন শঙ্করীকে, অনেক করুণ দৃষ্টি, অনেক চোরা হাসির সওগাতে। আজ বোধ করি একেবারে হেস্তনেস্ত করতে চায় সে।

কিন্তু নগেন কি শঙ্করীকে গায়ের জোরে এই নির্জন আমবাগানে টেনে এনেছিল? মুখে কাপড় বেঁধে, পাঁজাকোলা করে?

তা তো নয়।

সহায়সম্বলহীন ছেলেটার এত সাহস কোথা? মাসীর বাড়ির অন্ন খেয়ে খেয়ে তো মানুষ!

শঙ্করীর কাকীই নগেনের মাসী।

মা-মরা বোনপোকে কাছে এনে মানুষ করেছেন কাকী নিজের ছেলেদের সঙ্গে। যে সংসারে শঙ্করীও বেড়ে উঠেছে।

মাঝখানে শুধু একটা বিয়ের ব্যাপার।

কিন্তু সে আর ক'দিনের ? অষ্টমঙ্গলাতেই তো তার সমাপ্তি।

একই বাড়িতে বাস করেছে দুজনে! ভাই-বোনের মত। অথচ আশ্চর্য, মনোভাবটা কিছুতেই কেন ভাইবোনের মত তৈরী হল না ?

কেন ছোট্টবেলা থেকে শঙ্করীর নিজের খুড়তুতো দাদারা শঙ্করীর চুলের মুঠি ধরেছে, আর পান থেকে চুন খসলে খিঁচিয়েছে, আর নগেন কেনই বা বরাবর সেই দুঃখ-যন্ত্রণায় স্নেহের প্রলেপ লাগিয়েছে, অত্যাচারীদের প্রতি কটূক্তি করেছে!

পৃথিবীতে কি জন্যে কি হয় শঙ্করীর বোধের বাইরে। বোধের জগৎটা ওর নেহাতই সীমাবদ্ধ। নইলে আঠারো বছরের বিধবা মেয়ের পক্ষে, ভরা ভরদুপুরে, আমবাগানে এসে একটা বেটাছেলের সঙ্গে কথা কওয়া যে কতদূর গর্হিত, সে বোধ থাকা উচিত ছিল বৈকি একটা আঠারো বছরের মেয়ের।

কিন্তু সত্যিই কি এটুকু বোধও ছিল না শঙ্করীর ?

চব্বিশ ঘণ্টা কাকীর দাঁতের পিষুনিতে সে বোধ জন্মায় নি ? বাগানে এসেছিল কি শঙ্করী নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে ?

না, অবোধ হলেও এতটা অবোধ নয় শঙ্করী। এসেছিল বুকের মধ্যে ভয়ের বাসা নিয়েই। সকালে যখন নগেন এ আবেদন জানিয়েছে, তখন থেকেই বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়ছে তার। সকল কাজে ভুলচুক হয়েছে। তবু এসেছে।

তবু কি ভাগ্যিস আজ আর রান্নাঘরের ভারটা ঘাড়ে নেই। কাল শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে, বলতে গেলে জন্মের শোধই চলে যাবে, এই মমতায় গৃহকর্ত্রী শঙ্করীকে হেঁসেলের দায়িত্ব থেকে ছুটি দিয়েছেন। আর যখন শঙ্করী নিতান্ত বিনীত মূর্তিতে, নিতান্ত কাঁচুমাচু মুখে আবেদন জানিয়েছে, "বকুলফুলের বাড়ি একবার যাব কাকীমা ?" তখন 'না' করতে পারেন নি তিনি।

বাগানে এসেই প্রথম এই ছলনার খবর শুনে হেসে উঠেছিল নগেন। বলেছিল, "তা গুরুজনের সঙ্গে মিছে কথা কয়েছিস ভেবে অত মনমরা হচ্ছিস কেন ? ধরে নে না আমিও তোর একটা 'বকুলফুল' ?"

কিন্তু এখন আর নগেনের মুখে হাসি নেই, এখন নগেনের অন্য ভাব।

এখন কেমন রুক্ষ হিংস্র উদ্‌ভ্রান্ত মতন। এখন বজ্রমুষ্টিতে শঙ্করীর হাত ধরে, টেনে নিয়ে যেতে চায় ভিন্ন আর এক জগতে।

"পালিয়ে গিয়ে অন্য অনেক দূরের আর এক গাঁয়ে চলে যাই না? সেখানে কে চিনবে আমাদের? বলব আমরা স্বামী-স্ত্রী, আগুন লেগে ঘরবাড়ি ক্ষেতখামার সব পুড়ে গেছে, তাই মনের আক্ষেপে দেশ-ভুঁই ছেড়ে চলে এসেছি!"

"অমন পাপকথা বললে যে জিভ খসে যাবে নগেনদাদা? নরকেও ঠাঁই হবে না আমাদের।" উচ্চারণ করে শঙ্করী, কিন্তু সে উচ্চারণে কোথাও কোন জোর প্রকাশ পায় না। পাপের আশঙ্কায় আগে থেকেই কি জিভ শিথিল হয়ে এল শঙ্করীর?

"পাপ কিসের? তোর ওই বে-টা কি বে? স্বামীর ঘর করেছিস তুই? জন্ম-জন্মান্তর থেকে তুই আর আমি পতি-পত্নী, বুঝলি? তাই ওই একটা উট্‌কো স্বামী সইল না তোর। নইলে এতদিন তুই কোথায় থাকতিস, আর আমি কোথায় থাকতাম! তুই মন ঠিক কর্ শঙ্করী, দোহাই তোর।"

"এ কথা কানে শুনলেও যে অনন্ত নরক নগেনদাদা!"

"তাই যদি হয়," নগেন উগ্রমূর্তিতে বলে ওঠে, "নরকেই যদি যেতে হয়, তোকে তো একলা যেতে হবে না! আমাকেও যেতে হবে। তোর জন্যে সে ক্লেশও মেনে নিচ্ছি আমি। পৃথিবীর আর সব্বাই যাক তা স্বর্গে, তুই আর আমি নয় নরকেই থাকব। এ জন্মটা তো তবু ভাল যাবে।"

"এইটাই কি একটা নেয্য কথা হল? না নগেনদাদা, তোমার পায়ে ধরি আমায় ছেড়ে দাও. কেউ যদি এ অবস্থায় দেখে ফেলে, তা হলে আর আমার ঘরে ঠাঁই হবে না।"

"ভালই তো—" নগেন হাতটা ছেড়ে দেওয়ার পরিবর্তে আরও জোরে চেপে ধরেছিল, বুঝিবা একটু কাছেও টেনেছিল, বলেছিল, "ঘর থেকে দূর করে দিলে আমাদের সুরাহাই হবে। কলঙ্ক ছড়ালে শ্বশুরবাড়ি থেকেও নেবে না তোকে, তখন দুজনে চলে যাওয়া সোজা হবে। শাপে বর হবে আমাদের।"

"না না নগেনদাদা, হাত ছাড়। তোমার মনে এত 'কু' জানলে, কক্‌খনো এখানে আসতাম না আমি। তুমি বললে একটা কথা আছে—"

নগেন কখনো যা না করেছে তাই করল। অগ্নিমূর্তি হয়ে খিঁচিয়ে

উঠল, "ন্যাকামি করিস নে। জানলে আসতাম না! তোর সঙ্গে আমার কি ভাগবত-কথা থাকবে শুনি? আমি বলছি তুই আমার সঙ্গে পালিয়ে চল্।"

সজ্ঞানে নয়, অসতর্কে মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, "কোথায়?"

নগেন মহোৎসাহে বলে ওঠে, "যেখানে হোক। অনে—ক দূরের কোন গাঁয়ে। সেখানে শুধু তুই আর আমি, সুখে সংসার করব। ছোট্ট একখানা মাটির কুঁড়ে, একটু শাকপাতার বাগান, একটা একছিট্টে পুকুর, এর বেশী আর কি চাই আমাদের বল্? তা সেটুকু সংস্থান করতে পারব। পেটে তো একটু বিদ্যে করেছি, কিছু না পারি একখানা পাঠশালা খুলব! কারুর কোন ক্ষেতি নেই তাতে শঙ্করী।"

বুকের মধ্যেকার সেই ঢেঁকির পাড় পড়াটা বন্ধ হয়ে, কী এক কাঁপা-কাঁপা-সুখে মনটা কি দুলে উঠল না শঙ্করীর? চোখ দুটো কি জলে ভরে এল না? নতুন ফাগুনের সেই থেকে-থেকে-ঝিরিঝিরি, থেকে-থেকে-দমকা বাতাসে শরীরটা কেমন অবশ অবশ হয়ে আসে নি কি? মনে কি হয় নি, সত্যিই তো—তাতে কার কি ক্ষতি? শ্বশুরবাড়ি সে চোখে দেখে নি, এক দিনও ঘর করে নি। চেনে না তাদের, জানে না শঙ্করীকে না পেলে কার কি সুখ-দুঃখ, কার কি লাভ-লোকসান! কাকারা যদি খবর দেয়, শঙ্করী বলে যে একটা মেয়ে ছিল তাদের ঘরে—যে নাকি কবরেজ-বাড়ির ভাগ্নে-বৌ ছিল—হঠাৎ ওলাউঠো হয়ে মরে গেছে সে, কত কাঁদবে কবরেজ-বাড়ির লোকেরা?

আর কাকা-খুড়ী?

মরে গেছে বলে রটিয়ে দিলে সমাজের কাছে পার পাবে না?

না, বেশীক্ষণ এ চিন্তা মনে স্থান পায় নি। বাতাসটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে ভয়ানক যেন গুমোট হয়ে উঠল, চেতনা ফিরে পেল্ শঙ্করী। বলে উঠল, "হিঁদুর ঘরের বিধবাকে বেরিয়ে যাবার কুমন্তরণা দিতে লজ্জা করে না তোমার? তুমি না আমার ভাইয়ের মতন?"

"না, কক্খনো না।" গর্জে ওঠে নগেন, "কক্খনো ভাইয়ের মতন নয়। সে কথা তুইও ভাল জানিস, আমিও ভাল জানি। চিরকাল মনে মনে আমি তোকে পরিবারের মতন দেখে এসেছি। জেনেশুনে কেন মিছে বাকচাতুরি করছিস? কথা দে, দুপুররাতে তুই খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে এসে

এখেনে দাঁড়াবি, আমি আগে থেকে দাঁড়িয়ে থাকব। তার পর জোর পায়ে হেঁটে গাঁ থেকে একবার বেরোতে পারলে কে ধরে? খুঁজতে তো আর পারবে না মাসী-মেসো? কিল খেয়ে কিল চুরি করে বসে থাকতে হবে।"

"ও নগেনদাদা, আমার বুকের ভেতরটা কেমন করছে, ছেড়ে দাও আমায়। আমি পারব না।"

"পারতেই হবে তোকে।" নগেন ব্যাকুল স্বরে বলে, "যতক্ষণ না তুই মত দিবি ছাড়ব না হাত। দেখুক পাঁচজনে, সেই আমি চাই।"

"নগেনদাদা আমি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব।" আলগা আলগা দুর্বল স্বরে বলে শঙ্করী, "বলব বাগানে একলা পেয়ে তুমি আমাকে—"

নগেন বেপরোয়া, বলে, "চেঁচা! জড়ো কর লোক।"

"নগেনদাদা গো আমাকে বরং মেরে ফেল।"

"আমি আর কি মারবো তোকে? মেরেই তো ফেলেছে সবাই মিলে। বাপের বাড়িতেই লাথি-ঝাঁটা না খেয়ে একমুঠো ভাত জুটছিল না, মরার ওপর খাঁড়ার ঘা, এর পর আবার শ্বশুরবাড়ি। সারা জন্মটা শুধু লাথি-ঝাঁটা সার। আমিই বরং তোকে বাঁচাতে চাই। আদর করে যত্ন করে মাথার মণি করে রাখতে চাই।"

"আমি চাই না তোমার আদর-যত্ন।" এবার একটু দৃঢ় শোনাল শঙ্করীর কণ্ঠস্বর, "লাথি-ঝাঁটাই আমার ভাল।"

"বটে। লাথি-ঝ্যাঁটাই তোর ভাল?" নগেন সহসা মারমুখী হয়ে একটা ভয়ঙ্কর কাজ করে বসল।

হ্যাঁ, আদর করে প্রেমালিঙ্গন নয়, মারমুখী হয়ে সহসা শঙ্করীকে সাপটে জড়িয়ে ধরল নগেন, ধরে বলে উঠল, "বেশ, সেটাই যাতে আরও ভাল করে খাস তার ব্যবস্থা করছি। এই দিচ্ছি দেগে, তার পর তোর শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ে গিয়ে রটাব, ও আমার সঙ্গে মন্দ—"

কিভাবে যে নগেনের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিল শঙ্করী, কীভাবে যে একেবারে ঘাটে ডুব দিয়ে বাড়ি গিয়ে বলেছিল বকুলফুলের বাড়ি যাওয়া হল না, রাস্তায় যেতে একখানা ছুতোহাঁড়ি পায়ে ঠেকে গেল বলে একেবারে নেয়ে বাড়ি ফিরতে হল, আর কি করে যে 'অসময়ে নেয়ে মাথাটা ভার হয়েছে' বলে দিনের বাকী সময়টা শুয়ে কাটাল, সে সব আর ভাল করে মনে পড়ে না শঙ্করীর।

শুধু মনে আছে তার প্রবল কান্নার ব্যাপার দেখে কাকাসুদ্ধু মমতা-মমতা গলায় সান্ত্বনা দিয়েছিল, "কেন কাঁদছিস মা, মেয়েমানুষকে তো শ্বশুরঘর করতেই হয়। সেই হচ্ছে চিরকালের জায়গা। তা ছাড়া কবরেজমশাই অতি সজ্জন বেক্তি, সংসারে খাওয়া-পরার কোন দুঃখু নেই, ভাল থাকবি, সুখে থাকবি।"

তবু আরও আকুল হয়ে কেঁদেছিল শঙ্করী। অগত্যা খুড়ীকে পর্যন্ত বলতে হয়েছিল, "আবার আসবি, পালেপার্বণে আসবি, আমরা কি তোকে পর করে দিচ্ছি?"

বছর ঘুরে গেল, খুড়ীর প্রতিশ্রুতি খুড়ো রাখে নি। নিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, একবার উদ্দিশ পর্যন্ত করে নি। সে গাঁয়ের এক কানাকড়া খবরও আর সেই অবধি পায় নি শঙ্করী। শুধু অবিরত কাঁটা হয়ে থেকেছে, ওই বুঝি কে বলে, 'নগেন বলে একটা ছেলে এসে গ্রামে কি রটিয়ে বেড়াচ্ছে শঙ্করীর নামে'।

ঘাটে পথে বেরিয়ে গাছের পাতা নড়ার শব্দে শিউরে ওঠে শঙ্করী, বাঁশের সরসরানি শুনলে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু?

সে ভয় কি শুধুই ভয়? নিছক ভয়?

তার সঙ্গে ভয়ানক একটা আশাও কি জড়ানো নেই?

সর্বদা কি মনে হয় না, হঠাৎ কোন একটা বাঁশবাগানের ধারে কি পুকুর-ঘাটের কাছে সেই সর্বনেশে লোকটাকে দেখতে পায় তো, আর বাড়ি ফেরে না।......

কাল শুনেছে, বিয়ে উপলক্ষে কাকার বাড়ি থেকে নাকি 'নেমন্তন্নিতে' আসবে। কাল থেকে তাই মরে আছে শঙ্করী।

কি জানি কি বলবে খুড়ো কি খুড়তুতো ভাইরা এসে!

নগেন কি সব বলে বেড়িয়েছে?

নগেন কি ওখানে আছে এখনও?

নগেন কি বেঁচে আছে?

হয়তো টের পেয়ে সবাই মেরে ফেলেছে।

সেদিন কেন আমবাগানে গিয়েছিল শঙ্করী? আর যে লোকটা তাকে মন্দ

পথে টানবার চেষ্টা করছিল, কেন আজও শঙ্করীর মনকে লক্ষ দড়িদড়া দিয়ে টানছে সে ?

মরতে গিয়েও কেন মরতে পারে না শঙ্করী ?

পৃথিবীতে শঙ্করী বলে একটা মেয়েমানুষ যদি না থাকে কি এসে যাবে পৃথিবীর ? কলঙ্কিত মন নিয়ে ঠাকুরঘরের কাজ করছে সে, তুলসীতলায় প্রদীপ দিচ্ছে, এ মহাপাপের ফল—

চিন্তায় বাধা পড়ল।

কাশীশ্বরী এসে দাঁড়িয়েছেন, তীব্রকণ্ঠে ডাকছেন, "নাতবৌ !"

বারো

ভয় ! ভয় !

সত্যর মনের কাছে এত বড় ভয়ের পরিচয় বোধ করি এই প্রথম।

'কাটোয়ার বৌ'য়ের খুব যে একটা খোয়ার হবে এটা আশঙ্কা করছিল সত্য, কিন্তু এ কি! তিরস্কারের এ কোন্ ভাষা ? জীবনে অনেক কথা শুনেছে সত্য, অনেক কথা শিখেছে, কিন্তু এসব শব্দ তো কখনো শোনে নি।

'অসতী' মানে কি ? 'উপপতি' কাকে বলে ? 'কুল খাওয়া' বলতেই বা কি বোঝায় ?

যে কুলের আচার তৈরি হয়, আর তেলে-নুনে জরিয়ে অপূর্ব আস্বাদন পাওয়া যায়, এটা যে ঠিক সে জাতীয় নয়, এইটুকুই শুধু বুঝতে পারে সত্য। কিন্তু তারপরই কেমন দিশেহারা হয়ে যায়। দূর থেকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে শঙ্করী আর কাশীশ্বরীর দলের দিকে।

না, আর কেউ কিছু বলছে না, সবাই নিথর, এমন কি মোক্ষদা পর্যন্ত কেমন যেন স্তব্ধ, একা কাশীশ্বরীই পালা চালিয়ে যাচ্ছেন, চাপা তীক্ষ্ণ গলায়।

শঙ্করীকে ধরে চিবিয়ে খেলেও বুঝি রাগ মিটবে না, এমনি সব মুখভঙ্গী।

মোক্ষদা এক ধরনের, কাশীশ্বরী আর এক ধরনের। মোক্ষদার 'অটুট' গতর, অসীম ক্ষমতা, অনর্গল বাকপটুত্ব। কিন্তু কাশীশ্বরী তা নয়। কাশীশ্বরী শোকেতাপে কিছুটা অথর্ব, তাছাড়া চিরদিনই তিনি টেপামুখী।

শুধু তেমন মোক্ষম অবস্থা পড়লেই মুখ দিয়ে কথা বেরোয় তাঁর। চাপা তীক্ষ্ণ।

কিন্তু আজকের মত এমন সব কথা কবে বেরিয়েছে কাশীশ্বরীর মুখ দিয়ে? এমন ঘৃণা-জর্জরিত মুখই বা কবে দেখা গেছে তাঁর?

কে গিয়েছিল কাটোয়ায়?

কে কি শুনে এসেছে সেখান থেকে? বারবার শঙ্করীর বাপের বাড়ির কথাই বা উঠছে কেন? তারা নাকি কেউ ভোজবাড়িতে আসবে না, সম্পর্ক রাখতে চায় না শঙ্করীর সঙ্গে। নেহাৎ নাকি তারা শঙ্করীর মা-বাপ নয়, খুড়োখুড়ী, তাই অমন মেয়েকে টুকরো টুকরো করে কেটে কাটোয়ার গঙ্গায় ভাসিয়ে দেয় নি!

আরও কত কথা, তার সঙ্গে কত মুখভঙ্গী!

শঙ্করীকে গলায় দড়ি দিয়ে মরবার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। দেওয়া হচ্ছে ঘাটে ডুবে মরবার নির্দেশ। পাপিষ্ঠা শঙ্করীর পাপস্পর্শেই যে কাশীশ্বরীর একমাত্তর নাতিটা বিয়ের বছর না ঘুরতেই মরেছে, সে কথাও প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে আজকের বিচারের রায়ে।

অনেক শুনতে শুনতে, শেষ পর্যন্ত এইটুকু বুঝতে পারে সত্য, নাপিত-বৌ আর রাখু কাটোয়া গিয়েছিল যজ্ঞির জন্যে নেমন্তন্ন করতে। আর শঙ্করীর খুড়ী নাপিত-বৌয়ের কাছে শঙ্করীর নামে যাচ্ছেতাই করেছে।

সেখান থেকে খুব যে একটা গর্হিত কাজ করে চলে এসেছে শঙ্করী, সে বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র নেই। লক্ষ্মীর ঘরে সন্ধ্যা দিতে দেরি হওয়া, অথবা সাঁঝ-সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘাটে বসে থাকার চাইতে যে অনেক বেশী গর্হিত তা বুঝতে পারা যাচ্ছে।

কিন্তু শঙ্করীর অপরাধের সঙ্গে তার খুড়ীর বোনপোর যোগ কোথায়? সে কেন শঙ্করীর জন্যে বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দিশ হয়ে চলে গেছে?

এইখানেই সব গোলমাল লাগছে সত্যর!

সব যেন হেঁয়ালি!

এই অন্য জগতের অর্থবহ, জীবনে-না-জানা শব্দগুলো সত্যর বুকটাকে কেমন হিম হিম করে দিচ্ছে! ভয় করছে। যে অনুভূতি জীবনে জানে না সত্য, আজ সেই অনুভূতি তার সমস্ত সাহসকে যেন বোবা করে দিয়েছে।

গিন্নীরা কাউকে শাসন করছেন, অথচ সত্য তার মধ্যে ফোড়ন কাটছে না, এমন ঘটনা বোধ করি সত্যর জ্ঞানে এই প্রথম। অপরাধীর পক্ষ নেওয়াই সত্যর স্বভাব। তা সে অপরাধী যে শ্রেণীর হোক।

একবার বাসন-মাজুনী বাগদী-বৌ সন্ধ্যে করে ঘাটে বাসন মাজতে গিয়ে পাঁজার বাসন থেকে একটা বাটি হারিয়ে ফেলেছিল। খুব সম্ভব বাটিটা জলেই ডুবে গিয়েছিল, কিন্তু বাগদী-বৌকে 'চোর' অপবাদ দিয়ে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি করেছিলেন শিবজায়া আর দীনতারিণী। এবং মোক্ষদা হুকুম দিয়েছিলেন, "না যদি নিয়েছিস তো সমস্ত রাত ওই পুকুর হাতড়ে বাটি খুঁজে বার কর।"

বাগদী-বৌ যত হাউ-মাউ কাঁদে, গৃহিণীকুল ততই চেপে ধরেন তাকে। চুরির উদ্দেশ্যেই যে সে বেলা গড়িয়ে বাসন মাজতে আসে এ মন্তব্যও করতে ছাড়েন না তাঁরা। সেযাত্রা সত্যই তো রক্ষে করেছিল বাগদী-বৌকে।

বলেছিল, "চল্ বাগদী-বৌ, আমিও খুঁজি গে তোর সঙ্গে। আমি খুব সাঁতার জানি, সাঁতরে এপার-ওপার করে বাটি হাতড়াব।"

"তুই খুঁজবি মানে ?"

ধমকে উঠেছিল সবাই। এবং সকলকে চমকে দিয়ে সত্য উদাসভাবে বলেছিল, "তা খুঁজতে হবে বৈকি। তোমাদের পাপের প্রাচিত্তির আমাকেই করতে হবে, ভগবান যখন আমাকে তোমাদের ঘরের মেয়ে করে পাঠিয়েছে! বাড়িতে যাদের পাঁচসিন্দুক বাসন, তারা যদি তুচ্ছ একটা ডালথাবার বাটির জন্যে একটা মানুষের প্রাণবধ করতে চায়, তবে একজনকে তো তার প্রিতিকার করতে হবে।"

'থ' হয়ে গিয়েছিল সবাই, আর বোধ করি তুচ্ছ একটা বাটির জন্য নিজেদের তুচ্ছতার বহরটা সেই প্রথম নজরে পড়েছিল তাঁদের।

"তবে আর কি, পাঁচসিন্দুক বাসন আছে তো হরির নুট দিগে যা বাসনের! অনেক পয়সা আছে তোর বাপের!" বলে কেমন যেন শিথিল ভাবে রণে ভঙ্গ দিয়েছিলেন তাঁরা।

বাগদী-বৌ গলায় কাপড় দিয়ে সত্যকে প্রণাম করেছিল সেদিন।

তা এমন অনেককেই অনেক সময় বিপদ থেকে ত্রাণ করেছে সত্য। কিন্তু আজ আর সত্যর গলা দিয়ে শব্দ বেরোচ্ছে না।

একটা অন্ধকার অরণ্যের গা-ছমছমে রহস্য মূক করে দিয়েছে সত্যকে।

কখন যে তিরস্কার-পর্ব শেষ হল, কখন যে গিন্নীরা আপন আপন কর্মে প্রস্থান করলেন, কাটোয়ার বৌ তারপর গেল কোথায়, এসবের কোন খবরই আর রাখতে পারে নি সত্য, কখন একসময় যেন আস্তে আস্তে চলে গিয়ে সারদার ঘরের মেঁজেয় পরনের চাঁদের-আলো-রঙা আটহাতি শাড়িখানির আঁচলটুকু বিছিয়ে শুয়ে পড়েছিল। যেখানে সারদাও শুয়ে আছে সেই একই পদ্ধতিতে, কোলের ছেলেটুকুকে কোলের কাছে নিয়ে।

সারদা বলেছিল, "শুলে যে সত্য ঠাকুরঝি!"

"শুলাম।" বলে উত্তর এড়িয়েছিল সত্য।

সারদা আর একবার নিশ্বাস ফেলে বলেছিল, "কাটোয়ার বৌ অত গাল খাচ্ছিল কেন ঠাকুরঝি?"

সত্য বলেছিল, "জানি না।"

সত্যর পক্ষে এমন সংক্ষিপ্ত স্বল্প ভাষণ প্রায় অভূতপূর্ব, কিন্তু সারদারও নাকি মনে সুখের লেশ নেই—তাই আর বেশী কথা বাড়ায় নি। একসময় ছেলের সঙ্গে ঘুমিয়েও পড়েছিল।

কিন্তু সত্যর চোখে ঘুম আসতে চায় না।

ভয়ের সেই অনুভূতিটা ছাড়তে চায় না তাকে।

থেকে থেকে বুকটা কেমন ঠাণ্ডা আর ফাঁকা ফাঁকা লাগে। অজানা ওই শব্দগুলো না হয় চুলোয় যাক, কিন্তু আর একটা নতুন ভয় যে মনের মধ্যে বাসা বাঁধল এসে।

সত্যিই যদি কাটোয়ার বৌ ··

গলায় দড়ি দেওয়ার পদ্ধতিটা কি, আর তার পরিণামই বা কি ঠিক জানে না সত্য কিন্তু অপরটার আশঙ্কায় বারবার গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল তার। যদি তাই হয়?

যদি কাল 'যজ্ঞি'র প্রয়োজনে পুকুরে জাল ফেলতে গিয়ে জেলেরা মাছের সঙ্গে আরও একটা জিনিস ছেঁকে তোলে!

ভারী রুই পড়েছে ভেবে আহ্লাদে হেঁই হেঁই করে জাল টেনে তুলে যদি দেখে মাছ নয়—

বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়ার মত শব্দ হতে থাকে সত্যর।

কজনকে পাহারা দেবে সে?

সারদার ব্যাপারেই তো ভয়ে আর বাপের হুকুমে তটস্থ হয়ে আছে, তার

ওপর আবার কাটোয়ার বৌ চাপল মনের মধ্যে। কাকে রেখে কাকে দেখবে সত্য ?

গালাগালির সময় মুখটা কি রকম দেখাচ্ছিল কাটোয়ার বৌয়ের ?

সত্য কি তাকায় নি ?

বোধ হয় তাকিয়েছিল, কিন্তু দালানের এক কোণায় মিটমিট করে একটা প্রদীপ জলছিল, তার থেকে দাওয়ায় আর কত আলো এসে পড়বে ?

তাও আবার চাঁদের এখন আঁধারে-কাল চলছে। 'শুক্লা' চললে তবু উঠোনে বাগানে হেঁটে চলে সুখ, মনিষ্যিকে দেখাও যায়। 'আঁধারে' তো সন্ধ্যে হলেই হয়ে গেল !

মানুষের সঙ্গে কথা কওয়া ওই মুখ-চোখ না দেখেই !

না, শঙ্করীর মুখ দেখতে পায় নি সত্য।

তাই বুঝতে পারছে না, ওই অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দগুলোর মানে শঙ্করী ধরতে পেরেছে কিনা।

আচ্ছা সারদাকে একবার চুপি চুপি জিজ্ঞেস করবে সত ? যতই হোক সারদা সত্যর দুগুণ বয়সী, ছেলের মা, কতদিন আগে বিয়ে হয়েছে সারদার, হয়তো ওই বিদঘুটে কথাগুলোর মানে জানা থাকলেও থাকতে পারে।

কিন্তু বার বার বলি-বলি করেও বলতে পারল না শেষ অবধি। মুখের দরজায় কে যেন তালাচাবি দিয়ে দিয়েছে।

মানে বুঝতে না পারলেও কথাগুলো যে খারাপ কথা, সেটা বুঝতে পেরেছে সত্য।

কাটোয়ার বৌয়ের সঙ্গে খুব যে একটা যোগাযোগ ছিল সত্যর, তা নয়। একে তো মাত্র বছরখানেক হল এসেছে সে, নব আগন্তুক হয়ে, তাছাড়া সে তো নিরিমিষ দিকের। একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া নেই। তবে নাকি নেহাৎ দেখা-সাক্ষাৎ সূত্রে কথাবার্তা। তাও বিশেষ মিশুকে নয় শঙ্করী। সর্বদাই যেন আনমনা, কাজেই—

সত্য আজও যখন সন্ধ্যা গড়িয়ে যাওয়ার অপরাধে চুপি চুপি অবহিত করতে এসেছিল শঙ্করীকে, তখন নেহাৎ একটা জীবের প্রতি যতটুকু মমতা থাকা উচিত তার বেশী ছিল না। [illegible] এখন যেন মায়ায় মন ভরে যাচ্ছে

সত্যর। মনে হচ্ছে কত না জানি কাঁদছে বেচারা। জগতে এমন কেউ নেই ওর যে সে কান্নায় একটু সান্ত্বনা দেয়।

বিধবা হওয়ার কী কষ্ট!

সত্যরও তো বিয়ে হয়েছে। একটা বরের সঙ্গেই নাকি হয়েছে। সেই বরটা যদি হঠাৎ মরে যায়, সত্যও তো তাহলে বিধবা হবে?

তা যদি হয়, সত্যকেও সবাই অমনি করে খোয়ার করবে?

কিন্তু তাই বা কি করে বলা যায়?

পিস-ঠাকুমারাও তো বিধবা!

বিধবা আরো কতজনেই, তাদের ভয়েই তো সবাই তটস্থ হয়ে থাকে।

ওদের দেখে মনে হয় ওরাই যেন পৃথিবীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

তবে? ওরা বড় বলে? কিন্তু তাই কি? এরা বড় হলে ওরকম হতে পারে?

না, এসব ঠিক বুঝতে পারে না সত্য।

শুধু যে বয়েস দিয়েই সব বিচার হয় তা তো নয়। এই যে তার বাবাকে দেশসুদ্ধ লোকে ভয় করে, জেঠামশাইকে কি কেউ তা করে? উল্টে জেঠা-মশাই পর্যন্ত তো বাবার ভয়ে কাঁটা। শুধু কি জেঠামশাই? সেজঠাকুদ্দা? নঠাকুদ্দা? কে নয়? ওরা তো আর মেয়েমানুষ নয়?

বয়েসটা কিছু নয়। ছোট বড় বলেও কিছু নয়।

তাহলে ভয়ের বাসাটা কোথায়?

ভাবতে ভাবতে থই পায় না সত্য। তবু ভাবে। কে যে ওকে ভয়ের বাসা খোঁজার চাকরি দিয়েছে কে জানে!

অনেক রাত্রে ভুবনেশ্বরী আসে ডাকতে।

"এই সত্য, না খেয়ে ঘুমিয়েছিস যে, ওঠ্!"

সত্য পাশ ফিরে ঘুমের ভান করে জানায় তার খিদের অভাব।

ভুবনেশ্বরী বকে ওঠে, "খিদে নেই কেন? ওঠ্ যা, রাত-উপুসী থাকতে নেই। কথায় বলে রাত-উপুসে হাতী কাবু। বড় বৌমা, তুমিও ওঠো দিকিন্ বাছা। সারাদিন উপুসে আছ, আর অমন করে পড়ে থেকো না। স্বামী-পুত্তুরের অকল্যেণ হয় ওতে।"

ভুবনেশ্বরীর গলা পেয়েই ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছিল সারদা। পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার তীব্র ইচ্ছেয় ধরাশয্যা নিয়ে পড়ে থাকলেও, খুড়শাশুড়ীকে

দেখে সমীহ করবে না, এমন কথা ভাবা যায় না। তাই ধড়মড়িয়ে উঠেছিল। স্বামী-পুত্তুরের অকল্যেণ শুনে এবার মনে মনে ধড়ফড়িয়ে উঠল।

ভুবনেশ্বরী ফের বলে, "আমি তোমার ছেলে দেখছি, যাও ওঠো। সত্যকে ডেকে নিয়ে খেতে যাও গে। তোমার শাশুড়ী হেঁসেল আগলে বসে আছে। এ-বেলায় জাল ফেলিয়ে মস্ত একটা মাছ ধরানো হয়েছিল, 'এসো জন বসো জন' যদি আসে বলে। থামি থামি দাগার মাছ আর আমের বাখড়া দিয়ে এমন খাসা টক রেঁধেছে দিদি, দেখ গে যাও খেয়ে।"

ভুবনেশ্বরী অনেকগুলো কথা বলে গেলেও সত্যর কানে তার শেষ অবধি পৌঁছয় নি। 'পুকুরে জাল ফেলে বড় মাছ ধরা হয়েছে' শুনেই তার মনশ্চক্ষে ভেসে উঠেছে জালবদ্ধ আর একটা জীব! যাকে টেনে তুলে ধড়াস করে পুকুর-পাড়ে ফেলা হয়েছে আর যে মুখ চন্দ্র-সূর্য্যিতে দেখতে পাবার কথা নয়, সেই মুখ সহস্র লোকে দেখছে!

কিন্তু সেই মুখের উপর যে চোখ দুটো বসানো আছে, সে কি আর দেখছে? জীবনে কি আর দেখবে কোন কিছু?

উঠে বসে তাড়াতাড়ি বলে, "মা, কাটোয়ার বৌ কোথায়?"

"কোথায় আবার", ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে ভুবনেশ্বরী, "কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়েছে গিয়ে। তাকে তোর দরকার কি? খেতে যাচ্ছিস খেতে যা।"

"খাব না, খিদে নেই!" বলে ফের শুয়ে পড়ে সত্য।

কিন্তু ওদিকে 'দাগা দাগা রুই মাছ আর আমের বাখড়ার টক' অন্যত্র কাজ করেছে! একে ষোলো বছর বয়সের দুরন্ত স্বাস্থ্য, তার উপর সারাদিন ছেলেটা বুকের দুধ টেনে খাচ্ছে।

সতীনকাঁটার যন্ত্রণাটাও যেন কাবু হয়ে এসেছে।

তবু! একান্ত বাসনা সত্ত্বেও বাধা আসে মনে!

সারাদিন অভুক্ত পড়ে থেকেও সেই অভুক্ত চেহারাটায় স্বামীর সঙ্গে একবার দেখা হল না, কে জানে রাতে হতে পারে কিনা! আজ তো নতুন বৌয়ের 'কালরাত্রি,' কাজেই আজ পুরনো বৌ প্রাধান্য পেলেও পেতে পারে। দিব্যি করে মাছের ঝাল দিয়ে একপাথর ভাত সেঁটে এসে অভিমান জানাবে কোন্ মুখে? সারদা তাই চিঁচিঁ করে বলে, "সবে পেটের ব্যথাটা একটু নরম পড়েছে—।"

"তা হোক। ও খেলেই নরমে যাবে," নরম গলায় বলে ভুবনেশ্বরী, "তুমি ডেকেডুকে নিয়ে গেলে তবে যদি সত্য দুটো খায়।"

নিজের শাশুড়ীর সঙ্গে কথা চলে না। ঘোমটা দিতে হয় একগলা। কথা যা, তা এই খুড়শাশুড়ীর সঙ্গেই। তা খুড়শাশুড়ীর কণ্ঠের নরম স্বরটুকুই চোখে জল এনে দিল সারদার। অগত্যাই আর রাসুর সামনে অভুক্ত মুখ দেখাবার ইচ্ছেটাকে টেনে রেখে দেওয়া গেল না, সারদা সত্যকে নাড়া দিয়ে বলল, "চল ঠাকুরঝি, যা পারবে খেয়ে নেবে।"

সত্য উঠে বসল।

হাই তুলে বিরক্ত হয়ে উঠে বলল, "বাবাঃ, দু দণ্ড যদি একটু নিরিবিলিতে পড়ে থাকার জো আছে! নাও চল।"

সারদা চলে যেতেই ভুবনেশ্বরী একটা অসমসাহসিক কাজ করে বসল।

ঘুমন্ত ছেলেটাকে কাঁথা মুড়ে কোলে চেপে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চুপি চুপি রাখুর মাকে গিয়ে বলল, "রাখুর মা, বড় ছেলেকে একবার ডেকে দে তো। বলবি জরুরী দরকার।"

বড় ছেলে অর্থে রাসু।

রাসুর মা এদিক ওদিক তাকিয়ে ফিসফিস করে বলে, "দেখে এলাম চণ্ডীমণ্ডপে শুয়েছি।"

'তা হোক, তুই আমার নাম করে ডেকে নিয়ে আয়।'

ঘরের দরজার কাছাকাছি গিয়েই মায়ের ডাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল সত্যবতীকে, আর সারদার বুকটা কী এক আশার আশঙ্কায় চমকে উঠেই শীতকালের পানাপুকুরের জলের মত ঠাণ্ডা নিথর হয়ে গেল।

অভ্যস্ত উচ্চারণে মেয়ের নাম ধরে ডাক দেয় নি ভুবনেশ্বরী, ব্যস্ত অথচ চাপা গলায় বলে উঠেছে "এই, তুই ইদিকে আয়।"

'তুই' অর্থেই সত্য!

আর বিশেষ করে সত্যকেই হঠাৎ চাপা গলায় ডাক দিয়ে সরিয়ে নেবার অর্থ কি? অর্থ আছে, এরকম ডাকের একটাই অর্থ হয়। আর সে অর্থ সত্যর কাছে ধরা না পড়লেও সারদার [illegible]ছ যেন ধরা পড়েছে। তাই না

বুকটা হঠাৎ এমন হিম হিম নিথর হয়ে গেল। তাই না আশার আশঙ্কায় চমকে উঠল সে বুক।

সারদা জানে, সারদার মনে আছে।

ছেলেবেলায় সারদা যখন নিঃশঙ্কচিত্তে তার সদ্য-বিবাহিতা কাকীমার কাছে শোবার বায়না নিয়ে তোড়জোড় করত, তখন ঠিক এমনি চাপা গলায় তার মাও ডাক দিতেন, "ইদিকে আয় বলছি।" তবু বায়না করত সারদা। এখন মনে পড়লে কী হাসিই পায়।

সত্যবতী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "বড়বৌ কি একলা শোবে নাকি? তোমাদের আক্কেলটা তো ভাল!"

ভুবনেশ্বরী হাসি চেপে ভর্ৎসনার সুরে বলেন, "থাম্, তোকে আর সকলের আক্কেল খুঁড়ে খুঁড়ে বেড়াতে হবে না। একলা কেন, অত বড় বেটা ঘরে রয়েছে বড় বৌমার, সে কি কম নাকি?"

"জানি না বাবা, তোমাদের একো সময় একো মতি। ওইটুকুনখানি কচি ছেলে, যার গলা টিপলে দুধ বেরোয়, সে আগলাবে মাকে!"

"তুই আসবি?"

"যাচ্ছি বাবা, যাচ্ছি। তর সয় না একটু, সবাই যেন ঘোড়ায় জিন্ দিয়ে আছে। নাও চল। একটা মনোকষ্টওলা মানুষ এই আঁধারপুরীতে একলা পড়ে থাকবে, এই যখন তোমাদের বিচের তো তাই হোক। কোন্ মুখেই যে তোমরা ধম্মকথা কও, তাও জানি নে বাবা।"

আটহাত শাড়ীখানার হাততিনেক অংশমাত্র কাজে লাগিয়ে, আর বাকী হাতপাঁচেক বিঁড়ে পাকিয়ে কুক্ষিগত করে নিয়ে মায়ের পিছু পিছু চলল সত্যবতী অনিচ্ছামন্থর গতিতে। সত্যিই তার আজ সারদার কাছে শুতে ইচ্ছে ছিল। প্রধানতঃ সারদার প্রতি সহানুভূতি, দ্বিতীয়ত মনে আশা করছিল, যদি শুয়ে শুয়ে গল্প করতে করতে 'ভয়ঙ্কর' শব্দগুলোর অর্থ উদ্ধার করে নিতে পারে!

শব্দগুলো যে ভাল নয়, বড়দের কাছে প্রশ্ন করলে যে সত্যি উত্তর পাওয়া যাবে না, ঠেলামারা একটা ভুলভাল উত্তরের সঙ্গে হয়তো বা খানিকটা ধমকই জুটবে—এ বিষয়ে যেন নিশ্চিত হয়ে রয়েছে সত্যবতী।

অথচ ভয়ঙ্কর অদম্য একটা কৌতূহল ভিতর থেকে চাড়া দিচ্ছে। শব্দগুলোর অর্থ সংগ্রহ করতে পারলেই যেন অনেক রহস্যের ঘরের চাবি খোলা

যায়। অন্ততঃ শঙ্করী কেন চব্বিশ ঘণ্টা 'মরব মরব' করে, আর বাড়ির সকলে কেন তার প্রতি এককড়া সদ্ব্যবহার করে না, এটুকু যেন ওর থেকেই ধরা যাবে।

কিন্তু সকল গুড়ে বালি দিল মা।

তা নতুন কিছুও নয় অবিশ্যি। জন্মাবধি তো এই দেখে আসছে সত্যবতী, বড়দের কাজই হচ্ছে ছোটদের সকল ইচ্ছের গুড়ে বালি দেওয়া।

দীনতারিণীর ঘরে বাড়ির সব কটা 'সোমত্ত' মেয়ের শোবার ব্যবস্থা। ঘরটা প্রকাণ্ড বড় বলেও বটে, তা ছাড়া বড় বড় মেয়েরা এখান ওখান ছড়িয়ে থাকে এটা বিধি নয়। এই 'বয়স্থা' মেয়েদের মধ্যে ন বছরের সত্যবতীই সব চেয়ে বড়, আর তার বিয়েও হয়ে গেছে, তাই সে হচ্ছে দলনেত্রী। পুণ্যি রাজু নেড়ী টেঁপি পুঁটি রাখালী, সকলেই তাকে ওপর-ওলার সম্মানটা দেয়।

আজ ওরা সত্যর জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সত্য এসে দেখল ঘুমন্ত পুরী! যে যেমন ইচ্ছে হাত পা ছড়িয়ে শুয়েছে, জায়গা বিশেষ নেই, ওর মধ্যেই ওদের হাত-পা ঠেলে ঠুলে জায়গা করে নিতে হবে।

সত্য বিরক্তভাবে আর একবার বলে উঠল, "একদিন অন্তত্তর শুলে যে কী মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত মা মঙ্গলচণ্ডীই জানে।…নে সর্ দিকি, এই পুঁটি, ঠ্যাঙটা একটু গুটো।"

বলা বাহুল্য পুঁটির সুপ্তির গভীরতায় এ স্বর পৌঁছল না, অগত্যাই সত্যবতী বাক্যবলের সাহায্য ছেড়ে বাহুবলের শরণ নিল। পুঁটির পা আর রাখালীর হাত সরিয়ে নিজের মতন একটু জায়গা করে শুয়ে পড়ল বিছানায়। দীনতারিণী এখনো আসেন নি, তাঁর শুতে আসতে দেরি হয়। বিধবাদের দিকের রাতের জলপান চালভাজা তিলের নাড়ুকে বুড়ো দাঁতে জব্দ করতে সময় লাগে।

ঠাকুমার বিছানাটা ঠিক আছে কিনা একবার দেখে নিল সত্যবতী। আছে বটে একফালি ঠাঁই। অবিশ্যি বিছানা আর কি, ঘরজোড়া একখানা শতরঞ্চির উপর বড় বড় মোটা মোটা খানকয়েক কাঁথা পাতা; আর তারই মাথার দিকে দেয়াল-জোড়া টানা লম্বা মাথার বালিশ।

একসঙ্গে যাতে সারি সারি অনেকগুলো মাথা ধরানো যায় তার জন্যেই এই অভিনব মাথার বালিশের আয়োজন। এক-একটা বালিশ বোধ হয় লম্বায় চার হাত, আর ওজনে আধ মণ, যারা শোয় তারা নিজেরা তাকে এক

ইঞ্চিও নড়াতে পারে না। নিজের বালিশকে নিজের ঘাড়ের তলায় ইচ্ছেমত ভঙ্গীতে রাখতে পারার সুখ ওরা জানে না।

বালিশগুলো যে শুধু মাপেই বড় বলে ভারী তাও তো নয়, তুলোগুলোও যে পুরনো। জিনিস যত সস্তাই হোক, আর যত বেশীই প্রাচুর্য থাক—অপচয় করার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। তাই কর্তাদের বড় বড় তাকিয়াগুলো ছিঁড়ে গেলে যখন তাঁদের জন্যে নতুন 'খেরো' দিয়ে নতুন তুলোর তাকিয়া বানানো হয়, তখন পুরনো তুলো আর ছেঁড়া খেরোগুলো কাজে লাগানো হয় বাড়ির নাবালকদের জন্যে।

সব বাড়িতেই একই ব্যবস্থা। ছেলেপুলে কাচ্চা-বাচ্চা ছাড়া সংসারের যত ওঁচা মালের গতি হবে কাদের উপর দিয়ে? তবু তো কবরেজ বাড়ির অবস্থা উত্তম। বাৎসরিক বৃত্তি দিয়ে সাজো-ধোবা ঠিক করা আছে, নিয়মিত সব ফর্সা করে দিয়ে যায় সে। মানে আর কি, কেচে শুকিয়ে পাট করে দিয়ে যায় কি আর? 'কাচা'র পুকুরে কেচে ভিজে কাপড়-চোপড়ের 'ডাঁই' খিড়কির পুকুরের পৈঠেয় নামিয়ে রেখে যায়। তার পর তো আছেন মোক্ষদা। ভাল পুকুরের জল দিয়ে শুদ্ধ করে সেই ভিজের বস্তা রোদে মেলে দেওয়ার দায়িত্ব তাঁর! তার পর আছে বৌ-ঝিরা। শিবজায়ার ছেলের বৌরা, কুঞ্জর বৌ, ভুবনেশ্বরী, পরবর্তী ডিউটি এসে পড়ে এদের ওপর।

নিত্যি বিছানা কাঁথার ওয়াড় খোলা আর ওয়াড় পরানো কম ঝামেলার ব্যাপার নয়, কিন্তু রামকালীর যে ধোবার উপর এবং সংসার পরিচালিকাদের উপর কড়া হুকুম দেওয়া আছে, অন্তত মাসে দু ক্ষেপ সব সাফ করতে।

আজই বোধ হয় সব সদ্য কাচা। কলা-বাসনার ক্ষার আর সাজিমাটির গন্ধ ছাড়ছে। সত্যবতী নাকে কাপড় দিয়ে শুয়েছে, এই গন্ধটা তার ভারী বিশ্রী লাগে। ও শুয়ে শুয়ে ভাবে, এই বিচ্ছিরি গন্ধটা বাদ দিয়ে কাপড় কাচা যায় না? ওটা ভাবতে ভাবতে আরও অন্য ভাবনায় চলে গেল সত্যবতী।...

বড়বৌ তো একা শুলো, মাঝরাতে উঠে যদি জলে ডুবতে যায়? বৌটা তো যাবেই, বাবাকে কি জবাব দেবে সত্য? তারপর গিয়ে রাত পোহালেই বাড়ি কুটুমে ছেয়ে যাবে, তার মাঝখানে সেই বড়বৌয়ের ডুবে মরার ল্যাঠা! আচ্ছা বিপদ হল বটে।

নাঃ, নিশ্চিন্দি থাকা চলে না, বেশী রাতে বাড়ি নিঃসাড় নিশ্চুপ হয়ে গেলে

উঠে গিয়ে দেখে আসতে হবে বড়বৌকে। সব চেয়ে ভাল হয় ওর ঘরটায় বাইরে থেকে শেকল তুলে দিলে, নইলে কবার আর দেখতে যাওয়া যাবে? কোন ফাঁকে যদি উঠে গিয়ে সর্বনাশ ঘটিয়ে বসে থাকে বড়বৌ?

দরজার মাথায় শেকল, সত্যবতীর হাত পৌঁছয় না, কিসের ওপর উঠে শেকলে হাত পাওয়া যায় তাই ভাবতে থাকে সে।

ঢিপ্ ঢিপ করা বুকটা নিয়ে সারদা ঘরে ঢোকে। সারদার আহারকালীন অবকাশে ছেলে কেঁদে ভুবনেশ্বরীকে জ্বালাতন করেছিল কিনা জিজ্ঞেস করতেও পারে না। ভুবনেশ্বরীই নিজে থেকে বলে, "নিঃসাড়ে গিয়ে শুয়ে পড় তো বড়বৌমা, ছেলে সবে ঘুমিয়েছে, জেগে না যায়। শেওরে কাজললতা দিয়ে শুইয়ে রেখে এসেছি।"

রাসুকে ডাকিয়ে এনে ঘরে পুরে দেওয়া পর্যন্ত স্বস্তি ছিল না ভুবনেশ্বরীর। কি জানি যদি অন্ধকারে ঠাহর করতে না পেরে 'কে কে' করে চেঁচিয়ে ওঠে সারদা।

এদিকে আবার রাসুকে বলতে পারে না যে "ঘরের পিদিম নিভিও না", কারণ ছেলেকে শোবার ঘরে পুরে দিয়ে আর তার সঙ্গে কথা কইতে মায়েরই লজ্জা লাগে। এ তো ভাসুরপো! আর সারদাকেই বা স্পষ্টাস্পষ্টি বলা যায় কি করে, "ওগো তোমার জন্যে ঘরের মধ্যে মানিক আনিয়ে রেখেছি!" বলা যায় না বলেই কচি ছেলের ছুতো।

তা ছাড়া আর একটু কারণও কি ছিল না? একটু কৌতুকের সাধ? হলেও শাশুড়ী সম্পর্ক, তবু তো মেয়েমানুষ! আর বাবা রামকালীর ঘরনা হলেও ভুবনেশ্বরী যেন এখনও ভিতরে ভিতরে কোথায় একটু কাঁচা একটু সবুজ রয়ে গেছে।

'মানিকে'র উপমাটা ভুবনেশ্বরীরই মনে এসেছে। নিত্যকার মানুষটাই যে আজ সারদার কাছে পরম মূল্যবান হয়ে উঠেছে, একথা বোঝবার ক্ষমতা ভুবনেশ্বরীর আছে। দেখা যাক বড়বৌমা কতটুকু করায়ত্ত রাখতে পারে স্বামীকে। অবিশ্যি ভরসা কিছু নেই, বেটাছেলের মন, নতুন বৌ ডাগরটি হয়ে উঠতে উঠতে সারদাও কোন্ না ততদিনে তিন ছেলের মা হয়ে বসবে! তখন কি আর রাসু নতুন ফুলের মধু ফেলে—

ভাবতে গিয়ে চমকে গেল ভুবনেশ্বরী। মনে মনে নাক-কান মললো। রাসু না তার পুত্রস্থানীয়! তার সম্পর্কে এসব কথা কি বলে ভাবছে সে! সম্পর্কের মান-মর্যাদা আর থাকছে কি করে তা হলে!

ওদের সম্পর্কে সব ভাবনা জোর করে মুছে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল ভুবনেশ্বরী। এবার তাদের দলের খাবার পালা। তবে আজ আর খাবার পরে ঘুম নয়, রাত জেগে কালকের যজ্ঞির কুটনোবাটনা করতে হবে। বড়লোকের বাড়ির বৌ বলে তো আর আয়েস করবার হুকুম নেই! বৌ হচ্ছে বৌ। বরং রাসুর মা দু দণ্ড পা ছড়িয়ে বসলে কি কাজে গাফিলি করলে কেউ কিছু বলবে না, কিন্তু বৌদের সে রকম আচরণ অমার্জনীয়!

তা খাটুনিতেও দুঃখ ছিল না, যদি শুধু নিজেরা জা-ননদের দল থাকতে পায় সে দলে। হাতের সঙ্গে গল্পগাছাও চলে তা হলে। কিন্তু তা তো হবার জো নেই, একজন গিন্নী পাহারাদার থাকেনই।

বৌরা 'ঘরভাঙানি' মন্ত্রণা করছে কিনা সেটা তো দেখতে হবে তাঁদের! ওই গুরু কর্তব্যের দায়ে বেচারা শিবজায়াকে যে মরতে মরতে রাত জেগে ছেলে-বৌয়ের ঘরের পিছনের ঘুলঘুলির নিচে কান পেতে বসে থাকতে হয়।

সারদার ঘরে অবশ্য ঘুলঘুলি নেই। ভাল জানলা আছে। বাড়ির মধ্যে সব সেরা ঘরটাই সারদার। বর্ধমান থেকে মিস্ত্রী আনিয়ে রামকালী যখন অনেক খরচা করে দক্ষিণের উঠোনে এই ঘরদালান বানিয়েছিলেন, তখন সকলেই ভেবেছিল এটা রামকালীর নিজের জন্যেই। মিস্ত্রীর কাজ শেষ হয়ে গেলে দীনতারিণীও তাই বলেছিলেন, "একটা শুভদিন ছাখ তা হলে রামকালী, নতুন ঘরে ওঠবার।"

রামকালী হেসে উঠে বলেছিলেন, "তোমার যে দেখছি গাছে না উঠতেই এক কাঁদি গো মা! ঘরে যে উঠবে, সে আসুক আগে?"

দীনতারিণী অবাক হয়ে বলেছিলেন, "কে আসবে? কার কথা বলছিস?"

"ঘরের লক্ষ্মীর কথাই বলছি মা", রামকালী বোধ করি মায়ের হৃদ্গত ধারণা অনুমান করেছিলেন, তাই একেবারে মায়ের ধারণা-বৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করে পরম শান্তভাবে কথা শেষ করেছিলেন, "কেন, তুমি কি শোন নি রাসুর বিয়ের কথা চলছে!"

রাসুর! রাসুর বৌ এসে ওই ঘরের দখলীদার হবে!

দীনতারিণীর সতীনপোর ছেলের বৌ! দীনতারিণী আর আত্মসংবরণ করতে পারেন নি, বিরক্তভাবে বলে উঠেছিলেন, "অজ্ঞানের মত কথা বলো না রামকালী। ওই সেরা ঘরখানা তুমি রাসুকে দেবে!"

রামকালী আর হাসেন নি, গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, "দেওয়া-দিইর কথা কিছু নেই মা, যার যা ন্যায্য প্রাপ্য সে তা পাবে।"

দীনতারিণী তথাপি, ছেলের ক্রোধাশঙ্কা তুচ্ছ করেও, মনের উষ্মা প্রকাশ না করে পারেন নি, বলে ফেলেছিলেন, "তুমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপায় করছ, 'হীরে হেন জিরে' এনে নবাবী পছন্দের ঘর গড়লে, সে দ্রব্যি কুঞ্জর বেটা-বৌয়ের প্রাপ্য হল কোন্ সুবাদে রামকালী।"

না, রামকালী প্রত্যক্ষে তিরস্কার করেন নি মাকে, বরং আরও শান্তকণ্ঠে বলেছিলেন, "যে সুবাদে মানুষ বনের জন্তু-জানোয়ারদের মতন উদোম হয়ে না বেড়িয়ে কোমরে কাপড় দিচ্ছে মা! যাক্ গে, ওকথা থাক্, 'জ্যেষ্ঠর শ্রেষ্ঠ ভাগ' এ বিধিটা তো তোমার অজানা নয় মা! রাসু এ বাড়ির জ্যেষ্ঠ ছেলে।"

দীনতারিণীর, চোখে জল এসে গিয়েছিল, দুঃখে অপমান-বোধে, তাই শেষ-বেশ তর্কে বলে বসেছিলেন, "মেজ বৌমার প্রাণটার দিকেও তো তাকাতে হয়! যতই হোক সে এখনও কাঁচা ছেলে, এই ঘর আরম্ভ হয়ে ইস্তক তার একটা আশা ছিল তো!"

রামকালী এবার আর একটু হেসেছিলেন, "তোমার মেজ বৌমার যদি এমন ইল্লুতে আশা হয়েই থেকে থাকে তো সে আশায় ছাই পড়াই উচিত মা।"

"ছাই পড়াই উচিত?"

আঁচল দিয়ে চোখ মুছেছিলেন দীনতারিণী। মেজ বৌমার আশাভঙ্গের কল্পনায় যত না হোক, নিজেরই আশাভঙ্গে। কুঞ্জ যে জন্মভোর গায়ে হাওয়া দিয়ে বেড়িয়ে, সংসারের সব কিছুর সেরাভাগটা ভোগ করে, এটা কি চিরকাল সহ্য হয়? দীনতারিণীর আশা ছিল, এই ঘরখানার ব্যাপারে অন্ততঃ কুঞ্জ কুঞ্জর বৌয়ের মুখটা ছোট হবে। সেই আশায় ছাই পড়ল। তাই কেঁদে ফেলে বললেন, "ছাই পড়াই উচিত?"

"উচিত বৈকি! ভবিষ্যতে তা হলে আর কখনও এমন বেয়াড়া আশা জন্মাতে পাবে না!"

এর পর দীনতারিণী নীরবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিলেন চন্দননগর থেকে ছুতোর এসে ঢুকল সেই ঘরে! হ্যাঁ, জোড়াপালঙ্ক বানাতে হলে ঘরের মধ্যে বসেই বানাতে হয়, বাইরে থেকে গড়ে এনে লাগিয়ে দেওয়ার রীতি তখনও হয় নি।

বহুবিধ কারুকার্য-করা পালঙ্ক!

ওর জন্যে চন্দননগরের ছুতোরদের ভাত যোগাতে হয়েছিল মাস দেড়েক ধরে। খেয়ে, মজুরি নিয়ে আর নতুন কাপড়ের জোড়া বখশিশ আদায় করে ছুতোররা চলে গেল, তার পরই বিয়ে হল রাম্বর। নতুন পালঙ্কে ফুলশয্যে হল!

সেই পালঙ্ক ছেড়ে সারাদিন আজ মাটিতে পড়ে ছিল সারদা। এখনও খুড়শাশুড়ীর নির্দেশমত নিঃসাড়ে ঘরে ঢুকে হুড়কোটা লাগিয়েই ছেলের তল্লাস মাত্র না করে ঝুপ করে শুয়ে পড়ল মাটিতেই।

ঘরে ঢুকে না তাকিয়েও টের পেয়েছিল সারদা তার আশার আশঙ্কাটা মিথ্যে নয়। আঘ্রাণে, অনুমানে, হৃৎস্পন্দনে বুঝিয়ে দিয়েছিল সারদাকে—ঘরে তোমার সাতরাজার ধন মানিক।

এ যেন আবার নতুন বিয়ের নতুন বর। দ্বিরাগমনে এসে প্রথম রাত্তিরে যখন পাঁচটা সমবয়সী মিলে সারদাকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজায় শিকল লাগিয়ে পালিয়েছিল, তখন এমনি বুকটা ধড়াস ধড়াস করেছিল সারদার। তবু তো তখন মাত্র বারো বছর বয়েস! আর এখন যোলো। যোড়শীর হৃদয় তো আলোড়নে আরোই উত্তাল হবে।

ঘরে যে অপরাধী আসামী অবস্থান করছিল তার অবস্থাও অবশ্য সারদার চাইতে কিছু উন্নত নয়। তার বুকের মধ্যেও হাতুড়ি পিটছে। জীবনে আর কখনও সারদার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে, এ আশা বুঝি ছিল না রাম্বর। সারাদিন শুধু ভেবেছে জীবনের সমস্ত আনন্দ-আহ্লাদের সমাধি হয়ে গেল তার।

মেজ খুড়ী কেন অন্দরে ডাকিয়ে পাঠিয়েছিল, তাও ঠিক বুঝতে পারে নি। ভেবেছিল আবার কোন নিয়ম লক্ষণের পাকচক্রে পড়তে হবে এসে, কিন্তু এসে যা শুনল অভিনব।

সারদা নাকি রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত, আর ভুবনেশ্বরীরও কাজের তাড়া,

ভাঁড়ারের দিকে না গেলেই নয়, তাই 'ঘুমন্ত' খোকাকে একটু আগলাতে হবে রাসুকে!

কিছুই নয়, শুধু ঘরে একটু থাকা!

বোকা রাসু তখনও কিছু সন্দেহ করে নি। শুধু একটু তাজ্জব বনে গিয়েছিল প্রস্তাবে। দেশসুদ্ধ লোক থাকতে কিনা ছেলে আগলাবার জন্যে রাসুকে ডাকিয়ে আনা হল বার-বাড়ি থেকে? আশ্চর্য নয় তো কি? যে রাখুর মা ডাকতে গিয়েছিল সেই তো পারত কাজটা! করেই তো বরাবর তাই। তবু কিছু বলতেও পারে নি। না প্রতিবাদ, না প্রশ্ন। নতুন বৌয়ের ব্যাপারে যতটা লজ্জা, ঠিক ততটাই লজ্জা তো নতুন ছেলের বিষয়েও।

সুড় সুড় করে তাই ঘরে ঢুকেছিল রাসু। আর ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই বুকের মধ্যে সন্দেহের হাতুড়ি পড়েছিল।

মেজখুড়ীর এই ডাকিয়ে আনাটা ছল নয় তো? মেজখুড়ীকে তো এমনিতেই খুব ভালবাসে রাসু, এবার যেন ইচ্ছে হল পুজো করে তাঁকে। ফস করে প্রদীপটা নিভিয়ে দিয়ে কাঠ হয়ে বসে ভাবতে লাগল।

সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে খেয়াল করল ঘরে খিল পড়েছে, আর পরমুহূর্ত থেকেই অনুভব করল, বাতাসহীন ঘরের চাপা গুমোটটা যেন একটা চাপা কান্নার ধাক্কায় কেঁপে কেঁপে উঠছে।

টপটপ করে দু ফোঁটা জল পড়ল রাসুর চোখ থেকে। পুরুষ মানুষ? তা হোক, মানুষ তো বটে!

ধড়মড় করে উঠে বসল সারদা। একটা বলিষ্ঠ আবেষ্টন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে, রুদ্ধকণ্ঠে বলল, "আর কেন? আর কেন?"

আর কিছু বলতে পারল না। চোখ দুটো বিশ্বাসঘাতকতা করে বসেছে। সারাদিন ধরে প্রতিজ্ঞা করেছিল যদি কখনও সেই নিষ্ঠুরটার সঙ্গে দেখা হয়, কাঁদবে না মুখ মলিন করবে না। পরন্তু পরের মত উদাসীন থাকবে। কিন্তু পরিস্থিতিটা সমস্তই গোলমাল করে দিল।

তাই কি দু-চার ফোঁটা?

একেবারে ধারার শ্রাবণ!

একে কি করে রোধ করবে সারদা ? কোন্ বাঁধ দিয়ে ঠেকাবে ?

"বড়বৌ !"

এতটুকু শব্দের মধ্যে কত মিনতি কত আবেদন !

কিন্তু এই করুণ মিনতি ভরা ডাকেই বা সাড়া দিচ্ছে কে ?

"বড়বৌ, আমার কি দোষ ? আমার ওপর বিরূপ হচ্ছ কেন ? বুঝতে পারছ না আমার প্রাণটাও গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে !"

ধারা শ্রাবণে বন্যা এল।

"থাক থাক্, আর মন-মজানে মিছে কথায় কাজ নেই। পুরুষের প্রাণে আবার দরদ !

"বড়বৌ, এই আমার মাথা খাও, বিশ্বাস কর তোমার মতনই জলে পুড়ে খাক হচ্ছি আমি। তুমি যে আমাকে বিশ্বাসঘাতক ভাবছ, এ কষ্ট আমি রাখব কোথায় ?"

"রাখবার দরকার কি ? সারদা কান্না সামলে কঠোর হবার চেষ্টা করে, "কাল তোমার নতুন ফুলশয্যে, নতুন সুখ, আজ আবার এত দুঃখু-কষ্টর পালা গাইবার কি আছে ?"

"বড়বৌ বল কি করলে তুমি আমায় বিশ্বাস করবে ?"

বলিষ্ঠ আবেষ্টনের চাপটা যেন পিষে ফেলতে চাইছে সারদাকে, কি করে আর কঠিন থাকবে সারদা ? তবু শেষ চেষ্টা করে, "আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কি এসে যাচ্ছে তোমার ? ছেলের মা বুড়ীকে ছেড়ে এখন কচি তালশাঁস—"

"বড়বৌ, তুমি এমন ব্যাভার করলে, আমার আপ্তঘাতী হওয়া ছাড়া আর উপায় থাকবে না তা বলে দিচ্ছি—" রাসুও কঠিন হতে জানে, তাই বাঁধন আলগা দিয়ে বলে, "এই চললাম মেজকাকার ওষুধের ঘরে। তাজা গোখরো সাপের বিষ সঞ্চয় আছে। কোথায় আছে তাও আমার জানা। এর পর কিন্তু বিধবা হলে দোষ দিও না আমায় !"

বিধবা !

বুকটা থর থর করে ওঠে সারদার। বরং একশটা সতীন নিয়ে ঘর করবে সারদা। বিধবা হওয়ার মত অভিশাপ আর কি আছে ? কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে বলাই বা যায় কি ?

"তা হলে চললাম ! এই জন্মের শোধ দেখা।" বলে রাসু দরজার কাছে

এগোয়, আশা এই যে এবার সারদা মাথা খাওয়ার অনুরোধ জানাবে, কিন্তু সারদা যেন অনড়।

"ভেবেছিলাম ওকে চিরদিনের মতন ত্যাগ দিয়েই রাখব, তুমি আমার যে প্রাণেশ্বরী সেই প্রাণেশ্বরীই থাকবে—" স্বগত উচ্চারণে আক্ষেপ প্রকাশ করে দরজার হুড়কোয় হাত লাগায় রাসু, "কিন্তু তুমি পতিহন্ত্রী হয়ে নিজের পায়ে কুড়ুল মারলে বড়বৌ!"

হুড়কোটা খুলে পাশে রাখল রাসু।

এবার সারদা কথা বলল, কিন্তু এ কী কথা! এই কি প্রেমে পাগলিনী অবলা বালার ভাষা?

রুদ্ধকণ্ঠে সারদা বলে উঠেছে, "ঘরের পরিবারের সঙ্গে যাত্রা-গানের মতন কান্নার সুরে কথা কইছ কেন? হুড়কো খুলে বেরিয়ে গেলেই বুঝি খুব পৌরুষ হবে? তোমার গোখরো বিষ আছে, আর আমার দড়ি-কলসী নেই?"

"তোমার প্রাণটা পাথরে গড়া বড়বৌ! মেজকাকা যখন আমার গলায় গামছা মোড়া দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে গেল, তখন তাঁর সামনে গিয়ে বলতে পারলে না, 'আমারও দড়ি কলসী আছে!' ঠিক আছে, সবাইকে এবার দেখিয়ে দিচ্ছি—ভালমানুষ রাসু কি করতে পারে।"

এই প্রকাণ্ড বীররসের ভূমিকাটি অভিনয় করে কপাটটা ধরে হ্যাঁচকা টান মারল রাসু, কিন্তু টানার সঙ্গে সঙ্গেই পরিস্থিতিটা বুঝতে দেরি হল না, দরজার বাইরে শেকল। এ কাজ কে করল?

মেজখুড়ী?

কিন্তু তাঁর পক্ষে কি এ ধরনের চপল রসিকতা সম্ভব? অথচ তা ছাড়া আর কে? রাসু যে বাড়ির মধ্যে এসেছে, তাই তো কেউ দেখে নি। মেজখুড়ীই তো আজকের নাটকের নাট্যকার।

"বাইরে থেকে বন্ধ!"

একটা বিপন্ন স্বর আস্তে ঘরে ছড়িয়ে পড়ল।

"বন্ধ!"

সারদারও এতক্ষণকার নীরবতা ভঙ্গ হল, বিস্ময়ে ভয়ে।

"তাই তো দেখছি—" রাসুর কণ্ঠে ব্যাকুলতা, "এখন উপায়? যদি সকাল পর্যন্ত বন্ধ থাকে? বড় বৌ কি হবে?"

সহসা অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটে।

একেবারে অভাবিত অপ্রত্যাশিত! হয়তো বা সারদা নিজেও এক মুহূর্ত আগে এটা কল্পনা করতে পারত না! ভাবতে পারত না তার কান্নায় বুজে আসা কণ্ঠ সহসা অমন কৌতুকের লীলায় হেসে উঠবে। সে হাসির শব্দ চাপা বটে তবু রহস্যে উচ্ছ্বসিত।

তা এই ধরনেরই স্বভাব বটে সারদার, নিতান্ত দুঃখের সময়ও হাসির কথা হলে হেসে ফেলা। কিন্তু আজকের কথা যে আলাদা। আজ সারদার মরণ-বাঁচনের সমস্যা। আজ কান্নায় গলা বুজে রয়েছিল সারদার। তবু রাসুর এই বিপন্ন বিপর্যস্ত কণ্ঠ তাকে কী যে কৌতুকের যোগান দিল, উচ্ছ্বসিত রহস্যে হেসে উঠল সে। হেসে উঠে বলল, "কী আর হবে! দায়ে পড়ে মশাইকে এখন পরনারীর সঙ্গে রাত কাটাতে হবে।"

রাসু চমকে গেছে, থমকে পড়েছে। তবে কি এতক্ষণ ছলনা করছিল সারদা? সতীন হওয়ায় তেমন কিছু লাগে নি তার? এ হাসি এ কথা তো রীতিমত প্রশ্রয়ের।

অতএব দরজা নিয়ে মাথা পরে ঘামালেও চলবে, এখন এদিকের ঘাঁটি সামলে নেওয়া যাক।

খোলা হুড়কো আবার দরজায় উঠল।

অনাদৃত পালঙ্কের বিছানা আবার স্পর্শের উষ্ণতা পেল।

না, একেবারে সহজে ধরা দেবে না সারদা। সে সত্যবদ্ধ করিয়ে নেবে স্বামীকে।

"থাক, আমাকে স্পশ্য করতে হবে না, আগে মা সিংহবাহিনীর নামে দিব্যি কর, আমি বেঁচে থাকতে ছুটকিকে ছোঁবে না?"

রাসুর বুকটা কেঁপে ওঠে।

শপথটা যে মারাত্মক। ভয়ে ভয়ে বলে, "সিংহবাহিনীর নামে দিব্যি করা কি ভাল বড়বৌ?"

"মনে পাপ থাকলে ভাল নয়। একমন একপ্রাণ থাকলে ভয়ের কি আছে?"

"তবু, ঠাকুর-দেবতা বলে কথা।"

"বেশ তো, আমি তো তোমায় সাধি নি। নাই বা আর স্পশ্য করলে আমার!"

হায় মা সিংহবাহিনী, এমন ঘোরতর বিপদে তোমার গ্রামের আর কেউ কখনও পড়েছে ?

একদিকে—একখানি অপরাধ-বোধের ভারে পীড়িত আর নতুন আশায় উদ্বেল ব্যাকুল হৃদয় আর অপরদিকে এক অনমনীয়া পাষাণী।

তবে কি হাসিটাই ছল ?

তাই সম্ভব, নইলে দিব্যি গুছিয়ে ছেলের কাছ ঘেঁষে শোবার আয়োজন করছে কেন সারদা ?

"বড়বৌ!"

"আঃ, কেন জ্বালাতন করছ ?" সারদার বুকে পরম ভরসা দরজার বাইরে শেকল লাগানো, রাগ করে ছিটকে বেরিয়ে যাবার উপায় নেই রাম্বুর।

আঃ, কে সেই দেবী, যে রাম্বুকে এমন করে বন্দী করে ধরে দিয়েছে সারদার কাছে ? স্বয়ং মা সিংহবাহিনীই নয় তো ?

"তা হলে তোমার দয়া হবে না ?"

"সোয়ামী, গুরুজন, তুমি আবার দয়ার কথা তুলছ কেন গো ? পরিবারই হল গিয়ে কেনা দাসী।"

"আচ্ছা বেশ, করছি দিব্যি। হল তো ?"

"কই করলে ?"

"মনে মনে করেছি।"

"মনে মনে ? হুঁ! মনের কথা বনে যায়। মুখে বল।"

"বেশ বেশ, এই বলছি, তুমি ছাড়া আর কাউকে ছোঁব না সিংহবাহিনী সাক্ষী।"

"আমি ছাড়া নয়, আমি বেঁচে থাকতে—"

এটুকু অনুগ্রহ করে সারদা।

"ওই হল। কে আগে যায় কে পরে যায় বলা যায় কি ?"

"আমার কুষ্ঠিতে আছে সধবা মরব।" সারদা আত্মপ্রসাদের হাসি হাসে, "কিন্তু মনে থাকে যেন মা সিংহবাহিনী সাক্ষী।"

"থাকবে থাকবে।"

কিন্তু সত্যিই কি মনে ছিল ?

রাম্বু কি শেষ অবধি মা সিংহবাহিনীর মর্যাদা রাখতে পেরেছিল ?

পুরুষ মানুষ কি তাই পারে ?

রামুর মত মেরুদণ্ডহীন পুরুষ ?

তবু এমনি মিথ্যে শপথের চোরাবালির উপরই তো ঘর বাঁধতে হয় মেয়েমানুষকে।

তেরো

যজ্ঞির জন্যে ছানাবড়া ভাজা হচ্ছে। ভিয়েনের 'চালা'য় বড় বড় কাঠের উনুন জ্বেলে কারিগররা লেগে গেছে ভোর থেকে। প্রথমে বোঁদে ভেজে স্তূপাকার করে রেখেছে কাঠের বারকোশে বারকোশে, এখন শুরু হয়েছে ছানাবড়া! প্রচুর পরিমাণে না করলেও চলবে না, নিমন্ত্রিতদের পেট উপচে খাওয়ানোর পর আবার সরাভর্তি ছাঁদা দিতে হবে তো ? তা ছাড়া—যখন কুল্লে ওই দু-রকম মিষ্টি।

তাড়াহুড়োর যজ্ঞি, ওর বেশী আর সম্ভব হল না, অথবা সেটাও হয়তো ঠিক কথা নয়, একটা মোটামুটি কথা মাত্র। রামকালী চাটুয্যে যদি দরকার বুঝতেন, তা হলে এই একদিনের মধ্যেই কাটোয়া কি গুপ্তিপাড়া থেকে ওস্তাদ ময়রা আনিয়ে পাঁচ-সাত রকম মিষ্টি বানিয়ে তোলাও অসম্ভব হত না তাঁর পক্ষে। কিন্তু দরকার বোধ করেন নি তিনি।

রামুর প্রথম বিয়েতে ঘটা হয়েছিল বিস্তর, গ্রামে এখনও তার গল্প ফুরোয় নি। মিষ্টির কারিগর এসেছিল নাটোর থেকে, কেষ্টনগর থেকে, মুড়োগাছা থেকে। কাঁচাগোল্লা ক্ষীরমোহন মতিচুর সরভাজা ছানার জিলিপি খাজা অমৃত্তি নিখুঁতি ইত্যাদি করে বারো-তেরো রকম মিষ্টি হয়েছিল। আর মাছের কথা তো বলেই শেষ হবে না। এক-একজনের পাতে বড় বড় এক-একটা মালসা ভর্তি মাছের তরকারি বসিয়ে দিয়ে আবার তিন-চারবার করে পরিবেশন। তা ভিন্ন রান্নার পদ তো বাহান্ন রকম, বাহান্ন ব্যঞ্জন নইলে আবার ঘটা কিসের ?

কুমোর-বাড়ি বরাত দিয়ে সাইজের হাঁড়ি গড়িয়ে আনা হয়েছিল ঝোড়া ঝোড়া, তাতেই গলা উপচে মিষ্টির ছাঁদা। যজ্ঞির জের চলেছিল দিন পনেরো ধরে।

সে কথা আলাদা। সে বিয়ের সঙ্গে এ বিয়ের তুলনা করার কোনও মানেই হয় না। অন্য বাড়ি হলে যজ্ঞিই করত না, নেহাত রামকালী চাটুয্যের বাড়ি বলেই এত আয়োজন। পরিমাণে প্রচুরই হচ্ছে, তবে ওই, মাত্র দুরকম মিষ্টি, ষোলো-কুড়ি মত রান্নার পদ। রান্না এখনও চাপে নি, পাশের চালায় তার তোড়জোড় চলছে, হালুইকর ঠাকুররা স্নান করতে গেছে।

এ গ্রামে হালুইকর ঠাকুর এনে রাঁধানোর প্রথা প্রবর্তন করেছেন রামকালীই। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে দেখেছিলেন এ ব্যবস্থা। নইলে এ গ্রামে চিরদিনই কাজেকর্মে গ্রামের ব্রাহ্মণ-কন্যারাই রেঁধে থাকেন। সেটা রীতিমত একটা সম্মান সম্ভ্রমের ব্যাপার। ডাকসাইটে রাঁধুনী বলে খ্যাতি আছে যাঁদের, তাঁদেরই ডাকা হয় অনেক তোয়াজ করে। রান্নায় বসবার আগে 'পূর্ণপাত্র', নতুন কাপড়ের জোড়া, সধবা ব্রাহ্মণী হলে আলতা সিঁদুর এই সব দিয়ে, তবে পাকশালে ঢোকাতে হয় তাঁদের।

তথাপি এই রান্নার পর্ব থেকেই অনেক গদাপর্ব মুষলপর্ব বেধে যায়। গ্রামের যে এক দল ছুতো খুঁজে বেড়ানো লোক আছে, তারাই 'যজ্ঞি' দেখলে দক্ষযজ্ঞের আয়োজন করবার তালে ঘোরে। মনকষাকষি, কথান্তর, মান-অভিমান, এসব প্রায় যজ্ঞিরই অঙ্গ। রামকালী ওসব ঝামেলার মধ্যে নেই। পয়সা দিয়ে লোক আনাবেন, কাজ করাবেন, চুকে গেল। রাঁধুনী বামুনের হাতে খেতে যাদের আপত্তি, তারা যাও বিধবার হেঁসেলে ভর্তি হও গে। মাছ জুটবে না।

তা সে দু-চারজন নিতান্ত নিষ্ঠাপরায়ণ গ্রামবৃদ্ধ ছাড়া 'ন হুঁ করে' সকলেই বসে পড়ে রামকালীর বাড়ির ভোজে। ওস্তাদ কারিগরের রান্নার হাত, রামকালীর দরাজ হাত, আর রামকালীর প্রতি সমীহ-বোধ এই ত্রিশক্তির আকর্ষণে সকলেই প্রায় নরম হয়ে আসে। পয়সা যে এ অঞ্চলে কারুরই নেই তা তো নয়, কিন্তু এমন দরাজ হাত? এত বড় দিলদরিয়া মন?

খাঁটি গাওয়া ঘিয়ে সন্ত কাটানো টাটকা ছানার মিষ্টান্ন ভেজে তোলার সুগন্ধে শুধু আশপাশেরই নয়, সারা গ্রামখানারই বাতাস যেন 'ম-ম' করছে। বাড়ি বাড়ি ছোট ছেলেপুলেদের ঘরে আটকে রাখা দুঃসাধ্য হচ্ছে তাদের অভিভাবকদের।

পায়ে রুপোর বোল্ দেওয়া খড়ম, গায়ে বেনিয়ান, পরনে নেত্রকোণার

খান। সবদিকে চৌকস হয়ে তদারকি করে বেড়াচ্ছেন রামকালী। শুধু মিষ্টির ভিয়েনে শেকড় গেড়ে বসে থাকবার ভারটা দিয়েছেন বড়দা কুঞ্জকে। ওর থেকে বেশী দায়িত্বর কাজ কুঞ্জকে দেওয়া চলে না।

গয়লারা দইয়ের 'ভার' এনে নামিয়েছে, ক' মণ দইয়ের যোগান দিতে পেরেছে তাঁরা, দাঁড়িয়ে তারই হিসেব নিচ্ছিলেন রামকালী, হঠাৎ নেড়ু এসে কাছে দাঁড়াল। রামকালী গ্রাহ্য করতেন না, কিন্তু নেড়ু একেবারে গায়ের কাছে দাঁড়িয়েছে, ভাবটা যেন কিছু বক্তব্য আছে। গয়লাদের উপর চোখ রেখেই রামকালী ওর মাথাটায় একবার হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "কিরে নেড়ু?"

নেড়ু সভয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে আস্তে বলল, "এক বার অন্দরবাড়িতে যেতে বলছে।"

"অন্দরবাড়িতে যেতে বলছে? কাকে বলছে?"

"তোমাকে।"

রামকালী ভুরু কুঁচকে বলেন, "আমাকে এখন যেতে বলছে? পাগলটা কে হল?" অগ্রাহ্যভরে আবার অদূরবর্তী গোয়ালাদের দিকেই মন দেন, "বলিস কি রে তুষ্টু, ওই পাঁচ মণ বৈ দই দিয়ে উঠতে পারছিস না। তা হলে আমার উপায়? তুই ভরসা দিলি—"

তুষ্টু মাথা চুলকে বলে, "আজ্ঞে ভরসা তো দেছলাম, কিন্তু মা ভগবতীরা যে আমাকে নিভ্‌ভর্সা করে ছাড়লেন। কাল রেতে তো আর নিদ্রেই দিই নি, চৌদিকে সকল গোহালার ঘরে ঘরে বরাত দিয়ে দিয়ে বেড়িয়েছি, তা সবাইয়ের ঘরের দই যোগসাজস করে এই হল!"

"এই হল তা তো বুঝলাম, কিন্তু আমার কি হবে তাই বল্? দাঁড়িয়ে অপমান হতে বলিস আমায়?"

"অপমান!" তুষ্ট বীরবিক্রমে বলে ওঠে, "বলি একটা ঘাড়ে বিশটা মাথা কার আছে কবরেজ ঠাকুর যে, আপনাকে অপমান্যি করবে?"

"মাথা এ গাঁয়ের এক-একজনের একশটা করে, বুঝলি রে তুষ্টু।" বলে হাসলেন রামকালী, আর ঠিক সেই সময় নেড়ু আর একবার মিহিগলায় ডাক দিল, "মেজখুড়ো!"

"আরে, এ ছোকরা তো ভাল বিপদ করল! কে তোকে পাঠিয়েছে শুনি?"

"পিসঠাকুমা !"

রামকালী বিরক্ত ভাবে বললেন, "তা আমি বুঝেছি, নইলে আর কার এত—" বোধ করি 'কার এত আক্কেল হবে' বলতে যাচ্ছিলেন, সামলে নিলেন। ছোটদের সামনে গুরুজন সম্পর্কে তাচ্ছিল্যসূচক মন্তব্য করবার মত অসতর্কতা এসেছিল বলে রীতিমত বিরক্ত হলেন নিজের উপর। অথচ মোক্ষদার মত কাণ্ডজ্ঞানহীন গুরুজন সম্পর্কে সকল প্রকার সমীহনীতি মেনে চলাও শক্ত।

অসতর্কতা সামলে নিয়ে বললেন, "বল গে যাও আমার এখন বিস্তর কাজ, তাঁর যা বলবার যখন ভেতরে যাব তখন যেন বলেন।"

"তুমি একথা বলবে পিস্ঠাকমা জানে, তাই আমাকে বলে দিল—" নেড়ু ঢোঁক গিলে বলে, "বলে দিল বল্ গে যা বড় পিসঠাকুমার ভেদবমি হয়েছে, বাঁচে কিনা, এক্ষুনি দরকার।"

ভুরুটা আরও কুঁচকে উঠল রামকালীর। পিসির ভেদবমির দুর্ভাবনায় নয়, মেয়েমানুষের বিবেচনাহীন আবদারের ধৃষ্টতা দেখে। রোগ যে কাশীশ্বরীর হয় নি সেটা নিশ্চিত, তবু অনর্থক হয়রানি করতে ডাকাডাকি। হয়তো বা অভ্যাগত কুটুম্বিনীদের নিয়ে কোনরূপ সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, আর সালিশ মানতে ডাকা হয়েছে রামকালীকে। কিন্তু এই কি তার সময় ?

সাতপাড়া লোক নেমন্তন্ন হয়েছে, একদিনের যোগাড়ে যজ্ঞি, মাথায় পর্বত বয়ে ঘুরছেন রামকালী, তখন কিনা এই সব মেয়েলিপনা।

তা ছাড়া আরও বিরক্তিকর, ছোট ছেলেটাকে মিথ্যে কথায় তালিম দিয়ে পাঠানো। কিন্তু যে রাগিণী মোক্ষদা, নেড়ুকে ফেরত দিলে নির্ঘাত নিজেই এখুনি রণরঙ্গিনী মূর্তিতে বার-উঠোনেই হানা দেবেন, এবং পাঁচ জনের কান বাঁচাবার চেষ্টামাত্র না করে বকাবকি শুরু করবেন। "পয়সার দেমাকে ধরাকে সরা দেখিস নি রামকালী, গুরুজন বলে একটু সমেহা করিস।"—হ্যাঁ, এরকম কথা স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন মোক্ষদা, দ্বিধামাত্র করেন না।

সংসারের এই একটা মানুষকে কিছুতেই এঁটে উঠতে পারলেন না রামকালী। পারতেন, অনায়াসেই পারতেন, যদি সত্যিই রামকালীর গুরুজনে সমীহবোধ না থাকত। গুরুজন হয়েই মোক্ষদা রামকালীকে জব্দ ফেলেছেন।

কিন্তু শুধুই কি গুরুজন বলে জব্দ ?

আরও একজনের কাছেও কি মাঝে মাঝে জব্দ হয়ে পড়েন না রামকালী ? যে মানুষটা নিতান্তই লঘুজন ! হ্যাঁ, মনে মনে স্বীকার না করে পারেন না রামকালী, মাঝে মাঝে সত্যবতীর কাছে জব্দ হতে হয় তাঁকে, হার মানতে হয়। কিন্তু তাতে কি বিরক্তি আসে ?

"মেজখুড়ো !" ছেলেটাও কম নয়। তাই রামকালীর কোঁচকানো ভুরু দেখেও ভয়ে পালিয়ে গেল না, বলল, "পিস্ঠাকুমা তোমায় চুপি চুপি ডেকে নিয়ে যেতে বলল, খুব বিপদ !"

আঃ, এ তো আচ্ছা মুশকিলে ফেলল !

"বিপদটা তো দেখছি আমারই !" বলে রামকালী হাঁক দিলেন, "তুষ্টু, দই সব ভেতর-দালানে তুলে দাও, আর খোঁজ করে দেখ আর কারও ঘরে আরও দু-দশ সের পাওয়া যাবে কিনা।"

"পাওয়া গেলে তো ঠাকুরমশাই, আমি নিজেই—" তুষ্টু মাথা চুলকে একটু ধৃষ্টতা করে বসে, "তা তোমার আজ্ঞে পাঁচ মণই কি কম ? এ তো আর বড় খোকার পেরথম বিয়ে নয়—"

রামকালী ভুরুটা একবার কুঁচকেই মৃদু হাসলেন। বললেন, "কথাটা গয়লার ছেলের মতই বলেছিস তুষ্টু, পেরথম বিয়ে নয় বলে, কুটুম্বজনকে খাওয়াতে বসে অপরিতুষ্ট রাখব ? আচ্ছা তুই ওগুলো তুলে দে গে, আসছি আমি।"

নেড়ুর সঙ্গে সঙ্গে ভিতরবাড়িতে ঢুকলেন রামকালী, মাঝখানে প্রকাণ্ড উঠোনটা পার হয়ে। এই মাঝের উঠোনেই ধানের গোলা মরাই, সারা বছরের জ্বালানী কাঠের মাচা, চালার নিচে জালা জালা বীজধান।

নেড়ু দিগ্বিজয়ীর মত কাশীশ্বরীর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল, কারণ রামকালীকে ডেকে আনার ভার আর কেউ নিতে চায় নি। সত্য পর্যন্ত ঝাড়া জবাব দিয়েছিল, "এই দেখলাম বড় পিস্ঠাক্মা পুকুরে চান্ করে এল, এক্ষুনি আবার কী ব্যামোয় ধরল যে বাবাকে শত কম্মের মধ্যে থেকে ডেকে আনতে যাব ? মানুষটার কি এখন মাথার ঠিক আছে ? ঘরে তো জোয়ানের বড়ি আছে, তাই খেয়ে নাও না।"

"তুই বেরো দজ্জাল হারামজাদী—" বলে মোক্ষদা নেড়ুকে ধরেছিলেন।

কিন্তু নেড়ুদের তো আর গিন্নীদের ঘরে ওঠবার হুকুম নেই, তাই "এই যে ঠাকুমা—" বলে দাঁড়িয়ে পড়ল। নিচু দরজা, রামকালী খড়ম খুলে মাথা নিচু করে ঢুকলেন। আর সমস্ত কৃতজ্ঞতা ভুলে মোক্ষদা "তুই পালা লক্ষ্মীছাড়া ছেলে" বলে নেড়ুকে তাড়া দিয়ে বিদেয় করলেন।

রামকালী দেখলেন কাশীশ্বরী মাটিতে শুয়ে আছেন থানের আঁচলটুকু মুখে চাপা দিয়ে। এটা আবার কি! নিশ্চয় কোন মান-অভিমানের ব্যাপার। বিরক্তি এল, তবু শান্তভাবেই বললেন, "কি ব্যাপার!"

"ব্যাপার বেশ উত্তম—" চাপা গলায় এটুকু জ্ঞানদান করে মোক্ষদা আরও ফিস ফিস করে বললেন, "দুয়োরটা ভেজিয়ে দিয়ে তবে শুনতে হবে!"

রামকালী একবার বাইরে তাকালেন। শুচিবাই মোক্ষদাদের এই দিকটা বাদে সারাবাড়ি লোকে লোকারণ্য, এর মধ্যে কপাট ভেজিয়ে গুপ্তমন্ত্রণা! তিনি তো পাগল হন নি! গম্ভীর গলায় বললেন, "কপাট থাক, কি বলবার আছে বলো।"

কিন্তু বলবার কিছু আর আছে নাকি?

আছে বলবার মত মুখ?

অথচ এত বড় ভয়ানক কথা রামকালীকে না জানিয়ে করবেন কি মুখ্যু দুটো মেয়েমানুষ? হিতাহিত জ্ঞান কি আর কিছু অবশিষ্ট আছে তাঁদের? মোক্ষদার আর কাশীশ্বরীর। শঙ্করী যে কাশীশ্বরীরই নাত-বৌ!

ভয়ঙ্কর খবরটা এখনও পাঁচকান হয় নি, এখনও সংসারের সবাই আপন আপন কাজে হাবুডুবু খাচ্ছে, কিন্তু কতক্ষণ আর অন্যমনস্ক থাকবে লোক? কতক্ষণ আর তাদের কান বাঁচিয়ে রাখা যাবে? তার পর? এক কান থেকে পাঁচ কান, তার পরই তো—লহমায় পাঁচ শ কান। খড়ো চালার পাড়ায় আগুন লাগাও যা, আর একটা বিধবার কলঙ্ক-কেলেঙ্কারি প্রকাশ হয়ে যাওয়াও তা। এ চাল থেকে ও চাল তো, এ মুখ থেকে ও মুখ। হাড়হাবাতে লক্ষ্মীছাড়া মেয়েমানুষটা 'নিডুবি' হবার আর দিন পেল না!

যদি জলে ডুবে নিডুবি হয়ে থাকে তো সেও বরং ভাল কথা, কিন্তু যদি ভরাডুবি করে বসে থাকে?

কাশীশ্বরীর ধারণা তাই। তাই তিনি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে পড়ে

আছেন। আর মর্মে মর্মে অনুভব করছেন, কেন সেই সর্বনাশীর খুড়োখুড়ী ও মেয়েকে ঘরে রাখে নি, উপযাচক হয়ে কাশীশ্বরীর গলায় গছিয়ে গেছে। হায় হায়, কালই তো টের পেয়েছিলেন কাশীশ্বরী, নাপিত-বৌয়ের কথার আঁচে, তবে কেন আবাগীর বেটিকে দুয়ারে তালা লাগিয়ে আটকে রাখেন নি! পাঁচটা কুটুমের কাছে সাফাই গাইতে বললেই হত হঠাৎ মাথাটার কেমন দোষ হয়ে গেছে শঙ্করীর, তাই কাজের বাড়িতে ছেড়ে রাখতে সাহস করেন নি।

মোক্ষদা কিন্তু জলে ডোবার কথাই তোলেন। "কোন্ রাত্তিরে কখন উঠে এ কাজ করেছে কিছু টের পাই নি রামকালী, সকালবেলাও বলি চানে গেছে না কোথায় গেছে। বেলা হতে মাথায় বজ্রাঘাত! আমার থির বিশ্বাস বড় পুকুরে গিয়ে ডুবেছে কপালখাকী। এই বেলা জাল ফেলালে—"

"না!" রামকালী জলদগম্ভীর স্বরে বলেন, "জাল ফেলা হবে না।"

"জাল ফেলা হবে না!"

যন্ত্রচালিতের মত উচ্চারণ করেন মোক্ষদা।

"না। এতগুলো লোকের খাওয়া পণ্ড হতে দেব না আমি!"

মোক্ষদা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ নম্রভাবে বলেন, "কিন্তু একটা জীবের জীবনের চাইতে যজ্ঞিটাই বড় হল তোমার বিচারে?"

"শুধু আমার বিচারে নয়, যে কোন বুদ্ধিমান লোকের বিচারেই!" রামকালী ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বলেন, "বলছ সকাল থেকে দেখতে পাও নি, ধরে নিতে হবে, কাজটা হয়ে থাকে তো রাতেই হয়েছে। এখন জাল ফেললে জীবটা জীবন্ত উঠবে তোমাদের বিশ্বাস?"

মোক্ষদা চুপ করে থাকেন, উপযুক্ত উত্তরের অভাবে। আর কাশীশ্বরী চাপা গলায় হু-হু করে কেঁদে ওঠেন।

"থাম! লোকজন খাওয়ার আগে যেন টুঁ শব্দটি না হয়। যদি ডুবে থাকে তো যতক্ষণ না ভেসে ওঠে ততক্ষণ তাকে জলের তলায় থাকতে দাও। ডুবলে ভেসে উঠতেই হবে, নদী নয় যে ভেসে চলে যাবে। কিন্তু—" পায়চারি থামিয়ে রামকালী কাশীশ্বরীর খুব কাছে সরে আসেন, ঈষৎ নিচু হয়ে চাপা গম্ভীর স্বরে বলেন, "আর যদি ডুবে না থাকে, বৃথা জাল ফেলার পর সমাজে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে অনুমান করতে পারছ? ঘরের বৌ-ঝিকে

আগলে আটকে রাখার ক্ষমতা যখন নেই, তখন নিজেদের জিভকেই আগলে আটকে রাখো!"

কাশীশ্বরী সহসা কেঁদে ওঠেন, "ও রামকালী, তুমি আমায় একটু বিষ দাও বাবা, আমি এ মুখ আর কাউকে দেখাতে পারব না।"

"ছেলেমানুষি করো না!" মৃদুস্বরে ধমকে ওঠেন রামকালী, "বিপদে মতি স্থির রাখ। আমাকে বিবেচনা করবার সময় দাও। কিন্তু এই ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি আমি, বলছ তোমাদের কাছে শুতেন, অথচ দু-দুটো মানুষ কিছু টের পেলে না তোমরা?"

"মরণের ঘুম এসেছিল বাবা আমাদের—" কাশীশ্বরী আর একবার কেঁদে ওঠেন।

"পিসীমা, হাতজোড় করছি তোমায়, হৈ-চৈ করো না! সবাইকে না হয় বলো খুড়োর অসুখের খবর পেয়ে হঠাৎ বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁকে।"

"মানুষ তো আর ঘাসের বিচি খায় না রামকালী", মোক্ষদা নিজস্ব ভঙ্গীতে ফিরে আসেন, "কাল রাতদুপুর অবধি সবাইয়ের সঙ্গে কুটনো কুটেছে লক্ষ্মীছাড়ী—"

"আশ্চর্য!" আবার পায়চারি করতে করতে বলে ওঠেন রামকালী, "এ রকমটা হল কেন, কিছু অনুমান করতে পারছ তোমরা?"

কাশীশ্বরী মুখের ঢাকাটা আরও শক্ত করে চাপা দিয়ে বলে ওঠেন, "আমি পারছি রামকালী! মতিগতি তার ভাল ছিল না। ধিঙ্গী বয়েস অবধি খুড়োর ঘরে থেকেছে, মা-বাপ ছিল না যে সুশিক্ষে দেবে, উচ্ছন্ন যাওয়ার বুদ্ধির বৃদ্ধি করেছে বসে বসে। আমি বুঝছি জলে ডুবে মরে নি ও, আমাদের মুখে চুনকালিই দিয়েছে।"

ঘরটা নিচু-নিচু অন্ধকার মত। জানলা আছে কি নেই, তবু রামকালীর টকটকে ফরসা মুখটা আরও কত টকটকে হয়ে উঠেছে, টের পেলেন মোক্ষদা। চেয়ে চেয়ে মনে হল যেন ওই টকটকে মুখটা থেকে উত্তাপ বেরোচ্ছে। বেপরোয়া মোক্ষদাও ভয় খেলেন। কি বলতে গিয়ে থেমে গেলেন।

আর ঠিক এই সময় দরজার গোড়ায় কাঁসর বেজে উঠল।

মাজাঘষা চাঁচাছোলা কাঁসর। "ওগো অ ঠাকুমারা, কাটোয়ার বৌ গেল কোথায়? পান সাজবার জন্যে যে হাঁক-পাড়াপাড়ি হচ্ছে তাকে! তোমরাই

বা তুই বুনে এই বেলা তুপুর অবধি শোবার ঘরে গুলতুনি করছ কেন? চান করে আবার শোবার ঘরে এসে সেঁধিয়েছ যে বড়? আর একবার চানের বাসনা আছে বুঝি? তা তোমাদের বাসনা মেটাও, বৌকে পাঠিয়ে দাও।"

ঘরে ঢোকবার অধিকার নেই তাই বাইরে দাঁড়িয়েই বাক্যস্রোত বইয়ে দেয় সত্য। ধারণাও করতে পারে না ঘরের ভিতরে তার বাপের উপস্থিতি সম্ভব।

উঁচু 'পোতা'র ঘর, দরজার বাইরে থেকে ছোটদের পক্ষে ভিতরটা স্পষ্ট দেখাও সম্ভব নয়।

মোক্ষদা বিনা বাক্যব্যয়ে কপাটের সামনে এসে দাঁড়ান, অতএব ঘরেই আছেন তিনি। সত্য বিরক্ত কণ্ঠে বলে, "কি গো, মুখে বাক্যি-ওক্যি নেই কেন? কাটোয়ার বৌ গেল কোথায় সেটা বলবে তো? ঘাট থেকে আরম্ভ করে সাত চৌহদ্দি ছিষ্টি খুঁজে এলাম—"

সহসা মোক্ষদা সরে দাঁড়ালেন, এবং সেই শূন্যস্থানে রামকালীর মূর্তিটা দেখা গেল।

বাবা!

সত্য বজ্রাহত।

এখানে বাবা! আর সত্য মুখের তোড় খুলে দিয়েছে! ছি ছি! কিন্তু বাবা এখানে কেন? তা হলে নির্ঘাত কাটোয়ার বৌয়ের হঠাৎ কোনও অসুখ করেছে, পিসঠাকুমারা তাই নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। ছি ছি, এদিকে এই কাণ্ড, আর সত্য কিনা পান সাজার তাগাদা দিতে এসেছে! বাবা কি বলবেন! বাড়ির কোনও খবর রাখে না সত্য এইটাই প্রমাণ হবে।

মনে মনে জিভ কেটে চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বেচারা। আজ আর মানসিক চাঞ্চল্য নিবারণ করতে, অভ্যাসমত শাড়ির আঁচলটা নিয়ে চিবোবার উপায় নেই, পরনে উৎসব উপলক্ষে নিজের বিবাহকালে লব্ধ একখানা ভারী দামী বালুচরী চেলি।

রামকালী ঘাড় ফিরিয়ে মোক্ষদা ভগ্নীদ্বয়কে উদ্দেশ করে মৃদুস্বরে বললেন, "স্বাভাবিক ভাবে যার যা কাজ করো গে যাও, বৃথা ঘরের মধ্যে বসে থাকবার দরকার নেই," তার পর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। এসে সহসা মেয়েকে একটা সহজ পরিহাসের কথা বলে উঠলেন, "ঈস্! মেলাই সেজেছিস যে!"

কথাটা মিথ্যা নয়, শুধু বালুচরী চেলি কেন, মেয়েকে আজ একগা গয়না পরিয়ে সাজিয়েছে ভুবনেশ্বরী। কমগুলি গয়না তো হয় নি সত্যর বিয়ের সময়, পরে কবে? বাপের কথায় লজ্জিত হাসি হেসে মাথা নিচু করল। এবার রামকালী পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন, "ভাগ্নে-বৌমাকে কে ডাকছে?"

ভাগ্নে-বৌমা অর্থে আপাততঃ শঙ্করীকেই বোঝাল। সত্য বাবার কথায় নয়, বাবার কণ্ঠস্বরে থতমত খেল, অসহায় অসহায় চোখে বলল, "ওই তো ওরা, যারা এক বরজ পান নিয়ে সাজতে বসেছে।"

"তাঁদের বলে দাও গে উনি আজ আর পান সাজতে পারবেন না।" হঠাৎ যেন রামকালীও অসহায়তা বোধ করলেন, তাই তাড়াতাড়ি বললেন, "আচ্ছা থাক, তোমার এখন আর ওদিকে যাবার দরকার নেই, যারা পান সাজছেন সাজুন।"

কথায় কথায় পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছেন রামকালী ঘরের পিছনে ঢেঁকি-ঘরের দিকে ইচ্ছে করেই! সত্য সে খেয়াল করে না, ম্লানমুখে প্রশ্ন করে, "কাটোয়ার বৌয়ের অসুখ কি বেশী বাবা?"

"অসুখ? কে বললে?" রামকালী চমকে উঠে সামলে নিয়ে গম্ভীর ভাবে বলেন, "শোন, ওঁকে বৃথা ডাকাডাকি করো না। অসুখ করে নি, ওঁকে হঠাৎ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

আশ্চর্য, এ কথা কেন বললেন রামকালী!

একটু আগেও কি সিদ্ধান্ত করেছিলেন তিনি এ সংবাদটা আর কারও কাছে প্রকাশ করবেন না? হয়তো আর কেউ হলেই করতেন না, হয়তো ভুবনেশ্বরী এসে প্রশ্ন করলেও তাকে ওই "ডাকাডাকি করো না" বলেই থেমে যেতেন, কিন্তু সত্যর ওই উজ্জ্বল বিশ্বস্ত মস্ত বড় বড় চোখ দুটোর সামনে যেন সত্য গোপন করা কঠিন হল। আর রামকালীর চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে এখনও মনে হল, এই ন বছরের মেয়েটার কাছে বুঝি তিনি চিন্তার ভাগ দেবার আশ্রয় খুঁজছেন।

কিন্তু সত্যর তো ততক্ষণে 'হয়ে গেছে'।

খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না?

আস্ত একটা মানুষকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!

তাতে আবার মেয়েমানুষ! বেটাছেলে নয় যে পায়ে হেঁটে কোথাও চলে

গেছে। মেয়েমানুষকে খুঁজে না পাওয়ার অর্থই নির্ঘাত বড়পুকুরের কাকচক্ষু জল। অবশ্য এ জ্ঞানটা সত্যর সম্প্রতিই হয়েছে সারদাকে উপলক্ষ করে। তাই চমকে উঠে বলে, "খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? হায় আমার কপাল, ওই ভয়ে বড়বৌকে সমস্ত রাত ঘরে ছেকল তুলে রেখে দিলাম, আর কাটোয়ার বৌ এই করল! হে ঠাকুর, আমি কেন দুটোকেই ছেকল দিলাম না?"

"বড় বৌমাকে ছেকল দিয়ে রেখেছিলে?" চমৎকৃত রামকালী প্রশ্ন করেন।

"না দিলে," সত্য উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলে, "নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুম আসে? জলচৌকির ওপর জলচৌকি বসিয়ে কত কাণ্ড করে ছেকলে হাত দিয়েছি! ভোরের বেলা মাকে বলেকয়ে খুলিয়ে দিই। হায় হায় কাটোয়ার বৌকেও যদি—" বলেই সত্য সহসা স্বর ফেরায়, করুণ রসের পরিবর্তে বীর রসের আমদানি করে, "যাক। সে বেচারা মরেছে না জুড়িয়েছে। মানুষটা একদিন ঘাট থেকে আসতে একটু দেরি করেছে, লক্ষ্মীর ঘরে সন্ধ্যে দিতে পারে নি, তার তরে কী গঞ্জনা কী বাক্যিযন্তন্না! একটা মনিষ্যি, তাকে দশটা মানুষে তাড়না। বড় পিসঠাকুমাটি কি সোজা নাকি? গাল দিয়ে দিয়ে আর আশ মেটে না। অত বাক্যযন্তন্নায় পাষাণ-পিরতিমে হলেও জলে গে ঝাঁপ দেয়।"

রামকালী যেন ক্রমশঃ রহস্যের সূত্র পাচ্ছেন। বললেন, "বকাবকিটা কখন হল।"

"এই তো কালই। অবিশ্যি বৌয়েরও দোষ আছে, জল নিতে গেছ জল নিয়ে চলে এস, সন্ধ্যেভোর ঘাটে বসে থাকার দরকার কি? তবে হ্যাঁ, এনাদেরও লঘুপাপে গুরুদণ্ড! অবীরে বিধবা, মনেপ্রাণে কি সুখ আছে ওর? দু দণ্ড নয় ছিলই ঘাটে, তার জন্যে অত গালমন্দ! এই গ্রীষ্মিকালে কুল কোথায় তার ঠিক নেই, সকল গাছই তো নেড়া, তবু বলে কি ঘাটে যাবার ছুতোয় কুল খাচ্ছিলি, আরও সব কত কথা—" বলেই হতাশ নিশ্বাস ফেলে সত্য, "আমি তার মানেই জানি না বাবা।"

রহস্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কাল সন্ধ্যায় ঘাটে যে নারীমূর্তিটি দেখেছিলেন রামকালী, সে মূর্তি তা হলে সারদার নয়, কাশীশ্বরীর নাত-বৌয়ের। আত্মহত্যার চেষ্টাই ছিল তার তখন।

একবারের চেষ্টায় পারে নি তাই দ্বিতীয়বার আবার! কিন্তু খটকা

লাগছে একটা জায়গায়, বকাবকিটা তো তার পরবর্তী ঘটনা। তা ছাড়া সত্যবতী বর্ণিত 'কুল খাওয়া' শব্দটা! যা শুনে এত চিন্তার মধ্যেও হাসি এসে গিয়েছিল তাঁর।

কাশীশ্বরীও ওই সন্দেহ ব্যক্ত করেছেন।

রামকালী চাটুয্যের বাড়িতে এমন একটা ঘটনাও ঘটা সম্ভব!

ভয়ানক একটা যন্ত্রণা অনুভব করলেন রামকালী। না, শঙ্করীর অপঘাত মৃত্যু ভেবে নয়, চাটুয্যে-বাড়ির সম্ভ্রম নষ্ট বলেও নয়, যন্ত্রণা বোধ করলেন নিজের ত্রুটির কথা ভেবে। আরও হুঁশিয়ার হওয়া উচিত ছিল তাঁর, আরও যথেষ্ট পরিমাণে সাবধান। একটা নিতান্ত তুচ্ছ মেয়েমানুষ যেন রামকালীর ক্ষমতার তুচ্ছতাকে ব্যঙ্গ করে গেল।

মেয়েটার এ ধৃষ্টতাকে ক্ষমা করা যাচ্ছে না।

হঠাৎ অনুভব করলেন সত্য পিছিয়ে পড়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখে থমকে গেলেন। সহসা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে নিঃশব্দে কান্না শুরু করেছে সত্যবতী।

রামকালীর পিছিয়ে এলেন। গম্ভীরভাবে বললেন, "তোমার কাঁদবার দরকার নেই।"

"বাবা!" এবার আর নিঃশব্দে নয়, ডুকরে ওঠে সত্য, সব দোষ আমার। কাটোয়ার বৌ তো রাতদিন বলত, 'মরণ হলে বাঁচি', আমি যদি তখন তোমাকে বলি তো একটা প্রিতিকার হয়। মনে করতাম অলীক কথা, রাজ্যি সুদ্দু মেয়েমানুষই তো রাতদিন 'মরণ-মরণ করে—তেমনি। কাটোয়ার বৌ সত্যি ঘটিয়ে ছাড়ল! মা নেই বাপ নেই ভাই নেই, স্বামীপুত্তুর কেউ নেই মানুষটার, শুধু গালমন্দ খেয়ে খেয়ে বেঘোরে মরে গেল! তুমি আগে টের পেলে -"

কান্নাটা বড় বেশী উথলে উঠল সত্যর।

রামকালী কি হঠাৎ তড়িতাহত হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছেন? নইলে মুখের চেহারা তাঁর হঠাৎ অত অদ্ভুত ভাবে বদলে গেল কি করে? যে ভ্রূকুটি নিয়ে একটা তুচ্ছ মেয়েমানুষের ধৃষ্টতার দিকে তাকিয়েছিলেন, সে ভ্রূকুটি মিলিয়ে গেল কেন? হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে কি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল তাঁর এতক্ষণকার চিন্তাধারা?

"কান্না থামাও" বলে আস্তে আস্তে চলে গেলেন তিনি বারবাড়ির দিকে। গিয়ে দাঁড়ালেন ভিয়েন-ঘরে যেখানে কুঞ্জ তখন জলচৌকিটা ঘুরিয়ে নিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে বসে এক সরা গরম ছানা-বড়া চাখছেন।

বললেন, "বড়দা, আমাকে একবার বেরোতে হবে, তুমি দেখো অতিথিদের যেন কোন অমর্যাদা না হয়।"

"আ—আমি!" মিষ্টি গলায় বেধে গেল কুঞ্জর।

"হ্যাঁ তুমি। নয় কেন? তুমি বড়!"

হ্যাঁ, বেরোবেন রামকালী! জেলেদের ঘরে গিয়ে বলতে হবে, পুকুরে আর একবার জাল ফেলানো দরকার! বাড়ীতে কাজ, সন্দেহ করার কিছু নেই। ভাববে মাছের কমতি পড়েছে।

তবে রামকালী যেন বুঝছেন, ওটা নিরর্থক। কাশীশ্বরীর নাতবৌ নিজে ডুবে মরে নি। সংসারটাকেই ডুবিয়েছে।

রামকালী কি তবে এবার নির্দেশের আশ্রয় খুঁজবেন? নিজের ওপর কি আস্থা হারিয়ে ফেলছেন? না হলে যে প্রাণীটাকে শুধু 'প্রাণীমাত্র' ভেবে তার ওপর বিরক্ত হচ্ছিলেন—তার ধৃষ্টতার বহর দেখে, তাকে অন্য দৃষ্টিতে দেখছেন কেন? কেন ভাবছেন তারও কোনো প্রাপ্য পাওনা ছিল সংসারে? তাই রামকালী উপদেষ্টার দরকার অনুভব করছেন।

চোদ্দ

"ওরে বাবা-সকল, একটু চোটপায়ে চল, তাগাদা আছে।"

পালকি থেকে মুখ বাড়িয়ে আর একবার তাগাদা দিলেন রামকালী। মধ্যাহ্নের মধ্যে গিয়ে পৌঁছতে না পারলে বিদ্যারত্ন মশাইয়ের সঙ্গে দেখা হবে না। প্রাতঃসন্ধ্যা সেরে গঙ্গাস্নানে বেরিয়ে পড়েন বিদ্যারত্ন, যেটা বিদ্যারত্নের আবাসস্থান থেকে অন্ততঃ তিন ক্রোশ দূরে। যাতায়াতে এই ছ ক্রোশ পাড়ি দিয়ে নিত্যস্নানপর্ব সমাধা করে পুনরায় ঠাকুরঘরে ঢুকে পড়েন তিনি গৃহবিগ্রহের ভোগ দিতে। তৎপরে প্রসাদগ্রহণ, তার পর আবার সামান্য সময় বিশ্রাম, এই মধ্যবর্তী সময়টা কারও সঙ্গে দেখা করেন না

বিদ্যারত্ন। কাজেই তাঁর কাছে যেতে হলে ওই গঙ্গাস্নান সেরে ফেরার মুহূর্তে, নয় অপরাহ্নে।

কিন্তু অপরাহ্ন পর্যন্ত সময় কোথা রামকালীর—প্রয়োজন যে বড় জরুরী।

জীবনে যখনই কোন সমস্যা সমাধানের জরুরী প্রয়োজন পড়ে, তখনই রামকালী বিদ্যারত্নের দরবারে এসে হাজির দেন।

অবশ্য সে রকম প্রয়োজন জীবনে দৈবাৎই এসেছে।

সেই একবার এসেছিল নিবারণ চৌধুরীর মায়ের গঙ্গাযাত্রার ব্যাপারে। তিরানব্বই বছরের বুড়ী সজ্ঞানে গঙ্গাযাত্রা করলেন, আর সে নির্দেশ রামকালীই দিয়েছিলেন। কিন্তু বুড়ী যেন রামকালীর বিদ্যা-বুদ্ধিকে পরিহাস করে পাঁচদিন গঙ্গাতীরের হাওয়া খেয়ে ফের চাঙ্গা হয়ে উঠল। তারপর তার বায়না 'আমায় তোরা বাড়ি নে চল।' শরীরে শক্তি আছে, বয়সে মন অবুঝ হয়ে গেছে। নিবারণ চৌধুরী রামকালীকে এসে ধরে পড়লেন, 'বলুন কি বিহিত?'

সেই সময় চিন্তায় পড়েছিলেন রামকালী।

গঙ্গাযাত্রীর মড়া ফের ভিটেয় ফেরত নিয়ে গেলে সংসারের মহা অকল্যাণ, সদ্য ভিটেটায় তো তোলাই যাবে না তাকে! ঢেঁকিঘরে কি গোয়ালে বড় জোর রাখা যায়, কিন্তু নিবারণ চৌধুরীর মনোভাব দেখে মনে হয়েছিল, সেটুকুতেও তিনি নারাজ। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করেন তিনি, সংসারের এত বড় অকল্যাণ ঘটাতে বুক কাঁপছে। বারবার তাই কবরেজ মশাইয়ের কাছে বিধি-বিধান চেয়েছিলেন।

সেই সময় এসেছিলেন রামকালী বিদ্যারত্নের কাছে। এসে প্রশ্ন করেছিলেন, 'বিদ্যারত্ন মশাই, বলুন শাস্ত্র বড় না মাতৃমর্যাদা বড়?'

আজ এসেছেন আর এক প্রশ্ন নিয়ে।

অবশ্য আপাততঃ প্রশ্ন তাড়াতাড়ি পৌঁছবার। একখানা গ্রাম পার হয়ে তবে দেবীপুর। বিদ্যারত্নের গ্রাম।

পাল্‌কি থেকে আর একবার মুখ বাড়িয়ে দেখে বেহারাদের ফের তাগাদা দিতে গিয়ে থেমে গেলেন রামকালী, থাক, এত বিচলিত হবার দরকার নেই, পৌঁছে ওরা দেবেই ঠিক।

বিচলিত হওয়াকে ঘৃণা করেন রামকালী। তবু মনে মনে অস্বীকার

করে লাভ নেই, আজ একটু বিচলিত হয়েছেন। কোথায় যেন হেরে গেছেন রামকালী, তারই একটা সূক্ষ্ম অপমানের জ্বালা মনকে বিঁধছে।

কিন্তু রামকালীর মধ্যে এই পরাজয়ের গ্লানি কেন? সংসারের একটা বুদ্ধিহীন মেয়ে যদি একটা অঘটন ঘটিয়ে বসে থাকেই, তাতে রামকালীর পরাজয় কেন?

ঘোড়ায় এলে এতক্ষণে পৌঁছে যেতেন, কিন্তু কোন বয়োজ্যেষ্ঠ বা গুরুস্থানীয়ের সামনাসামনি সাধ্যপক্ষে ঘোড়ায় চড়েন না রামকালী। তাই পাল্কিতেই বেরিয়েছেন। বেরিয়ে এসেছেন একটু সঙ্গোপনেই। জেলেদের জাল ফেলার ব্যাপারটা সামান্য তদারক করেই। বাড়তি কিছু মাছ উঠল, উঠুক। খাদ্যবস্তু কখনো বাড়তি হয় না। ওরা এখন যে যেভাবে কাজ করছে করুক, রামকালীর অনুপস্থিতি টের না পেলেই মঙ্গল। টের পেলেই কাজে ঢিলে দেবে।

কারুর ওপর কি ভরসা করার জো আছে?

কাকা আছেন, সেজকাকা। কিন্তু তাঁকে কোন কাজকর্মের ভার দেওয়াও বিপদ। কারণ তাঁর মতে ডাকহাঁক চেঁচামেচি এবং নির্বিচারে সকলকে ধমকাতে পারাই পুরুষের প্রধান গুণ। আর বয়েস হয়ে গেলেও পৌরুষের পরিমাণটা যে তাঁর এক তিলও কমে নি, সর্বদা সেটা প্রমাণ করতেও রীতিমত তৎপর সেজকাকা। তাই তাঁকে ডেকেডুকে কর্তৃত্বের ভার দেওয়া মানে বিপদ বাধানো।

আর কুঞ্জ?

কুঞ্জর কথা কি বলারই যোগ্য?

মিষ্টির ভিয়েনের কানাচে হাতেমুখে রসমাখা আর মুখভর্তি ছানাবড়া ঠাসা কুঞ্জর তৎকালীন চেহারাটা একবার চোখের সামনে ভেসে উঠল। তখন, যখন দেখেছিলেন, মনটা বিরক্তিতে ভরে গিয়েছিল, এখন হঠাৎ একটা মমতা-মিশ্রিত অনুকম্পার ভাব মনে এল।

যে মানুষ লুকিয়ে-চুরিয়ে নিজের ছেলের বিয়ের ভোজের মিষ্টান্ন খেতে বসে, তার উপর অনুকম্পা ছাড়া হৃদয়ের আর কোন্ ভাববৃত্তি বিকশিত হবে?

এরা কি রাগেরই যোগ্য?

আশ্চর্য। রাসুটাও হচ্ছে ঠিক বাপের মতই অপদার্থ! ভবিষ্যতের

দিকে তাকালে খুব একটা আশার আলো চোখে পড়ে না। কিন্তু তার জন্য হতাশাও আনেন না রামকালী—আপন শক্তিতে বিশ্বাসী, আপন কেন্দ্রে অটুট অবিচল তিনি।

ওদের কথাকে চিন্তার জগতে ঠাঁই দেন না রামকালী, কিন্তু সত্যটা মাঝে মাঝে তাঁকে ভাবিয়ে তোলে। শুধু যে সেই একটা ভয়ঙ্কর সরল মুখ থেকে উচ্চারিত ভয়ঙ্কর জটিল প্রশ্নগুলোই চিন্তিত করে তোলে রামকালীকে তা নয়, চিন্তিত করে তোলে সত্যর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে।

সংসার কি সত্যবতীকে বুঝবে ?

পাল্‌কি থেকে নেমে পড়লেন রামকালী।

বিদ্যারত্নের মাটির কুটির থেকে একটু দূরে। সেটাই সভ্যতা, সেটাই গুরুজনের সম্ভ্রম রক্ষা। গুরুজনের চোখের সামনে গাড়ি পালকি থেকে নামা অবিনয়।

মাটির ঘর দালান দাওয়া, দাওয়ার নিচের উঠোনে আঁকা ছবির মত বেড়া ঘেরা ছোট্ট ফুলবাগানটি। বিদ্যারত্নের নিজের হাতের বাগান, নিজের হাতের দেওয়া বেড়া। টগর দোপাটি গাঁদা বেল মল্লিকা রক্তজবা করবী সন্ধ্যামণি,—নানান গাছ, সারা বছরই ফুলের সমারোহ। এছাড়া বেড়ার ধারে ধারে আছে তুলসীর কেয়ারি। গঙ্গাস্নানের পর পূজোর আগে একবার গাছগাছড়াগুলির তদারক করে যাওয়ার অভ্যাস বিদ্যারত্নের। পায়ে খড়ম, পরনে নিজের হাতে কাটা সুতোর ধুতি ও উত্তরীয়,—পিতলের ঝারায় জল নিয়ে গাছের গোড়ায় গোড়ায় ঢালছিলেন বিদ্যারত্ন, রৌদ্রে রামকালীর ছায়া পড়তেই মুখ তুলে তাকালেন।

হৈ হৈ করে সম্ভাষণ করে উঠলেন না বিদ্যারত্ন। হঠাৎ আবির্ভাবের জন্য বিস্ময় প্রকাশও করলেন না, শুধু রামকালীর প্রণাম শেষ হলে, তাঁর মাথায় হাত রেখে বললেন, "এস, দীর্ঘায়ু হও।"

শান্ত সৌম্য মুখ, শ্যামবর্ণ ছোটখাটো চেহারা, মাথার চুলগুলি ধবধবে পাকা, কিন্তু দৃঢ়নিবদ্ধ মুখের চামড়ায় বলিরেখার আভাসমাত্র নেই। সহজে বিশ্বাস করা শক্ত—বিদ্যারত্ন মশাইয়ের বয়স আশী ছোঁয়-ছোঁয়। চকচকে সাজানো দাঁতের পাটির শুভ্র হাসিটুকুও বিশ্বাস করতে প্রতিবন্ধকতা করে।

দাওয়ার উপর খান দুই-তিন জলচৌকি, কাছেই পৈঠের ঘটিতে জল। পা ধুয়ে দাওয়ায় উঠে জলচৌকিতে বসলেন রামকালী, বিনত হাস্যে বললেন, "আপনার তো আহ্নিকের বেলা হল!"

"তা হল।" বিদ্যারত্ন প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন, "বলবে কিছু—যদি বলবার থাকে?"

বলবার কিছু আছেই, নচেৎ এমন অসময়ে ব্যস্ত হয়ে আসার কারণ কি?

রামকালী আর গৌরচন্দ্রিকা করলেন না, মুখ তুলে পরিষ্কার কণ্ঠে বললেন, "পণ্ডিতমশাই, আজ আবার এক প্রশ্ন নিয়ে আপনার দরবারে এসে দাঁড়িয়েছি। বলুন মানুষ বড়, না বংশমর্যাদার অহঙ্কার বড়?"

ঠিক এই একই সময় একটা ছোট মেয়ে ওই একই ধরনের প্রশ্ন করছিল, অন্য কাউকে নয়, নিজের মনকেই। "আচ্ছা এও বলব, মানুষ বড় না তোমাদের রাগটাই বড়?"

কী আশ্চয্যি, কী আশ্চয্যি! জলজ্যান্ত একটা মানুষ হারিয়ে গেল, তবু গিন্নীরা কিনা সত্যর ওপর চোখ রাঙাচ্ছেন, "খবরদার, দুটি ঠোঁট ফাঁক করবি না, কারুর যদি কানে যায় তো তোদের সব কটার হাড়মাস দু ঠাঁই করব।"

বেশ বাবা, তোমাদের জেদই থাক, রাগ নিয়ে ধুয়ে ধুয়ে জল খাও তোমরা।

ওদিকে বিদ্যারত্ন রামকালীকে বলছিলেন, "কালের সমুদ্রে একটা মানুষের জীবনমরণ সুখদুঃখ কিছুই নয় রামকালী, সমুদ্রে বুদ্বুদ মাত্র। কুলত্যাগিনী বধূকে সন্ধান করবার প্রয়োজন নেই।"

"কিন্তু সমাজকে তো একটা জবাব দিতে হবে?"

"যা সত্য তা বলবে সাহসের সঙ্গে। সত্যকে স্পষ্ট করে বলতে পারা চাই। সেটাই ধর্ম। সেই বিপথগামিনীকে তুমি তো আর ঘরে নিচ্ছ না? ভেবে নাও তার মৃত্যু হয়েছে।"

"কিন্তু পণ্ডিতমশাই, এ আমি ভাবতেই পারছি না—আমার ঘরের কথা নিয়ে অপরে আলোচনা করবে।"

"রামকালী, তোমার দেহে একটা দুষ্ট রোগ হওয়া অসম্ভব নয়, তা যদি হয় কি করবে তুমি? বিধাতার বিধান মেনে নিতেই হবে। তা ছাড়া

হয়তো এরকম একটা কিছুর প্রয়োজনও ছিল। হয়তো তোমার ভিতর কোনখানে একটু অহমিকা এসেছিল—"

"অহমিকা! পণ্ডিতমশাই, 'আমি'র প্রতি মর্যাদাবোধ থাকাটা কি ভুল? অন্যায়?"

"এই একটা জায়গা বড় গোলমেলে রামকালী, আত্মমর্যাদা-বোধ আর অহমিকা-বোধ, এ দুটোর চেহারা যমজ ভাইয়ের মত, প্রায় এক, সূক্ষ্ম আত্ম-বিচারের দ্বারা এদের তফাত বোঝা যায়। তা ছাড়া তুমি ব্রাহ্মণ। রজোগুণ তোমার জন্য নয়। কিন্তু আজ তোমার চিত্ত চঞ্চল, তুমি এখন বিশেষ ব্যস্তও, কাজেই আজ এসব আলোচনা থাক।"

রামকালী কয়েক মুহূর্ত মাথা নিচু করে ভূমিসংলগ্ন দৃষ্টিতে কি যেন ভাবলেন, তারপর সহসা মাথা তুলে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন "আচ্ছা, আপনার নির্দেশই শিরোধার্য করলাম।"

আর একবার বিদ্যারত্নের পদধূলি নিয়ে বেরিয়ে এসে পালকিতে চড়লেন রামকালী। ফেরার মুখে আর বেহারাদের তাড়া দেবার কথা মনে এল না। বিদ্যারত্নের একটা কথা তাঁকে বিশেষ ধাক্কা দিয়েছে। বিদ্যারত্ন বললেন "তুমি ব্রাহ্মণ, রজোগুণ তোমার জন্য নয়।"

কিন্তু তাই কি সত্য?

ব্রাহ্মণের মধ্যে তেজ থাকবে না? থাকবে কেবলমাত্র রজোগুণ-শূন্য স্তিমিত শান্তি?

ফিরে দেখলেন বাড়ি লোকে লোকারণ্য! নিমন্ত্রিতেরা প্রায় সকলেই এসে গেছে। রান্নাও প্রস্তুত। শুধু রামকালীর অনুপস্থিতিতে ভোজে বসিয়ে দেবার ব্যবস্থাটা ঠিকমত হচ্ছে না, সকলে মিলে শুধু গুলতানি চলছে।

এই চনচনে সময়ে দূর থেকে পরিচিত পাল্‌কি বেহারাদের "হুম্‌ হুম্‌' আওয়াজ কানে এল। আশায় অধীর হয়ে উঠল সবাই—'এসে গেছেন, এসে গেছেন' রবে গম্‌ গম্‌ করে উঠল জনতা। সকলেই অবশ্য ধরে নিয়েছিল আচমকা কোনও রোগীর মরণ-বাঁচন সংবাদ পেয়ে বাধ্য হয়ে বেরিয়ে যেতে হয়েছে রামকালীকে। কুঞ্জও সেই কথাই বলে রেখেছিলেন।

অন্দরমহলে মেয়েদের মধ্যে শঙ্করী সম্পর্কে কানাঘুষো শুরু হয়ে গিয়েছিল ; কিন্তু বারমহল সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত।

রামকালী এসে দাঁড়াতেই বয়োজ্যেষ্ঠ অতিথি অভ্যাগতের দল হৈ হৈ করে এগিয়ে এলেন, "ব্যায়রামটা কার রামকালী ? কোন্ গাঁয়ে ? কে যেন দেবীপুরের দিকে পালকি যেতে দেখল, ওইখানেই কারও—"

"না, কারও ব্যায়রাম শুনে আমি যাই নি—" রামকালী একবার লোকভর্তি আটচালার সমস্তটায় চোখ বুলিয়ে নিলেন, তার পর একটু থেমে বললেন, "আমি বেরিয়েছিলাম অন্য প্রয়োজনে, সে প্রয়োজনের কথা আপনাদের সকলকেই জানাব। যদিও আপনারা এখনো অভুক্ত ও ক্ষুধার্ত, আমার কথা শুনে ঠিক কি মনোভাব আপনাদের হবে তাও সম্পূর্ণ বুঝতে পারছি না, তবু আহারাদির পূর্বেই কথাটা ব্যক্ত করা উচিত মনে করছি আমি। বলতে আপনারা সকলে অনুমতি করুন আমাকে।"

নিঃশব্দ জনতার মাঝখানে রামকালীর ভরাট ভারী কণ্ঠস্বর গম্ গম্ করে উঠল, অনেকেরই বুক কেঁপে উঠল একটা অজানা আশঙ্কায়।

কুঞ্জ হঠাৎ পিছনদিকে হটে গিয়ে ধুলোর উপর বসে পড়লেন, রাসু ভিড়ের একেবারে পিছনেই ছিল, সে হাঁ করে তাকিয়ে রইল কাকার আরক্ত গৌরমুখের দিকে। সমাগতেরা অনুধাবন করতে পারছেন না ব্যাপারটা কি। আহার্য বস্তুতে কি কোনও অনাচার স্পর্শ ঘটেছে ? কিন্তু তাই বা কি করে বলা যায় ? রামকালীর আচমকা বেরিয়ে যাওয়ার প্রশ্নটাও যে রয়েছে।

তবে কি সহসা রামকালীদের কোন জ্ঞাতির মৃত্যু ঘটেছে ? এই বিরাট ভোজের রান্না সব অশৌচান্ন হয়ে গেছে ? সেই সংবাদ পেয়েই রামকালী··· ! রামকালী কি এমন অর্বাচীন যে এই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে সেই তথ্য এসে প্রকাশ করবেন ? মৃত্যুসংবাদ কানে না শুনলে তো অশৌচ হয় না, উনি নিজে গা ঢাকা দিয়ে বেড়ালে তো আর এখানের অন্নগুলো আশৌচান্ন হয়ে যেত না ? বলে এমন ক্ষেত্রে ঘরের মড়া কাঁথা চাপা দিয়ে রেখে লোকে দিন উদ্ধার করে নেয়।

তবে ?

রামকালী যে তাঁর বক্তব্য জ্ঞাপন করতে অনুমতি চেয়েছিলেন, এ কথা কারও মনে ছিল না, ফের চেয়ে সে কথা মনে করিয়ে দিলেন রামকালী।

"তা হলে আপনারা আমায় অনুমতি দিচ্ছেন ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্য অবশ্য ! তোমার যা বলবার আছে বল ।"

"তা হলে শুনুন, গতরাত্রে আমার পরিবারভুক্ত একটি বিধবা বধূ গৃহত্যাগ করেছে—"

"অ্যাঁ ! অ্যাঁ ! অ্যাঁ !"

সহসা ভয়ঙ্কর একটা ঝড় উঠল ? কালবৈশাখীর দুমদাম এলোমেলো ঝড় নয়, যেন একটা বুনো অরণ্যের চাপাশ্বাস গোঁ গোঁ করে উঠল। সেই শ্বাস শুধু সমবেত কণ্ঠের ওই আহত বিস্ময়ের প্রচণ্ড ধ্বনি।

রামকালী কি এই বজ্রটাকেই প্রস্তুত করেছিলেন এতক্ষণ ধরে, তাঁর অভুক্ত ক্ষুধার্ত নিমন্ত্রিত অতিথিদের জন্যে ?

তুমুল ঝড়ের ধ্বনিতে রামকালীর কথার শেষ অংশ চাপা পড়ে গিয়েছিল, আর একবার সে স্বর গম্ গম্ করে উঠল চাপা মেঘমন্দ্রের মত।

"এখন আপনারা স্থির করুন, এই অপরাধে আমাকে ত্যাগ করবেন কিনা ?"

যেন বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন রামকালী, এমনি ধীর-স্থির সমুন্নত সেই মূর্তি !

এঁকে ত্যাগ !

সম্ভব ?

কিন্তু তাও হওয়া সম্ভব বৈকি। সমাজ বলে কথা !

নিবারণ চৌধুরীর মামা বেঁটেখাটো বিপিন লাহিড়ী একটা জলচৌকি টেনে এনে তার উপর দাঁড়িয়ে উঠে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, "ত্যাগ ক্কুরাকরির কথা নয়, ভবিষ্যতে যা বিচার তা হবে। কিন্তু বর্তমানে আজ তো আর আমাদের এখানে খাওয়া হয় না রামকালী।"

রামকালী দুই হাত জোড় করে শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "আমি কাউকে অনুরোধের দ্বারা পীড়ন করতে চাই না, তবে এইটুকুই শুধু জানাচ্ছি, আমি সেই মতিভ্রষ্টা মেয়েকে মৃত বলেই গণ্য করব। মানুষের সমাজ থেকে তার মৃত্যু হয়েছে। আহারের পূর্বে এই কথাটি নিবেদন করতে যারপরনাই দুঃখ বোধ করছি আমি, কিন্তু আমার বিবেকের কাছে এটাই কর্তব্য বলে মনে হল আমার।"

বিপিন লাহিড়ী মনে মনে মুখ ভেঙচান্, 'আগে বলাই কর্তব্য ভাবলাম !

ওরে আমার যুধিষ্ঠির! এই যজ্জির খাওয়াটা পণ্ড করলি! ভাল হবে, তোর ভাল হবে?'

চোখে জল এসে যাচ্ছিল বিপিন লাহিড়ীর। তবু কথা বলেন তিনি, "আমার মনে হয়, খবরটা তোমার এখন গোপন রাখাই উচিত ছিল রামকালী।"

"সে কথা আমি ভেবেছিলাম।" রামকালী আবার একবার সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, "কিন্তু পরে মনকে ঠিক করে নিলাম। আমার এত বড় কলঙ্ক সত্ত্বেও যদি আপনারা আমাকে ত্যাগ না করেন, তা হলে পরম ভাগ্য বলে মানব। আর যদি তা করেন, সে শাস্তি মাথা পেতে নেব।"

এবার আর ঝড় নয়, গুঞ্জনধ্বনি।

সে ধ্বনি ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠল। "তা এতে তোমার আর কলঙ্ক কি?"

"আছে বৈকি! আমার অন্তঃপুর উচিতমত রক্ষা করবার অক্ষমতাই আমার কলঙ্ক। আমার অপরাধ। মার্জনা আমি চাইব না, এ অপরাধের মার্জনা নেই, শুধু আমার প্রতি আপনাদের স্নেহ-ভালবাসার কাছে হাত জোড় করে প্রার্থনা করছি, আপনারা পরে আমার প্রতি যে শাস্তির আদেশ দেন মাথা পেতে নেব, শুধু আজ আপনারা দয়া করে আহার করুন।"

আর একবার ঝড় উঠল।

অসন্তোষের? না উল্লাসের?

বোধ করি বা উল্লাসেরই, তবে জলচৌকির উপর দাঁড়িয়ে থাকা বেঁটে-খাটো বিপিন লাহিড়ীর গলাটাই শুধু শোনা গেল, "আচ্ছা, আজকের মত তোমার অনুরোধ রক্ষা করাই আমরা স্থির করছি।"

রামকালী ধীরে ধীরে সরে গেলেন। মাথা সোজা করেই।

পনেরো

সকালবেলা নেড়ুকে হাতের লেখা মক্‌শ করতে হয়। পূবের উঠোনের রোদ যতক্ষণ না পেয়ারাতলায় ঠিক নিচেটায় এসে পড়বে ততক্ষণ পর্যন্ত নেড়ুকে সেই দুরূহ কর্তব্যটি করেই চলতে হবে, এই নির্দেশ আছে তার উপর। ঋতুভেদে সীমানার কিছু ভেদ হয়, আপাততঃ ওই পেয়ারাতলা।

অবশ্য তার প্রতি আরও একটা নির্দেশ আছে।

সেটা হচ্ছে তালপাতার গোছাগুলি ও দোয়াত-কলম নিয়ে বসার সময় এবং 'মক্‌শ'র পর, সেগুলি তুলে রাখার সময় ভক্তিভরে মা সরস্বতীকে প্রণাম করা। প্রণামমন্ত্রের সঙ্গে প্রার্থনামন্ত্রও যুক্ত করা আছে।

দেবীর প্রসন্নতা লাভের উপায় স্বরূপ বিদ্যা অনুশীলনের চাইতে স্তবস্তুতি প্রণাম প্রার্থনার উপরই নেড়ুর আস্থা বেশী। কাজেই 'শব্দবোধে'র পাতা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মুড়ে ফেলে, নিঃশব্দ স্তুতিতেই সময় বেশী যায় তার। চোখটা বুজে রেখেও তেরছা কটাক্ষের কৌশলে পেয়ারাতলার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে পরম ভক্তিভরে মন্ত্রোচ্চারণ করছিল সে পাততাড়িটি কপালে ঠেকিয়ে—

ত্বং ত্বং দেবী শুভ্রবর্ণে,
রত্নশোভিত কুণ্ডলকর্ণে।
কণ্ঠে লম্বিত গজমোতি হারে,
দেবী সরস্বতী বর দাও আমারে।
লাগ্ লাগ্ বাণী কণ্ঠে লাগ্—
যাবজ্জীবন তাবৎ থাক্।
দুষ্ট সরস্বতী দূরে যাক্।
আমি থাকি গুরুর বশে,
ত্রিভুবন পূরিত আমার যশে।

দেবী-স্তবের কালে কিন্তু নেড়ু ভাবছিল দেবের কথা। সূর্যদেব।

আশ্চর্য! নিষ্ঠুর সূর্যদেবতাকে এত আন্তরিকভাবে মাতুল সম্বোধন করেও ভাগ্নের প্রতি তাঁর মমতার কোনও প্রকাশ দেখতে পায় না নেড়ু। পেয়ারাতলার নিচেটায় আসার যেন কোনও গরজই নেই তাঁর। অথচ তিনি সামান্য একটু কৃপাদৃষ্টিপাত করলেই, করা মাত্রই, নেড়ুর আজকের মত যন্ত্রণা

শেষ হয়। বার বার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একই স্তবস্তুতি কতক্ষণ ধরেই বা করা যায়?

তবু কপাল থেকে কলম তালপাতা নড়ায় না নেড়ু, ঠেকিয়েই থাকে, এইমাত্র ঠেকানোর ভঙ্গীতে।

"খুব যে বিদ্যে হচ্ছে! আহা মরে যাই, ছেলের কী ভক্তি রে!"

সত্যবতীর শানানো গলা বেজে ওঠে।

বুকটা কেঁপে ওঠে নেড়ুর।

উঃ, যা মেয়ে ও! আর যা জেরা! তথাপি বাইরের প্রকাশে সত্যকে কোন স্বীকৃতি দেয় না নেড়ু, একই ভাবে চোখ বুজে বিড়বিড় করতে থাকে।

সত্যবতী হি-হি করে হেসে ওকে একটা ঠেলা দিয়ে বলে, "এখন যে বড় চোখ বোজা হচ্ছে? এতক্ষণ কি করছিলি? হুঁঃ বাবা, খালি চোখ পিটপিট আর পেয়ারাতলার দিকে তাকানি!"

"আঃ, সত্য!" নেড়ু এবার পাতা কলম কপাল থেকে নামিয়ে সযত্নে জলচৌকির উপর স্থাপিত করে বিরক্তি-ব্যঞ্জক গম্ভীর স্বরে বলে, "নমস্কারের সময় গোলমাল করছিস কেন?"

"নমস্কার তো তুই সকাল থেকেই করছিস! এক পোর বেলা হয়ে গেল সেই এস্তক নমস্কারই হচ্ছে! দেখি নি যেন!"

"ইঃ, দেখেছিস তুই!" নেড়ু উঠোনের দিকে তাকিয়ে দেখে। মনে হচ্ছে যেন মাতুল সূর্যদেব এতক্ষণে সদয় হয়েছেন, পেয়ারাতলার ঠিক নিচেটাতে কৃপা-কটাক্ষ করছেন। অতএব বুকের বল বাড়ে তার। দৃপ্তকণ্ঠে বলে, "কত মকশ করলাম তখন থেকে!"

"কই দেখি কত!" বলেই সত্য একটা কাজ করে বসে। হাতটা একবার মাথায় মুছে নিয়ে চট্ করে মা সরস্বতীর উদ্দেশে একটা প্রণাম নিবেদন করে নেড়ুর এইমাত্র রক্ষিত তালপাতার গোছায় এক টান মারে।

"অ্যাই অ্যাই, ও কী হচ্ছে!" শিহরিত নেড়ু ভয়ঙ্কর একটা ভয়ের সুরে বলে ওঠে, "সত্য! তুই তালপাতায় হাত দিলি?"

"দিলাম তা কি!" নির্ভীক স্বর সত্যর, "আমি তো মা সরস্বতীকে পেন্নাম করে হাত দিয়েছি!"

"পেন্নাম করলেই সব হল? তুই না মেয়েমানুষ? মেয়েমানুষের তালপাতায় হাত ঠেকালে কি হয় জানিস না?"

সত্য ইতিমধ্যে নেড়ুর সারা সকালের 'শ্রমফল' নিরীক্ষণ শুরু করে দিয়েছে। বলা বাহুল্য একখানি মাত্র পাতা কালি-কলঙ্কিত, বাকী সবগুলিই নিষ্কলুষ নিষ্কলঙ্ক। কাজেই আর একবার তার 'হি-হি'র পালা।

"খুব যে বলছিলি অনেক মক্শ করেছিস? কই কোথায়? দোয়াতে বুঝি কালির বদলি জল ভরেছিস? তাই চোখে ঠাহর হচ্ছে না?"

সত্যর বিদ্রূপের ভঙ্গী বড় তীক্ষ্ণ, কারণ উক্ত মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে চোখের তারা পাতার যতটা সম্ভব কাছে নিয়ে এসেছে সে, মুখে কৌতুকের আলোর ঝলমলানি।

এতটা সহ্য করা শক্ত।

নেড়ু এক হ্যাঁচ্কায় নিজ সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে, "বেশ থাক্। আমার বিদ্যে না হোক তোর কি? নিজের কি হয় দেখ। বলে দিচ্ছি গিয়ে সবাইকে, তালপাতে হাত দিয়েছিস তুই।"

আর কেউ হলে 'সবাইকে বলে দেওয়ার' ভীতি প্রদর্শনেই কাবু হয়ে পড়ে এবং আপসের সুরে 'আচ্ছা, বেশ ভাই দেখলাম!' ইত্যাদি অভিমান-সূচক বাণী উচ্চারণ করে শত্রুপক্ষের মন নরম করে আনে। কিন্তু সত্যর মনোভাব আপসবিহীন। তাই ভিতরে যাই হোক, বাইরে বিন্দুমাত্র বিচলিত ভাব দেখায় না সে, সমান জোরের সঙ্গেই বলে, "বলে দিবি তো দিবি, সবাই আমার কি করবে শুনি? শূলে দেবে?"

"দেয় কি না দেখিস! চালাকি নয়!"

"কেন, মেয়েমানুষ তালপাতে হাত দিলে কি হয়? কলকেতায় তো কত মেয়েমানুষ লেখাপড়া করে?"

"তোকে বলেছে করে! পড়লে চোখ কানা হয়ে যায় তা জানিস?"

"কক্ষনো না, মিছে কথা! বড্ডই তুই জানিস! যারা পড়ছে তারা সব অমনি কানা হয়ে যাচ্ছে! হুঁঃ।"

কলকেতা নামক অ-দৃষ্ট সেই দেশটায়, কদাচ কখনও যেখানের নাম কানে আসে, সেখানে সত্যিই কোনও মেয়েমানুষ লেখাপড়া করে কিনা, এবং করলে তাদের চক্ষুযুগলকে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন রাখতে পারে কিনা, এ সম্পর্কে নেড়ুর স্পষ্ট কিছু জানা নেই, তবু নিজের অভিমতকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রাণপণ চেষ্টা করে সে, "এখন না যাক—আসছে জন্মে যাবে। অমনি না!"

"আসছে জন্মে! হি-হি-হি! তাদের আসছে জন্মটা তুই দেখে এসেছিস

বুঝি? আমি এই তোকে বলে দিচ্ছি নেড়ু, ওসব কিচ্ছু হয় না। বিয়ে তো ভাল কাজ, করলে কখনও পাপ হতে পারে?"

লেখাপড়ার ব্যাপারে বুদ্ধি না খুললেও কূটতর্কের ব্যাপারে নেড়ু ওস্তাদ, তাই সে অকাট্য একটি যুক্তি প্রয়োগ করে, "নারায়ণ পুজোও তো ভাল কাজ, করে মেয়েমানুষরা? ছুঁতে তো পায় না! ভগবান বলে দিয়েছে ভাল কাজগুলো বেটাছেলেরা করবে, খারাপ কাজগুলো মেয়েমানুষরা করবে, বুঝলি?"

"হ্যাঁ, বলেছে ভগবান তোর কান ধরে!" ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে সত্য, "ভগবান কখনো অমন একচোখো নয়। ওসব বেটাছেলেরাই ছিষ্টি করেছে।"

বচসার শব্দ খুব মৃদু হচ্ছিল না, শব্দে আকৃষ্ট হয়ে পুণ্যি এসে দাঁড়ায় এবং সকৌতূহলে প্রশ্ন করে, "কি ছিষ্টি করেছে রে বেটাছেলেরা?"

সত্য মুহূর্তে অনুত্তেজিত ভাব পরিগ্রহ করে বলে, "কিছু না, শাস্তরের কথা হচ্ছে।"

শাস্তর!

পুণ্যি হালে পানি পায় না।

সহসা এখানে শাস্ত্রালোচনা শুরু হল কী বাবদ, সেটা অনুধাবন করতে চেষ্টা করে। ইত্যবসরে নেড়ু সেই 'বলে দেওয়া'র সুরে বলে ওঠে, "সত্যর সাহসখানা শুনবি পুণ্যিপিসী? তালপাতে হাত দিয়েছে, আবার বলছে 'দিয়েছি তো হয়েছে কি'!"

তালপাতে হাত!

এটা আবার আর এক আকস্মিকতা। তালপাতটা কি জাতীয় সহসা সেটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না পুণ্যবতী।

"তালপাত কি রে?" প্রশ্ন করে সে সত্যর মুখের দিকে তাকিয়ে।

তাকে 'হাঁ' করে দিয়ে, সত্য হেসে উঠে দেওয়ালে পোঁতা পেরেকে গোঁজা একখানা তালপাতার হাতপাখা পেড়ে নিয়ে বলে ওঠে, "এই যে এই! দেখ, এখন হাতে পোকা পড়ল কিনা আমার!"

"সত্য!"

নেড়ু চোখ পাকিয়ে বলে, "মা সরস্বতীকে নিয়ে তামাশা করছিস তুই?"

প্রত্যেক সময় প্রত্যেক ব্যাপারেই সত্য জিতে যায়, নেড়ু হারে। নেড়ুর

মজ্জায় অবস্থিত পৌরুষবোধ এতে যথেষ্টই আহত হয়, আজ সহসা সত্যকে শাসন করবার একটা ছুতো পেয়ে নেড়ুর আর উল্লাসের সীমা নেই। তাই সহসা করতলগত সেই শক্তিটাকে অবহেলায় বাজে খরচ করে ফেলতে পারছে না, রীতিমত করে ভাঙিয়ে খেতে চাইছে চেখে চেখে।

এবার আর হাসে না সত্য, বিরক্তি প্রকাশ করে, সেই ওর অভ্যস্ত ভঙ্গীতে জোড়াভুরু কুঁচকে, "হাঁদার মতন কথা কস নে নেড়ু। তামাশা আমি মা সরস্বতীকে করছি না, করছি তোকে। তালপাতে একটু হাত দিয়েছি তো কী কাণ্ডই করছিস! যেন সগ্‌গো মত্য রসাতলে গেছে! শুধু হাত দেওয়া কেন, আমি তো লিখতেও পারি।"

"লিখতেও পারিস!"

যুগপৎ নারী-পুরুষ দুইকণ্ঠে উচ্চারিত হয় এই সর্পাহত-কণ্ঠবৎ শব্দ। আড়ষ্ট হয়ে গেছে পুণ্যি আর নেড়ু।

কিন্তু নিষ্ঠুর সত্য ওদের ওই আঘাতপ্রাপ্ত চিত্তেই আরও আঘাত হেনে বসে, "পারিই তো, এই দেখ্।"

ঝপ করে আলোচ্য তালপত্রখণ্ডের একখানা টেনে নিয়ে দোয়াতে কলম ডুবিয়ে পরিপাটি করে লিখে ফেলে সত্য, "কর খল ঘট।" লিখে অদৃশ্যের উদ্দেশে আর একটা প্রণাম ঠুকে বলে, "আরও কত লিখতে পারি।"

বিস্ময়ের ঘোর কাটতে কিছুক্ষণ লাগে। পুণ্যির চাইতে নেড়ুই বেশী বিস্ময়াহত। যে দুরূহ কর্মের চেষ্টায় তার ঘাম ছুটে যায়, এত অনায়াসলীলায় সেটা করে ফেলে সত্য!

তা ছাড়া কেমন করে?

মা সরস্বতী কি সহসা ওর উপর ভর করেছেন? যেমন নাকি শুনতে পাওয়া যায় কবি কালিদাসের উপর করেছিলেন?

লেখা শব্দ কটির উপর চোখ রেখে ঝিম্ হয়ে তাকিয়ে থাকে নেড়ু। আর পুণ্যি স্পর্শ বাঁচিয়ে তালপাতখানার উপর ঝুঁকে পড়ে বিস্ফারিত নেত্রে বলে, "কোথ্‌থেকে শিখলি রে সত্য? কে শেখালে?"

"শেখাতে আবার কার দায় পড়েছে, আমি নিজে নিজেই শিখেছি। দেখে দেখে!"

"নিজে নিজেই শিখেছিস? দেখে দেখে?"

"না তো কি?"

"দো'ত কলম পেলি কোথা ?"

"দো'ত কলম কে দিচ্ছে !" সত্য ঝোঁকের মাথায় তার গোপন কথাটি প্রকাশ করে বসে, "বটপাতার ঠুলি গড়ে, তার মধ্যে পুঁইমেটুলির রস গুলে কালির মতন করি।"

তাজ্জব বনে যাওয়া দুটি প্রাণী ক্ষীণকণ্ঠে বলে, "আর পাত কলম ?"

"তোরা আর 'হাঁ'-করা কথা কস নে বাপু। পৃথিবীর তালগাছ কি কেউ সিঁদুকে বন্ধ করে রেখেছে, না আকিঞ্চন করে খুঁজলে একটা শরকাঠি মেলে না ?"

গিন্নীর মতন মুখ করে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে সত্য।

এতক্ষণে বুঝি হদিস পায় পুণ্যি। তা সেও গিন্নীদের মত গালে হাত দিয়ে বলে, "তাহলে তুই লুকিয়ে লুকিয়ে মকৃশ করিস ? উঃ ধন্যি বাবা ! কাউকে টেরটি পেতে দিস না। কখন হাত পাকাস ?"

সত্য রহস্যের হাসিতে মুখ রঞ্জিত করে বলে, "যখন তোরা থাকিস না।"

"কিন্তু সত্য !" পুণ্যি চিন্তিত স্বরে বলে, "খেয়াল করে তো করছিস, দেখে আহ্লাদও হচ্ছে, কিন্তু হাজার হোক মেয়েমানুষ, এতে তোর পাপ হবে না ?"

"কেন পাপ হবে কেন ?" সত্য সহসা উদ্দীপ্ত তেজের সঙ্গে বলে ওঠে, "মেয়েমানুষরা যে রাতদিন ঝগড়া কোঁদল করছে, যাকে তাকে গালমন্দ শাপ-মন্যি করছে, তাতে পাপ হয় না, আর বিদ্যে শিখলে পাপ হবে ? বলি স্বয়ং মা সরস্বতী নিজে মেয়েমানুষ নয় ? সকল শাস্তরের সার শাস্তর চার বেদ মা সরস্বতীর হাতে থাকে না ?"

নেড়ুর আর বাক্যস্ফূর্তি নেই।

এত বড় অকাট্য যুক্তির সামনে পড়ে গিয়ে যেন বিরাট একটা দৃষ্টির দরজা খুলে যায় তার চোখের সামনে।

সত্যিই তো বটে, মা সরস্বতীটি স্বয়ং নিজেই তো মেয়েমানুষ !

এত বড় স্পষ্ট সত্য কি করে এত দিন তার দৃষ্টির বাইরে ছিল ? আর এই সত্যবতীটাই বা কেমন করে উদ্‌ঘাটন করে ফেলেছে সেই সবাইয়ের ভুলে থাকা, অথচ পরম স্পষ্ট কথাটাকে !

"নে, পুণ্যি ঘাটে যাই চ !"

আলোচনায় ইতি টেনে দিয়ে উঠে পড়ে সত্যবতী, "আর দেরি করলে গিন্নীরা ভাত গেলবার জন্যে হাঁক পাড়বে, ভাল করে চানই হবে না।"

কথাটা মিথ্যা নয়, জলে পড়লে সহজে আশ মিটতে চায় না এদের! সাঁতার দিতে দিতে হাঁপিয়ে না পড়া পর্যন্ত 'ভাল করে চান' হয় না।

"চ" বলে উঠে পড়ে পুণ্যি, কিন্তু নেড়ুর সঙ্গে চোখে চোখে একটা ইশারা হয়ে যায় তার।

কিন্তু না, অসদভিপ্রায় ছিল না তাদের, 'বলে দেওয়া'র মনোভাবও ছিল না আর। সত্যর গুণপনা সমাজে প্রকাশ করে সকলকে চমৎকৃত করে দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল।

সত্য যে তাদেরই একজন।

সত্যর মহিমায় তো তাদেরই মহিমা।

কিন্তু সদভিপ্রায়ের ফল কি সব সময় সুস্বাদু হয়?

হয় না।

হয় না, সেইটাই আর একবার প্রমাণিত হয়ে গেল নেড়ুর সত্যোদ্ঘাটনে।

হুলস্থুল পড়ে গেল অন্দর-বাড়িতে।

প্রচ্ছন্ন বইতে লাগল রামকালীর মেয়েকে আশকারা দেওয়ার সমালোচনা, আর প্রত্যক্ষে ছিছিক্কার পড়তে লাগল সত্যর বুকের পাটার।

ও কি ভেবেছে শ্বশুরঘর করতে হবে না ওকে?

"করতে হবেও না", শিবজায়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলেন, "শ্বশুররা টের পেলে উদ্দিশে হাতজোড় করে ত্যাগ করবে ও বৌকে।"

মোক্ষদা বলেন, "হারামজাদী যখনই জটার নামে ছড়া বেঁধেছিল, তখনই সন্দ হয়েছিল আমার। এখন বুঝছি।"

রাসুর মা কোন দিনই কোন কথায় বড় থাকে না, কাজের পাহাড় নিয়েই কাটায় সারা দিন, কিন্তু আজকের এই অপরাধের আবিষ্কর্তা নাকি স্বয়ং তারই পুত্ররত্ন, তাই বোধ করি কিছুটা দাবি অনুভব করে কথা বলার।

আস্তে আস্তে বলে, "একে তো ঘরের একটা বৌ যা নয় তাই কেলেঙ্কারি করে গালে-মুখে চুনকালি দিয়ে, জন্মের শোধ লোকের কাছে হেয় করে রেখে গেল, আবার ঘরের মেয়েরাও যদি যা ইচ্ছে তাই করতে থাকে—"

কথা শেষ করে না রাসুর মা, শুধু দুটো পাতকই যে একই গর্হিতের পর্যায়ে পড়ে সেইটুকুরই ইশারা দেয়।

কাঠ হয়ে তাকিয়ে থাকে ভুবনেশ্বরী।

শুধু কাশীশ্বরই নীরব। তাঁর আর মুখ নেই।

সমালোচনার উদ্দামতা কিছুটা স্তিমিত হলে দীনতারিণী প্রায় মিনতির ভঙ্গীতে বলেন, "যাক গে বাবা, ওই নিয়ে আর বেশী কথাকথিতে কাজ নেই সেজঠাকুরঝি। প্রবাদে বলে কথা কানে হাঁটে। কোন্ সূত্রে কার দ্বারা চালিত হয়ে কুটুমবাড়ির কানে উঠবে, হয়তো সেই নিয়ে কি বিপত্তি বাধবে কে বলতে পারে। একে তো—"

দীনতারিণীও কথায় একটা অকল্পিত সম্ভাবনা উহ্য রেখে টেনে ছেড়ে দেন।

কাশীশ্বরীর সামনে আর শঙ্করীর কথা স্পষ্ট করে তোলেন না।

তবু মোক্ষদা উচ্চ চীৎকারে ভবিষ্যদ্বাণী করতে ছাড়েন না, "সে তুমি যতই সাবধান হও বড়বৌ, আমি এই আগ্ বাড়িয়ে বলে দিচ্ছি, ও মেয়ের কপালে অশেষ দুঃখ আছে। আজ নয় তুমি আমি চেপে গেলাম, কিন্তু ওকে নিয়ে যারা ঘর করবে, তাদের কি আর গুণ বুঝতে বাকী থাকবে? হবে না তো কি, বাপে শাসন না করলে কি আর বেয়াড়া মেয়ে-ছেলে শায়েস্তা হয়?"

দীনতারিণী অকূলের কূল হিসেবে ম্রিয়মানভাবে বলেন, "তা, তুমি না হয় রামকালীকে বুঝিয়ে বলো?"

"রক্ষে করো বড়বৌ! আমি আর হেয় হতে চাই না। আমি লাগাতে যাব, আর তিনি মেয়েকে শাসন তো দূরের কথা, উল্টে আরও আশকারা দেবেন।"

অগত্যাই দিশেহারা দীনতারিণী ভুবনেশ্বরীর প্রতিই দৃষ্টিক্ষেপণ করেন, "তা তুমিও তো সময়ান্তরে যখন তার মনমেজাজ ঠাণ্ডা দেখবে, একটু বুঝিয়ে বলতে পার মেজবৌমা? সত্যিই যে মেয়ে তোমার স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠছে। পরের ঘরে পাঠাতে তো হবে?"

ভুবনেশ্বরী অবশ্য এ কথার কোন উত্তর দেয় না। দেওয়া সম্ভবও নয় তার পক্ষে। যদিও তার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, তবু গুরুজনের সমক্ষে স্বামী সম্পর্কে উল্লেখই যে যারপরনাই লজ্জাজনক। ভুবনেশ্বরী যে রামকালীর সঙ্গে কথা কয়, এত বড় লজ্জার কথাটা শাশুড়ী এই লোকসমাজে প্রকাশই বা করে বসলেন কেন? ছি ছি!

লজ্জা প্রতিকারের আর কিছু না দেখে মাথার ঘোমটাটাই আরও খানিকটা বাড়িয়ে দিয়ে মাথা হেঁট করে ভুবনেশ্বরী।

তা মাথাটা আর ভুবনেশ্বরী উঁচু করতে পায় কখন ?

স্বামীকেও যে তার বড় ভয়।

তবু বড্ডই চিন্তাগ্রস্ত হচ্ছে সে মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে। অহরহ সকলেই যে বলছে—'ও মেয়ে শ্বশুরঘর করতে পারবে না।'

আসামী এক, বিচারকও এক, শুধু কাঠগড়া আর অভিযোক্তা আলাদা।

তবে আসামীকে প্রথমেই হাজির করে না ভুবনেশ্বরী, তাকে শাসিয়ে রেখে এসে, অনেক কৌশলে ভয়ানক একটা দুঃসাহসিক চেষ্টায় দিনের বেলা একবার স্বামীর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ যোগাড় করে ফেলে সে। রামকালী যখন মধ্যাহ্ন বিশ্রাম করছেন, সেই সময় কাছে এসে ঘোমটা দিয়ে দাঁড়ায়।

রামকালী ঈষৎ আশ্চর্য হয়ে বলেন, "কিছু বলবে ?"

স্বামীর স্নেহকোমল সুরে সহসা চোখে জল এসে যায় ভুবনেশ্বরীর, উত্তর দিতে পারে না, শুধু ঘোমটাটা একটু কমায়।

"কি হল ?" রামকালী মৃদু কৌতুকে বলেন, "বাপের বাড়ি যেতে ইচ্ছে হচ্ছে ?"

"না।" ভুবনেশ্বরী মাথা নেড়ে বাষ্পরুদ্ধস্বরে বলে, "বলছি সত্যর কথা।"

"সত্যর কথা! কেন ?" আর একটু হাসেন রামকালী, "আবার কি মহা অপরাধ করে বসল সে ?"

"করছেই তো সব সময়," অভিমানের আবেগে কথায় জোর আসে ভুবনেশ্বরীর, "তুমি তো সবই হেসে ওড়াও। কথা শুনতে হয় আমাকেই।"

"বাজে কথা গায়ে মাখতে নেই মেজবৌ।"

"বাজে ? মেয়ে কি করেছে শুনলে আর—"

"কি করেছে ?"

"লিখেছে।"

"লিখেছে! লিখেছে কি ?"

"তা জানি না। নেড়ুর তালপাতে কি সব বইয়ের কথা লিখেছে। আবার নাকি আসপদ্দা করে বলেছে আরও অনেক লিখতে পারে। বুকের পাটা কত, বাগান থেকে তালপাতা কুড়িয়ে শরকাঠি যোগাড় করে পুঁইমেটুলির রস দিয়ে লেখা শিখেছে!

এর পর রামকালী চমৎকৃত না হয়ে পারেন না। বলেন, "তাই নাকি? গুরুমশাইটি কে? নেড়ুই নাকি?"

"নেড়ু? নেড়ু বলেছে সাতজন্ম চেষ্টা করলেও নাকি অমন হরফ সে লিখতে পারবে না।"

"বটে! কই তাকে একবার ডাক তো দেখি।"

আসামী পাশের ঘরেই অবস্থান করছে, ভুবনেশ্বরী তাকে চোখ রাঙিয়ে বসিয়ে রেখে এসেছে।

স্বামীকে যে খুব বেশী দুশ্চিন্তিত করতে পেরেছে ভুবনেশ্বরীর এমন ভরসা হয় না, শাস্তির মাত্রা কি আর তেমন গুরু হবে? অথচ লঘু শাস্তিতে কাজ হবে বলে মনে হয় না, কারণ সত্যর ভাব যথারীতি অনমনীয়। তাই স্বামীকে একটু তাতিয়ে তোলবার আশায় বলে, "ডাকছি, বেশ ভাল করে শাসন করে দিও। শুধু যে আসপদ্দার কাজ করেছে তাও তো নয়, আলাত পালাত কত সব তক্ক করেছে। 'কলকাতায় নাকি অনেক মেয়েমানুষ আজকাল লেখাপড়া শিখছে, তাদের তো কই চোখ কানা হচ্ছে না, বিদ্যের দেবী মা সরস্বতীই তো নিজে মেয়েমানুষ' এই সব বাচালতা। তুমি একটু উচিত শিক্ষা দিয়ে বকবে মেয়েকে, বুঝলে?"

শেষাংশে মিনতি ঝরে পড়ে ভুবনেশ্বরীর কণ্ঠে।

সরে গিয়ে পাশের ঘর থেকে ইশারায় ডাকে মেয়েকে। স্বামীর সামনে তো আর গলা খুলতে পারে না।

সত্য এসে হেঁটমুণ্ডে দাঁড়ায়।

কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াবার সময় এটাই পদ্ধতি সত্যর। উত্তরদানকালে মুখ তোলে।

রামকালী প্রথমটায় একটুও অন্তত ধমক দেবেন এ আশা ছিল ভুবনেশ্বরীর, কিন্তু তিনি তাকে হতাশ করলেন। ভাবলেশশূন্য কণ্ঠে সহজভাবে বললেন, "তুমি নাকি লিখতে শিখেছ?"

মুখটা অবশ্য একটু পাংশু হল সত্যবতীর।

"কই, কি লিখেছ দেখি?"

অস্ফুটে যা উত্তর দেয় সত্য তার অর্থ এই—অপরাধের পর আর সেই অপরাধের চিহ্ন সম্পর্কে সে ওয়াকিবহাল নয়। নেড়ু জানে।

"আচ্ছা ঠিক আছে। আবার লিখতে পার?"

সত্যবতী মুখ তুলে তাকায়।

কই বাপের চোখে তো রুদ্ররোষের চিহ্ন নেই। তবে বোধ হয় তেমন রাগ করেন নি। তাই এবার সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে সত্য।

"আচ্ছা কই লেখো দিকি।"

হাত বাড়িয়ে চৌকির পাশে অবস্থিত জলচৌকিতে রক্ষিত দোয়াত কলম ও খসখসে একখানা বালির কাগজ টেনে নেন রামকালী, বলেন, "লেখো। যা শিখেছ লেখো।"

এ কী! এ যে হিতে বিপরীত!

ধমক চুলোয় যাক, মেয়ের হাতে আবার কাগজ কলম তুলে দিচ্ছেন রামকালী!

ভুবনেশ্বরী কি ডুকরে কেঁদে উঠবে, না নিস্পন্দ চিত্তে অপেক্ষা করবে নাটকের শেষ দৃশ্যের জন্যে?

অবশ্য এমনও হতে পারে, যাচাই করে দেখছেন নেড়ুর কথার সত্যতা।

সত্যি, আগাগোড়া ব্যাপারে নেড়ুর চালাকিও তো হতে পারে।

কিন্তু তাই কি? হতচ্ছাড়া মেয়ে তো অস্বীকারও করছে না!

ততক্ষণে সত্য ঘাড় গুঁজে দু-তিনটি শব্দ লিখে ফেলেছে। অবশ্য তাল-পাতার নিয়মে অধিক জোর প্রয়োগে কাগজগাত্রে সামান্য সামান্য ক্ষতের সৃষ্টি হল, কিন্তু লেখা হল।

রামকালী সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারকয়েক দেখে কোনও মন্তব্য না করে শান্তভাবে বলেন, "কলকাতায় অনেক মেয়ে লেখাপড়া করছে, একথা তোমায় কে বললে?"

"ছোটমামী।"

"তাই নাকি?—তিনি কোথা থেকে—ও তিনি যে কলকাতারই মেয়ে! তাই না?"

এ উদ্দেশটা ভুবনেশ্বরীকে। কিন্তু ভুবনেশ্বরী তো আর অত বড় মেয়ের সামনে গলা খুলে কথা বলতে পারে না, ঘাড় কাত করে সায় দেয়।

"তা তিনি জানেন লেখাপড়া? তোমার মামী?"

"একটু একটু জানেন। বেশী করে কবে আর শিখতে পেল বেচারা? শুধু বলছিল, একজন মেম নাকি দিশী ইস্কুল খুলেছে, আর একজন

সায়েব বিলিতী ইস্কুল খুলে দিয়েছে, কলকাতার মেয়েরা আর মুখ্যু থাকবে না।"

"মেয়েদের লেখাপড়া শিখে লাভ কি? তারা কি নায়েব গোমস্তা হবে?"

সকৌতুক হাস্যে মেয়েকে প্রশ্ন করেন রামকালী।

এবার সত্যবতীর তেজের পালা।

সব সইতে পারে সে, সইতে পারে না ব্যঙ্গ।

"নায়েব গোমস্তা হতে যাবে কেন? লেখাপড়া শিখে নিজে নিজে রামায়ণ মহাভারত পুরাণ বই-টই পড়তে পারে তো? কবে কথকঠাকুর কোথায় পড়বেন বলে অপিক্ষে করে থাকতে হয় না।"

মেয়ের এই ক্রুদ্ধমূর্তি আর সগর্ব উক্তি কি রামকালীর খুশির খোরাক হয়? তাই আরও একটু উত্তপ্ত করতে চান তাকে?

"তা মেয়েমানুষের এত বেদপুরাণ জানবার দরকারই বা কি?"

এবার সত্যবতী স্থান পাত্র বিস্মৃত হয়ে নিজমূর্তি ধরে, "এত যদি দরকারের কথা, তো মেয়েমানুষের জন্মাবারই বা দরকার কি, তাই বল তো বাবা শুনি একবার?"

মেয়ের এই দুঃসাহসে ভুবনেশ্বরীর বুক থর থর করে, অত বড় মানুষটার মুখে মুখে এতখানি চোপা!

হবে না, হবে না—এ মেয়ের ককখনো শ্বশুরবাড়ি ঘর করা হবে না।

কিন্তু ভুবনেশ্বরীকে চমকে দিয়ে সহসা হেসে ওঠেন রামকালী, বেশ সশব্দেই।

তার পর মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন, "তুমি লেখাপড়া শিখতে চাও?"

"চাই তো, পাচ্ছি কোথায়?"

"ধরো যদি পাও?"

"তা হলে রাতদিন লেখাপড়া করব।"

"অতটা করতে হবে না। নিয়ম করে কিছুক্ষণ পড়লেই হবে। কাল থেকে দুপুরবেলা এই সময় আমার কাছে পড়বে।"

"পড়বে!"

ভুবনেশ্বরী আর কথা না বলে পারে না।

"হ্যাঁ, পড়বে লিখবে। পুঁইমেটুলির কালি দিয়ে নয়, সত্যিকার দোয়াত কলমই দেব ওকে।"

"বাবা!"

সত্যর মুখ দিয়ে মাত্র এই দুটি অক্ষর সম্বলিত শব্দটা বেরোয়। আর ভুবনেশ্বরীর দুচোখে শ্রাবণ নামে।

ষোলো

বসেছে কাব্যপাঠের আসর।

ঋতুরঙ্গ কাব্য! 'বর্ষাখণ্ড' শেষ করে প্রকৃতিদেবী সবেমাত্র "শরৎখণ্ডের" মলাটখানি খুলে ধরেছেন, এখনও তার ভিতরের শ্লোক পড়তে বাকী। এখনও কাশের বনে বনে শুরু হয় নি শ্বেতচামরের ব্যজনারতি, শুধু ভোরের বাতাসে লেগেছে অকারণ পুলকের স্পন্দন। শুধু আকাশের নীলে দর্পণের স্বচ্ছতা, পাখীদের 'শিসে' উল্লাসের তীক্ষ্ণতা। দেবী অনন্তকাল ধরে একই কাব্য আবৃত্তি করে চলেছেন, শেষ লাইনের পরই আবার গোড়ার লাইন, তবু সে কাব্য পুরনো হয়ে যায় নি, পুরনো হয়ে যায় না। অনন্তকালের মানুষের কাছে বয়ে নিয়ে আসে আশার বাণী, প্রত্যাশার স্বপ্ন, উৎসাহের সুর।

উৎসাহের জোয়ার লেগেছে বাংলার গ্রামে গ্রামে। প্রতীক্ষার উৎসাহ।

"মা দুর্গা আসছেন।"

'আসছেন বাপের বাড়ি। কৈলাস থেকে মর্ত্যলোকে।' এ কথা গল্পকথা নয়, বাংলার অন্তরের সত্য বিশ্বাসের কথা। বৎসরান্তে মা মাতৃরূপ আর কন্যারূপের সমন্বয় সাধন করে নেমে আসেন মাটি-মায়ের কোলে, এসে মায়ের কাছে সুখদুঃখের কথা কন, বিদায়কালে চোখের জল ফেলেন, এ কথা কি অবিশ্বাসের? দেবতার সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন পাতিয়ে, দেবতাকে ঘরের লোক করে নিয়েই তো বাঙালীর ঘরকন্না। তাই তারা শিবের বিয়ে দেয়, ইতু-মনসার 'সাধ' দেয়, ভাদুকে সোহাগ করে, আর পার্বতীকে পতিগৃহে পাঠাতে চোখের জলে বুক ভাসায়। আর সবাই তবু দেবদেবী, উমা যে একেবারে ঘরের মেয়ে। মহিমায় তাঁর সহস্রনাম থাক, আসল নাম যে সেই উমা নামটি। শরৎ পড়তেই ভিখারী বৈষ্ণবরা সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে

যায় খঞ্জনীর তালে তালে। "আয় মা উমাশশী, নিরখি মুখশশী, দিবানিশি আছি আসার আশায়।"

হয়তো একটি গ্রামে একটি মাত্র ভাগ্যবানের বাড়িতেই কন্যারূপিণী জগন্মাতার পদার্পণ ঘটবে, কিন্তু গ্রামের প্রতিটি ঘরের অন্তরবীণায় বাজছে আগমনীর সুর।

এবারে আশ্বিনের প্রথম দিকেই পূজো, তাই ভাদ্র পড়তে পড়তেই 'সাজ সাজ' রব। সংসারের নিত্য রান্না খাওয়া বাদে অন্য সব কিছুতেই যে করা চাই মাসখানেকের মত আয়োজন। পূজোর মাসে তো আর কেউ মুড়ি ভাজবে না, চিঁড়ে কুটবে না, মুড়কি মাখবে না, পক্বান্ন বাঁধবে না, মেটে ঘরের দেয়াল নিকোবে না? এমন কি সলতে পাকানো, সুপুরি কাটা, নারকেল কাঠি চাঁছা, সবই সেরে রাখতে হবে দেবীপক্ষ পড়ার আগে। কোজাগরীর পর আবার এ সব কাজে হাত, আবাব কাঁথায় ফোঁড় তোলা, আর তার সঙ্গে সদ্য-বিগত উৎসবের স্মৃতি রোমন্থন।

ভাদ্র মাসে শুধু যে আগমনীর প্রস্তুতি তাও তো নয়, বর্ষার পর যে অনেক কাজ এসে জোটে গেরস্তর মেয়েদের। স্যাঁৎসেতে বিছানা কাঁথা, তোরঙ্গে তোলা কাপড় চাদর, ভাঁড়ারের সম্বচ্ছরের মজুত বড়ি আচার, মশলাপাতি, ডাল কড়াই, সব কিছুকে টেনে ভাদুরে রোদ খাওয়ানো তো কম কাজ নয়।

ভুবনেশ্বরীর মা নেই, ভাজেরাই সংসারের গিন্নী, কদিন থেকে দুপুর ভোর এই কর্মকাণ্ড নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে তারা। আজ পড়েছে নাড়ু নিয়ে। হাঁড়িভর্তি মুগের নাড়ু, নারকেলের নাড়ু করে মাচায় তুলে রাখতে পারলে মাসখানেকের মত 'জলপানে'র দায়ে নিশ্চিন্দি। আর পূজোর মাসে ছেলেপুলের পাতে দুটো ভালমন্দ দিতেও হয়। ভুবনেশ্বরীর বড় ভাজ নিভাননী জোর হাতে নারকেল কুরছিল আর ছোট ভাজ সুকুমারী জাঁতা ঘুরিয়ে মুগ ভাঙছিল, হঠাৎ উঠোনের দরজার শিকলি নড়ে উঠল।

"এই দেখ কাজের গুরু কামাই" নিভাননী নিচু গলায় বলে, "কে আবার এখন বেড়াতে এল কাজ পণ্ড করতে! নে ছোট বৌ, ওঠ, দুয়োর খোল।"

সুকুমারীর অবশ্য মনোভাবটা ঠিক বড় জায়ের সমর্থক নয়, একঘেয়ে কাজ করতে করতে বাইরের হাওয়া একটু ভালই লাগে তার। নিভাননী যদি একটু গল্প-গাছা করতে জানে, মুখ বুজে খালি কাজ আর কাজ!

দরজা খুলেই সুকুমারী উল্লাসধ্বনি করে ওঠে, "ওমা কি আশ্চয্যি, পূবের স্থয্যি কি পশ্চিমে উঠেছে আজ, না যার মুখ কখনও দেখি নি তার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছি ?"

এ হেন সংলাপে নিভাননীরও ব্যাজার মুখ কৌতূহলে সরস হয়, সে মুখ বাড়িয়ে বলে, "কে এলো গো, কার সঙ্গে এত রসের কথা ?"

"এই যে ডুমুরের ফুল, ঠাকুরঝি।" বলে সুকুমারী তাড়াতাড়ি ননদের পা ধোবার জল আনতে ছোটে। ভুবনেশ্বরী মুখের ঘোমটা নামিয়ে দাওয়ায় বসে পড়ে ধুলো পা ঝুলিয়ে। ভাদ্দরের কড়া রোদে তার ফর্সা মুখটা লাল টকটকে হয়ে উঠেছে, ঘোমটা দেওয়ার দরুন চুলের গোড়ায় আর গলার খাঁজে ঘাম গড়াচ্ছে।

এমন করে ভররোদে হেঁটে আসা ভুবনেশ্বরীর পক্ষে সত্যিই অভাবনীয় ঘটনা। একে তো আসাই তার কম, তা ছাড়া যদি আসার বাসনা প্রকাশ করে, পালকি করে পাঠিয়ে দেন রামকালী। যদিও এর জন্যে বাড়ির আর পাঁচজন ঠেস-টিটকিরি দিতে ছাড়ে না, পাড়ার সমবয়সী বৌরা বলে 'বাদশার বেগম', তবু রামকালীর নির্দেশ মেনে চলতেই হয়।

কিন্তু আজ ব্যাপারটা কি ?

পা ধোবার জল আর গামছা এগিয়ে দিয়ে একখানা ঝালর-বসানো হাতপাখা নিয়ে ননদকে বাতাস করতে থাকে সুকুমারী। একে তো গুরুজন, তায় আবার বড়ঘরের ঘরনী।

"কার সঙ্গে এলে ?" নিভাননী প্রশ্ন করে।

ভুবনেশ্বরী কিন্তু সে কথার উত্তরের আগেই বলে ওঠে, "পাখায় ঝালর বসিয়েছে কে গো ?"

"কে আবার, ছোটগিন্নী!" নিভাননী অগ্রাহ্যে মুখ বাঁকিয়ে বলে, "রাতদিন যিনি সংসারের সব্বতাতে বাহার কাটছেন!"

সুকুমারীর মুখটা চুন হয়ে যায়, ভুবনেশ্বরী তাড়াতাড়ি বলে, "তা বাহার কাটা তো ভালই, কেমন খাসা দেখাচ্ছে!"

"হোক গে," নিভাননী আর একবার মুখ বাঁকায়, "এখন অবধি তো গাই দোয়াতে শিখল না, কুলো পাছড়াতে পারল না। ঢেঁকিশালে গিয়ে যা রঙ্গ, যদি দেখ তো বুঝবে। না পারে 'পাড়' দিতে, না পারে হাতে-পাতে নেড়ে দিতে, পাড়া-পড়শীকে তোয়াজ করে ডেকে এনে কাজ উদ্ধার করতে

হয়। আসল কাজ চুলোয় দিয়ে ভাঁড়ারের হাঁড়ি-কলসীর গায়ে চিত্তির কেটে, শিকের দড়িতে কড়ির থোপ্‌না গেঁথে, আর পাখার ঘাড়ে শালুর ঝালর ঝুলিয়ে গেরস্তর সগ্‌গের সিঁড়ি হবে!"

ভুবনেশ্বরী দেখে হিতে বিপরীত, এই সূত্র ধরে নিভাননী আরও কোথায় গিয়ে পৌঁছবে কে জানে। তা হলে তো আসল কাজই মাটি। ছোট ভাজকেই যে আজ তার দরকার। তবু ভুবনেশ্বরী আবার একটা ভুল চালই করে বসে। বসে এইজন্যেই যে নিচুতলাদের নিন্দাবাদ করে ওপরওয়ালাদের প্রসন্ন রাখার যে চিরন্তন কৌশল, সে কৌশলটা তার ভাল আয়ত্তে নেই বলেই। নিজের বাড়িতে তো সেই ভয়ে সে কথাই কয় না সহজে। দেখে ঘোমটা আর নীরবতা অনেক বিপদের রক্ষক। কিন্তু এটা নাকি ভুবনেশ্বরীর বাপের বাড়ি, তাই সাহসে ভর করে বলে বসে, "কেন বাপু, এই তো বেশ ডাল ভাঙছে। মুড়ি ভাজতেও পারে। অত বড় একখানা শহরের মেয়ে, আর কত পারবে?"

"তা বটে!" নিভাননী একটি উত্তপ্ত নিশ্বাস ফেলে বলে, "শহর কখনও চোখে দেখি নি, তার মন্মও জানি নে। ঘর-সংসারই বুঝি, আর বুঝি মেয়েমানুষের সেখানে হেরে গেলে লজ্জায় মাথাকাটা যায়।...বসো একটু, গুড়ের পানা করে আনি, রোদে এসেছ।"

রোদের সময় ঘরে কিছু না থাক, আখের গুড় জলে গুলে তাতে পাতিলেবুর রস মিশিয়ে খাওয়ার রেওয়াজ এদিকে আছে, নিভাননীর মগজে সেই সহজটাই আসে। কিন্তু সুকুমারীর ওই গুড়ের পানা জিনিসটায় বিষম বিতৃষ্ণা, তাই সে বড়জায়ের ওপর কথা-কওয়া রূপ অসমসাহসিক কাজটাও করে বসে ননদের প্রতি সমীহে। সসংকোচে বলে ফেলে, "কেন দিদি, 'মিছরি-নারকেল' গাছের ডাব তো পাড়ানো রয়েছে ঘরে।"

রয়েছে সেটা নিভাননীর মনে ছিল না, কিন্তু মনে পড়িয়ে দেওয়ায় অপদস্থের একশেষ হয়ে যায় সে। কে জানে ননদ মনে করল কিনা, ইচ্ছে করেই ডাবের কথাটা বিস্মৃত হয়েছে সে। এই ছোট বৌটা দেখতে ভালমানুষ হলে কি হবে, টিপে ডান। কিন্তু এক্ষেত্রে নিভাননীকে মনের রাগ মনে চেপে হাসতেই হয়। হেসে বলতেই হয়, "অই দেখ, ভাগ্যিস মনে করলি ছোটবৌ! আমার অমনিতর ভুলো মনই হয়েছে আজকাল, বুঝলে ঠাকুরঝি! ঠাকুরজামাইয়ের কাছ থেকে এবার একটা

সিঁতিশক্তির ওষুদ খেতে হবে। ··যা তবে ছোটবৌ, দুটো ডাব কেটে আন গে।"

"আহা কেন ব্যস্ত হচ্ছ বড়বৌ?" ভুবনেশ্বরী অকারণে গলা নামিয়ে বলে, "আমি এসেছি বিশেষ একটা দরকারে পড়ে, এখুনি চলে যেতে হবে।"

"ওমা শোন কথা! এখুনি চলে যেতে হবে কি গো? কি এমন বিশেষ দরকার পড়ল? এলেই বা কার সঙ্গে, যাবেই বা কার সঙ্গে? একা নাকি?"

"একা?" ভুবনেশ্বরী হেসে ওঠে, "সে আর এ কাটামোয় হবে না। এসেছি পিসশাশুড়ীর সঙ্গে। দুয়োর থেকে আমাকে ছেড়ে দিয়ে গেলেন, আবার ফিরতি মুখে ডেকে নিয়ে যাবেন। চুপিসাড়ে চলে এসেছি, ঘরে কেউ জানে না।"

"ঠাকুরজামাই?" নিভাননী রহস্যের হাসি হাসে।

ভুবনেশ্বরী নিভাননীর ঠাকুরজামাইয়ের প্রসঙ্গেই মাথার কাপড়টা একটু টেনে বলে, "তিনি তো ভিন্ গাঁয়ে গেছেন রুগী দেখতে, নইলে আর এত বুকের পাটা! নিতান্ত দায়ে পড়েই আসা, পিসশাশুড়ী সইয়ের বাড়ি আসছেন শুনে খুব কাকুতি করলাম, বলি, 'ওই পথ দিয়েই তো যাবে পিসীমা!' তা সেদিকে ভাল আছেন মানুষটা, কেউ শরণ নিলে তাকে বুক দিয়ে আগলান।"

"তা কাজটা কি?"

এবার ভুবনেশ্বরী থতমত খায়, কাজটা কি, সেটা নিভাননীর সামনে বলা সঙ্গত কিনা এতক্ষণে খেয়াল হয়। আসলে এসেছে সে সুকুমারীর কাছে একখণ্ড লেখা কাগজ নিয়ে, যে কাগজের হিজিবিজি রেখাগুলো এক দুর্বোধ্য ভ্রূকুটি হেনে তার দিকে ক্রমাগত তাকিয়ে আছে আজ কদিন থেকে।

সত্যবতীর লেখা একখণ্ড কাগজ!

জিনিসটা ভুবনেশ্বরীকে ভাবিয়ে তুলেছে। ঘরের কোণে ঘাড় গুঁজে লিখছিল সত্যবতী, হঠাৎ বুঝি পূজোর দালানে কুমোর এল এই বার্তা পেয়ে ছুটে চলে গিয়েছিল নেড়ু পুণ্যি আর আরও কুচোকাচাদের সঙ্গে, কাগজখানা চৌকিতে পাতা শেতলপাটির তলায় গুঁজে রেখে। ভুবনেশ্বরী কৌতূহলপরবশ হয়ে পাটিটি ঈষৎ উঁচু করে তুলে দেখতে গিয়েছিল কেমন আখর সত্যর হাতের, কিন্তু দেখতে গিয়েই স্তম্ভিত হয়ে গেল, গোটা গোটা আখরে ঠিক পত্তর ছাঁদে এ কী লিখছিল সত্য?

নকল করছিল?

কিন্তু নকল করবে যদি তো সামনে বই খোলা ছিল কই? সর্বনেশে মেয়ে নিজেই পয়ার বাঁধছে নাকি? ভয়ে বুকের রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল ভুবনেশ্বরীর. কিন্তু কাকে দেখিয়ে রহস্যের মীমাংসা হবে?

রামকালীকে তার বড় ভয়।

রাস্থকে বলতে গেলে পাঁচকান হবার সম্ভাবনা। তা ছাড়া বাড়িতে আর যারা লিখন-পঠনক্ষম, সকলেই তো ভুবনেশ্বরীর শ্বশুর-ভাসুর, ভেবে আর কূলকিনারা পাচ্ছিল না বেচারা। তার পর সহসাই মনে পড়ল সুকুমারীর কথা।

সুকুমারী পড়তে জানে।

বামালটা সরিয়ে ফেলে সুকুমারীর কাছে আসার তাল খুঁজছিল সে দু-তিন দিন থেকে! আড়চোখে দেখেছে, সত্য কখন একসময় শেতলপাটি উল্টে লণ্ডভণ্ড করে খোঁজাখুঁজি করেছে, আবার 'ধুত্তোর' বলে নতুন কাগজ নিয়ে বসেছে। সে কাগজে আর কোন্ রহস্যের রেখা এঁকেছে সত্য, সে কথা ভুবনেশ্বরীর অজ্ঞাত, জিজ্ঞেস করতে গেলে সত্য মারমুখী হয়। বাড়ির লোকের জ্বালায় যে একদণ্ড নিরিবিলিতে বসবার জো নেই তার, এ কথা স্পষ্ট গলায় ঘোষণা করতে বাধে না সত্যবতীর।

অতএব এই টুকরোটুকুই ভরসা।

ঘাড় গুঁজে গুঁজে কি এত লেখে সে জানবার জন্যে মায়ের মন নানা কারণেই ব্যাকুল হয়। ব্যাকুল হয় কৌতূহলে, ব্যাকুল হয় আশঙ্কায়।

সত্যকে যে শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে!

হায়, সত্য যদি ভুবনেশ্বরীর মেয়ে না হয়ে ছেলে হত। বাপের উপযুক্তই হত। কিন্তু ভুবনেশ্বরীর কপালে 'এক তরকারি মুনে বিষ'। একটা সন্তান তা মেয়ে।

"কি গো ঠাকুরঝি, বাক্যি-ওক্যি নেই কেন?"

নিভাননী অবাক হয়। এত কুণ্ঠা কিসের?

গরীব ননদ নয় যে, আশঙ্কা করবে ধার চাইতে এসেছে ভাজের কাছে।

আর চেপে রাখা চলে না, ঢোক গিলে বলতেই হয় ভুবনেশ্বরীকে—"এসেছিলাম ছোট বৌয়ের কাছে, একটা কাগজ পড়ানোর দরকার ছিল।"

"কাগজ!" নিভাননী আকাশ থেকে পড়ে, "কাগজ কিসের? কোন পাট্টা কোবলা নাকি?"

"না না, ওমা সে কি? সে সব আমি কোথায় পাব? এ ইয়ে—একটু চিঠির মর্তন।"

"চিঠির মতন! সেটা আবার কি বস্তু ঠাকুরঝি? আর সে পড়ানোর লোক তোমার বাড়ি হাঁটকে একটা পুরুষ বেটাছেলে কাউকে পেলে না, সাতপাড়া ডিঙিয়ে একটা মেয়েমাগীর কাছে পড়াতে এলে? কিছু গোপন বুঝি?"

সুকুমারী গিয়েছে ডাব কাটতে। ভুবনেশ্বরী অসহায় ভাবে একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে সহসাই দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে বলে, "কি যে বলো বড়বৌ, গোপন আবার কি? এই সত্যর একটু লেখা। বলি অষ্টপ্রহর কি এত লেখে বসে দেখি তো। বাড়িতে কাউকে দেখালে রসাতল করবে তো মেয়ে!"

নিভাননীর কানে আসতে বাকী ছিল না—সত্য লেখাপড়া করছে, তবু অজ্ঞের ভানে বলে, "বল কি ঠাকুরঝি, সত্যও কি তার ছোটমামীর মতন লেখাপড়া করছে? কালে কালে হল কি? বলি মেয়ে কি তোমার শামলা এঁটে কাছারি যাবে? সবাই তো তোমার ভাইদের মতন ভালমানুষ নয় যে, যা ইচ্ছে তাই চলে যাবে, শ্বশুররা এ খবর টের পেলে?"

"কি করব বড়বৌ, জানোই তো তোমাদের ননদাইকে, কেমন একজেদী? মেয়ে বললে পড়ব তো পড়ুক। মেয়ে আকাশের চাঁদ চাইলে চাঁদ পেড়ে আনতে যাবেন এমন মানুষ! তাই তো ভাবলাম কি লেখে বসে দেখি। ছেলেবুদ্ধি!"

বড় একটা পাথরবাটিতে ডাবের জল নিয়ে এসে দাঁড়াল সুকুমারী।

"ও বাবা কত? এত পারব না ছোটবৌ, তুমি একটু ঢেলে নাও।" বলে ভুবনেশ্বরী।

"খাও না, রোদে এসেছ।"

"তা হোক, অতটা নয় বাপু।"

অগত্যাই খানিক ঢালাঢালি করতে হল সুকুমারীকে। ভুবনেশ্বরী ইত্যবসরে ব্যাপারটাকে লঘুর পর্যায়ে ফেলবার বুদ্ধিটা এঁচে নিয়েছে, তাই ডাবের জলে চুমুক দিতে দিতে ঝট করে বাঁ হাতের মুঠো থেকে কাগজের টুকরোটা এগিয়ে দিয়ে বলে, "এই নাও বিদ্যেবতী বৌ, পড় দিকিন এটা! আমরা তো চোখ থাকতে অন্ধ!"

"জন্ম জন্ম যেন অন্ধই থাকি বাবা—" নিভাননী বিষমুখে বলে, "যে জাতের

দশহাত কাপড়ে কাছা নেই, তাদের আবার এত চোখ-কান ফোটার দরকার কি?" বলে, কিন্তু জিনিসটার ওপর এমন ভাবে হুমড়ে পড়ে, দেখে মনে হয় চোখ-কান থাকলে মুহূর্তে গ্রাস করে ফেলত। ভুবনেশ্বরী যাই বলুক, জিনিসটায় যেন রহস্যের গন্ধ।

সুকুমারী কাগজখানা উল্টে-পাল্টে বলে, "কি এ?"

"কি তা আমি বলব কেন? তুমি বলো?" কৌতুকের হাসি হাসে ভুবনেশ্বরী।

"একটা তো ত্রিপদী ছন্দের দেবীবন্দনা দেখছি, কার লেখা? খুব ভাল হাতের লেখা তো?"

'ত্রিপদী ছন্দ' শব্দটা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়, কিন্তু 'দেবীবন্দনা' কথাটার অর্থ জানা, তাই ভুবনেশ্বরীর বুক থেকে যেন একটা পাহাড় নেমে যায়, তবে জিনিসটা দোষণীয় নয়।

"পড় তো শুনি?"

সুকুমারী একটু শঙ্কিত দৃষ্টিতে বড়জায়ের দিকে তাকায়। নিভাননীর সামনে পড়া? তিনি এটাকে কোন্ আলোয় নেবেন? গুরুজনের প্রতি অসম্মাননা? কিন্তু নিভাননীই অভয় দেয়, "নাও, পড়ই শুনি। হাবা কালা কানা অন্ধদের একটু জ্ঞান দাও।"

অতএব সুকুমারী একটু কেসে একটু ইতস্ততঃ করে পড়ে—

"এসো মা জননী, দুর্গে ত্রিনয়নী,
এসো এসো শিবজায়া,
সন্তানের ঘরে এসো দয়া করে,
মহেশ্বরী মহামায়া!
তোমারে হেরিতে আশাভরা চিতে
রয়েছি আকুল হয়ে,
আসিবে মা তুমি, এই মর্ত্যভূমি,
পুত্র কন্যা সাথে লয়ে।
একটি বৎসর শূন্য আছে ঘর
দুঃখে আছি নিরবধি,
দিবস রজনী কাটে দিন গুণি,
কবে দিন দেবে—"

"ওমা এ কি, শেষ নেই যে?" সুকুমারী অবাক হয়ে বলে, "এ স্তোত্তর কোথায় পেলে ঠাকুরঝি?"

"আর বল কেন?" ভুবনেশ্বরী কুণ্ঠা দমন করতে হাতপাখাখানা তুলে জোরে জোরে নাড়তে নাড়তে বলে, "সত্যর কীত্তি। লিখছিল—কুমোর এসে কাঠামো বাঁধছে শুনে ফেলে দিয়ে ছুটে চলে গেল। আমি কুড়িয়ে তুলে –"

"তা নকল করেছে কোথ্ থেকে?"

সকৌতূহল প্রশ্ন করে সুকুমারী।

"নকল করেছে তা মনে হল না ছোটবৌ", ভুবনেশ্বরী যাকে বলে 'দোনা মোনা' সেই সুরে বলে, "ও মুখপুড়ী নিয্যস নিজেই বেঁধেছে।"

"কি যে বল ঠাকুরঝি," সুকুমারীর কণ্ঠে অবিশ্বাস, "নিজে বাঁধবে কি? অতটুকু মেয়ে এসব কথার মানে জানে?"

"জানে না কি করে বলি বৌ, মুখপুড়ী লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার নন্দাইয়ের কবরেজী শাস্তরের বইগুলো পর্যন্ত টেনে পড়তে বসে।"

"সে কথা আলাদা! পারুক না পারুক আম্বা করে বসে, কিন্তু ছন্দ বেঁধে আখর মিলিয়ে এত বড় একটা স্তোত্তর তৈরি কি সোজা নাকি?"

ছোটবৌয়ের এই অবিশ্বাসের সুর ভুবনেশ্বরীকে ঈষৎ থতমত করছিল, কিন্তু মেঘ উড়িয়ে দিল নিভাননী, যে নিজে এতক্ষণ মুখে আষাঢ়ের মেঘ নামিয়ে ছোটজায়ের 'অবলীলাক্রমে'র দিকে তাকিয়ে ছিল। সুকুমারীর কথা শেষ হতেই হাত নেড়ে বলে উঠল নিভাননী, "তা এতে আর আশ্চয্যি হবার কি আছে ছোটবৌ? ঠাকুরঝি মনে বেদনা পাবে তাই রেখে ঢেকে বলা, ঠাকুরঝির ওই মেয়েটিই কি সোজা? কতদিন আগে ভোঁদার নামে ছড়া বাঁধে নি ও? এ নয় মা দুগগার নামে বেঁধেছে! তবে ভাবনার কথা বটে। ঠাকুর-জামাইয়ের দবদবায় আমরা দশজনা নয় মুখে চাবি দিয়ে আছি, কিন্তু কুটুম তো তা মানবে না? একবার টের পেলে—"

কথা শেষ হল না, মোক্ষদার হন্তদন্ত মূর্তি দেখা গেল খোলা দরজার সামনে। "চলে এস মেজবৌমা, ঝটপট্ চলে এস, ওদিকে এক কাণ্ড হয়েছে।"

কাণ্ড হয়েছে!

কী সেই কাণ্ড!

ভুবনেশ্বরীর মুখে কথা যোগায় না, হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। সুকুমারী

তো আগেই ঘোমটা টেনে বসেছে। তবে নিভাননীর কথা আলাদা, এ বাড়ির গিন্নীর পদটা তার, এগিয়ে গিয়ে বলে, "কিসের কাণ্ড মাউই মা?"

"আর ব'লো না বাছা! সইয়ের বাড়িতে বসেছি কি না বসেছি, রাখলা ছোঁড়া 'রণপা' নিয়ে গিয়ে হাজির! কি সমাচার? না শীগ্‌গির চল, সত্যর শ্বশুর-বাড়ি থেকে লোক এসেছে। ভাগ্যিস দিদিকে বলে এসেছিলাম সইয়ের বাড়ি যাচ্ছি—"

না:, মোক্ষদার কথা শেষ হতে পারে না, সহসা ভুবনেশ্বরী ডুকরে কেঁদে উঠেছে।

"ওমা ও কি! কাঁদছ কেন মেজবৌমা? চল চল, অপিক্ষের সময় নেই।"

কিন্তু চলবে কে?

ভুবনেশ্বরীর শুধু পা দুখানাই নয় সমস্ত লোমকূপগুলো পর্যন্ত যে অবশ হয়ে গেছে।

সত্যর শ্বশুরবাড়ি থেকে লোক!

অতএব আর সন্দেহ কি যে সমস্ত জানাজানি হয়ে গেছে! তা ছাড়া আর কি অর্থ থাকতে পারে এরকম বিনা নোটিসে হঠাৎ শ্বশুরবাড়ির লোক আসার? কোথায় কে ঘরশত্রু বিভীষণ আছে, সে গিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে সত্যর ওই মারাত্মক অপরাধের, আর সত্যর বাপের ওই ভয়ানক দুঃসাহসের খবর! এর পর? এর পর আর কি, ভুবনেশ্বরী ভাবতে পারে না, শুধু ডুকরোনোর মাত্রাটা বাড়িয়ে বলে ওঠে, "ওগো পিসীমা গো, তুমি আমাকে এখেনে মেরে ফেলে রেখে যাও, বাড়ি অবদি যেতে পারবো না আমি।"

"আহা অধোয্য হচ্ছ কেন মেজবৌমা?" মোক্ষদা দেহটাকে প্রায় উল্‌টো-মুখো ঘুরিয়ে ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন, "এখন কি অধোয্যর সময়? এক্ষুনি না যেতে পারো, একটু সামলে নিয়ে ভেজের সঙ্গে যেও, আমি চললাম। পা তো আমারও কাঁপছে, কে জানে কী বাত্রা নিয়ে এসেছে! তা বলে কোত্তব্য তো ত্যাগ করা চলে না! আচ্ছা, আমি এগোলাম।"

'রণপা' ব্যতীতই রণ্‌পায়ের বেগে অদৃশ্য হয়ে যান মোক্ষদা।

ভুবনেশ্বরী যখন নিভাননীর সঙ্গে সন্তর্পণে খিড়কি দরজা দিয়ে ঢুকল, তখন বাড়ির চেহারা নিথর নিস্পন্দ!

যেন এইমাত্র কেউ একটা শোক-সংবাদ পাঠিয়েছে!

তা হলে?

নিভাননী ফিসফিস করে বলে, "বাড়ি এমন থমথমে কেন বল তো ঠাকুরঝি? মন তো ভাল নিচ্ছে না! আর পোড়া মনের স্বধর্মই তো কু-কথা গাওয়া! জামাইয়ের কিছু দুঃসংবাদ নেই তো?"

আধমরা মানুষটাকে চৌদ্দ আনা মেরে নিভাননী হৃষ্টচিত্তে উঠোনে পা দিয়ে এদিক ওদিক তাকায়।

দালানে কারা যেন নিঃশব্দে জটলা করে বসে রয়েছে, ঘোমটা দিয়ে বোধ করি সারদা ঘোরাঘুরি করছে, ছোট ছেলেমেয়েগুলোর পাত্তা নেই।

"এসো ঠাকুরঝি উঠে এসো, নিয়তি যা করবে তা তো সইতেই হবে, এখন দেখি গে চল কার কি হল!"

নিভাননী নিজে বুঝতে পারুক না পারুক, তার অবচেতন মনের একটা ফটোগ্রাফ নিতে পারলে সেখানে একটা প্রত্যাশার ছবি দেখতে পাওয়া যেত। জামাইটির 'কিছু' হলেই যেন প্রত্যাশাটি পূর্ণ হয়। ননদাইয়ের দব্‌দবা সেই গহন গভীরে যে একটি অনির্বাণ দাহ সৃষ্টি করে রেখেছে, সেটাও বুঝি কিঞ্চিৎ শীতল হয় এমন একটা কিছু হলে।

ভুবনেশ্বরী কিন্তু দাওয়ায় উঠে দালানের চৌকাঠ পার হবার সাহস সঞ্চয় করতে পারে না, উঠোনের পৈঠেতেই বসে পড়ে বলে, "আমার হাত পা উঠছে না বড়বৌ, তুমি দেখ গে।"

"শোন কথা! তুমি এখেনে এমন করে বসে থাকলে চলবে কেন? ভীমের গদা বুকে পড়লেও তো বুক পেতে নিতে হবে ঠাকুরঝি!" কণ্ঠস্বর সহানুভূতিতে কোমল হয়ে আসে নিভাননীর, "চল, আমি তোমায় আগলে দাঁড়াই গে।"

ভয় যতই তীব্র হোক, ভয়ের আকর্ষণটাও যে ততোধিক তীব্র! কাজে কাজেই উঠে পড়ে ভুবনেশ্বরী। আস্তে আস্তে দাওয়ায় উঠে দালানের কোণের দিকের একটা জানলায় উঁকি মারে। নিভাননী অবশ্য দরজায়

কিন্তু ব্যাপারটা কি হল?

'ভালমন্দে'র মত তো কিছু দেখাচ্ছে না! অন্ততঃ সত্যর শ্বশুরবাড়ি থেকে আগতা হৃষ্টপুষ্টাঙ্গী রমণীটির হিসেবে তো মনে হচ্ছে পুরোপুরি ভালই।

হয় কোনও দাসী, নচেৎ 'নাপিতমেয়ে', এ ছাড়া আর কে-ই বা আসবে? যেই হোক, আপাততঃ তাঁর আদরটা প্রায় মহারাণীর মত। 'জল খাওয়া'তে বসানো হয়েছে তাঁকে, চারিদিকে ঘিরে বসে আছেন দীনতারিণী, কাশীশ্বরী, মোক্ষদা, শিবজায়া, ছোট জ্যেঠী, তা ছাড়া আশ্রিতা প্রতিপালিতার ঝাঁক।

সকলের মুখের চেহারাতেই একটি ভক্তি-বিনম্র সমীহ ভাব।

আর মধ্যমণিটির মুখচ্ছবিতে অহংবোধের দৃপ্ত মহিমা! তাঁর সামনে কানা-উঁচু বড়সড় পাথরের খোরা, তার মধ্যস্থলে মন্দিরাকৃতি শুকনো চিঁড়ের স্তূপ, পাশে একটি উঁচু কালো পাথরবাটি ভর্তি দই, এবং সন্নিকটে একখানি আগুট কলার পাতে স্থাপিত ছড়াখানেক চাটিম কলা, গণ্ডাচারেক দেদো মণ্ডা, একরাশ ফেনী বাতাসা, এবং ক্ষীরের ছাঁচ, চন্দ্রপুলি, নারকেলনাড়ু, বেসননাড়ু ইত্যাদির বেশ একটি বড় গোছের সম্ভার।

অর্থাৎ ঘরে সংসারে যতপ্রকার মিষ্ট বস্তু ছিল, সব কিছু দিয়ে তুষ্ট করার চেষ্টা চলছে কুটুমবাড়ির নাপতিনীকে।

হ্যাঁ নাপতিনীই।

মালুম হয় দীনতারিণীর কথাতেই। নিতান্ত কাকুতিভরা কণ্ঠে বলছেন তিনি, "আর দুটোখানি চিঁড়ে দিই না নাপিত-বেয়ান, আর বেয়ানই বা কেন? হিসেবে তো মেয়ে স্বাদ হচ্ছ, মেয়েই বলি। আর দুটো চিঁড়ে একেবারে মেখে জব্দ করে নাও মেয়ে, দইয়ে ভিজলে ও আর কটা? সেই কোন্ ভোরে বেরিয়েছ। রোদে একবারে মুখচোখ সিটিয়ে গেছে।"

ভুবনেশ্বরী বোধ করি বিহ্বলতার বশেই জানলা ছাড়তে ভুলে গিয়েছিল, নিষ্পলক নেত্রে ঠায় দাঁড়িয়ে তাকিয়েছিল সেই দেবীমূর্তি আর তাঁর নৈবেদ্যের দিকে, হঠাৎ এক সময় পিছনে একটা মৃদুকণ্ঠের আভাসে চমকে ফিরে তাকাল, পিছনে সারদা!

"এখানে দাঁড়িয়ে কেন মেজখুড়ীমা?"

"দাঁড়িয়ে কেন? এমনি। ঘরে ঢুকতে পা উঠছে না। ও কেন এসেছে বড় বৌমা?"

"কেন আর?" সারদা অস্ফুট ম্রিয়মাণ গলায় বলে, "এসেছে মস্ত উদ্দেশ্য নিয়ে। বৌ নিয়ে যাবার বার্তা পাঠিয়েছেন তাঁরা। আশ্বিন পড়তেই নিয়ে যাবেন বলছে।"

"আশ্বিন পড়তেই! বলো কি বড়বৌমা! এই কদিন বাদ?"

"তাই তো বলছে। একেবারে নাকি পুরুত দিয়ে 'দিন' দেখিয়ে পাঠিয়েছেন তাঁরা।"

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে ভুবনেশ্বরীর বুক ছিঁড়ে একটা প্রশ্ন ওঠে, "সত্য টের পেয়েছে?"

"তা আর পায় নি?"

"কি করছে?"

"তা তো জানি না খুড়ীমা, ভয়ে ডরে ঘরে গিয়ে সেঁধিয়েছে বোধ হয়!"

"আমি যে বাড়ি ছিলাম না—এটা কেউ টের পেয়েছে?"

এবার সারদা একটু সত্য গোপন করে, "বলতে পারছি না মেজখুড়ীমা, বোধ হয় পান নি কেউ। গোলেমালে ব্যস্ত আছেন সবাই।"

সত্য কথা বলা চলে না।

কারণ অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্পর্কে যে ধরণের আলোচনা হয়, সেটা যথাযথ প্রকাশ করলে 'লাগিয়ে দেওয়া ভাঙিয়ে দেওয়া'র পর্যায়ে পড়ে।

"ব্যস্ত থাকলেই বাঁচন," ভুবনেশ্বরী আর একটা দীর্ঘশ্বাস-বাক্যে উচ্চারণ করে, "কিন্তু এখন হঠাৎ এ কী বিপদ বড় বৌমা?"

বড়বৌমা কিছু বলার আগেই নাপিত-মেয়ের মাজা-ঘষা চাঁচা গলাটি ধ্বনিত হয়, "বাপ বাড়ি নেই বলে মত দিতে ছুতো করছ কেন মাউইমা? আমি তো আর আজই নে যাচ্ছি না? আমাকে এ মাসের কটা দিন এখেনে থেকে একেবারে আশ্বিনের তেসরা তারিখে নিয়ে যেতে বলেছে।"

সতেরো

জগতের সমস্ত বিস্ময়কে কি একটিমাত্র প্রশ্নের মধ্যে প্রকাশ করা যায়? সেই একটি প্রশ্নের মধ্যেই ধিক্কার দেওয়া যায় জগতের সর্বাপেক্ষা অসহনীয় ধৃষ্টতাকে?

আর কারো পক্ষে যাওয়া সম্ভব কি না জানি না, কিন্তু দেখা গেল অন্ততঃ একজনের পক্ষে তা সম্ভব হয়েছে।

বারুইপুরের বাঁড়ুয্যে গিন্নীর একটি মাত্র ছোট্ট প্রশ্নে ধ্বনিত হল বিশ্বের সমস্ত বিস্ময় আর সমস্ত ধিক্কার-বাণী।

"পাঠাল না!"

"না!"

পথশ্রান্ত নাপিত-বৌ শুধু এই একটি শব্দ উচ্চারণ করে পা ছড়িয়ে বসল।

প্রথম বড় ঢেউয়ের পরবর্তী আর একটি ছোট ঢেউ।

"তুই হার মেনে ফিরে এলি?"

এবার বিস্ময় আর ধিক্কারের পালা নাপিত বৌয়ের। "শোনো কথা! তাদের মেয়ে, তারা পাঠালে না, আমি কি তাদের ঘর থেকে মেয়ে কেড়ে নিয়ে আসব?"

এবার বাঁড়ুয্যে গিন্নী নিজেই পা ছড়িয়ে বসলেন, তুই ভ্রূ এক জায়গায় এনে জড়ো করার চেষ্টা করতে করতে বললেন, "ছুতোটা কী দেখাল?"

"শোনো কথা! ছুতো আবার কিসের, সোজাসুজি মুখের ওপর ঝাড়া জবাব 'এখন পাঠাব না'।"

নাপিত বৌ আঁচল খুলে পানের কৌটো বার করে।

"এক্ষুনি মুখে পান ভরিস নে নাপিত বৌ, চোদ্দবার উঠবি পিক্ ফেলতে। আমার কথাগুলোর আগে উত্তুর দে। বলি ছুতো যুক্তি কিছু না—শুধু পাঠাব না?"

"এখন পাঠাব না।"

"তা কখন পাঠাবেন? আমার ছেরাদ্দর সময়? আমি যে ভেবে থই পাচ্ছি নে রে নাপিত বৌ, মেয়ের বাপের এত বড় বুকের পাটা! পৃথিবীতে এখনও চন্দ্র-সূয্যি উঠছে, না থেমে গেছে? একথা ভেবে বুক কাঁপল না যে, তোর মেয়েকে যদি ত্যাগ দিই!"

নাপিত বৌ নিষেধ অগ্রাহ্য করে মুখে পান-দোক্তা পুরে বলে, "বুক কাঁপবে! হুঁঃ! একটা কেন একশটা মেয়েকে ঘরে ঠাঁই দেবার, ভাত কাপড় দে' পোষবার ক্ষমতা তাঁদের আছে! লক্ষ্মীমন্তর ঘর বটে!

"খুব বুঝি গিলিয়েছে!" বাঁড়ুয্যে গিন্নী দুরন্ত ক্রোধকে পরিহাসের ছদ্মবেশ পরিয়ে আসরে নামান, "তাই বেয়াই বাড়ির লক্ষ্মীর ঘটায় চোখ ঝলসেছে! বলি ঘরে ভাত থাকলেই মেয়ের শ্বশুরবাড়ির আশ্রয় ঘোচাতে হবে? এত বড় আসপদ্দার পর আর ওদের মেয়ে আনব আমি?"

"খাওয়ার কথা তুলে খোঁটা দিও নি বামুন বৌদি, তোমাদের আশীর্ব্বাদে নাপিত বৌয়ের অমন খাওয়া ঢের জোটে। তবে হ্যাঁ, নজর আছে বটে! শুধু পয়সা থাকলেই হয় না, নজর থাকা চাই।"

কথাটা অর্থবহ, এবং সে অর্থ বাঁড়ুয্যে গিন্নীর অন্তরে ছুঁচের মত গিয়ে বেঁধে, তবু তিনি নিজেকে সংযত করে বলেন, "তা নজরের পরিচয় কি দেখাল? বিশ ভরির চন্দরহার গড়িয়ে দিয়েছে তোকে, না কি পঁচিশ ভরির গোট?"

"উপহাস্যির কিছু নেই, যা অনেয্য তা বললে চলবে কেন? একজোড়া ফরাসডাঙার থান, একখানা কেটে ধুতি আর নগদ পাঁচ টাকা কে দেয় গা কুটুমবাড়ির লোককে?"

"দেবে না কেন, যারা মেয়ে ঘরে আটকে রেখে দিতে চায়, তারা ঘুষ দিয়ে মুখ বন্ধ করে কুটুমের লোকের। নইলে তুই তাদের যাচ্ছেতাই শুনিয়ে দিয়ে না এসে সুখ্যেত করছিস বসে বসে! তোর ওপর আমার ভরসা ছিল, এ তল্লাটে তোর মতন 'মুখ' তো কারুর দেখি না, আর তুইই ডোবালি? বাঘিনী হয়ে মেড়া বনে এলি?"

"কী যে তকরার করো বামুন বৌদি, মেয়ের বাপ নিজে তফাতে দাঁড়িয়ে গিন্নীকে বলে দিল, 'মা, কুটুমবাড়ির মেয়েকে বলে দাও, বিয়ের সময় কথা হয়েছিল মেয়ের কুমারীকাল পূন্ন না হলে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো হবে না, সে কথা তাঁরা হয়ত বিস্মরণ হয়ে গেছেন, আমি তো হই নি। সময় হলে যাবে বৈ বি!"

বাঁড়ুয্যে গিন্নী বিবাহকালের শর্ত উল্লেখে ধেই ধেই করে ওঠেন, "কী বললি নাপিত বৌ, বিয়ের কালের শত্ত-সাবুদের কথা তুলেছে? কথা অমন কত হয়—বলে লাখ কথা নইলে বিয়ে হয় না—বলি তাঁদের চরণে খত লিখে দিয়েছিল কেউ? আমার ঘরের বৌ আমার যদি আনতে ইচ্ছে হয়! আচ্ছা আমিও দেখছি কত তাদের আসপদ্দা, কত তাদের তেজ। মেয়েকে শুধু ভাত-কাপড় দিলেই যদি সব মিটে যেত, তা হলে আর কেউ তাকে বিয়ে দিয়ে পরগোত্তর করে দিত না, বুঝলি নাপিত বৌ? আসছে মাসেই বেটার আবার বিয়ে দেব আমি, এই তোকে বলে রাখলাম।"

নাপিত বৌ নিমকহারাম নয়। অনেক খেয়ে অনেক পেয়ে এসেছে, তাই বেজার মুখে বলে, "সে তোমাদের কথা তোমরা বুঝবে, বেয়াই তো পত্তর লিখে দিয়েছে বামুনদাদার নামে, গুাও রাখো।"

"তুই যে তাজ্জব করলি নাপিত বৌ, এই কদিনে তোকে তুক্ করল না গুণ করল লো! তাই ঘরশত্তুর বিভীষণ হলি! কেবল ওদের কোলে ঝোল টেনে কথা বলছিস! কই, পত্তর কোথা?"

"এই যে" নাপিত বৌ নিজের গামছার পুঁটলির গিঁট খোলে।

বাঁড়ুয্যে গিন্নীর অবশ্য তৎপরতার অভাব নেই, তিনিও সঙ্গে সঙ্গে পুঁটলির মধ্যে শ্যেন-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, "কই, বড়মানুষ কুটুম কী দিয়েছে দেখি।"

একটি ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটুলি খুলে একখানি দোমড়ানো মোচড়ানো চিঠি বার করে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে নাপিত বৌ প্রাপ্ত সম্পদ দেখায়, "এই কেটে, এই কাপড়ের জোড়া, এই গামছা, আর—"

"ও বাবা আবার নতুন ঘটি কাঁসি দিয়েছে যে দেখছি!" বাঁড়ুয্যে গিন্নী বলেন, "সাধে কি আর বলছি ঘুষ দিয়েছে। তা নাকুর বদলে নরুন নিয়ে ফিরলি তুই! কাঁসিখানা তো দেখছি ভারী পাথরকুচি।"

"তা ভারী আছে! আর কথাবার্তাও ভাল। বাড়িসুদ্ধু গিন্নীরা যেন আমায় হাতে রাখে কি মাথায় রাখে। সে তুমি যাই বলো বামুন বৌদি, কুটুম তোমার খুব ভাল হয়েছে। অমন কুটুমের সঙ্গে অস্‌রস করলে তুমিই ঠকবে। তবে গিয়ে বৌ তোমার, মিছে বলব না, একটু বাচাল।"

বাচাল!

সহসা যেন পাথরে পরিণত হলেন বাঁড়ুয্যে গিন্নী।

"বাচাল! আর সে কথা এতক্ষণ বলছিস না তুই? হবেই তো, বাচাল হবে না? বাপের চালচলন তো বুঝতেই পারছি, পয়সার গরমে ধরাকে সরা দেখেন, মেয়েকে আশকারা দিয়ে ধিঙ্গী অবতার করে তুলেছেন আর কি! আমিও এলোকেশী বামনী, বাচাল বৌকে কেমন করে টাট্ করতে হয় তা আমার জানা আছে।"

"তা আর জানা থাকবে না?" ঠোঁটকাটা নাপিতবৌ বলে বসে, "আরও একটা মানুষের মেয়েকে ঘরে পুরে কী হালে রেখেছ তা তো আর কারু অজানা নেই। তা এ বৌকে আর তুমি টাট্ করছ কখন, বেটার তো আবার বে দিচ্ছ।"

নাপিত বৌয়ের কথায় এবার একটু ভয় খান বাঁড়ুয্যে-গিন্নী এলোকেশী। ও যা মুখফোঁড়, পাড়ায় পাড়ায় সমস্ত রটিয়ে বেড়াবে, হাটে হাঁড়ি ভাঙবে।

বাঁড়ুয্যেরা বৌ আনতে পাঠিয়েছিল, বড়মানুষ বেহাই মেয়ে পাঠায় নি, এ খবর রাষ্ট্র হলে কি আর মাথা হেঁট হবার কিছু বাকী থাকবে? নাপিত বৌকে চটানোটা ঠিক হয় নি। চটায় না ওকে কেউ, চটাতে সাহসই করে না। সকলের হাঁড়ির খবর রাখে, সকল ঘরে যাতায়াত করে, আর সময় অসময়ে নাপিত বৌয়ের শরণ না নিলে কারুর চলে না। যেমন তেজী তেমনি বিশ্বাসী, আর তেমনি জোরমস্ত ডাকাবুকো। একটা মদ্দজোয়ানের ধাক্কা ধরে নাপিত বৌ। বৌ মেয়ের শ্বশুরবাড়ি বাপের বাড়ি করতে নাপিত বৌ এ গ্রামের ভরসাস্থল।···চৈতন্য হয় সেটা, এবার তাই আর একবার দেঁতো হাসি হাসেন বাঁড়ুয্যে গিন্নী, "তবে আর কি, যা দেশ-রাজ্যে রাষ্ট করে আয়, আমি আবার বিয়ে দিচ্ছি বেটার! মরণ আর কি, গা জ্বলে যায়! কিন্তু তুইই বল, রাগে মাথার রক্ত চড়ে ওঠে কি না। যাক বিশদ বৃত্তান্ত বল দিকি, তুই কি বললি, তারা কি বলল, মেয়েই বা—"

"সাতকাণ্ড রামায়ণ গাইবার সময় এখন আমার নেই বামুন বৌদি, ছদিন ছ রাত পায়ের ওপর, সব্বাঙ্গ যেন ভেঙে আসছে। ঘরে যাই এখন।"

"ঘরে আর যাবি কেন", বাঁড়ুয্যে গিন্নী নিষ্প্রভ ভাবে বলেন, "এখানেই নয় ছুটো—"

"না বাবা, ওতে আর দরকার নেই, কথায় বলে 'ভাইয়ের ভাত ভেজের হাত!' ঘরে গে দু দণ্ড জিরোই, তার পর বোঝা যাবে।"

আরো নরম হতে হয়, আরো তোয়াজ করতে হয়। শক্তের ভক্ত পৃথিবী।

"হ্যালা তা মাথায় বিষবাণ বিঁধে রেখে দিলি, উদ্ধার কর? মেয়ে কি বলল তাই বল? তুই কুটুমের বাড়ি থেকে গিয়েছিস, তোর সামনে কি বাচালতা করল?"

"করল কি আর গাছে চড়ল? তা নয়। তবে ঠাকুমাদের সঙ্গে খুব হাত মুখ নেড়ে বক্তিমে করছিল দেখছিলাম। গিন্নীরা বলছিল, কুটুম চটানো ঠিক নয়, তোমার বেয়াইয়ের দুর্বুদ্ধির নিন্দে করছিল, তা দেখি ঘরের মধ্যে ঝাঁজ দেখাচ্ছে, 'বাবার কথার ওপর কথা? বাবার চাইতে তোমাদের বুদ্ধি বেশী? বে'র সময় যদি কথা হয়ে গেছল বারো বছর বয়েস না হলে তারা বৌ নিয়ে যাবে না, তো নিতে পাঠায় কোন্ আইনে', এই সব!"

কিন্তু বাঁড়ুয্যে-গিন্নীর তখন আর বাক্স্ফূর্তির ক্ষমতা নেই। পুত্রবধূর বাক্-বিন্যাস-প্রণালীর সংবাদে সে ক্ষমতা লোপ পেয়েছে তাঁর।

কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়ে স্তব্ধ হয়ে থেকে সনিশ্বাসে বলেন, "হ্যালা বৌ, তুই তো আমাকে খুব উপহাস্যি করলি, বেটার আবার বে দেব বলেছি বলে, তা তুইই নিজে মুখে স্বীকের কর, এ বৌ নিয়ে ঘর করা যাবে? বাবার জন্মে তো এমন কথা শুনি নি নাপিত বৌ, যে শ্বশুরঘরে যাওয়ার কথা নিয়ে ঘরবসতের বৌ কথা কয়, চিপ্‌টেন কাটে!"

"বাপের একটা তো, একটু বাপসোহাগী আছে! তা ও দোষ কি আর থাকবে? আপনিই যাবে। কথাতেই তো আছে গো—'হলুদ জব্দ শিলে, চোর জব্দ কীলে, আর দুষ্টু মেয়ে জব্দ হয় শ্বশুরবাড়ি গেলে'।"

"জানি নে মা, আমার তো ভয়ে পেটের মধ্যে হাত পা সেঁদিয়ে যাচ্ছে। বুড়ো বয়সে বেটার বৌয়ের হাতে কি খোয়ার আছে তা জানি নে! আবার বে দেব আর কোথা থেকে? তোর বামুনদাদা যে বেয়াইয়ের বিষয়-সম্পত্তির ওপর টাঁক করে বসে আছে। বলে বাপের একটা মেয়ে, বাপ চোখ বুজলে সব মেয়ে-জামাইয়ের!"

"শোন কথা!" এবার গালে হাতের পালা নাপিত বৌয়ের, "ওই বিরিঙ্গির গুষ্টি, অমন সব সোনারচাঁদ ভাইপো রয়েছে। তারা পাবে না? তা ছাড়া ভাগভেন্ন তো নয়?"

"তা জানি নে বাপু, কত্তা বলে তাই শুনি। বলে বাপটা একবার চোখ বুজলে হয়।"

"কার চোখ আগে বোজে, কে কার বিষয় খায়, কে বলতে পারে বামুন বৌদি! বেয়াইয়ের তো তোমার সোনার গৌরাঙ্গর মতন চেহারা, এখনো বে দিলে বে দেওয়া যায়। যাকগে বাবা, তোমাদের কথা তোমরা বোঝ। যাই উঠি। বামুনদাদাকে পত্তরখানা দিও।"

নাপিত বৌ উঠতে যায়, আর সেই মুহূর্তেই বামুনদাদার আগমনবার্তা ঘোষণা করে—খড়মের খট খট।

"এ কী, নাপিত বৌ ফিরে এলি যে?"

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের উঠোন থেকে ভিতর উঠোনে পা ফেলেন বাঁড়ুয্যে।

"ফিরে না এসে অকারণ আর কতদিন কুটুমের অন্ন ধ্বংসাব? অবিশ্যি তারা অনেক বলেছিল আর দশদিন থেকে—"

"তা তুই গিয়েছিলি কি করতে? বৌ কই?"

"পাঠাল না।"

বজ্রনির্ঘোষ ধ্বনিত হয় গৃহিণীর কণ্ঠ হতে।

"পাঠাল না!"

আর একবার প্রমাণিত হল একটি প্রশ্নের মধ্যেই জগতের সমস্ত বিস্ময় প্রকাশ করা সম্ভব।

ছেলেকে খেতে বসিয়ে কথাটা পাড়লেন এলোকেশী। নাপিত বৌ নিষিক্ত অগ্নিধারা শরীরের মধ্যে পরিপাক করতে করতে বেগুনেরঙা হয়ে উঠেছিলেন তিনি, তাই ভাতের থালাটা ছেলের পাতের গোড়ায় ধরে দিয়ে যখন পিদ্দিমের সলতেটা একটু বাড়িয়ে পা ছড়িয়ে বসলেন, মায়ের ভীষণাকৃতি মুখ দেখে বুকটা কেঁপে উঠল নবকুমারের।

নবকুমারের বয়স আঠারো-উনিশ হলেও মায়ের কাছে সে দুগ্ধপোষ্যের সমগোত্র। আর মা এবং যম তার মনের জগতে সমতুল্য। মা যখন মুখ ছোটায়, তখন ভয়ে নবকুমারের হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়। যার উদ্দেশেই সেই বহ্নিস্রোত প্রবাহিত হোক, নবকুমার ভয়ে কাঁপে।

আজকের গালিগালাজের স্রোতটা আবার নবকুমারেরই শ্বশুরবাড়িকে কেন্দ্র করে, কাজেই খাওয়া আর হয় না বেচারার। ভয়ে লজ্জায় ঘাড়টা নিচু হতে হতে প্রায় থালার সঙ্গে ঠেকে আসে।

নাপিত বৌ কুটুমবাড়ি যাওয়া পর্যন্ত মনের মধ্যে একটি পুলকের গুঞ্জরণ বইছিল নবকুমারের, ছড়ানো ছিটোনো কথায় শুনতে পাচ্ছিল এলোকেশী না কি বৌকে আনতে পাঠিয়েছেন।

কেমন সেই বৌ, কি তার নাম, কি রকম দেখতে, এসব লজ্জাকর চিন্তাকে কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছিল না নবকুমার। শয়নে স্বপনে একটি মুখচ্ছবি আবছা আবছা ছায়া ফেলে বাড়ির এখানে সেখানে, এলোকেশীর কাছে কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ঘোমটা টেনে টেনে।

শোবার ঘরে? অনবগুণ্ঠনে?

ওরে বাবা, অত দুঃসাহসী কল্পনার সাহস নবকুমারের নেই। সে ভাবনার ধারে-কাছে গেলেই বুক গুরগুর করে ওঠে তার। যার সামনে দাঁড়ালে তো কথাই নেই, আশঙ্কা হয় ছেলের মনের ভিতরটা 'কাঁচদীঘি'র জলের ভিতরটার মতই দেখতে পাচ্ছেন এলোকেশী।

না, শোবার ঘরের এলাকায়, কি নিজের ধারে-কাছে বৌয়ের উপস্থিতির অবস্থা চিন্তা করে না নবকুমার, করে শুধু মায়ের ধারে-কাছেই।

নাপিত বৌয়ের অভিযান কার্যকরী হবে না, এরকম অবিশ্বাস্য দুর্ঘটনার কথা তার স্বপ্নেও মনে আসে নি, তাই এই ক'দিনই প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ভবতোষ মাস্টারের কাছে ইংরিজি পড়া পড়ে বাড়ি ফিরে, উৎকর্ণ হয়ে থাকে একটি মৃদু ঝুনঝুন মলের শব্দের আশায়!

কিন্তু কই?

ক'দিনের কড়ারে গেছে নাপিত বৌ, সে খবর নবকুমারের জানবার কথা নয়, তবু আশা করছিল পুজোর আগে অবশ্যই। আর পুজোর উৎসবের সঙ্গে হৃদয়ের আর এক উৎসবকে যুক্ত করে নিয়ে অবিরত বিহ্বল হচ্ছিল সে।

পুজো আসছে!

বৌ আসছে!

পুজোটা জানা, কিন্তু না জানি কেমন সে বৌ।

বিয়ে হয়েছিল পনেরো পার হয়, এমন কিছু অজ্ঞানের বয়সে নয়, তবু লাজুক-প্রকৃতি নবকুমার বিয়ের কোন অনুষ্ঠানের সময়ই, একটু চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেও কনেবৌকে দেখে নেবার চেষ্টা করে নি। এখন যদি কেউ বদলে অন্য মেয়ে গছিয়ে দেয়, ধরার সাধ্য হবে না নবকুমারের।

এমন কি এই কদিন ধরে শত চেষ্টাতেও বৌয়ের নামটা মনে আনতে পারছে না সে। এতদিন অবশ্য মনে আনবার খেয়ালও হয় নি, নাপিত বৌয়ের অভিযানই সহসা নবকুমারকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে। কৈশোর থেকে যৌবনের ধাপে।

বিয়ের সময় সম্প্রদানকালে নামটা তো দু-এক বার উচ্চারিত হয়েছিল মনে হচ্ছে, কিন্তু কে তখন ভেবেছে এই নামটা মনে রাখবার দায়িত্ব তার। নবকুমার তো তখন অবিরাম ঘামছে!

ওই ঘামটাই মনে আছে, নাম-টাম নয়।

একে তো বিয়ের বর, তা ছাড়া—শ্বশুরের সেই দৃপ্ত উন্নত চেহারা, গম্ভীর স্বর, আর রাশভারী ভাব! সেটাও সেই ভয়কে বাড়িয়ে দেওয়ার সহায়তা করেছিল।

তা ছাড়া বাসরঘরে আরও কত রকম ভয়!

সে ভয় এখনও বুঝি একটু একটু আছে।

কিন্তু 'বৌ' শব্দটা কী মিষ্টি! ভয়ের মধ্যেও রোমাঞ্চ!

'কওনা কথা মুখ তুলে বৌ,
দেখ না চেয়ে চোখ খুলে!"

মনের মধ্যে বাজছে সুর আর শব্দ! বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বৌয়ের আসন্ন আবির্ভাব নিয়ে আলোচনা করবার ক্ষমতাও নেই নবকুমারের। পাড়ার বন্ধু যারা খবরটা শুনেছিল, তারা যদি একটু-আধটু ঠাট্টা করছে, "ধেৎ, ধেৎ" ছাড়া আর কোনও উত্তর দিতে পারছে না সে।

অথচ যখন ভবতোষ মাস্টারের কাছ থেকে পড়া সেরে সন্ধ্যায় কাঁচদীঘির নির্জন পাড় দিয়ে বাড়ি ফিরেছে, তখন অনুচ্চারিত শব্দে বারবার ফিরিয়ে ফিরিয়ে গেয়েছে—

'এনেছি বকুলমালা, করবে আলা
তেল-চোয়ানো তোর চুলে!

মিশি দাঁতের হাসিটি বেশ,
মুখখানি বেশ ঢলঢলে!'

তারপর কি? তাই তো! 'মুখখানি বেশ ঢলঢলে, মুখখানি বেশ'— পরের লাইনটা কিছুতেই মনে পড়ে না, কোথা থেকে যে শিখেছিল তাও মনে পড়ে না। তবু ওই অসমাপ্ত গানটাই অপূর্ব সুরে গুঞ্জরিত হতে থাকে সমস্ত রাস্তাটা!

ক'দিনের প্রত্যাশার পর আজ বাড়ি ফিরেই এলোকেশীর প্রদত্ত সমাচারে বুকটা ছলাৎ করে উঠল! আর সেই বিয়ের দিনের মত ঘাম ছুটে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

"নাপিত বৌ এসেছে শুনেছিস!" বলে উঠলেন এলোকেশী।

বাঘিনীর মত বসেছিলেন দাওয়ার ধারে। ছেলে এসে পা-টা হাতটা ধোবে, এটুকু সময়ও দেরি সইল না তাঁর। দিয়ে বসলেন সংবাদ। অন্ধকারেই বলে বসলেন, আলোটাও আনলেন না ছেলের সামনে।

নবকুমারের কাছে অবশ্য এ সংবাদ অন্য অর্থ বহন করে এনেছে, তাই তার চিত্তে বিহ্বলতা! তাই মার বর্তমান অবস্থা ধরতে পারল না সে।

ধরতে পারল না কণ্ঠস্বরের ভীষণতাও। তাই না-জানা একটা সুখে শিউরে উঠল।

কিন্তু কতক্ষণের জন্যেই বা!

ক্ষণকালের মধ্যেই নিষ্ঠুর সত্য প্রকাশিত হল।

মান্যগণ্য বেহাইয়ের উদ্দেশে 'ছোটলোক' 'চামার' 'আসপদ্দাবাজ' ইত্যাদি শোভন সুন্দর বিশেষণমালা প্রয়োগ করে এলোকেশী জানালেন, "মেয়ে পাঠাল না।"

মেয়ে পাঠাল না!

এ কী অদ্ভুত বাণী!

মেয়ে না পাঠানো যে সম্ভব, সে কথা তো একবার মনের কোণেও আসে নি নবকুমারের।

কিন্তু এ কথায় আর কি কথা কইবে নবকুমার? আর উত্তরের প্রত্যাশা করেও কথা বলেন নি এলোকেশী।

আরও খানিকক্ষণ ধরে বেহাইয়ের 'পয়সার গরম' তুলে, নাপিতবৌকে ঘুষ দিয়ে 'হাত-করা'র বার্তা জানিয়ে, অবশেষে হঠাৎ আবিষ্কার করলেন এলোকেশী, ছেলেটা সেই অবধি উঠোনেই দাঁড়িয়ে আছে কাঠ হয়ে।

মাতৃস্নেহ জেগে উঠল।

"আর দাঁড়িয়ে থেকে কি করবি, হাত-মুখ ধো।" বলে এলোকেশী উচ্চগ্রামে চীৎকার করলেন, "ভাত নেমেছে সদু?"

রান্নাঘর থেকে সাড়া এল, "নেমেছে মামীমা!"

"আয় মুখ ধুয়ে, ভাত দিই।" বলে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন এলোকেশী। আর নবকুমার আস্তে আস্তে গায়ের কোটটা খুলে দেয়ালে লাগানো একটা গজালে টাঙিয়ে রেখে চলে গেল খিড়কি পুকুরের দিকে।

হঠাৎ মনটা কেমন শিথিল আর ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। যা ছিল না, কোন দিনই যার স্বাদ জোটে নি, তেমন জিনিস হারালেও এমন শূন্যতা-বোধ আসে? সব ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে?

কিন্তু তখনই বা হয়েছে কি!

আসল কথা পাড়লেন এলোকেশী ছেলেকে খেতে দিয়ে পিদ্দিমের সলতে উসকে পা ছড়িয়ে বসে।

যে মুখ দেখে বুক কেঁপে উঠল নবকুমারের।

"আমি এই তোকে বলে রাখছি নবা, শেষবেশ একটা চিঠি চামারটাকে দেওয়াব কর্তাকে দিয়ে, তাতেও যদি মেয়ে না পাঠায়, এই সামনের অঘ্রানেই তোর আবার বিয়ে দেব।"

আবার বিয়ে!

মা কি আজকে বুক ধড়াস ধড়াস করিয়েই মারবে নবকুমারকে?

আবার বিয়ে!

তার মানে আবার আর একবার নবকুমারকে নিয়ে সেই নকড়া-ছকড়া খেলা, আবার আর একটা বাড়িতে গিয়ে সেই সম্প্রদান, সেই বাসর, সেই কানমলা, সেই ঘাম!

ঘাড়টা প্রায় পাতের সঙ্গে ঠেকে যায় নবকুমারের। মুখ দিয়ে কথাও বেরোয় না, মুখের মধ্যে ভাতের গ্রাসও ঢোকে না!

হঠাৎ এক সময় কটূক্তি থামিয়ে এলোকেশী বলেন, "খাচ্ছিস কই?"

"খাচ্ছি তো!" এতক্ষণে অস্ফুটে একটা কথা বলে নবকুমার, এবং বাক্যের সত্যতা রক্ষার্থে এক গ্রাস ভাত ঠেলে ঠুলে মুখের মধ্যে চালান দেয়।

এবার সদু বা সৌদামিনীর রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব। মাটির সরায় এক সরা ধোঁয়া-ওঠা গরম ভাত নিয়ে এসে অবাক গলায় বলে ওঠে সে, "ও মা, ই কি! যেখানকার ভাত সেখনে পড়ে! এতক্ষণ কি করলি রে নবু?"

"খাচ্ছি তো!" আরও একবার পূর্ব কথা এবং পূর্বোক্ত কাজের পুনরাবৃত্তি করে নবকুমার।

"দিয়ে যাই আর দুটো?"

"না না আর নয়", ভরা মুখে হাত মুখ মাথা সব নেড়ে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে নবকুমার।

"খিদে নেই?"

নবকুমার আর একবার বলে, "খাচ্ছি তো!"

এদিকে ঠেলে ওঠা চোখে জল আসতে চায়।

"খিদে আর থাকবে কোথা থেকে!" এলোকেশী বলে ওঠেন, "শ্বশুরের নিন্দে করেছি যে! একালের ছেলে তো! কিন্তু তোকে আবারও এই বলে রাখছি নবা, তোর দেমাকে-শ্বশুরের ওই খাঁড়া নাক যদি না ভুঁয়ে ঘষটে দিই আমি তো কি বলেছি! বাপ বাপ বলে ওই মেয়ে ঘাড়ে করে নাকে

খত্ দিতে দিতে আসে তো ভাল, নচেৎ আবার ছানলাতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে তোকে! এবার আর নবাবের বেটী আনব না, গরীব-গুরবো ঘরের মেয়ে নে আসব।"

"ওই শোন্", সদু হেসে ওঠে, "আর মুখগোঁজ করে থাকবার কিছু নেই রে নবু, আশ্বাস-বাক্যি পেয়ে গেলি! এখন বড় বড় থাবায় খেয়ে নে।...বৌ এল না বলে মনের দুঃখে নবু অমন সরলপুঁটির টকটাই ভাল করে খেল না, দেখেছ মামী!"

"সব সময় ন্যাকরা করিস নে সদু", এলোকেশী বেজার মুখে বলেন, "চব্বিশ ঘণ্টা হাসি-মশকরা ভালও বা লাগে! প্রাণে কিসের যে এত উল্লাস তাও তো বুঝি না।"

কথাটা সত্যি।

উল্লাস আসবার কথা সদুর নয়।

তবু আসে।

তবু রং-তামাশা করে সদু, হি হি করে হাসে। কিন্তু হাসি আসে কি করে সদু নিজেই কি জানে ছাই?

হয়তো এ জগতে একমাত্র ওইটুকুই ওর নিজের এক্তারে আছে বলে আনায়। দুর্ভাগ্যকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হি হি করে হেসে বেড়ায় সে, বুকের পাথরখানা ঠেলে ফেলে দিতে।

অবিরত ওই পাথরখানা বুকে বইতে হলে কি ঘুরে ফিরে আর অসুরের মত খেটে বেড়াতে পারত?

গাঁ-সুদ্ধু সবাই তো ধিক্কার দেয় সদুর ভাগ্যকে, সবাই তো জানে সদুকে বরে নেয় না! অকারণ, শুধু খেয়ালের বসে সদুকে সদুর বর ত্যাগ করেছে! স্বভাব-চরিত্র খারাপ তো অনেকেরই থাকে, পরিবারকে ত্যাগ আর কজন করে?

সদুর মা নেই, বাপ নেই, আজন্ম মামার বাড়ি মানুষ। মামা দু তিন বার চেষ্টা করে করে শ্বশুরবাড়ি রেখে এসেছিল তাকে, কিন্তু কিছুতেই নিজের আসন দখল করতে পেরে উঠল না হতভাগা মেয়েটা। দুর্ব্যবহারের চোটে পালিয়ে আসতে পথ পায় নি!

তদবধি আবার এই মামার বাড়িতেই স্থিতি।

তা ছাড়া উপায় কি ?

মামার বাড়িতে আছে, দুবেলা হেঁসেল ঠেলছে, জুতো চণ্ডী সব নাড়ছে, আর মামীর মুখনাড়া খাচ্ছে।

তবু সে হাসে।

বলিহারি !

'বলিহারি যাই বাবা !' মামী বলে, পাড়াসুদ্ধু সবাই বলে। শুনে শুনে নবকুমারেরও এমন ধারণা হয়ে গেছে, হাসিটা সদুদির পক্ষে গর্হিত, তাই সে হাসি-ঠাট্টায় কোনও দিনই তেমন করে যোগ দিতে পারে না। আর আজকের কথা তো স্বতন্ত্রই ! আজকের হাসি-ঠাট্টার বিষয়বস্তু তো নবকুমার নিজেই।

"দুধটা আনবি, না দাঁড়িয়ে রঙ্গ করবি ?"

ধমকে ওঠেন এলোকেশী।

ছেলের কোলের গোড়ায় ভাতের থালাটি বসিয়ে দেওয়া ছাড়া আর বেশী নড়াচড়া করেন না এলোকেশী। দ্বিতীয়বার যা কিছু লাগে 'সদু সদু' হাঁক। মস্ত সুবিধে, সদু বিধবা পুষ্যি নয়। বিধবা হলে তো এক মহা ঝঞ্ঝাট—রাত্তিরে আঁশ হেঁসেলের ভার দেওয়া যায় না ! এক্ষেত্রে আর কোন দ্বিধা-দায় নেই। বড় বড় সরলপুঁটির টক সদু তো নিজেও একটু খাবে, অতএব কুটুক বাছুক রাঁধুক !

কর্তা নীলাম্বর বাঁড়ুয্যের বয়স যাই হোক, রাতে ভাত খাওয়া ছেড়েছেন তিনি অনেক দিন। ঘরের গরুর খাঁটী দুধ দেড়-সেরখানেককে মেরে আধসের করে সর পড়িয়ে রাখা হয়, তাতেই বাড়িতে ভাজা টাটকা খই ফেলে গোটা আষ্টেক মনোহরা মেখে আহার সারেন নীলাম্বর।

সে সারা তাঁর সন্ধ্যাহ্নিক সেরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই হয়। নবু মাষ্টারের কাছে পড়ে ফেরার আগেই। আবার তিনি যখন বেড়িয়ে ফেরেন, নবুর তখন অর্ধেক রাত্তির, কাজেই এ বেলায় বাপে-ছেলেতে দেখাই হয় না। ছেলের যে এই এক বেয়াড়া খেয়াল হয়েছে, ইংরিজি শিখবে ! ওই ম্লেচ্ছের ভাষা শিখে কি চতুর্বর্গ লাভ হবে কে জানে, তবু খুব একটা বাধাও দেন নি নবকুমারের স্নেহশীল পিতা। বলেছেন, ইচ্ছে হয়েছে পড়ুক !

আসল নষ্টের গোড়া তো ওই ভবতোষ বিশ্বাসটা। কলকেতা থেকে ইংরিজি শিখে এসে গাঁয়ে এখন ইস্কুল খোলা হয়েছে বাবুর ! সকাল-বিকেল

দুবেলা ইস্কুল বসায়। গাঁয়ের ছোঁড়াগুলোকে ক্ষ্যাপানোর গুরু! কানে মন্তর দিচ্ছে, ইংরিজি না শিখলে নাকি উন্নতি নেই, শিখে কলকাতায় গিয়ে হাজির হতে পারলে সাহেবের আফিসে মোটা মাইনের চাকরি অবধারিত! ছুটছে সবাই ওর ইস্কুলে। চালাকের রাজা ভবতোষ ফাস্‌টু বুক, সেকেন বুক, কত সব শক্ত শক্ত বই কিনে এনেছে কলকাতা থেকে, তাই থেকে পড়িয়ে পড়িয়ে বিদ্যে-দিগগজ করছে সবাইকে!

বামুনের ঘরের ছেলেগুলো যাচ্ছে শুদ্দুরের কাছে বিদ্যে নিতে! কলি পূর্ণ হতে আর কতই বা বাকি!

তবু ছেলেকে বাধা দেন নি নীলাম্বর, কলির তালেই চলেছেন। শুধু ওই ম্লেচ্ছ-ভাষা-শিখে-আসা জামা-কাপড়গুলো ঘরে তোলে না, পরে কিছু ছোঁয় না, ছেড়ে হাত পা ধুয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে, এই পর্যন্ত।

নবকুমারকে খাইয়ে মামী-ভাগ্নী দুজনে রান্নাঘরে বসে পড়ে খেতে। ওরা তো আর ভাত বেড়ে পিঁড়ে পেতে খাবে না, কাঁসি গামলা যাতে তাতে খেয়ে নেবে মাটিতে থেবড়ে বসে। তা এ সময় গল্পটা চলে ভাল। কি হাত ধমক দিলেও ভাগ্নীকে নইলে চলেও না এলোকেশীর। কথা কইবার সঙ্গী বলতে দ্বিতীয় আর কে?

খাওয়ার পর রান্নাঘর ধোয়ার ভার সৌদামিনীর।

ঘর ধুয়ে পরদিনের জন্যে রান্নার কাঠ গুছিয়ে চকমকি ঠিক করে রেখে, কাজকরা কাপড় কেচে তবে শুতে যায় সদু। শোবার জন্যে তার নামে একটা ঘর আছে বটে, বিছানাও আছে, কিন্তু সে ঘরে সে বিছানায় কতটুকুই বা শুতে পায় সে? নীলাম্বর যতক্ষণ না আসেন, এলোকেশীকে আগলাতে হয়, কারণ এলোকেশীর বড় ভূতের ভয়!

নীলাম্বর আসার পর তাঁর জল চাই কিনা, তামাক চাই কিনা, খোঁজ খবর করে তবে সদুর ছুটি। তা সে ছুটিটা প্রায়ই রাতের আধখানা গড়িয়ে গিয়ে হয়!

অবিশ্যি তার পর বাকী রাতটা সদুকে কে আগলাবে, এ প্রশ্ন ওঠে না। সদু তো সদু! ওকে যদি এ নিয়ে আক্ষেপ প্রশ্ন করো, নিশ্চয় হেসে উঠে বলবে, "ভূতই আমায় আগলায়। জানো না—আমি যে শাঁকচুন্নী!"

তবু সদু মামীকে ভালবাসে, মামাকে ভক্তিসমীহ করে, নবকুমারকে প্রাণতুল্য দেখে।

তার এই বত্রিশ বছরের জীবনে ভালবাসার, ভক্তি করবার, স্নেহ করবার জন্যে পেলই বা আর কাকে ?

ভোরবেলাই ঘুমটা ভেঙ্গে গেল।

কারণটা কিছু মনে নেই, তবু যেন মনে হল নবকুমারের, বুকটায় কী একটা পাষাণভার চেপে রয়েছে! যেন আস্ত একটা পাহাড়ই কেউ বুকের ওপর বসিয়ে দিয়েছে কোন্ ফাঁকে! রাত্রে ঘুমের মধ্যেও ছিল যেন কি এক আতঙ্কের স্বপ্ন!

একটুক্ষণ খোলা জানলার দিকে চেয়ে বসে থাকতে থাকতে সব মনে পড়ল। মনে পড়ল মায়ের শপথবাণী। মনে পড়ে হাত-পা ছেড়ে এল!

ধীরে ধীরে উঠে পড়ল, বেরিয়ে এল ঘর থেকে কোঁচার খুঁটটা গায়ে দিয়ে। ভোরের দিকে বেশ শীত শীত পড়ে গেছে। আর শরৎকালের সকালের এই গা সিরসিরে হাওয়াটাই তো কোন উধাও পাথারে মনটাকে ছুটিয়ে নিয়ে যায়।

বাইরে এসে দেখল সৌদামিনী উঠোনে ছড়াঝাঁট দিচ্ছে। কাছে গিয়ে বলল, "মা ওঠে নি সদুদি ?"

"মামী।" সকালবেলাই হেসে গড়িয়ে পড়ে সৌদামিনী, "মামী আবার এমন সময়ে কবে ওঠে রে নবু ? 'ভোর ঠাকুরের' সঙ্গে যে মামীর বিরোধ!"

খচ্ খচ ঝাঁটা চালাতে চালাতে বলে সদু, "সরে দাঁড়া নবু, ধুলো লাগবে।"

"লাগুক গে!" বলে বরং কাছেই সরে এল নবকুমার, কাছে এসে হঠাৎ শীতকালে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গীতে বলে উঠল, "সদুদি, তুমি মাকে বলে দিও ওসব পারব-টারব না।"

ঝাঁটা বন্ধ হল সৌদামিনীর।

চোখ গোল গোল করে বলল, "কি বলে দেব মামীকে? কী পারবি না ?"

"ওই সব!" নবকুমার বকে ওঠে, "শুনলে তো কাল নিজের কানে, আবার শুধোচ্ছ কেন ?"

"নাঃ, তুই আমায় অথই জলে ফেললি নবু, কালকের দিনভোর কত কথাই তো শুনেছি, কোন্‌টা তোর মনে গিঁথে আছে, তা কেমন করে বুঝব ?"

"আঃ! আচ্ছা জ্বালায় ফেললে তো! নাপিত পিসীর ব্যাপারে রেগে গিয়ে মা যা বলল মনে নেই তোমার?"

"ও হরি, তাই বল্! তোর আবার বিয়ে দেবে, এই কথা তো?" ফের সত্যর সেই হি হি হাসি, "সেই চিন্তেয় রাতভোর ঘুমুস নি বুঝি? নাকি সেই 'ঠাকুরঘরে কে, না আমি তো কলা খাই নি,' তাই? মামী পাছে প্রতিজ্ঞে বিস্মরণ হয়ে যায় তাই 'আমি পারব না, আমি করব না' বলে স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছিস?"

"আঃ সত্যদি, ভাল হবে না বলছি। আমি এই তোমায় বলে রাখছি ওসব পারব না। আবার ওই কানমলা-টানমলা—ওরে বাবা!"

সত্য ফের হাতের কাজে মনোনিবেশ করে বলে, "তা আমায় বলে কি হবে? মামীকে বল্!"

"আমি বলব? আমি বলব মাকে?"

সত্য হাসতে হাসতে বলে, "বলবি না কেন? ডাগর হয়েছিস, সাহস হচ্ছে না?"

"মার কাছে সাহস! হুঁঃ! এই তোমায় বলছি সত্যদি, আমি তোমার কাছে বলে খালাস, যা বিহিত করবার তুমি করবে।"

সৌদামিনী ফের হাত থামিয়ে বলে, "বেশ, বলব মামীকে, নবুর আমাদের প্রেথম পক্ষের ওপর বড্ড আঁতের টান, ওকে ত্যাগ দিয়ে অন্তত্তর বিয়ে করবে না!"

"সত্যদি, ভাল হবে না বলছি! বলি, আবার ওই সব ভূতুড়ে কাণ্ডর দরকার কি? নাই বা পাঠাল কেউ মেয়ে, পরের ঘরের মেয়ে নইলে বুঝি সংসার চলে না?"

"কই আর চলে?" সত্য হাত মুখ নেড়ে বলে, "চললে আর এই আদি অন্তকাল ধরে মানুষে ওই সব ভূতুরে কাণ্ড করত না, বুঝলি রে নবু! এর পর ওই পরের মেয়েই জগতের সেরা আপন হবে।"

"ছাই হবে।" ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলে নবকুমার, "কই, জামাইবাবুর তো হল না।"

সত্যর উচ্ছ্বাস কমে, একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, "ও কথা বাদ দে। আমার মতন ছাই-পোরা কপাল যেন অতি বড় শত্রুরও না হয়!"

নবকুমার সত্যর ভাবান্তরে ঈষৎ থতমত খেয়ে বলে, "আমি কিছু

ভেবে বলি নি সদুদি! কিন্তু যা বললাম, তোমাকে আমার রক্কেকত্তা হতে হবে।"

"বেশ বলব মামীকে, যা দেখছি দু ঘা ঝ্যাঁটা আছে ললাটে!"

তা সদুর কথা মিথ্যা নয়। এলোকেশী সেই ব্যবস্থাই করেন।

তবে ললাটের ঝাঁটাটা দৃশ্যমান নয় এই যা। শব্দ অদৃশ্য। তবু এলোকেশী যখন কথার তুবড়ি ছোটান, মনে হয় তাঁর মুখ থেকে আগুনের হলকার মত দৃশ্যমানই কিছু বার হচ্ছে বুঝি!

শাক বাছতে বাছতে কথাটা পেড়েছিল সৌদামিনী, "ওগো মামী, তুমি তো বলছ ওরা পত্তরপাঠ-মাত্তর মেয়ে না পাঠালে তুমি ছেলের আবার বিয়ে দেবে, এদিকে ছেলে তো বেঁকে বসে আছে!"

"কী! কী বললি?"

মুহূর্তে অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেল।

সদুকে ন ভূতো না ভবিষ্যতি করে গাল দিয়ে ঘোষণা করলেন এলোকেশী, "যে আমার খেয়ে আমার পরে আমার সংসার ভাঙবার তাল খুঁজবে, তাকে ঝেঁটিয়ে দূর করে দেব তা এই বলে রাখছি সদু! আমার ছেলেকে কানে বিষমন্তর দিয়ে পর করে নিতে চাস লক্ষ্মীছাড়ি! উঠুক তোর মামা আহ্নিক করে, দেখাচ্ছি মজা!"

সদু প্রতিবাদও করে না, নিজের সাফাইও গায় না এবং এ প্রশ্নও তোলে না তার অপরাধ কোথায়? এমন কি তার মুখ দেখে এই মনে হয়, এই বাক্যবাণের লক্ষ্য বুঝি তার অপরিচিত কেউ!

নীলাম্বর আহ্নিক সেরে উঠে বাইরে এসে তামার কুশিতে সূর্যার্ঘ নিবেদন করে কুশিটা মাটিতে উপুড় করে, আর এক দফা সূর্যপ্রণাম সেরে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াতেই, এলোকেশী দুধকলা দিয়ে কালসাপ পোষার নজীর তুলে স্বামীকে অবহিত করিয়ে দিয়ে বলেন, "তুমি যদি এই দণ্ডে চিঠি লিখে রওনা করে না দেবে তো আমার মাথা খাবে।"

নীলাম্বর 'আহাহা' করে উঠে বলেন, "দিব্যি গালাগালির কি আছে! পত্র লিখছি, কিন্তু পাঠাবার কি হবে তাই ভাবছি। নাপতে বৌ তো—"

"কেন গাঁয়ে কি ও ভিন্ন আর মানুষ নেই? রাখাল তো গেছল সেবার?"

"রাখাল যাবে? কিন্তু অতখানি পথ একেবারে একলা! তাই ভাবছি।"

"তা হলে গোবিন্দ আচাযির ছেলে গোপনাকে পাঠাও। গাঁজার পয়সা দিলে রাজী হয়ে যাবে।"

"গোপনাকে কুটুমবাড়ি পাঠাব! কি বলতে কি বলে আসবে!"

"আসুক না!" এলোকেশী বীরদর্পে বলেন, "ওই গেঁজেলের কটুবাক্যিতে যদি মিন্‌সের চৈতন্য হয়! তার পর দেখি কেমন সোহাগিনী মেয়ে নিয়ে ঘরে বসে থাকতে পারে। গোপনাকে এও বলে দেবে ওখানে আশেপাশে কুলীনের মেয়ের সন্ধান পায় কিনা দেখে আসতে। নাকের সামনে হলেই ভাল হয়।"

নীলাম্বর আর কথা বাড়ান না, কাগজ কলম নিয়ে বসেন। এবং অনেক মুসাবিদান্তে একখানি চিঠির খসড়া খাড়া করেও ফেলেন।

তাতে এই কথাই বিশদ বোঝানো থাকে, রামকালী যদি পূর্ব জিদ বজায় রাখতে চান, তাঁর কপালে অশেষ দুঃখ আছে! ছেলের তো আবার বিয়ে দেবেনই এঁরা, তা ছাড়া আরও যা করবেন ক্রমশঃ প্রকাশ্য। রীতিমত ভয় দেখানো চিঠি।

পত্রের ভাব ও ভাষায় এলোকেশী প্রীতিপ্রকাশ করেন। অতএব নীলাম্বর তৎপর হন পাঠাবার চেষ্টায়। কিন্তু মনে তাঁর দুশ্চিন্তা, রামকালীর একমাত্তর মেয়ে সত্যবতী! বেশী টান্ কষলে দড়ি না ছিঁড়ে যায়!

এত কথার কিছুই নবকুমার জানে না। সে স্কুলে।

বেলায় যখন ফিরল, সদুর কাছে গিয়েই আগে দাঁড়াল। "সদুদি তেল!"

সদু পলায় করে তেল এনে ওর হাতে দিয়ে বলে, "দেখলি তো বললাম কাজ কিছু হবে না, শুধু আমার কপালে ঝ্যাঁটা, তাই হল। তোর শ্বশুরের মিত্যুবাণ তৈরি, এতক্ষণে বোধ হয় পাঠানোও হয়ে গেল। যদি বা দুদিন দেরি হত, তোর অমত শুনে মামী একেবারে ধেই ধেই।"

হাতের তেল আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ে, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে বেচারা নবকুমার।

সদু বোধ করি ওর মুখভঙ্গী দেখেই করুণাপরবশ হয়ে বলে, "যাক গে, তুই আর ও নিয়ে মন উচাটন করিস নে, দিতে হয় আর একবার টোপর মাথায় দিবি। কত আর কষ্ট! তোর একটা বৌ পেলেই হল। তবে মনে নিচ্ছে এবার তালুইমশাই নরম হবে, যতই হোক মেয়ের বাপ!"

হঠাৎ নবকুমার একটা বেখাপ্পা এবং অবান্তর কথা বলে বসে, "সায়েবরা শুধু একটা বিয়ে করে, কক্ষনো অনেক বিয়ে করে না।"

ব্যস, আর যায় কোথা!

সত্থর হাসির ধুম পড়ে যায়। "ওমা তাই না কি? ও বুঝেছি, তাই সায়েবদের বই পড়ে পড়ে তোরও সেই বুদ্ধি মাথায় ঢুকেছে! তা হ্যাঁরে নবু, সায়েবরা যদি একটা বৈ বিয়ে করে না, তো বাকী মেমগুলোর কী দশা হয়? বিধাতাপুরুষ যখন পৃথিবী ছিষ্টি করেছিল, তখন একটা করে বেটাছেলে আর দেড়কুড়ি করে মেয়েমানুষ গড়েছিল, এ তো জানিস? তা হলেই বল্! বাকীগুলোর গতি কে করবে, যদি একটা বৈ বিয়ে না করে?"

"যত সব আজগুবী!" নবকুমার মার আড়ালে বেশ সশব্দেই কথা বলে, "পৃথিবীসুদ্ধ্ বেটাছেলে বুঝি দেড়কুড়ি করে—"

মুখের কথা মুখেই থাকে, রঙ্গস্থলে এলোকেশী দেখা দেন, "বলি নবা, চান করতে যেতে হবে কিনা? যখনই দুটোয় এক হবে, অমনি হাসি-মস্করা। হ্যাঁলা সদি, তোকেও বলি, ও কি তোর সমবইসী? তা তো না, রাতদিন কেবল কানে কুমন্তর দেওয়া! রোস, বৌ একটা আসুক না ঘরে, হাঁড়ি গলায় গেঁথে দেবার লোক হোক, তোকে একবার ঝেঁটিয়ে বিদেয় করি।"

মাতৃ-সন্নিধানে নবকুমারের সর্বদাই চোরের ভূমিকা। তাই সত্থদির এই অপমানে তার প্রাণটা ছটফটিয়ে উঠলেও মুখ দিয়ে রা ফোটে না। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই, সত্থর মুখের রেখায় কোন ভাব-বৈলক্ষণ্য ফোটে না। সে যথাপূর্বং হাস্যবদনে নবুকে চোখ টিপে ইশারা করে, যার এই অর্থ হয় 'যা নাইতে যা, মামী ক্ষেপেছে!'

হাতের তেল তেলো থেকে সবটাই গড়িয়ে পড়ে গেছে, তেলালো হাতটাই শুধু মাথায় ঘষতে ঘষতে সোজা কাঁচদীঘিতে চলে যায় নবু। আজ আর যেন খিড়কি পুকুরে মন ওঠে না!

যেতে যেতে হঠাৎ সেই একদিনের দেখা শ্বশুরের ওপর ভারী রাগ এসে যায় নবকুমারের। এত ঝামেলার কিছুই তো হত না, যদি সেই মেয়ে না কি পাঠাতেন তিনি!

বুকটায় শুধু পাষাণভারই নয়, যেন কাঁটাও বিঁধেছে। দূর ছাই!

আঠারো

সপরিবার তুষ্টু গয়লা মাঠে এসে বুক চাপড়াচ্ছে, আর পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে। তুষ্টুর পরিবার জলে পড়ে কি আগুনে পড়ে এইভাবে লুটোপুটি খাচ্ছে এখান থেকে ওখান।

একরাশ লোক চারিদিকে ভিড় করে হা-হুতোশ করছে, আর কে কবে কোথায় ঠিক এই রকম, অথবা এই ধরনের ব্যাপার দেখেছে তারই আলোচনায় বাতাস মুখর করে তুলেছে।

আশ্বিনের রোদে সর্দি-গর্মি হবার কথা নয়, কিন্তু সময়টা বড্ড কড়া। একেবারে ভর দুপুরবেলা। আর ভিজে পান্ত কটা পেটে ঢেলেই মাঠে জঙ্গলে ঘোরা। মায়েরা তো এঁটে উঠতে পারে না ছেলেগুলোকে।

ছেলেটা তুষ্টু গয়লার নাতি রঘু। সমবয়সের দাবিতে নেড়ু কোম্পানির দলের একজন। আশ্বিনে আখের ক্ষেত রসে ভরভর, ছেলেগুলোর তাই দ্বিপ্রাহরিক খেলা আখচুরি। উপকরণের মধ্যে এক টুকরো ধারালো লোহার পাত। তার পর ক্ষেত থেকে কেটে আনার পর তো দাঁতই আছে।

দাঁত দিয়ে খোলা ছাড়িয়ে মাথা প্রমাণ লম্বা লাঠিগুলো চিবিয়ে চিবিয়ে রসগ্রহণ করেছে সকলেই, হঠাৎ রঘুর যে কি হল! বুড়ো বটগাছটার তলায় যেখানে বসেছিল সবাই, সেখানেই ধুলো জঞ্জালের ওপর শুয়ে পড়ল রঘু, যেন নেশাচ্ছন্নের মত।

ছেলেরা প্রথমটা খেয়াল করে নি, আগামীকাল আবার কখন অভিযান চালানো হবে সেই আলোচনাতেই তৎপর হয়ে উঠেছিল, চোখ পড়ল উঠে পড়বার সময়।

"কী রে রঘু, তুই যে দিব্যি ঘুম মারছিস?" বলল, একজন হি হি হাসির সঙ্গে ঠেলা মেরে। কিন্তু পরক্ষণেই হাসিমুখটা কেমন শুকিয়ে উঠল তার। রঘুটা দেহটা যেন শক্ত কাঠ-মত, রঘুর ঠোঁটের কোণে ফেনা।

"এই রঘুটার কি হয়েছে দেখ্ তো!"

"কি আবার হল?" বেপরোয়া ছেলেগুলো রঘুর গায়ে হাত দিয়ে প্রথমটা হাসির ফোয়ারা ছোটাল, "দেখেছিস চালাকি, কি রকম মট্‌কা মেরে পড়ে আছে। এই রঘু, গায়ে কাঠপিঁপড়ে ছেড়ে দেব, ওঠ্ বলছি।"

শুধু গায়ে কাঠপিঁপড়ে নয়, কানে জল, পায়ে চিমটি, ইত্যাদি করে ঘুম

ভাঙাবার সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ করার পর বেদম ভয় ঢুকল ওদের। নিশ্চিন্ত হল, এ ঘুম আর ভাঙবে না রঘুর, এ একেবারে 'মরণ ঘুম'। নইলে অমন হলদে হলদে রংটা ওর এমন বেগুনে হয়ে উঠবে কেন?

"চল্ পালাই"। বলল একজন।

"পালাব?" নেড়ু রুখে দাঁড়ায়।

"পালাব না তো নিজেরাও রঘুর সঙ্গে যমের দক্ষিণ দোরে যাব নাকি? কর্তারা কেউ দেখলে আস্ত রাখবে আমাদের?"

"যা বলেছিস! তুষ্টু ঠাকুর্দা ওর ওই দুধের বাঁক দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেবে।"

"বাঃ, আমাদের কি দোষ! আমরা কি মেরে ফেলেছি?"

"তা কে মানবে? বলবে তোদের সঙ্গে খেলছিল, তোরাই কিছু করেছিস। চল্ চল্, কে কমনে দেখে ফেলবে।"

নেড়ু ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে, "খুব ভাল কথা বলেছিস! বলি রঘু আমাদের বন্ধু না? ওকে শ্যাল-কুকুরে খাবে, আর আমরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচাব?"

রঘু বন্ধু, এ কথা সকলের মনেই কাজ করছিল, কিন্তু ভয় কাজ করছিল তার চাইতে অনেক বেশী। কাজেই আর একজন বাস্তববাদী এবং ঈশ্বরবাদী বালক উদাসমুখে বলে, "ভগবান ওর কপালে যা লিখেছে তাই হবে। আমাদের কী সাধ্যি যে খণ্ডাই!"

"আর রঘুর মা যখন বলবে, 'তোমাদের সঙ্গে খেলতে গেছল রঘু, সে তো বাড়ি ফিরল না। কোথায় সে গেল বাবা? তখন কি বলবি?"

"বলব আজ রঘু আমাদের সঙ্গে খেলতে যায় নি।"

"মিছে কথা বলবি?"

"তা কি করব? বিপাকে পড়লে স্বয়ং নারায়ণও মিছে কথা বলে।"

"বলে! তোকে বলেছে!" নেড়ু তীব্রকণ্ঠে বলে ওঠে, "পাহারা দে তোরা ওকে, আমি দেখি গিয়ে মেজকাকা আছেন না কি।"

"আর মেজকাকা! যমে ওকে গ্রাস করেছে রে নেড়ু!"

"তাতে মেজকাকা ডরায় না। জটাদার বৌ তো মরে গেছল, বাঁচান নি? কত লোককেই তো বাঁচান। আমি যাব আর আসব। তবে কপালক্রমে যদি দেখা না পাই, তাহলেই রঘুর আশায় জলাঞ্জলি।"

অগত্যাই রঘুর বাস্তববাদী বন্ধুরা 'য পলায়তি' নীতি ত্যাগ করে রঘুর

মৃতদেহ পাহারা দিতে সম্মত হল। মায়া কি তাদেরই করছিল না? কিন্তু কি করবে?

তারপর এই জলন্ত আগুনের মত সংবাদটাই আগুনের মতই এখান থেকে ওখান, এঘর থেকে ওঘর, দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে দিয়ে গ্রামসুদ্ধ সবাইকে টেনে এনেছে এই বুড়ো বটতলায়।

তার পর চলছে জল্পনা-কল্পনা।

সর্দি-গর্মি?

শরৎকালে?

"তা হবে না কেন? শরতের রোদই তো বিষতুল্য।' গণেশ তেলির শালীর ছেলেটা সেবার ঠিক এই রকম করে—"

"আর জীবন স্যাকরার ভাইপোটা?"

"নেপালের ভাগ্নীটাও তো—"

"আরে বাবা সে এ নয়, সে অন্য ঘটনা।"

"আমার পিসশ্বশুরের দেশেও একবার কাদের নাকি বুড়ো বাপ ঘাট থেকে আসতে গিয়ে—"

সহসা সমুদ্রকল্লোল স্তব্ধ হয়ে গেল।

কবরেজ মশাই আসছেন!

বাড়ি ছিলেন না, কোথা থেকে যেন ফিরেই শুনে পালকি করেই বুড়োবটতলায় এসে হাজির হয়েছেন।

শায়িত বালকের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন রামকালী, চমকে বললেন, "কখন হয়েছে এ রকম?"

নেড়ুর দিকে তাকিয়েই বললেন।

নেড়ু সভয়ে ঘটনাটা বিবৃত করল। রামকালী নিচু হয়ে ঝুঁকে ছেলেটার হাতটা তুলে ধরে নাড়ি পরীক্ষা করে নিশ্বাস ফেললেন, তার পর আস্তে মুখ তুলে বললেন, "কাদের ক্ষেতের আখ খেয়েছিলি?"

অন্য সব বালকরাই নাগালের বাইরে, নেড়ুই রাজসাক্ষী, তাই নিরুপায় স্বরে গুপ্তকথা প্রকাশ করে, "ইয়ে—বসাকদের।"

"কিছু কামড়েছে বলে চেঁচিয়ে ওঠে নি একবারও?"

"না তো!" নেড়ু অবাক হয়। সমগ্র জনসভা একটি মানুষের মুখের

দিকে তাকিয়ে চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান। এমন কি তুষ্টুরা পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে গেছে, হাঁ করে তাকিয়ে আছে, বোধ করি কোনও একটু ক্ষীণ আশায় বুক বেঁধে।

"সর্দি-গর্মি নয়' নিষ্ঠুর নিয়তির মত উচ্চারণ করেন রামকালী, "সাপের বিষ।"

সাপের বিষ!

একটা সমস্বর চীৎকার উঠল, "কোথায়? কোথায় কেটেছে?"

"কাটে নি কোথাও, সে তো ওর সঙ্গীরাই বলছে," রামকালী নিশ্বাস ফেলেন," খাওয়ার সঙ্গে দেহে বিষ প্রবেশ করেছে। একটু আগে যদি হাতে পেতাম, চেষ্টা দেখতাম, এখন আর কিছু করবার নেই।"

"কবরেজ মশাই!" হাহাকার করে পায়ে আছড়ে পড়ল তুষ্টু, "জগতের সবাইকে জীবন দিচ্ছেন কবরেজ-ঠাকুর, আর আমার নাতিটাকেই কিছু করবার নেই বলে ত্যাগ দিচ্ছেন।"

রামকালী ডান হাতটা তুলে একবার আপন কপাল স্পর্শ করে বলেন, "আমার ভাগ্য!"

"আপনার পায়ে ধরি ঠাকুরমশাই, ওষুধ একটু স্থান।"

এবার আছড়ে এসে পড়েছে বুড়ী। তুষ্টুর বৌ।

রামকালী কোন উত্তর দেন না, লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন জনতার দিকে।

কিন্তু সাপের বিষ মানে কি?

আহারের সঙ্গে সাপের বিষ আসবে কোথা থেকে?

সহসা এ কী আকাশ-থেকে-পড়া বিপর্যয়ের কথা বলছেন কবরেজ মশাই!

তুষ্টুর মত নির্বিরোধী নিরীহ মানুষটার এত বড় মহাশত্রু কে আছে যে, তার বংশে বাতি দেবার সলতেটুকু উৎপাটিত করবে, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করবে!

গুঞ্জন উঠছে জনতা থেকে।

"কবরেজ মশাই, সাপের বিষের কথা বলছেন? এত বড় শত্রু কে আছে তুষ্টুর?"

"কেন, ভগবান!" তীক্ষ্ণ একটা ব্যঙ্গ-তিক্ত হাসির সঙ্গে কথাটা শেষ

করেন রামকালী, "ভগবানের বাড়া পরম শত্রু আর মানুষের কে আছে তুষ্টু ?"

কিন্তু এত সংক্ষিপ্ত ভাষণ বোঝে কে ?

বিশদ না শুনতে পেলে ছাড়বেই বা কেন লোকে ? শুধু 'সাপের বিষ' ফতোয়া জারি করে নিষ্ঠুরের মত নীরব হয়ে থাকলে প্রশ্ন-বিষের দাহে যে ছটফট করবে লোক !

বলতেই হবে রামকালীকে, সাপে কাটল না, তবু তার বিষ এল কোথা থেকে।

কিন্তু উত্তর দিয়ে যে রামকালী বাক্‌শক্তিরহিত করে দিলেন সবাইকে ! এ কী তাজ্জব কথা !

আখের ক্ষেতে সাপের গর্ত ছিল, থাকেই এমন। ঠিক যে আখ গাছটার গোড়ায় সেই বিষের থলি, সেই আখটাই তুলে খেয়েছে হতভাগ্য ছেলেটা।

"এ কি বলছেন কবিরাজ মশাই !"

"যা সত্য তাই বলছি।" হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মোছেন রামকালী, গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, "নিয়তির উপর হাত নেই, আয়ু কেউ দিতে পারে না। তবু তক্ষুনি টের পেলে বিষ তোলার চেষ্টাটা অন্তত করতাম। কিন্তু তা হবার নয়, অদৃশ্য নিয়তি অমোঘ নিষ্ঠুর।"

অমোঘ নিয়তি !

তবু উৎসাহী কোন এক ব্যক্তি 'সাপের বিষ' শোনামাত্রই হাড়িপাড়ায় ছুটে গিয়ে ডেকে এনেছে বিন্দে ওঝাকে।

বিন্দে এসেও ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে।

অর্থাৎ সেই এক কথা—আর কিছু করবার নেই।

কিন্তু মরাকে বাঁচাতে না পারুক, জ্যান্তটাকে তো মারতে পারে বিন্দে ! সেই সর্বনাশের মূল স্বয়ং যমটাকে মন্ত্রের জোরে শেষ করে দিক সে। জনমত প্রবল হয়ে ওঠে।

হয়তো এই তীব্র বাসনার মধ্যে অন্য একটা প্রচ্ছন্ন বাসনাও সুপ্ত হয়ে রয়েছে। সন্দেহ নেই রামকালী কবিরাজ দেবতা, তাঁর বিচার নির্ভুল, কিন্তু এ হেন কৌতূহলোদ্দীপক কথাটার একটা ফয়সালা হওয়া তো দরকার।

বিন্দেকে ঝুলোঝুলি করতে থাকে সবাই।

রামকালী সামান্য একটু বিষণ্ন হাসি হেসে বলেন, "যাচাই করতে চাও ?"

"হায় হায়, আজ্ঞে এ কী কথা! কী বলছেন ঠাকুরমশাই!"

"যা বলছি তাতে ভুল নেই বাবা সকল। যা হোক একটা কথা কেউ বললেই সেটা বিশ্বাস করে নিতে হবে, তার কোন হেতু নেই। কিন্তু হতভাগার দেহটার যথাযথ একটা ব্যবস্থা আগে না করে—"

বিন্দে মাথা নেড়ে বলে, "আজ্ঞে বিষহরির পো যখন কাটেন নি, তখন ওতে আমার কিছু করার নেই। ও আপনার সহজ মিত্যুর হিসেবেই যা করবার করতে হবে।"

"কিন্তু দেখছ তো বিষে একেবারে নীল হয়ে গেছে।"

"তা অবিশ্যি দেখছি আজ্ঞে। একেবারে কালকেউটে দংশনের চেহারা। তবু যা কান্নন!"

"বাবা সকল, তোমরা তবে আর বৃথা ভিড় না করে কাজে লাগো।" শিথিল স্বরে বলেন রামকালী। রঘুর দিকে আর যেন তাকাতে পারছেন না তিনি। কিন্তু কে এখন কাজে লাগতে যাবে?

এত বড় একটা উত্তেজনা তাদের অধীর করে তুলেছে। সকলে বিন্দেকে ঘিরে ধরে চেঁচাচ্ছে, "কড়ি চাল্ তুই, কড়ি চাল। হারামজাদা বেটা সুড়সুড় করে এসে তোর ঝাঁপিতে ঢুকুক। তারপর তুই আছিস আর তোর বিষপাথর আছে। আছড়ে মেরে ফেল্।"

"তোমরা এত ছেলেমানুষি করছ কেন? সাপটাকে ঠিক পাওয়াই যাবে তার নিশ্চয়তা কি?"

"পাওয়া যাবে না মানে? আপনি যখন বলেছেন—"

"বিষ তো ঠিক, কিন্তু আখের ক্ষেতটা আমার অনুমান মাত্র, তার আগে জলটল কিছুই যখন খায় নি বলছে—তাই। কিন্তু এখন বিন্দের কীর্তি নিয়ে পড়লে তোমরা তো—"

কিন্তু যে যতই ভয়-ভক্তি করুক রামকালীকে, আজকের উত্তেজনা তাকে ছাপিয়ে উঠেছে। যদি আখের গাছের গোড়ায় সাপের বাসা থাকে, সেই খেয়ে জলজ্যান্ত একটা 'সাদস্তি' গোয়ালার ছেলে এক দণ্ডে মরে যাবে? তা যদি হয়, সেটা চোখের সামনে যাচাই হোক।

সাপের গর্ত আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত কেউ নড়বে না।

অতএব সমস্ত দৃশ্য যথাযথ রয়ে গেল, রঘুর ব্যবস্থায় কেউ গাও দিল

না, বিন্দে ওঝা মহাকলরবে সাপ চেগে আনার মন্ত্র আওড়াতে শুরু করে দিল।

রামকালী চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন, হয়তো বা শেষ অবধি দাঁড়িয়েই থাকতেন, হয়তো বা একসময় চলেই যেতেন, কিন্তু সহসা সেজখুড়ো এসে হাজির হয়ে চাপা গলায় ডাক দিলেন, "রামকালী!"

খানিক আগে গ্রামে আরও অনেক কাজের লোকের মত সেজকর্তাও একবার এখানে এসে ঘুরেফিরে নানা মন্তব্য করে চলে গেছেন। আবার ফিরে এলেন কোন্ বার্তা নিয়ে?

না, বার্তাটা বলতে রাজী নন সেজকর্তা।

তবে জরুরী দরকার!

বাড়ি যেতে হবে রামকালীকে!

দ্বিতীয় প্রশ্ন আর করলেন না রামকালী, ধীরে ধীরে সরে এলেন বুড়ো বটতলা থেকে। অকর্মা একদল লোক তখন বিন্দেকে ঘিরে উন্মত্ত হট্টগোল করছে।

ভাবলেন মৃত্যুর কারণ না বললেই হত। মৃত্যু, মৃত্যুই। মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করতে পারলেই কি তুষ্টু নাতিকে ফিরে পাবে? নাকি আততায়ীকে 'শেষ' করে ফেললেই পাবে?

তা পায় না।

তবু মৃত্যুর পর মৃত্যুর কারণ নিয়ে মাথা ঘামায় লোকে। আর খুন হলে নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীর ফাঁসি ঘটাবার জন্যে মরণ-বাঁচন পণ করে লড়ে।

আকাশ আর পাতাল, পাহাড় আর সমুদ্র।

কোন্ পরিবেশ থেকে কোন্ পরিবেশ।

কিন্তু ঘটনা যাই হোক, রামকালীর অন্তঃপুরেও প্রায় শোকেরই দৃশ্য। দীনতারিণী চোখ মুছছেন, চোখ মুছছেন কাশীশ্বরী, ভুবনেশ্বরী মূর্ছাতুরার মত পড়ে আছে একপাশে, মোক্ষদা দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন এবং সেজখুড়ী, কুঞ্জর বৌ, আশ্রিতা অনুগতা প্রভৃতি অন্যান্য নারীকুল নিম্নস্বরে রামকালীর জেদ তেজ ও অদূরদর্শিতার নিন্দাবাদ করছেন।

শুধু সারদা সেখানে নেই, সে তদব্যস্তে কুটুমবাড়ির লোকের আহার-আয়োজনে ব্যাপৃত আছে।

তুষ্টু গয়লার নাতির ব্যাপার নিয়ে সারা গ্রাম আজ তোলপাড়, তবে বাইরের কোনো হুজুগে এ বাড়ির অন্তঃপুরিকাদের উঁকি দেবার অধিকার নেই, বাদে মোক্ষদা।

মোক্ষদা একবার দেখে এসে স্নান করেছেন, আর যাবেন না। গিয়ে করবেনই বা কি ?

সত্যর শ্বশুরের প্রেরিত চিঠি কুঞ্জবিহারী পড়ে দিয়েছেন, আর তার পর থেকেই বাড়িতে এই শোকের ঝড় বইছে।

জামাইয়ের মা বাপ যদি ছেলের আবার বিয়ে দেয়, মেয়ের মৃত্যুর চাইতে সেটা আর কম কি ? পরের মেয়ে-বৌকে উদারতার উপদেশ দেওয়া যায়, তার মধ্যে সতীনের হিংসের পরিচয় পেলে নিন্দে করা যায়, কিন্তু ঘরের মেয়ের কথা আলাদা।

সারাদিনের ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহ, আর তুষ্টুর নাতির ওই শোচনীয় পরিণামে ক্লিষ্ট মন নিয়ে বাড়ি ঢুকেই ঘটনাটা শুনলেন রামকালী।

তীক্ষ্ণ তীব্র দুই চোখের মণিতে জ্বলে উঠল দু-ডেলা আগুন! মনে হল ফেটে পড়বেন এখুনি, ধৈর্যচ্যুত হয়ে চিৎকার করে উঠবেন, কিন্তু তা তিনি করলেন না, শুধু ভয়াবহ ভারী গলায় প্রশ্ন করলেন, "কে এসেছে চিঠি নিয়ে ?"

এ সময় মোক্ষদা ভিন্ন আর কার সাধ্য আছে সামনে এগিয়ে যাবার ? তিনিই গেলেন। বললেন, "এনেছে ওদের ওখানের এক আচাযিদের ছেলে। গোপেন আচাযি না কি বলল।"

"কোথায় সে ? চণ্ডীমণ্ডপে ?"

"না, খেতে বসেছে!"

"ঠিক আছে, খাওয়া হলে আমার সঙ্গে দেখা করতে পাঠিয়ে দিও। চণ্ডীমণ্ডপে আছি আমি।"

মোক্ষদা প্রমাদ গনে বলেন, "তা তুমিও তো আজ সারাদিন নাওয়া-খাওয়া কর নি।"

"থাক বেলা পড়ে এসেছে, একেবারে সন্ধ্যাহ্নিক সেরে যা হয় হবে।"

"লোকটা একটু রগচটা আছে, একটু বুঝেসুঝে কথা কয়ো তার সঙ্গে।"

রামকালী ভুরু কুঁচকে বললেন, "লোকটা একটু কি আছে ?"

"বলছিলাম রগচটা আছে।"

মোক্ষদাকে অবাক করে দিয়ে সহসা হেসে ওঠেন রামকালী, "তাতে কি? আমি তো আর রগচটা নই!"

তা বলেছিলেন রামকালী ঠিকই।

রগ মাথা সবই তিনি খুব ঠাণ্ডা রেখেছিলেন; বুঝিবা অতিমাত্রাতেই রেখেছিলেন; গোপেন আচাযিকে ডেকে বেয়াইবাড়ির কুশলবার্তা নিয়ে হাস্যবদনে বলেছিলেন, "শুনলাম নাকি বেয়াইমশাইয়ের ছেলের বিয়ে? বলো শুনে খুব আনন্দিত হয়েছি। নেমন্তন্ন পেলে উচিতমত লৌকিকতা পাঠিয়ে দেব।"

গেঁজেল গোপেন আচাযি কটুকাটব্য দূরের কথা, কথা কইতেই ভুলে গেল, হাঁ করে চেয়ে রইল।

"খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তোমার?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"আজ রাতে তো আর ফিরছ না?"

"আজ্ঞে না!"

"বেশ। সকালে জলটল খেয়ে যাত্রা করো।"

"আজ্ঞে মেয়ে তা হলে পাঠাবেন না?"

"মেয়ে? কার মেয়ে? কোথায় পাঠাবার কথা বলছ হে?"

গোপেন এবার সাহসে ভর করে বলে ওঠে, "আজ্ঞে, আজ্ঞে আপনার মেয়ের কথা ছাড়া আপনাকে আর কার কথা বলতে আসব? মেয়ে তাহলে পাঠাবেন না?"

"আরে বাপু কোথায় পাঠাব তাই বলো? ভদ্রলোকের মেয়ে ভদ্রলোকের ঘরেই যেতে পারে, যেখানে সেখানে তো যেতে পারে না?"

গোপেনের শীর্ণ মুখটা বিকৃত হয়ে ওঠে, "বেশ, তবে পত্রে তাই লিখে দিন।"

"আবার পত্র লিখতে হবে? এই তুচ্ছ কথাটুকু তুমি বলতে পারবে না?"

"আজ্ঞে না। আমি গেঁজেল-নেশেল মানুষ, আমার কথায় বিশ্বাস করে না করে! এসেছি যখন পাকা দলিলই নিয়ে যাব।"

"হুঁ।" বলে মিনিটখানেক ভুরু কুঁচকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন

রামকালী, তার পর বলেন, "আচ্ছা, তাই হবে। পত্র লিখে রাখব, কাল সকালে রওনা দেবার আগে নিও।"

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তবু ধীরে ধীরে বেরিয়ে পড়লেন রামকালী।

না, সন্ধ্যাহ্নিকের পূর্বে হাতমুখ ধুতে ঘাটে গেলেন না, গেলেন বুড়ো-বটগাছতলার দিকে। কি করল ওরা দেখা যাক। এতক্ষণ পরে আবার রঘুর চেহারাটা চোখে ভেসে উঠল।

উঃ! নিয়তি কী অকরুণ!

বাড়ি থেকে একটু এগিয়েই থমকে দাঁড়ালেন রামকালী।

চলচলিয়ে চোটপায়ে আসছে কে অন্ধকারে? সত্যবতী না?

"তুই এখানে একলা যে?"

"একলা নয় বাবা, নেড়ু এসেছিল, তা ও এখন ফিরল না।"

"এসেছিলি কেন?"

"কেন, সে কথা আর শুধোচ্ছ কেন বাবা?" সত্য বিষণ্ণ হতাশ কণ্ঠে বলে, "রঘুটাকে একবার শেষ দেখা দেখতে।"

"এভাবে এসে ভাল কর নি। সেজঠাকুমার সঙ্গে এলে পারতে।"

"সেজঠাকুমার তো আটবার ডুব দেওয়া হয়ে গেছে, আর আসত?"

"আচ্ছা বাড়ি যাও।"

"যাচ্ছি।···বাবা—"

"কি হল? কিছু বলবে?"

"বলছি—"

"কি? কি বলতে চাও বলো?"

"বলছি কোথা থেকে যেন একটা লোক এসেছে না পত্তর নিয়ে?"

রামকালী মেয়ের মুখে এ প্রসঙ্গ শুনে অবাক হন। তার পর ভাবেন মেয়েটা তো চিরকেলে বেপরোয়া। শ্বশুরবাড়ি যাবার ভয়ে বাপের কাছে আর্জি করতে এসেছে! তাই সস্নেহে বলেন, "হ্যাঁ এসেছে তো! তোর শ্বশুরবাড়ি থেকে! তার কি?"

"বলছিলাম কি—" সত্যবতীর কথা বলার আগে চিন্তা আশ্চর্য বটে!

রামকালী মনে মনে হাসেন, শ্বশুরবাড়ি শব্দটাই মেয়েদের এমন!

"বলো কি বলছ?"

"আচ্ছা এখন থাক। তুমি ঘুরে এসো। গুছিয়ে বলবার কথা। রঘুটার মিতদেহ দেখে অবধি মনটা বড় ডুকরোচ্ছে। বাড়ি ফিরে একটু জিরোই।"

"আচ্ছা।" বলে চলে যান রামকালী।

এই অবোধ মেয়ে—একে এক্ষুনি শ্বশুরবাড়ি পাঠানো চলে? অসম্ভব!

"পাওয়া গেছে! পাওয়া গেছে!"

বহু কণ্ঠের একটা উন্মত্ত উল্লাসধ্বনি ভেসে আসে কবরেজবাড়ির দিকে, "কবরেজ মশাই, পাওয়া গেছে!"

কী পেল ওরা? কিসের এত উল্লাস? কোন্ পরম প্রাপ্তিতে মানুষ এমন উন্মত্ত হয়ে উঠতে পারে? চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়া থেকে নেমে এলেন রামকালী। তবে কি হতভাগ্য রঘুর প্রাণটাই ফিরে পাওয়া গেল তুষ্টুর পূর্বজন্মের পুণ্যে? কলিযুগেও ভগবান কানে শুনতে পান?

রঘু কি শুধু অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল?

মৃত্যুর কাছাকাছি অচৈতন্যতার যে গভীর স্তর, সেখানে ডুবেছিল? জটার বৌয়ের মত? রামকালীর নির্ণয় ভুল? তাই হোক তাই হোক! হে ঈশ্বর, একবারের জন্য অন্ততঃ তুমি রামকালীর গর্ব খর্ব করো, একবারের মত প্রমাণ করো রামকালীর নির্ণয় ভুল।

নাঃ, কলিযুগে ভগবান হাবা কালা ঠুঁটো। রামকালীর গর্ব খর্ব করবারও গরজ নেই তাঁর। রঘুর প্রাণটা ওরা ফিরে পায় নি, পেয়েছে তার প্রাণঘাতককে। ওঝার মন্ত্রচালনার গুণে সাপটা এসে লুটিয়ে পড়েছে মুখে ফেনা ভেঙে। আশ্চর্য! এ এক পরম আশ্চর্য!

সাপটাকে নাকি নিতে চেয়েছিল ওঝা, কাকুতিমিনতি করে বলেছিল, "এমন জাতসাপ দৈবাৎ মেলে।" কিন্তু জনতার আক্রোশ থেকে রক্ষা করতে পারে নি তার জাতসাপকে। লাঠি দিয়ে আর বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে তার গোল চকচকে দেহটাকে ছেঁচে কুটে চ্যাপটা করে দিয়েছে সবাই।

"অপরাধ নিও না মা জগদ্‌গৌরী!" বলেছে আর পিটিয়েছে।

এখন লম্বা একটা বাঁশের আগায় সেই মরা সাপটাকে ঝুলিয়ে নিয়ে ওরা এসেছে রামকালীর জয়গান করতে। ওঝা বুড়োও তার নিকষ কালো গুলি-

পাকানো বেঁটে শরীরটাকে নিয়ে আসছে ছুটে ছুটে বকশিশের আশায়। মোটা বকশিশ কি আর না দেবেন রামকালী? ওঝার সাফল্য যে রামকালীরও সাফল্য!

উল্লাস-চীৎকার-রত এই লোকগুলো যেন একটা অখণ্ড বর্বরতার প্রতীক। ঘৃণায় ধিক্কারে মনটা বিষিয়ে গেল রামকালীর, হাত তুলে ওদের থামতে নির্দেশ দিয়ে ভ্রূকুটি করে বললেন, "কী হয়েছে কি? এত স্ফূর্তি কিসের তোমাদের? রঘু বেঁচে উঠেছে?"

"বেঁচে উঠবে!" একজন মহোৎসাহে বলে ওঠে, "ভগবানের সাধ্য কি ওকে বাঁচায়! একেবারে কালনাগিনীর বিষ! কিন্তু ধন্যি বলি কবরেজ মশাই আপনার শিক্ষা। কামড়ায় নি, শুধু—"

"থামো।" ধমকে ওঠেন রামকালী, "তা ওই নিয়ে এত হৈ-চৈ করছ কি জন্যে? একটা বালক এখনো মরে পড়ে রয়েছে—"

সহসা একটা প্রবল আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে রামকালী চাটুয্যের, যেমনটা তাঁর বড় হয় না। রঘুর এই শোচনীয় মৃত্যুটা বড় লেগেছে রামকালীর। বার বার মনে হচ্ছে হয়তো সময় থাকতে রামকালীর হাতে পড়লে বেঁচে যেত ছেলেটা।

ভাবতে চেষ্টা করছেন, নিয়তি অমোঘ, আয়ু নির্দিষ্ট, এ চিন্তা মূঢ়তা, তবু সে চিন্তাকে রোধ করতে পারছেন না। বিষ-নিবারক ওষুধগুলো তাদের নাম আর চেহারা নিয়ে অনবরত মনে ধাক্কা দিচ্ছে।

"আজ্ঞে কর্তা, মা বিষহার নিলে কে কি করতে পারে? তবে কীর্তি একটা দেখালেন বটে!" বলে ওঠে ওঝা বুড়ো, "তবে আমাকেও মুখে রক্ত তুলে খাটতে হয়েছে কত্তা! বেটী কি আসতে চায়? একেবারে মোক্ষম মন্তর ঝেড়ে, তবে—"

"বেশ, শুনে সুখী হলাম। যাও তোমরা এখন ওটার একটা সদ্‌গতি করো গে।" সাপ মারলে তাকে শাস্ত্রীয় আচারে দাহ করা নিয়ম, সেই কথাই উল্লেখ করে কথাটা বলেন, তার পর ঈষৎ গাঢ়স্বরে বলেন, "আর সেই হতভাগাটারও একটা গতির ব্যবস্থা করো গে। তুষ্টুর একার ঘাড়ে সব দায়টা চাপিয়ে নিশ্চিন্ত থেকো না।"

জনতার উল্লাসটা একটু ব্যাহত হয়। এটা কী হল! এমনটা তো তারা আশা করে আসে নি! ভেবেছিল, সাপটা আবিষ্কৃত হয়েছে দেখে নিঃসন্দেহে

উৎফুল্ল হবেন রামকালী, কারণ এটা তাঁর 'জয়পতাকা বলা চলে। অনেকের মধ্যেই তো একটা অবিশ্বাস উঁকি দিয়েছিল, কবরেজ মশাইয়ের প্রতি অপরিসীম বিশ্বাস সত্ত্বেও।

একেবারে একটা অসম্ভব কথাই যে বলেছিলেন রামকালী। অসম্ভবও যে সম্ভব হয়, এ কথা প্রমাণ করত কে, এই সাপটা ছাড়া? অথচ রামকালী যেন নির্বিকার।

ক্ষুব্ধ হল, আহত হল ওরা।

"সে ব্যবস্থা কি আর না হচ্ছে কবরেজ মশাই", ওরা বলে, "এতক্ষণে বাঁশ কাটা হয়ে গেল বোধ হয়। তবে কথা হচ্ছে সাপের মড়া, ওকে তো ভাসাতে হবে?"

"না।" ভারী গলায় বলেন রামকালী, "সাপে কাটে নি। যথারীতি দাহর ব্যবস্থাই করো গে। কতগুলো হৈ-চৈ করো না।"

বাঁশ ঘাড়ে করে চলে গেল ওরা, তার পিছনে গ্রাম-ঝেঁটানো ছেলেমেয়ে ইতর-ভদ্র। ওদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হল রামকালীর, এরা আমাদের আত্মীয়! এই আমাদের প্রতিবেশী! বুনো জঙ্গলে কোন সাঁওতালদের থেকে এমন কি উন্নত এরা? বর্বরতার সুযোগ পেলেই তো মেতে উঠতে চায় সেই বন্য বর্বরতায়! মৃত্যুকে যে একটু শ্রদ্ধা করতে হয়, শ্রদ্ধার লক্ষণ যে নীরবতা, এ বোধের কণামাত্রও তো নেই এদের মধ্যে।

"কর্তা আমার বকশিশটা?"

নিকটে সরে এসে হাত কচলায় বিন্দে বুড়ো।

"বকশিশ?" রামকালী ভুরুর তীক্ষ্ণতায় কপালে রেখা এঁকে বলেন, "বকশিশ কিসের?"

"আজ্ঞে কত্তা—!"

"বলছি বকশিশ কিসের? ছেলেটাকে বাঁচিয়েছ?"

"সে আজ্ঞে মিত্যুর পর আর বাঁচাবে কে?"

"হ্যাঁ, আমি তা জানি। শুধু এইটা বুঝতে পারছি না, বকশিশ পাবার দাবিটা কখন হল তোমার?"

"বেশ, বকশিশ না দ্যান, মজুরিটা তো দেবেন আজ্ঞে।" ওঝা এবার রুখে ওঠে।

"সেটা দেবে যারা ডেকে এনেছে—" শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলেন রামকালী, "আমি তোমায় ডেকে আনি নি।"

"দশজনের মধ্যে কাকে ধরতে যাব কত্তা", বিন্দে বেজার মুখে বলে, "না হ্বান তো চলে যাব। গরীব মানুষ—"

"দাঁড়াও", রামকালী বেনিয়ানের পকেট থেকে নগদ দুটি টাকা বার করে ওর হাতে দিয়ে, আরও গম্ভীর গলায় বলেন, "শুধু তো তোমার মজুরি নয়, একটা সাপেরও দাম। দামী সাপটা গেল তোমার—"

বুড়ো বিহ্বল দৃষ্টি মেলে অভিভূত কণ্ঠে বলে, "আজ্ঞে কী বলছ কত্তা?"

"যা বলছি ঠিকই বুঝেছ।...যাও।"

"কত্তা!"

"কটা সাপ তোমার ঝাঁপিতে ছিল বুড়ো?" নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিয়ে তাকিয়ে রামকালী আস্তে উচ্চারণ করেন কথাটা।

সে দৃষ্টির সামনে কেঁপে ওঠে লোকটা, কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, "কত্তা তুমি অন্তরযামী—"

"বিশ্বাস করছ সে-কথা? আচ্ছা যাও ভয় নেই।"

টাকা, অভয়, দুটো জিনিস পেয়ে গেছে লোকটা, অতএব আর দাঁড়ায় না। কি জানি 'অগ্নিমুখ দেবতা' এক্ষুনি যদি মত পাল্টায়!

রামকালী অদ্ভুত একটা ক্ষোভের দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকেন। এদের তো নিজেদের অজ্ঞতার শেষ নেই, বুদ্ধিহীনতার চরম প্রতীক, তবু অপরের অজ্ঞতা আর মূঢ়তাকে উপজীবিকা করে চালিয়েও চলেছে দিব্যি!

সাপটা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু ধারণা করেন নি, লোকটা এত সহজে স্বীকার পাবে, এক কথায় এমন গুটিয়ে কেঁচো হয়ে যাবে।

মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে একটা বিষণ্ণ বেদনায়। দেহের রোগ সারাবার ভার চিকিৎসকের হাতে, কিন্তু মনের রোগ কে সারাবে? কুসংস্কার, অজ্ঞতা, বোকামি, অথচ তার সঙ্গে ষোলো আনা কুটিল বুদ্ধি। আশ্চর্য!

অন্ধকার হয়ে গেছে। আহ্নিকের সময় উত্তীর্ণপ্রায়, তবু সেই দাওয়ার ধারেই জলচৌকিটার উপর বসে আছেন রামকালী। খড়মটা পায়ে পরা নেই, পা দুটো আলগা তার ওপর চাপানো। অন্ধকারে খড়মের রুপোর 'বৌল' দুটো ঈষৎ চকচক করছে।

"বাবা!"

চমকে উঠলেন এই অপ্রত্যাশিত ডাকে।

"সত্য? তুমি এখানে? ও, আহ্নিকের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে তাই বলতে এসেছ? যাই মা। তুমি ভেতরে যাও।"

"আমি সে কথা বলতে আসি নি বাবা।"

"সে কথা বলতে আসি নি! তা হলে?"

"বলছিলাম—" প্রায় মরীয়ার মতন বলে ফেলে সত্য, "বারুইপুরের লোককে 'হ্যাঁ' করেই দাও না বাবা।"

বারুইপুরের!

রামকালী অবাক হয়ে বলেন, " 'হ্যাঁ' করে দেব? কি " 'হ্যাঁ' " করে দেব?"

"তুমি তো বুঝতেই পারছ বাবা"—সত্য কাতর সুরে বলে, "আমি আর নিল্লজ্জর মত মুখ ফুটে কি বলব!"

রামকালী মেয়ের মুখটা দেখতে পান না অন্ধকারে, কিন্তু স্বরটা ধরতে পারেন, তবু বুঝতে সত্যিই পারেন না, সত্য কি বলতে চায়। বারুইপুরের লোকটার চলে যাওয়ার ব্যাপারে, 'হ্যাঁ' করতে বলতে চাইছে না কি? রামকালী তো সে রায় দিয়েই দিয়েছেন, তবে? বাড়ির মেয়েরা বোধ হয় এখনো জের টানছেন?

সান্ত্বনার গলায় বলেন, "ভয় পেও না, শ্বশুরবাড়ি তোমায় যেতে হবে না এখন।"

সত্য বোঝে বাবা তার আবেদন ধরতে পারেন নি, আর পারার কথাও নয়। সত্যর মতন কোন্ মেয়েটা আর নিজের গলা নিজে কাটতে চায়? কিন্তু সত্য যে সাতপাঁচ ভেবে তাই চাইছে। হাড়িকাঠের নিচে গলাটা বাড়িয়েই দিচ্ছে। পিস্ঠাকুমার দল সশব্দে ঘোষণা করেছেন, 'অহঙ্কারে ধরাকে সরা দেখে রামকালী মেয়ের আখের ঘোচালেন! কুটুমরা রক্তমাংসের মানুষ বৈ তো কাঠ-পাথরের নয় যে, এত অপমান সহ্য করে বসে থাকবে! ছেলের আবার বিয়ে দেবেই নির্ঘাত, আর রামকালী চিরকাল মেয়ে গলায় করে বসে থাকবেন? গলায় পড়া মেয়ে মানেই হাতে পায়ে বেড়ি!'

সত্য ভেবে ঠিক করেছে বাপ-মায়ের হাতে পায়ে বেড়ি হয়ে থাকাটা কোন কাজের কথা নয়। তার চাইতে বাপের সুমতি করানোই ভাল।

কিন্তু বাবা তার বক্তব্যই ধরতে পারছেন না।

অতএব আর লজ্জার আবরণ রাখা চলল না। সত্য সকালবেলার চিরেতার জল খাওয়ার মতই চোখ-কান বুজে বলে ফেলল, "সে ভয়কে আমি মনে ধরাচ্ছি না বাবা, বরং উল্টো কথাই বলছি। ও তুমি পাঠাবার মন করেই দাও, আমার কপালে মরণ বাঁচন যা আছে হবে।"

রামকালী স্তম্ভিত হলেন।

এযাবৎ মেয়ের বহু দুঃসাহসের পরিচয় তিনি পেয়েছেন, সে দুঃসাহস পরিপাকও করেছেন। কারণ তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেছেন। কিন্তু এটা কি? নিজে সেধে শ্বশুরবাড়ি যেতে চাইছে সে?

বয়স্থা মেয়ে নয় যে, এ চাওয়ার অন্য অর্থ করবেন, তবে?

কণ্ঠস্বর গম্ভীর হল, হয়তো বা একটু রূঢ়ও, "তুমি ইচ্ছে করে শ্বশুরবাড়ি যেতে চাইছ?"

"যেতে চাইছি কি আর সাধে?" বাবার কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তার আভাস সত্যর চোখে প্রায় জল এনে ফেলেছে, "চাইছি অনেক ভেবেচিন্তে। কুটুমকে চটিয়ে শুধু গেরো ডেকে আনা বৈ তো নয়!"

রামকালী বুঝলেন, বাড়িতে এই ধরনের কথার চাষ চলেছে। অবোধ শিশু শিখবেই তো। কিন্তু তাই বলে এতই কি অবোধ যে, বাপের সামনে কোন্ কথা বলতে হয় তা বোঝে না?

কঠিন স্বরে বললেন, "আমার গেরোর কথা আমিই বুঝব সত্য, তুমি ছেলেমানুষ এ নিয়ে ভাববার এসব কথায় থাকবার দরকার নেই। এটা বাচালতা।"

কিন্তু সত্য তো দমবে না।

হাত ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া সত্যর কোষ্ঠীতে লেখে নি। তাই ম্লান হলেও জোরালো স্বরে বলে, "সে তো বুঝছিই বাবা, বাচালতা নিল্লজ্জতা, কিন্তু উপায় কি? সমিস্তে যে প্রেবল! এর পর যখন তোমাকে আমায় নিয়ে ভুগতে হবে, তখন যে মরেও শান্তি পাবে না। ওরা ছেলের আবার বিয়ে নাকি দেবে বলেছে। সেটা তো অপমান্যি। তুশ্চু একটা মেয়েসন্তানের জন্যে কেন তোমার উঁচু মাথাটা হেঁট হবে বাবা?"

রামকালীর মনে হল প্রচণ্ড একটা ধমকে মেয়েটার বাচালতা ঠাণ্ডা করে দেন, কিন্তু পরক্ষণেই একটা বিপরীত ভাবের ধাক্কা এল। মেয়েটার মনের

মধ্যে আছে কি? এতটুকু মেয়ে এত কথা ভাবেই বা কেন? আর এতখানি দুর্জয় সাহসই বা সংগ্রহ করল কোথা থেকে?

বাপের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার আলোচনা ভূভারতে আর কোনো মেয়ে করেছে কখনো? তাও রামকালীর মত রাশভারী বাপ? মা দীনতারিণী পর্যন্ত যার সঙ্গে সমীহ করে কথা বলেন? তা ছাড়া 'শ্বশুরবাড়ি' শব্দটাই তো মেয়েদের কাছে 'সাপখোপ বাঘ ভাল্লুক ভূত চোর' সব কিছুর চাইতেও ভয়ের। সে ভয়কেও জয় করেছে সত্য কোন্ নির্ভয় মন্ত্রের জোরে?

ঠিক করলেন ধমকে ঠাণ্ডা করবেন না, শেষ অবধি ধৈর্য ধরে শুনবেন ওর কথা। দেখবেন ওর মনের গতির বৈচিত্র্য। রাগের বদলে একটা বিস্মিত কৌতূহল আসছে।

শান্তগলায় বললেন, "মেয়েসন্তান যে 'তুশ্চ' এটা তো তুমি কখনো বলো না?"

"বলি না, অবস্থাই বলাচ্ছে বাবা! তুশ্চু না হলে আর তাকে সাত তাড়াতাড়ি 'পরগোত্তর' করে দিতে হয়? একটা সন্তান বলে কথা, তাও তো ঘরে রাখতে পার নি, তবে আর মিথ্যে মায়ায় জড়িয়ে কি হবে বাবা? সেই 'পরগোত্তর'ই যখন করে দিয়েছ, তখন আর জোর কি? আজ নয় কাল পাঠাতে তো হবেই, বলতে তো পারবে না 'দেব না আমার মেয়ে', তবে?"

"পাঠাবার একটা সময় আছে, নিয়ম আছে, সে তুমি এখন বুঝবে না। ও নিয়ে মিছে মাথা খারাপ করো না। যাও ভেতরে যাও।"

"ভেতরে নয় যাচ্ছি, কিন্তু মনের ভেতরে যে তোলপাড় হচ্ছে বাবা! রঘুর মিত্যু আজ আমার দিষ্টি খুলে দিয়েছে। ভগবানের রাজ্যেই যখন সময় বাঁধা নেই, নিয়ম নেই, তখন মানুষের আর থাকবে কি? এই আজ আমাকে পরের ঘরে পাঠাতে বুক ফাটছে তোমার, এক্ষুনি যদি মিত্যু এসে দাঁড়ায়, দিতে তো হবে তার হাতে তুলে?" সহসা আঁচলের কোণ তুলে চোখটা মুছে নেয় সত্য, তার পর ভারী গলায় বলে, "তখন তো বলতে পারবে না— 'এখনও সময় আসে নি, নিয়ম নেই।' ও শ্বশুরবাড়ি আর যমেরবাড়ি দুই যখন সমতুল্যি, তখন আর মনে খেদ রেখো না। পাঠিয়ে দিয়ে মনে করো সত্য মরে গেছে।"

আর বোধ করি শক্ত থাকতে পারে না সত্য, নিজের সেই কাল্পনিক মৃত্যুর শোকেই ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

স্তব্ধ রামকালী সেই ক্রন্দনবতীর দিকে তাকিয়ে থাকেন। মেয়েটা কি শুধুই শেখা বুলি কপ্‌চে যায়, না সত্যিই এমনি করে ভাবে?

খানিকক্ষণ পরে স্তব্ধতা ভেঙে বলেন, "মন-কেমনের কথা আমি ভাবি না সত্য, তুমি বড়দের মত কথা বলতে শিখেছ তাই বলছি, তোমায় পাঠালে আমার মান থাকবে না।"

সত্য গভীর দুঃখে হতাশ স্বরে বলে, "বুঝি বাবা, বুঝি না কি? কিন্তু এ তো তবু শুধু ওদের কাছে মান থাকা মান যাওয়া। গলবস্তর হয়ে যেদিন ওদের ঘরে মেয়ে দিয়েছ, মান তো সেদিনই গেছে। কিন্তু ওরা যদি তোমার মেয়েকে ত্যাগ দেয়, তা হলে যে দেশশুদ্ধ লোকের কাছে হতমান্যি! দুদিক বিবেচনা করো বাবা!"

রামকালীর গলা দিয়ে বুঝি আর শব্দ বেরোয় না, ভাষা স্তব্ধ হয়ে গেছে তাঁর। মেয়েটা কি সত্যি বালিকা মাত্র নয়, ওর মধ্যে কি কোন শক্তির "ভর" হয়? বুদ্ধির শক্তি, বাক্যের শক্তি?

"আচ্ছা তুমি যাও, আমি ভেবে দেখছি?"

"ভাবো। যা পারো আজ রাত্তিরের মধ্যেই ভেবে নাও। ওই হতচ্ছাড়াটা তো রাত পোহাতেই বিদেয় হবে।"

"ছি মা, শ্বশুরবাড়ির লোকের সম্পর্কে কি এভাবে বলতে আছে?"

"নেই তা তো জানি বাবা, কিন্তু দেখে যে অপিরবিত্তি আসছে। কুটুম-বাড়িতে পাঠাবার যুগ্যি একটা লোকও জোটে নি!"

রামকালী ঈষৎ তরল কণ্ঠে বলে ওঠেন, "তুই তো আমার মুখ হেঁট হবার ভয়ে সারা, কিন্তু শ্বশুররা ত্যাগ না দিয়ে কি ছাড়বে তোকে? দুদিন ঘর করেই তো ফেরত দেবে। তোকে নিয়ে কে ঘর করবে সত্য? এত বাক্যি কে সইতে পারবে?"

সত্য সগৌরবে মাথা তুলে বলে, "সে তুমি নিশ্চিন্দি থেকো বাবা, সত্যকে দিয়ে তোমার মুখ কখনো হেঁট হবে না।"

রামকালী গভীর স্নেহে মেয়ের পিঠে একটু হাত রাখেন।

মেয়েটা যে কি, তিনি যেন বুঝে উঠতে পারেন না। থেকে থেকে সে যেন তীক্ষ্ণ একটা প্রশ্নের মত তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায়। যে কথাগুলো বলে,

সব সময় সেগুলো পাকা মেয়ের শেখা কথা বলে উড়িয়ে দেওয়াও শক্ত, সে সব কথা চিন্তিত করে, বুঝিবা ভীতও করে। তবু রামকালী ওকে বুঝছেন, কিন্তু পৃথিবী কি ওকে বুঝবে ?

ও কেন সাধারণ হল না ?

পুণ্যির মত, বাড়ির আর পাঁচটা মেয়ের মত ? অথবা ওর মার মত ? সেটাই তো স্বাভাবিক, সেটাই তো উচিত। রামকালী তাহলে ওর সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতেন। সুখী হতেন।

কিন্তু ?

সত্যিই কি সুখী হতেন ? সত্য সাধারণ হলে, বোকা হলে, ভোঁতা হলে ? সত্যকে যে তাঁর একটা দামী জিনিস বলে মনে হয়, সেটা কি হত তাহলে ? কেবলমাত্র স্নেহের ওজন চাপিয়ে পাল্লাটা এত ভারী করে তুলতে পারতেন ?

"যাও মা ভেতরে যাও, আহ্নিক করব এবার।"

"যাচ্ছি—" উঠে দাঁড়িয়েই রামকালীর অসাধারণ মেয়ে সহসাই একটা হাস্যকর সাধারণ কথা বলে বসে, "ভেতরদালান পর্যন্ত একটু এগিয়ে দেবে বাবা ?"

"এগিয়ে দেব ? কেন রে ?"

"রঘুর দিশুটা দেখে অবধি গা-টা কেমন ছমছম করছে বাবা! মেলাই অন্ধকার ওখানটায়।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ চল, যাচ্ছি আমি। কেন যে তুমি গেলে সেখানে! ভাল কর নি।"

রামকালী কি একটু আশ্বস্ত হলেন ? তাঁর নির্ভীক মেয়ের এই ভয়টুকু দেখে ?

মেলাই অন্ধকারটা পার হয়ে এসে সত্য একবার থমকে দাঁড়াল, তার পর ঝপ্ করে বলে উঠল, "ভাবতে ভুলে যেও না বাবা!"

"ভাবতে ? কি ভাবতে ? ও!" অন্যমনস্কতা থেকে সচেতনতায় ফিরে আসেন রামকালী, "ভেবেছি। পাঠিয়েই দেব তোমায়।"

সহসা কান্নায় উথলে উঠল সত্য, "আমার ওপর রাগ করলে বাবা ?"

"না, রাগ করি নি।"

"আবার আনবে তো ?" কান্না অদম্য হয়ে ওঠে।

"ওরা যদি পাঠায়।" নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলেন রামকালী।

"পাঠাবে না বৈকি, ইস্!" মুহূর্তে কান্না থামিয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে সত্য, "তুমি ওদের মান রাখছ, আর ওরা তোমার মান রাখবে না? পাছে কুটুম্বুর সঙ্গে 'অস্‌রস' হয়, আসা-যাওয়া বন্ধ হয়, এই ভয়ে বুক ফেটে যাচ্ছে তবু যেতে চাইছি আমি, বুঝবে না তারা সে কথা?"

রামকালী আর একবার চমৎকৃত হলেন।

অতটুকু মগজে এত তলিয়ে ও ভাবে কি করে? তার পর হতাশ নিশ্বাস ফেললেন, বোঝবার কথা যদি সবাই বুঝত!

মেয়ের বিয়ে দেবার সময় জামাইয়ের রূপ দেখে নেওয়া যায়, কুল দেখে নেওয়া যায়, অবস্থা দেখে নেওয়া যায়, কিন্তু তার সংসারসুদ্ধ পরিজনের প্রকৃতি তো আর দেখে নেওয়া যায় না!

মেয়েকে রামকালী গৌরীদান করেছেন।

পাত্র খোঁজার সময় দীনতারিণী বলেছিলেন, "তোমার মোটে একটা মেয়ে, পরের ঘরে কেন দেবে? একটি সোন্দর দেখে কুলীনের ছেলে নিয়ে এসে ঘরজামাই রাখো।"

ভুবনেশ্বরীও স্পন্দিতচিত্তে শাশুড়ীর অন্তরালে বসে রায় শোনবার জন্যে হাঁ করে ছিল, কিন্তু রামকালী তাঁদের আশায় জল ঢাললেন। বললেন, "ঘরজামাই? ছি ছি ছি!"

"কেন?" দীনতারিণী বুকের ভয় চেপে জেদের সুরে বলেছিলেন, "লোকে কি এমন করে না?"

"লোকে তো কত কি করে মা!"

"তা বৌমার যে আর ছেলেপুলে হবে এ আশা তো দেখি না, কুষ্টিতেও নাকি আছে এক সন্তান। তা'লে তোমার বিষয়-আশয় তো জামাই-ই পাবে, ছোট থেকে গড়েপিটে তৈরি না করলে—"

রামকালী তীব্র প্রতিবাদে মাকে নির্বাক করে দিয়েছিলেন, "রাসু থাকতে, তা'র ভাইয়েরা থাকতে জামাই বিষয় পাবে এ কথা তুমি মুখে আনলে কি করে মা? ছি ছি! সত্য কেন বাপের ভাত খেতে যাবে? এমন পাত্রে দেব, যাতে জামাইকে শ্বশুরের বিষয়ে লোভ করতে না হয়।"

তা সে কথা রামকালী রেখেছিলেন।

মেয়ের যা বিয়ে দিয়েছিলেন, শ্বশুরের সম্পত্তিতে লোভ করার দরকার তাদের নেই।

বিষয়-আশয় ঢের, সে-ও বাপের এক ছেলে।

শুনেছেন বাপ একটু কৃপণ, তা সে আর কি করা যাবে? সব নিখুঁত কি হয়?

তেমনি যে চাঁদের মত জামাই!

তা ছাড়া পরম কুলীন!

এর বেশী আর কি দেখা যায়?

কিন্তু লোভ কি মানুষ দরকার বুঝে করে? রামকালী কি স্বপ্নেও ভেবেছেন, তাঁর পরম কুলীন বেহাই শ্যেনদৃষ্টি মেলে বসে আছেন তাঁর বিষয়ের দিকে? এমনই তীব্র লোভ যে রামকালীর 'অবর্তমান' অবস্থাটাই তাঁর একান্ত চিন্তনীয় বিষয়?

রামকালীর চাইতে বছর দশেকের বড় হয়েও, নিজে তিনি চিরবর্তমান থাকবেন এমনই আশা।

এসব জানেন না রামকালী।

শুধু জামাই পাঠচর্চা করছে এটা জেনেছেন, জেনে সন্তুষ্ট হয়েছেন।

'ম্লেচ্ছ বিদ্যা' বলে হেয় করবেন, এমন সংস্কারাচ্ছন্ন রামকালী নন। শিখুক, ভালই। ম্লেচ্ছদেরই তো রাজত্ব চলছে এখন।

উনিশ

লক্ষ্মীকান্ত বাঁড়ুয্যে মারা গেলেন।

পুণ্যবান মানুষ, নিয়মের শরীর, ভুগলেন না ভোগালেন না, চলে গেলেন সজ্ঞানে। সকালেও যথারীতি স্নান করেছেন, ফুল তুলেছেন, পূজো করেছেন। পূজো করে উঠে বড় ছেলেকে ডেকে বললেন, "তোমরা আজ একটু সকাল সকাল আহারাদি সেরে নাও, আমার শরীরটা ভাল বুঝছি না, মনে হচ্ছে ডাক এসেছে।"

বড় ছেলে হতচকিত হয়ে তাকিয়ে থাকে, বোধ করি ধারণাও করতে

পারে না, লক্ষ্মীকান্তর শরীর খারাপের সঙ্গে তাদের আহারাদি সেরে নেওয়ার সম্পর্ক কোথায়? আর 'ডাক' কথাটারই বা অর্থ কি?

লক্ষ্মীকান্ত ছেলের ওই বিহ্বলতায় হাসলেন। হেসে বললেন, "আহারাদি সেরে দুই ভাই আমার কাছে এসে বসবে, কিছু উপদেশ দিয়ে যাব। অবশ্য উপদেশ দেবার অধিকার আর কিছুই নয়, কতটুকুই বা জানি, জগৎকে কতটুকুই বা দেখেছি, তবু বয়সের অভিজ্ঞতা। বধূমাতাদের জানিয়ে দাও গে রান্নার কতকগুলি 'পদ' বাড়িয়ে যেন বিলম্ব না করেন।"

বাপ কেবল তাদের খাওয়ার কথাই বলছেন! কিন্তু তাঁর নিজের?

বড় ছেলে রুদ্ধকণ্ঠে বলে, "আপনার অন্নপাক কখন হবে?"

"এই দেখ বোকা ছেলে, বিচলিত হচ্ছে কেন? আমার আজ পূর্ণিমা, অন্ন নেই! ফলাহার একটু করে নেব, নারায়ণের প্রসাদ। প্রসাদে চিত্তশুদ্ধি, দেহশুদ্ধি!"

ছেলে গিয়ে ছোট ভাইয়ের কাছে ভেঙ্গে পড়ল। তার পর অন্তঃপুরিকারা টের পেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত সংসারে শোকের ছায়া নেমে এল। কেউ অবিশ্বাস করল না, কেউ হাস্যকর বলে উড়িয়ে দিল না, 'অমোঘ নিশ্চিন্ত' বলে ধ্বসে পড়ল।

বাঁড়ুয্যের সংসার থেকে এ সংবাদ সঙ্গে সঙ্গেই বাইরেও ছড়িয়ে পড়ল, কারণ আগুন কখনো এক জায়গায় আবদ্ধ থাকে না।

মুহূর্তে চারিদিকে প্রচার হয়ে গেল, "বাঁড়ুয্যে যে চললেন!"

যেন বাঁড়ুয্যে কোন বিদেশ ভ্রমণে যাচ্ছেন, নৌকোভাড়া হয়ে গেছে, সঙ্গীরা প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কোথাও।

উঠোনে তুলসীমঞ্চের নীচে লক্ষ্মীকান্তর শেষশয্যা বিছানো হয়েছে, বালিশে মাথা রেখে দুই হাত বুকে জড়ো করে টানটান হয়ে শুয়ে আছেন তিনি সোজা।

কপালে চন্দনলেখায় হরিনাম, দুই চোখের উপর পাতায় আর দুই কানে চন্দন-মাখানো তুলসীপাতা। বুকের উপর ছোট্ট একটি হাতেলেখা পুঁথি। লক্ষ্মীকান্তর নিজেরই হাতের লেখা, গীতার কয়েকটি শ্লোক। নিত্য পাঠ করতেন, সেটি সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে।

যাত্রাকালে কেউ স্পর্শ করবে না, যাত্রীর নিষেধ। বিছানাটি ছেড়ে

আশেপাশে মাথা হেঁট করে বসে আছে ছেলেরা, পাড়ার কর্তা-ব্যক্তিরা। অন্তঃপুরিকারা অদূরে আলম্ব ঘোমটায় আবৃত হয়ে বসে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করছেন।

মৃত্যুর দণ্ডকাল অতীত না হওয়া পর্যন্ত ডাক ছেড়ে কাঁদা চলবে না, সেটাও নিষেধ। ক্রন্দনধ্বনি আত্মার উর্ধ্বগতির পথে বিঘ্ন ঘটায়।

বাঁড়ুয্যে গিন্নীও সেই নিষেধাজ্ঞা শিরোধার্য করে নিঃশব্দে ডুকরোচ্ছেন।

ঘোষাল এসে দাঁড়ালেন।

কাঁপা গলায় বলে উঠলেন, "জনকরাজার মত চললে বাঁড়ুয্যে ?"

লক্ষ্মীকান্ত মৃদু হেসে মৃদুস্বরে বললেন, "বিদেশ থেকে স্বদেশে! বিমাতার কাছ থেকে মাতার কাছে।"

তার পর ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তারক ব্রহ্ম।"

অর্থাৎ বৃথা কথায় কালক্ষেপ নয়।

"নমো নারায়ণায় নমো নারায়ণায়, হরের্নামৈব কেবলম !"

আস্তে আস্তে চোখের পাতা দুটি বুজলেন লক্ষ্মীকান্ত। তুলসীপাতা দুটি ঢেকে দিল দুটি চোখের পাতা।

নিশ্বাসের উত্থানপতনের সঙ্গে নামজপ হতে থাকল ভিতরে, যতক্ষণ চলল শ্বাসের ওঠাপড়া।

একসময় থামল।

যাক, বয়স হয়েছিল লক্ষ্মীকান্তর, ভুগলেন না ভোগালেন না, চলে গেলেন এতে দুঃখের কিছু নেই। অন্ততঃ দুঃখ করা উচিত নয়। মানুষ তো মরবার জন্যেই এসেছে পৃথিবীতে, সেই তার সর্বশেষ আর সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মটি যদি নিপুণ ভাবে নিখুঁতভাবে করে যেতে পারে, তার চাইতে আনন্দের আর কি আছে ?

না, লক্ষ্মীকান্তর মৃত্যুতে দুঃখের কিছু নেই।

তবু নিকট-আত্মীয়রা দুঃখ পায়।

মায়াবদ্ধ জীব দুঃখ না পেয়ে যাবে কোথায় ?

কিন্তু নিকট-আত্মীয় না হয়েও একজন এ মৃত্যুতে দুঃখের সাগরে ভাসে, সে হচ্ছে সারদা!

শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নতুন কুটুম্বকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে বাঁড়ুয্যের ছেলেরা, আর 'নিয়মভঙ্গ' অবধি থাকার আবেদন জানিয়ে রাসুকে নিতে লোক পাঠিয়েছে।

তুলনা হিসেবে বলতে গেলে সারদার মাথায় একখানা ইঁট বসিয়েছে।

নিয়ে যাবে পরদিন। কথা চলছে সারাদিন।

এ বাড়ি থেকে রামকালী খবর শোনামাত্র একবার দেখা করে এসেছেন, এবং যথারীতি হবিষ্যান্নের যোগাড় পাঠিয়েছেন লৌকিকতা হিসাবে। প্রচুরই পাঠিয়েছেন।

এখন আবার রাসুর সঙ্গে লোক যাবে, শ্রাদ্ধের 'সভাপ্রণামী' আর সমগ্র সংসারের ঘাটে ওঠার কাপড়চোপড় নিয়ে। নিয়মভঙ্গের দিন পুকুরে জাল ফেলানো হবে, মাছ যাবে, রাসুর শাশুড়ীদের জন্য সিঁদুর আলতা পান সুপারি যাবে।

এইসব আলোচনাই চলছে সারাদিন।

সারদার মনে হচ্ছে, সবই যেন বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

এই যে তার বাবার খুড়ী মারা গেলেন সেবার, কই এতসব তো হয় নি!

যাক, সে কথা যাক।

পয়সা আছে বিলোবে।

কিন্তু সারদার খাস তালুকটুকু না এই উপলক্ষে বিকিয়ে যায়!

রাতে ছাড়া কথা কওয়ার উপায় নেই, স্পন্দিতচিত্তে সংসারের কাজ সারে সারদা, আর প্রহর গোনে।

তবু কুটুমদের একটু আক্কেল আছে, দিনেদিনেই নিয়ে চলে যায় নি, একটা রাত হাতে রেখেছে।

এ বাড়ির খাওয়াদাওয়া মিটতে রাতদুপুর হয়ে যায়।

তবু একসময় আসে সেই আকাঙ্ক্ষিত সময়।

দরজার হুড়কো লাগিয়ে দেওয়া যায় এবার, সমস্ত সংসার থেকে পৃথক হয়ে এসে বসা যায় দুটো মানুষ।

চট্ করে কথা বলা সারদার স্বভাব নয়।

প্রথমটা যথারীতি প্রদীপ উস্কোয়, প্রদীপের শিখার ওপর বাটি ধরে ছেলের দুধ গরম করে, ছেলে তুলে দুধ খাওয়ায়, তার পর তাকে শুইয়ে চাপড়ে তার ঘুম সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে, এদিকে এসে পা ঝুলিয়ে বসে।

বড় করে একটা নিশ্বাস ফেলে।

তার পর বলে ওঠে, "যাচ্ছো তা হলে?"

রাসু অবশ্য এ প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুতই ছিল, তাই নির্লিপ্ত স্বরে বলে, "যাওয়া ছাড়া তো উপায় দেখছি না!"

"উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছিলে বুঝি ?" ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ স্বর।

"খুঁজে আর কি বেড়াব ? জানি তো ছাড়ান-ছিড়েন নেই !"

"চেষ্টা থাকলে ছাড়ান থাকে।" আরও তীক্ষ্ণ হুল ফোটায় সারদা।

"কি করে শুনি ?" ঈষৎ উষ্মা প্রকাশ করে রামু।

"শরীর খারাপের ছুতো দেখাতে পারলে কেউ টেনে নিয়ে যেতে পারে না।"

রামু বিরক্তভাবে বলে, "সে ছুতোটা দেখাব কি করে শুনি, এই আকাঁড়া দেহখানা নিয়ে ?"

সারদা এ বিরক্তিতে ভয় পায় না, দমে না। অম্লান বদনে বলে, "চেষ্টা থাকলে কি না হয় ! বলকা দুধ তোমার ধাতে অসৈরন, লুকিয়ে সের দু-তিন কাঁচা দুধ চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেললেই এখুনি এককুড়ি বার মাঠে ছুটতে হত। অসুখ বলে টের পেত সবাই। গুরুজনের সঙ্গে মিছে কথাও বলা হত না।"

"তা এটা আর মিছে ছাড়া কি ? মিছে কথা না হয়ে, নয় মিথ্যে আচরণ !"

নীতিবাগীশ রামু জোর দিয়ে বলে।

"থামো থামো," সারদা তীব্র প্রতিবাদ করে ওঠে, "এটুকু তো আর কখনো কর না গোসাঁইঠাকুর ? ফটা বটঠাকুরদের বাড়ি থেকে পাশা খেলে দেরি করে ফিরে সদর দিয়ে না ঢুকে খিড়কি দিয়ে ঢোকা হয় কেন শুনি ? মেজকাকা মশাই যে সমস্কৃত পড়ার টোল ঠিক করে দিয়েছেন, সেখানে তো মাসের মধ্যে দশ দিন কামাই দাও, সে কথা জানাও ওনাকে ? নিত্যিনিয়মে বেরিয়ে এখান-ওখান করে বেড়াও না ? আমাকে আর তুমি ধম্ম দেখাতে এস না।"

"আমি কাউকে কিছু দেখাতে চাই না," বীরপুরুষ রামু বলে, "গুরুজন যা নির্দেশ দেবেন মানব, ব্যস।"

"তা তো মানবেই। সেখানে যে মধু আছে। নতুন বাগানের নতুন ফুল ! পাটমহলের পাটরাণী !"

"বাজে কথা বলো না।"

"বাজে কথাই বটে !"

সারদা আর একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, "আমার গা ছুঁয়ে প্রিতিজ্ঞে করেছিলে, সে কথা মনে পড়ছে ?"

"পড়বে না কেন ? তা আমি তো আর জামাইষষ্ঠীর নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছি না। যাচ্ছি একটা মান্যমান লোকের শ্রাদ্ধয়।"

"তার সঙ্গে আমারও শ্রাদ্ধ-পিণ্ডির ব্যবস্থা হচ্ছে, অন্তরেই জানছি। এবার নিঘ্‌ঘাত তারা মেয়ে পাঠাবার কথা কইবে।"

রাসু তেড়ে ওঠার ভান করে বলে, "তোমার যেমন কথা! নিজে থেকে কেউ মেয়ে পাঠাবার কথা বলে ?"

"বলে বৈকি! ক্ষেত্তর বিশেষে বলে! সতীনের ওপরে পড়া মেয়ের কথায় বলে!"

"বলি তার ঘরবসতের বয়েসটা হবে তবে তো ? তুমি যেন রাতদিন দড়ি দেখে 'সাপ' বলে আঁতকাচ্ছ!"

"বয়েস!" সারদা তীব্র ঝঙ্কারে বলে ওঠে, "মেয়েমানুষের বয়েস হতে আবার কদিন লাগে ? দশ পেরোলেই বয়স! আর মেজোকাকা মশাইয়ের কড়াকড়ির জারিজুরি তো ভেঙে গেল। নিজের মেয়েকেই যখন বয়েস না হতেই পাঠালেন।"

"গুরুজনের কাজের ব্যাখ্যানা করো না। কারণ ছিল তাই এ কাজ করেছেন।"

সারদা দুর্বার, সারদা অদম্য।

সেও সমানে সমানে জবাব দেয়, "তা তোমার দ্বিতীয় পক্ষকে শ্বশুরঘর করতে নিয়ে আসারও একটা কারণ আবিষ্কার হবে! তবে এই জেনে রাখো, নতুন বৌ যদি আসে, সেও এক দোর দিয়ে ঢুকবে, আমিও আর এক দোর দিয়ে দড়িকলসী নিয়ে বেরিয়ে যাব!"

অস্ত্রটা মোক্ষম।

রাসু এবার কাবু হয়।

আপসের সুরে বলে, "আচ্ছা অত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে দুঃখু ডেকে আনবার কি দরকার তোমার বলো তো ? যাচ্ছি দাদাশ্বশুরের শ্রাদ্ধয়, খাব মাখব চলে আসব, ব্যাস। আমি কি কাউকে আনতে যাচ্ছি ?"

"তা সেটা মনে রাখলেই হল!"

সারদা সহসা রাসুর একটা হাত টেনে নিয়ে ঘুমন্ত ছেলের মাথায় ঠেকিয়ে দিয়ে বলে, "তবে সত্যি করে যাও সেকথা!"

"আ ছি ছি! কী মতিবুদ্ধি তোমার! ছেলের মাথায় হাত দিয়ে—"

সারদা অকুতোভয়ে বলে, "তাতে ভয়টা কি? আমায় বলো না খোকার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করতে—জীবনে কক্ষনো পরপুরুষের দিকে চোখ তুলে চাইব না, একশ বার সে দিব্যি করব।"

"চমৎকার বুদ্ধি! সেটা আর এটা এক হল?"

"কেন হবে না? আমি ছাড়া জগতের আর সকল মেয়েমানুষকে পরস্ত্রী ভাবলে কোন কষ্ট নেই!"

"বাঃ, যাকে অগ্নি-নারায়ণ সাক্ষী করে গ্রহণ করলাম—"

"ও:!" সারদা ঝট করে উঠে দাঁড়ায়। দরজার খিলটা খুলে ফেলে, কপাট ধরে দাঁড়িয়ে চাপা অথচ ভয়ঙ্কর একটা শব্দে বলে ওঠে, "ও বটে! এতক্ষণে প্রেকাশ পেল মনের কথা! তা এতক্ষণ না ভুগিয়ে সেটা বললেই হত! আচ্ছা—"

রামুও অবশ্য এবার ভয় পেয়েছে, সেও নেমে এসে বলে, "আহা তা, কপাট খুলছ কেন? যাচ্ছ কোথায়?"

"যাচ্ছি সেইখানে, যেখানে খলকাপট্য নেই, আগুনের জ্বালা নেই।" বলে ঝট করে বেরিয়ে পড়ে অন্ধকারে মিশিয়ে যায় সারদা।

নাঃ, আর কিছু করবার নেই!

নিরুপায় ক্ষোভে কিছুক্ষণ উঠোনের সেই গভীর রাত্রির নিকষ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকে নিঃশব্দে কপাটটা ভেজিয়ে দিয়ে খাটের ওপর বসে পড়ে রামু।

ঘাম গড়াচ্ছে সর্বাঙ্গ দিয়ে।

গরমে নয়, আতঙ্কে।

কিন্তু করবার কি আছে এখন? ঘর থেকে বেরিয়ে তো আর বৌ খুঁজে বেড়াতে পারবে না রামু? মা-খুড়ীর ঘুম ভাঙিয়ে দুঃসংবাদটা জানাতেও পারবে না!

নিজের হাতে যদি করণীয় কিছু থাকে, তো সে হচ্ছে নিজের হাতটা মুঠো পাকিয়ে নিজের মাথায় কীল মারা!

কুড়ি

এলোকেশী দাওয়ায় পাটি পেতে বসে বৌয়ের চুল বেঁধে দিচ্ছেন। দিচ্ছেন অনেকক্ষণ থেকেই। সেই দুপুরবেলা বসেছিলেন—এখন বেলা প্রায় গড়িয়ে এল।

এলোকেশী যেন পণ করেছেন আজ তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি দেখিয়ে ছাড়বেন। বৌকে সামনে রেখে তার পিছনে হাঁটু গেড়ে উঁচু হয়ে বসেছেন তিনি, মুখের ভাব কঠিন কঠোর।

ওদিকে টানের চোটে সত্যবতীর রগের শির ফুলে উঠেছে, চুলের গোড়াগুলো মাথার চামড়া থেকে উঠে আসতে চাইছে, ঘাড় অনেকক্ষণ আগে থেকেই টনটন করতে শুরু করেছে, এখন মেরুদণ্ডের মধ্যেও একটা অস্বস্তি শুরু হচ্ছে।

অথচ তার কেশকলাপ নিয়ে যে অপূর্ব শিল্প-রচনার চেষ্টা চলছে, আশা হচ্ছে না সহজে তার সমাপ্তি ঘটবে।

কিন্তু কেবলমাত্র এলোকেশীর অক্ষমতাকেই দায়ী করলে অবিবেচনার কাজ হবে, দায়ী অপরপক্ষও। সত্যবতীর চুলগুলো যেন বেয়াড়া ঘোড়া, কোনমতেই তাকে বাগ মানিয়ে বশে আনা যাচ্ছে না।

ঝুলে খাটো আর আড়ে ভারী চাপ চাপ কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলো খোলা থাকলে যতই সুন্দর দেখাক, তাকে বেণীর বন্ধনে বেঁধে কবরীর আকৃতি দিতে গেলেই মুশকিলের একশেষ। গোড়া বাঁধতে গেলে ফস ফস করে এলিয়ে খুলে পড়ে, কোনরকমে যদিবা তিনগুছির ফেরে ফেলা যায়, তো পাঁচগুছি সাতগুছি নগুছির দিকেও যাওয়া চলে না।

কিন্তু এলোকেশী আজ বদ্ধপরিকর, সাতগুছির বাঁধনে বেঁধে 'কল্কা খোঁপা' করে দেবেন বৌকে। তাই বারতিনেক অসাফল্যের পর একগোছা মোটা মোটা কালো ঘুনসি দিয়ে চুলের গোড়াটাকে প্রায় ব্রহ্মতালুতে জড় করে এনে প্রাণপণ বিটকেলে বেঁধে ফেলেছেন, এবং সাতগুছির সাত ভাগকে আয়ত্ত করতে চেষ্টা করছেন।

দীর্ঘস্থায়ী এই চেষ্টায় সত্যবতীর অবস্থা উপরোক্ত। অনেকক্ষণ বাবু হয়ে বসে থাকার পর এবার হাঁটু দুটো মুড়ে বুকের কাছে জড়ো করে বসেছে সত্যবতী, কারণ পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরেছিল। মুখটা সত্যবতীর আকাশমুখো

আর সেই মুখের ওপর পরনের নীলাম্বরী শাড়িখানার আঁচলটুকু চাপা দেওয়া।

মুখে আঁচল চাপা না দিয়ে উপায় নেই, কারণ চুল বাঁধবার সময় ঘোমটা দেওয়া চলে না। অথচ জলজ্যান্ত আস্ত মুখখানা খুলে বসে থাকলেও তো চলে না। না-ই বা ধারেকাছে কেউ থাকল, আর হলই বা শাশুড়ী পিছনে বসে, তবু 'নতুন বৌ' বলে কথা। তাই আঁচলটা তুলে মুখে চাপা দিয়েছে সত্যবতী। মানে দিতে বাধ্য হয়েছে। ঘোমটা খসাবার আগেই এলোকেশী নির্দেশ দিয়েছেন "আঁচলটা মুখে ঢাকা দাও দিকি বাছা! তোমার তো আর বোধ-বুদ্ধির বালাই নেই, অগত্যে সবই পষ্ট করে বলে দিতে হবে আমায়।"

দিনটা কি তবে সত্যবতীর শ্বশুরবাড়ী বাসের প্রথম দিন?

না তা নয়, এসেছে সত্যবতী প্রায় মাসখানেক হয়ে গেল, কিন্তু মাথাটা ওর এ পর্যন্ত শাশুড়ীর হাতে পড়ে নি। সৌদামিনীই চুল বেঁধে সরময়দা মাখিয়ে আলতা পরিয়ে নতুন বৌয়ের প্রসাধন আর যত্নসাধন করছিল কদিন। হঠাৎ আজ সকালে এলোকেশীর নজরে পড়ল বৌয়ের চুল বেড়া-বিনুনি করে বাঁধা।

দেখে রেগে জ্বলে উঠলেন এলোকেশী। তবু নিশ্চিত হবার জন্যে ভুরু কুঁচকে ডাক দিলেন, "এদিকে এস দিকি বৌমা!"

শাশুড়ীর সামনে কথা বলাও নিষেধ, মুখ খোলাও নিষেধ, সত্যবতী নীরবে কাছে এসে দাঁড়াল।

ঘোমটা অবশ্য বজায় থাকলই, এলোকেশী হ্যাঁচকা একটা টানে পুত্রবধূর পিঠের কাপড়টা তুলে খোঁপাটা দেখে নিলেন। ঠিক বটে, বেড়া-বিনুনই বটে।

তেলে-বেগুনে জ্বলে ডাক দিলেন, "সদু! সদি!"

যাকে বলে ত্রস্তেব্যস্তে সেইভাবে ছুটে এল সৌদামিনী। দেখল নতুন বৌ 'বুকে মাথায় এক' হয়ে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে, আর মামী তার পিঠের কাপড় উঁচু করে তুলে ধরে দণ্ডায়মান। মামীর নয়নে অগ্নিশিখা, কপালে কুটিলরেখা।

'কি বলছ' এ প্রশ্ন উচ্চারণ করল না সৌদামিনী, শুধু শঙ্কিত দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে রইল।

কি হল বৌয়ের পিঠে ?

কোন জড়ুল চিহ্ন, না কোন চর্মরোগের আভাস, নাকি বা কোন পুরনো ক্ষতের দাগ ? অর্থাৎ নতুন বৌ কি 'দাগী' ! আর মামীর শ্যেনদৃষ্টির সামনে ধরা পড়ে গেছে সেটা !

অবশ্য ভুল ধারণা নিয়ে বেশীক্ষণ থাকতে হল না, সৌদামিনীকে এলোকেশী প্রবল স্বরে বলে উঠলেন, "বলি সদি, এমন ব্যাগারঠেলার কাজ কি না করলেই নয় ?"

বুক থেকে পাথর নামে সৌদামিনীর।

যাক বাঁচা গেল।

নতুন কিছু নয়। সেই আদি ও অকৃত্রিম লক্ষ্য।

অতএব সাহসে ভর করে বলল, "কি হল !"

"কি হল ! বলি শুধোতে লজ্জা করল না ? ধম্মের ষাঁড়ের মতন আকাঁড়া গতর নিয়ে দুবেলা ভাতের পাথর মারছিস, আর গতরে হাওয়া দিয়ে বেড়াচ্ছিস, একটু হায়া আসে না প্রাণে ? দশটা নয় বিশটা নয় একটা ভাই-বৌ, তার চুলটা বেঁধে দিয়েছিস এত অছেদ্দা করে ! বলি কেন ? কেন ? এত অগোরাহ্যি কিসের ?"

"হলটা কি তা বলবে তো ?"

সহজ গলায় বলে সৌদামিনী। আর সত্যবতী ঘোমটার মধ্য থেকে অবাক হয়ে প্রায় থরথর করে কাঁপতে থাকে। না, এলোকেশীর কটু-ভাষণে নয়, গিন্নীদের মুখে এরকম বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি কথা শোনার অভ্যাস পাড়াবেড়ানি সত্যর আছে। রামকালী চাটুয্যের বাড়ির কথাবার্তাগুলো কথঞ্চিৎ সভ্য, নইলে তারই সেজপিসি শাবিপিসির বাড়ি সর্বদা এই ধরনের কথার চাষ। সেজন্যে না। এলোকেশীর কটুভাষণে না। অবাক হয় সৌদামিনীর সহ্যশক্তি দেখে। এত অপমানের পর ওইরকম সহজ ভাবে কথা বলল ঠাকুরঝি !

এটা সত্যবতীর অদেখা।

কটু কথার পরিবর্তে হয় কটু কথা, নয় ক্রন্দন, এই দেখতেই অভ্যস্ত সে। আর ঠাকুরঝি কিনা বলছে "হলটা কি তা বলবে তো ?"

এলোকেশী অবশ্য অবাক হন না, কারণ সৌদামিনীর এই সহ্যশক্তি তাঁর পরিচিত। তবে তিনি তো আর প্রশংসায় উদ্বেল হন না, বরং এটা তার মামীর প্রতি অগ্রাহ্য ভাব বলেই রেগে জ্বলে যান।

এখনো তাই বললেন, "হলটা কি, তা বলে তবে বোঝাতে হবে? মনে মনে জানছ না? চোখে দেখতে পাচ্ছ না? এ কী ছিরির চুল বাঁধা হয়েছে? বৌয়ের মাথায় বেড়া-বিনুনি! ছি ছি, এতখানি বয়েস হল, কখনো শ্বশুরবাড়ীর বৌয়ের মাথায় বেড়া-বিনুনি দেখি নি। গলায় দড়ি তোর সদু, গলায় দড়ি যে একটা মাত্তর মাথা, তাও একখানা বাহারি খোঁপা বেঁধে দিতে পারিস না।"

সদু হেসে ওঠে, "বৌয়ের চুল যা বাহারি, ওতে আর বাহারি খোঁপা হয় না। বাগ মানানোই যায় না।"

"বাগ মানানো যায় না!" এলোকেশী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, "আচ্ছা দেখব কেমন না যায়। এই বাঁড়ুয্যে-গিন্নীর কাছে জব্দ হয় না এমন কোন্ বস্তু জগতে আছে দেখি। ত্রিজগতের মধ্যে বাগ মানাতে পারলাম না শুধু এই তোমাকে।"

"বেশ তো মামী, তুমি নিজে হাতেই বৌকে সাজিও না, তোমার একটা মাত্তর বেটার বৌ।" বলে সৌদামিনী।

আর এলোকেশী আরও ধেই ধেই করে ওঠেন, "কী বললি সদি? এ্যাঁ! এত আস্পদ্দা! মুখে মুখে জবাব! এত অহঙ্কার তোর কবে চূর্ণ হবে, কবে তোর দুঃখে শ্যালকুকুর কাঁদবে, সেই আশায় আছি আমি। এই তোকে দিব্যি দিলাম সদি, যদি আর কোনদিন তুই আমার বো'র চুলে হাত দিবি।"

"গুরুজনের দিব্যি গায়ে লাগে না—ও মানলে কি চলে গা?" সদু অম্লানবদনে বলে, "তোমার হল গে মন-মর্জি, কোনদিন দেবে, কোনদিন বা ভুলে যাবে—"

"কী বললি! কী বললি লক্ষ্মীছাড়ি! আমার একটা বেটার বৌয়ের কথা আমি ভুলে যাব?"

"তা তাতে আর আশ্চিয্যি কি মামী!" সদু নিতান্ত অমায়িক মুখে বলে, "তোমার সে গুণে কি ঘাট আছে? আপনার খিদের খাওয়া, তাই তো অর্ধেক দিন ভুলে যাও, ডেকে খাওয়াতে হয়।"

এলোকেশী সহসা থতমত খান। এটা ঠিক কোন্ ধরনের কথা ধরতে পারেন না। অভিযোগ না প্রশস্তি!

তাই ভারী মুখে বলেন, "হ্যাঁ, আমি ভুলে থাকছি আর রোজ তুমি আমায় ডেকে তুলে ঝিনুকে করে গিলিয়ে দিচ্ছ।"

"আহা তা না দিই, তোমার কি খেয়াল থাকে ?"

"না থাকে না থাক। বৌয়ের চুল আজ থেকে আমি বাঁধব এই বলে রাখছি। ওর চুলের দড়ি কাঁটা সব আমার ঘরে রেখে যাবি। পাখী-কাঁটা-গুলো দিতে ভুলবি না "

"দেব, দিয়ে যাব। তা বৌয়ের বাবা যে সোনার চিরুনি, সাপকাঁটা, বাগান ফুল ইত্যেদি করে একরাশ মাথার গয়না দিয়েছেন, সেগুলোই বা বাক্সয় পুষে রাখছ কেন ? সব বার করে বাহার করে দিও।"

"সে আমি কি করব না করব তোমার কাছে পরামর্শ নিতে আসব না! অনবরত খালি চ্যাটাং চ্যাটাং কথা! ভগবান যে কেন কঠিন রোগ দিয়ে তোর বাক্‌শক্তি হরণ করে নেন না তাই ভাবি। তুই জন্মের শোধ বোবা হয়ে বসে থাক, আমি 'নিসিংহতলা'য় ভোগ চড়াই।"

"দোহাই মামী, ওসব মানত-টানত করতে যেও না। দেব-দেবীরা এক শুনতে আর এক শুনে বসে থাকে, হয়ত বোবার বদলে ঠুঁটো করে দেবে, তখন মরবে তুমি লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে।"

"কী বললি! তুই ঠুঁটো হয়ে বসে থাকলে আমার সংসার অচল হয়ে যাবে? সাধে বলি অহঙ্কারের পাঁচ-পা তোর। আমার সংসার আমি চালাতে পারি নে ভেবেছিস? বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলে পারি। কিন্তু সে আঙ্গুলই বা আমি নাড়ব কেন ? ভাতকাপড় দিয়ে তোকে পুষছি যখন !"

"আহা, আমিও তো তাই বলছি গো। ঠুঁটো হলেও তো ভাত-কাপড়টা দিতেই হবে।"

"হবে! দায় পড়েছে। ঠ্যাং ধরে টেনে পগারে ফেলে দেব।"

"সর্বনাশ মামী, ও-বুদ্ধি করতে যেও না, পাড়াপড়শী তা হলে সেই পগারের পাঁক তুলে এনে তোমাদের গালে মুখে মাখাবে।" বলে হাসতে হাসতে চলে যায় সৌদামিনী সত্যবতীকে স্তম্ভিত করে রেখে।

বড় সংসারের মেয়ে সত্যবতী, তার এতটুকু জীবনে অনেক চরিত্র দেখেছে, এরকম আর দেখে নি।

যাক, সকালের সেই ঘটনার পরিণামে আজ দুপুরের এই মল্লযুদ্ধ।

সত্যিই বড় ভারী চুলের গোড়া সত্যর, অথচ এদিকে ঝুলে খাটো! এক গোছা কালো ঘুনসি দিয়ে কষে বেঁধে আর গোছা গোছা ঘুনসির ভেজাল

মিশিয়ে বেণী দুটো যদিবা লম্বা করলেন এলোকেশী, তাদের প্রজাপতি ছাঁদে পাক খাওয়াতে গিয়েই গোড়াসুদ্ধ ঢিলে হয়ে নেমে এল। আর সত্যবতীর কপালের ফের, ঠিক সেই মুহূর্তেই সত্যবতী বোধ করি পিঠের খিল আর পায়ের ঝিঁঝিঁ ধরা কমাতে একটু নড়েচড়ে বসল।

ব্যাপারটা হল 'পাত্রাধার তৈল কি তৈলাধার পাত্রে'র মতই। বন্ধনটা ঢিলে হয়ে পড়ার জন্যেই মুক্তির সুখে নড়েচড়ে বসল সত্যবতী, না নড়েচড়ে বসার জন্যেই বেণী বন্ধনমুক্ত হয়ে গেল সেটা বোঝা গেল না। এলোকেশী দেখলেন বৌ নড়ল, চুল খুলল।

এলোকেশী পাথরের দেবী নয়, রক্তমাংসের মানুষ, এরপরও যদি তাঁকে ঠাণ্ডা মাথায় সহজভাবে বসে থাকতে দেখবার আশা করা যায়, সে আশাটা পাগলের আশা। পাগলের আশা পূরণ হয় না, হবার নয়।

এতক্ষণের পরিশ্রম পণ্ড হওয়ার রাগে, আর সৌদামিনীকে নিজের শিল্প-প্রতিভা দেখিয়ে দেবার আশাভঙ্গে, দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য এলোকেশী সহসা একটা অভাবিত কাজ করে বসলেন। বৌয়ের সেই খিল-ছাড়ানো সিধে পিঠটার ওপর গুম্ করে একটা গোলগাল কীল বসিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, "হল তো! গেল তো গোল্লায়! এক দণ্ড যদি সুস্থির—"

কিন্তু কথা এলোকেশীকে শেষ করতে হল না, মুহূর্তের মধ্যে আর এক প্রলয় ঘটে গেল। শাশুড়ীর হাত থেকে চুলের ভার এক হ্যাঁচকায় টেনে নিয়ে সত্যবতী ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠল, আর শাশুড়ীর সঙ্গে যে কথা কওয়া নিষেধ সে কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে দৃপ্তস্বরে বলে উঠল, "তুমি আমায় মারলে যে!"

কীলটা বসিয়ে চকিতে হয়তো একটু অনুতপ্ত হয়েছিলেন এলোকেশী, কিন্তু সে অনুতাপের অনুভূতি দানা বাঁধবার আগেই এই আকস্মিক বিদ্যুতাঘাতে এলোকেশী প্রথমটা যেন পাথর হয়ে গেলেন। বৌয়ের কণ্ঠস্বর কেমন সেটা জানবার সুযোগ এ পর্যন্ত হয় নি এলোকেশীর, কেননা তাঁর সঙ্গে তো বটেই, তাঁর সামনেও কোনদিন বৌ কথা কয় নি। কইবার রেওয়াজও নেই। কোনও প্রশ্ন করলে শুধু ঘাড় নেড়ে "হ্যাঁ-না" জানিয়েছে। কথা যা সে সদুর সঙ্গে। কিন্তু সেও তো নিভৃতে। রাত্রে সৌদামিনীর কাছেই শোয় বৌ, কারণ ডাগরটি না হলে তো আর 'ঘর-বরে'র প্রশ্ন ওঠে না।

না, কোন ছলেই সত্যর কণ্ঠস্বর এলোকেশীর কানে আসে নি, সহসা আজ সেই স্বর বাজের মত এসে কানে বাজল।

এ কী জোরালো গলা বৌ-মানুষের!

এতটুকু একটা মানুষের!

অনুতাপের বাষ্প ধুলো হয়ে উড়ে গেল।

এলোকেশীও দাঁড়িয়ে উঠলেন। চেঁচিয়ে তেড়ে উঠলেন, "মেরেছি বেশ করেছি। করবি কি শুনি? তুইও উল্টে মারবি নাকি?"

সত্য তখন এলোকেশীর অনেক পরিশ্রমে গড়া সাতগুছির বেণী দুটোর মধ্যে আঙুল চালিয়ে চালিয়ে জোরে জোরে খুলে ফেলতে শুরু করেছে। মাথায় কাপড় নেই, মুখের আঁচল খসেছে, সেই মুখে আগুনের আভা।

এলোকেশীর কথায় একবার সেই আগুনভরা মুখটা ফিরিয়ে অবজ্ঞাভরে উচ্চারণ করল সত্য, "আমি অমন ছোটলোক নই। তবে মনে রেখো আর কোনদিন যেন—"

"কী বললি? আর কোনদিন যেন? গলা টিপলে দুধ বেরোয় এক ফোঁট্টা মেয়ে, তার এত বড় কথা! মেরে তোকে তুলো ধুনতে পারি তা জানিস?... সদি লক্ষ্মীছাড়ি, আন্ দিকি একখানা চেলাকাঠ, কেমন করে বৌ ঢিট্ করতে হয় দেখাই ত্রিজগৎকে। চ্যালাকাঠ পিঠে পড়লেই তেজ বেরিয়ে যাবে।"

"মারো না দেখি তোমার কত চ্যালাকাঠ আছে!"

বলে দৃপ্তভঙ্গিতে সোজা শাশুড়ীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে সত্যবতী নির্ভীক দুই চোখ মেলে।

জীবনে অনেকবার রেগে জ্ঞানহারা হয়েছেন এলোকেশী, অনেকবার বুক চাপড়েছেন শাপমন্যি দিয়েছেন দাপাদাপি করেছেন, কিন্তু আজকের মত অবস্থা বোধ হয় তাঁর জীবনে আসে নি।

এ অবস্থা যে তাঁর কল্পনার বাইরে, স্বপ্নের বাইরে। তাই সহসা যেন নিথর হয়ে গেলেন তিনি, সাপের মত ঠাণ্ডা চোখে শুধু তাকিয়ে রইলেন সেই দুঃসাহসের প্রতিমূর্তির দিকে।

ঠিক এই অবস্থায় থাকলে কতক্ষণে কি হত বলা শক্ত, কিন্তু ভাগ্যের কৌতুকে আর এক অঘটন ঘটে গেল।

এই নাটকীয় মুহূর্তে উঠোনের বেড়ার দরজা ঠেলে বাড়িতে এসে ঢুকল নবকুমার।

ঢুকেই যেন বজ্রাহত হয়ে গেল।

এ কী পরিস্থিতি!

সহস্র সাপের ফণার মত একরাশ চুলের ফণায় ঘেরা সম্পূর্ণ খোলামুখে এলোকেশীর মুখোমুখি অগ্নিবর্ষী দুই চোখে সোজা তাকিয়ে যে মেয়েটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, কে ও ?

নবকুমারের বৌ নাকি ?

কিন্তু তাই কি সম্ভব ?

আকাশ থেকে বাজ পড়ছে না, পৃথিবীর মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে না, এমন কি প্রলয়ঙ্কর একটা ঝড়ও উঠছে না, অথচ নবকুমারের বৌ নবকুমারের মার সামনে অমনি করে দাঁড়িয়ে আছে ?

আর নবকুমার ঢুকে হাঁ করে দাঁড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও দৃকপাতমাত্র করছে না ?

অসম্ভব ! অসম্ভব !

এ অন্য আর কেউ !

নবকুমারের অজানিত পড়শীবাড়ির মেয়ে। হয়তো ভয়ঙ্কর কোন একটা কিছু ঘটেছে ওদের সঙ্গে।

নবকুমার গলাখাঁকারি দিতে ভুলে যায়, সরে যেতে ভুলে যায়, স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। বিপদ যে ঘোরতর! 'অসম্ভব' বলে একেবারে নিশ্চিন্ত হতেই বা পারছে কই ?

বৌয়ের মুখটা দেখবার সৌভাগ্য কোনদিন না হলেও এই মাসখানেকের মধ্যে কোন্ না বিশ-পঁচিশবার আভাসে ছায়ায় বৌকে দেখতে পেয়েছে সে। যদিও পাছে কেউ দেখে ফেলে বৌয়ের দিকে তাকিয়ে আছে নবকুমার, তাই সেই তাকানোটা পলকস্থায়ী হয়েছে মাত্র !

তবুও ক্যামেরার লেন্‌স্ পলকের মধ্যেই চিরকালের মত ছবি ধরে রাখে।

মুখ না দেখুক, সর্ব অবয়বের একটা ভঙ্গি তো দেখেছে।

আর দেখেছে ওই নীলাম্বরীর আঁচলখানা।

অতএব মনকে চোখ ঠেরে লাভ নেই। চোখ বুজে সূর্যকে অস্বীকার করতে যাওয়া হাস্যকর।

পড়শীবাড়ির কেউ নয়, ওই দৃপ্তমূর্তি নবকুমারের বৌয়েরই।

যে বৌয়ের উদ্দেশে নবকুমার স্বপ্নে জাগরণে নিঃশব্দ উচ্চারণে ক্রমাগত গেয়েছে, গাইছে, "কও না কথা মুখ তুলে বৌ, দেখ না চেয়ে চোখ খুলে।"

কিন্তু সে কী এই চোখ !

নবকুমার যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, যদি পরিস্থিতি দেখে তেমনি নিঃশব্দে সরে পড়ত, তাহলে হয়তো নাটকের এই নাট্য-মুহূর্তটা এমন চূড়ান্তে উঠত না, হয়তো সত্যবতী নির্ভীকভাবে সেখান থেকে সরে যেত, আর এলোকেশী জীবনে যত গালিগালাজ শিখেছেন, সবগুলো উচ্চারণ করতেন বসে বসে। আর স্বামী-পুত্র বাড়ি ফিরলে বৌয়ের এই মারাত্মক দুঃসাহস আর ভয়ঙ্কর দুর্বিনয়ের কাহিনী বিস্তারিত বর্ণনায় পেশ করতেন। তারপর গড়িয়ে যেত ব্যাপারটা।

কিন্তু নির্বোধ নবকুমার সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল হাঁ করে।

আর একসময় এলোকেশীর চোখ গিয়ে পড়ল তার ওপর। দাওয়ার উপর তিনি, নিচে উঠোনে ছেলে।

নবকুমারকে এভাবে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এলোকেশীও একবারে হাঁ হয়ে গেলেন, তারপর সহসা সেই এতক্ষণের স্তব্ধ হয়ে থাকা হাঁ থেকে ভয়ঙ্কর একটা চিৎকার উঠল, "ওরে লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা মেনিমুখো ছোঁড়া, পায়ে কি তোর জুতো নেই! জুতোয় জুতিয়ে ওর মুখটা যদি জন্মের শোধ ছেঁচে শেষ করে দিতে পারিস, তবে বলি বাপের বেটা বাহাদুর!"

কিন্তু নবকুমার নিশ্চল।

পরক্ষণেই সুরকের্তা ধরলেন এলোকেশী, "ওগো মাগো, কোথায় আছ দেখ গো, বেটা বেটার-বৌ দুজনে মিলে কী অপমান্যিটা করছে আমায়! ওরে নবা, বামুনের গরু, ছোটলোকের মেয়েকে বিয়ে করে তুইও কি ছোট-লোক হয়ে গেলি? দু পায়ে খাড়া দাঁড়িয়ে মায়ের অপমানটা দেখছিস! তবে মার মার, ঝাঁটা আমাকেই মার। ঝাঁটা খাওয়াই উপযুক্ত শাস্তি আমার। নইলে এখনো ওই বৌকে ভিটের বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দিই? মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিই না? ওগো মাগো, বৌ আমায় ধরে মারে আর তাই আমার ছেলে দাঁড়িয়ে দেখে!"

এতক্ষণে নবকুমার বোধ করি চেতনা ফিরে পায়, আর ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোঁ চোঁ দৌড় মারে সেই খোলা দরজাটা দিয়ে।

খিড়কির ঘাটে বাসন মাজছিল সদু, ঘাটের পাশ দিয়ে নবকুমারকে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে দেখে দাঁড়িয়ে উঠে ছাইমাখা হাতটাই নেড়ে ডাক দেয়, "নবু কি হল রে? অ নবু, অমন করে ছুটছিস কেন?"

নবকুমার প্রথমটা ভাবল পিছুডাকে সাড়া দেবে না, ছুটে একেবারেই নিতাইয়ের বাড়ি গিয়ে পড়বে, তার পর বলবে, "জল দে এক ঘটি।"

কারণ নিতাই হচ্ছে তার সব চেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু। বিচলিত অবস্থায় তার কাছেই যাওয়া চলে।

কিন্তু সৌদামিনীর উত্তরোত্তর ডাকে কি ভেবে থমকে দাঁড়াল, ফিরল, তার পর গুটি গুটি এসে ঘাটের পাশে একটা ঝড়ে-পড়া তালগাছের গুঁড়ির ওপর বসে পড়ে রুদ্ধকণ্ঠে বলল, "আমি আর বাড়ি ফিরব না সদুদি!"

"কথার ছিরি শোন ছেলের! হল কি তাই বল্?"

"সর্বনাশ হয়েছে সদুদি!"

"আরে গেল যা! সর্বনাশের কথা বলতে আছে না কি?"

"হলে বলতে আছে বৈকি।"

সদু নবকুমারের প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত, তাই বেশী ভয় না পেয়ে বলে, "কেন তোর মা হঠাৎ চড়ি ওল্টালো নাকি?"

"মা নয় সদুদি, মা, নয়, আমিই। জানি না ঠিক বলতে পারছি না, আমি সত্যি বেঁচে আছি কিনা!"

"গায়ে চিমটি কেটে দেখ্।" বলে পুকুরের জলে হাত ডুবিয়ে ডুবিয়ে ছাইমাটি ধুতে ধুতে বলে সদু, "মামী বুঝি রণচণ্ডী হয়ে তেড়ে এসেছিল?"

"জানি না!"

"জানিস না? ন্যাকামি রাখ দিকি নবু, হয় কি হয়েছে তাই বল্, নয় যে দিকে যাচ্ছিলি সেইদিকে যা। বেটাছেলে না মেয়েমানুষ তুই?"

"সদুদি, যে দৃশ্য দেখে এসেছি, তা দেখলে অতি বড় বীর বেটাছেলেরও পেটের ভেতর হাত-পা সেঁধিয়ে যায়।"

"নাঃ, তোর দেখছি আর গৌরচন্দ্রিকে শেষ হয় না। বলবি তো বল্, না বলবি তো যা। ভূত দেখেছিস না ডাকাত পড়া দেখেছিস তাও তো জানি না।"

নবকুমার বুকে বল করে, কণ্ঠে শব্দ আনে, ঝপ করে বলে ওঠে, "মাতে আর তোমাদের বৌতে মারামারি করছে।"

"কি করছে মাতে আর বৌতে?"

চমকে উঠে বলে সৌদামিনী।

"বললাম তো, মারামারি করছে।"

সৌদামিনী এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে তারপর বলে, "মারামারি কথাটা বলছিস কেন, মামী বৌকে ধরে ঠেঙাচ্ছে তাই বল্! আর সেই দৃশ্য দেখে তুই মদ্দ পুরুষ কাছা কোঁচা খুলে ছুট মারছিস। কেন তুই মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাস নি নবু তাই ভাবি। যাই দেখি ইতিমধ্যে কি এমন ঘটল। এই তো খানিক আগে বাসনের পাঁজা নিয়ে বেরিয়ে এলাম—দেখলাম মামী বেটার বৌয়ের চুল বাঁধছে, ইতিমধ্যে হলটা কি?"

"আমি তো এই ঢুকলাম বাড়িতে। তুমি শীগগির যাও সদুদি।"

"যাই। বাবা পলকে প্রলয়, তিল থেকে তিলভণ্ডেশ্বর! কি হল এক্ষুনি?"

সৌদামিনী তাড়াতাড়ি বাসনগুলো ধুয়ে নিতে থাকে।

"আমি আজ নিতাইদের বাড়িতেই থাকব সদুদি। এই চললাম।"

সৌদামিনী ভুরু কুঁচকে বলে, "কদিন পরের বাড়িতে থাকবি?"

"যতদিন চলে।"

"তার মানে নিজে গা বাঁচিয়ে কেটে পড়বি, আর পরের মেয়েটা, দুধের মেয়েটা তোর মার হাতে পড়ে মার খাবে!"

পরের মেয়ে এবং দুধের মেয়ে শব্দটায় নবকুমারের বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে, চোখে জল এসে যায়। কষ্টে গোপন করে বলে, "তা আমি আর কি করব!"

সৌদামিনী আড়চোখে একবার ওর মুখচ্ছবি দেখে নিয়ে নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে, "দৃশ্য দেখে চলে না এলে পারতিস, তুই দেখছিস জানলে যতই হোক নিজেকে একটু সামলে নিত মামী, একেবারে শেষ করে ফেলত না। যাই দেখি ছুঁড়ি বাঁচল কি মরল।"

নবকুমার লজ্জা ত্যাগ করে সহসা বলে ওঠে, "যাই বল সদুদি, যা দেখলাম ও তোমাদের বৌটি পড়ে মার খাবার মেয়ে নয়।"

"আমারও তাই মনে হয়", বলে সদু সকৌতুকে একটু হেসে বলে, "মারামারি না করুক পড়ে মার খাবে না। তা তুই তো বলতেই পারলি না হয়েছেটা কি?"

"গোড়া থেকে কি কিছু জানি ছাই। বাড়ি ঢুকেই দেখি দাওয়ায় দু প্রাণী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। একজন সাপিনীর মতন ফুঁসছে, আর একজন বাঘিনীর মতন গজরাচ্ছে।"

সৌদামিনী হেসে উঠে বলে, "বারে, তুই তো অনেক নাটুকে কথা শিখেছিস দেখছি। যাক কালে-ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। তোর বৌও খুব পণ্ডিত।"

বৌয়ের গল্প কান ভরে শুনতে ইচ্ছে করে নবকুমারের, ভুলে যায় এইমাত্র তাকে বাঘিনীর সঙ্গে তুলনা করেছে সে নিজেই। কিন্তু গল্প বাড়বে কি উপায়ে? নবকুমার তো আর কথা ফেলে বাড়াতে পারে না?

শুধু ভাবে, 'কালে-ভবিষ্যতে'! •

সে কত কাল?

কোন্ ভবিষ্যৎ?

বাঘিনীর মুখটা বার বার মনে ধাক্কা দিচ্ছে। ভয়ঙ্কর, কিন্তু সুন্দর! কী বড় বড় চোখ, কী চমৎকার জোড়া ভুরু!

কিন্তু বৌও মায়ের মত রাগী হবে হয়তো! লজ্জায় কুণ্ঠায় বিগলিত বৌটি মাত্র থাকবে না। নবকুমারের কল্পনার সঙ্গে ঠিক খাপ খাচ্ছে কি?

ঠিক যেন কি একটা লোকসানের দুঃখে বুকটা টনটন করে ওঠে নবকুমারের।

কাদার পুতুলের মত একটি নিরীহ ভালমানুষ বৌ নবকুমারের ভাগ্যে জুটলে, কি এসে যেত ভগবানের! কত লোকেরই তো তেমন বৌ হয়।

কিন্তু সাপের ফণার মত চুলের ফণায় ঘেরা ওই মুখখানি!

ওতে যেন আগুনের আকর্ষণ!

নবকুমার পতঙ্গ মাত্র।

সৌদামিনী বলে, "বিবাগী হয়ে যাচ্ছিলি তো যা, মেলা রাত করিস নে। হাঁড়ি আগলে বসে থাকতে পারব না।"

হাঁড়ি!

রান্না!

ভাত!

এসব শব্দগুলো কাজে লাগবে আজ! নবকুমারের যেন বিশ্বাস হয় না। ভয়ে ভয়ে বলে, "আমি এখানটায় আছি, তুমি, তুমি একবার দেখে এসে খবরটা আমায় দিতে পার না সদুদি? নিশ্চিন্দি হয়ে তা হলে আমাদের তাসের আড্ডায় যেতে পারি।"

"ওরে আমার কে রে, উনি বাবু বসে থাকবেন, আর আমি ওঁর জন্যে খবরের থালা বয়ে আনব।"

বলে থালা-বাসনের গোছাটা বাগিয়ে কাঁধের ওপর তুলে নেয় সদু। হাতে গামছার পুঁটলিতে ঘটিবাটি। চলে যেতে যেতে ছোট ভাইকে আর একবার অভয় দেয় সে, "বৌয়ের চিন্তে করে মন খারাপ করিস নে, নেহাৎ যদি মামী খুন করে ফাঁসির দায়ে না পড়ে তো ওই বৌয়ের দ্বারাই শায়েস্তা হবে। বৌ তোর যেমন তেমন মেয়ে নয়।"

যদি খুন না করে!

যদিটা নবকুমারের বুকের মধ্যে কাঁটার মত খচখচিয়ে ওঠে, কিন্তু প্রশ্ন তুলতে পারে না, শুধু ম্রিয়মাণ হয়ে বসে থাকে।

"সন্ধ্যে হয়ে আসছে, এখেনে আর বসে থাকতে হবে না, যা কোথায় যাচ্ছিলি ঘুরে আয়।"

সদু লম্বা লম্বা পা ফেলে বাঁশবাগানের খানিকটা অতিক্রম করে। কিন্তু নবকুমার আবার পিছু নিয়েছে। উদ্‌ভ্রান্ত মুখ, ছলছল চোখ।

"সদুদি, তোমার সঙ্গে আমি যাব?"

সদু মৃদু হেসে পা চালাতে চালাতেই বলে, "কেন, এই যে বললি আর কখনো বাড়ি ফিরবি না!"

"মনটা কি রকম যেন করছে সদুদি!" বলে সঙ্গে সঙ্গে এগোতে এগোতে নবকুমার হঠাৎ সুর বদলায়, "বৌ যদি মাকে অপমান করে থাকে, তারও শাস্তি করা দরকার।"

"গায়ে পড়ে কাউকে অপমান করবার মেয়ে সে নয় নবু, সেদিকে তুই নিশ্চিন্দি থাক। তবে কেউ যদি গা পেতে অপমান নিতে যায় সে আলাদা কথা। আসল কথা কি জানিস, বৌ হল উঁচুঘরের মেয়ে, শিক্ষাদীক্ষা উঁচু, লেখাপড়া জানে, বড় বড় বই পড়ে ফেলে, নিজে পয়ার বাঁধে—"

"অ্যাঁ!"

স্থানকাল ভুলে নবকুমার প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, "মস্করা করছ আমার সঙ্গে?"

"কি দরকার আমার? আকাশ থেকে কথা পেড়ে বলতেই বা যাব কি করে? আর ওসব আমি বুঝিই বা কি? বৌ আমার কাছে মনটা খোলে তাই টের পেয়েছি।"

সদুর কাছে মনটা খোলে!

হায়, কবে সেই আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গসুখ আসবে নবকুমারের ভাগ্যে, যেদিন নবকুমারের সামনে বৌ মন খুলবে।

সদু আবার মুখ চালায়, "তোদের এ বাড়িতে বিয়ে হওয়া ওর উচিত হয় নি এই বলে দিলাম পষ্ট কথা! তুই রাগ করিস আর যা-ই করিস, এ বাড়ি ওর যুগ্যি নয়। মামীর পয়সাই আছে, নজর বলতে আছে কিছু? আর বৌয়ের ছোট নজর দেখার অভ্যেসই নেই। এই তো সেদিন মামী পাড়ার লোকের গয়না বাঁধা রেখে টাকা ধার দিয়ে সুদ নেয় শুনে যেন হিমাঙ্গ হয়ে গেল বৌ।"

নবকুমার বিরক্ত স্বরে বলে, "তা ওসব কথা বলতে যাবারই বা দরকার কি?"

"বলতে আমি যাই নি রে বাপু তোর বৌয়ের কানে ধরে। ওর সামনেই ঘোষগিন্নী একজোড়া বাজু বন্দক নিয়ে দৈ-দস্তুর করতে লাগল। সে বলে টাকায় এক পয়সা, মামী বলে টাকায় দেড় পয়সা, এই আধপয়সা নিয়ে ধস্তাধস্তি। শেষ অবধি—"

শেষ অবধি কি হল তা আর শোনা হল না নবকুমারের, সহসা বাড়ির মধ্যে থেকে ভয়ঙ্কর একটা চিৎকার রোল ভেসে এল।

"সর্বনাশ করেছে—"

সদুর নিষেধবাণী ভুলে নবকুমার সর্বনাশ শব্দটাই আবারও ব্যবহার করল, "নিশ্চয় হয়ে গেল একটা কিছু।"

সদু ততক্ষণে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

আর নবকুমার?

সে চলৎশক্তি হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নিজেদেরই বাড়িখানার দিকে তাকিয়ে।

তীক্ষ্ণ তীব্র সানুনাসিক এই স্বরটা কার?

এ তো এলোকেশীর!

তবে হলটা কি?

কিন্তু যাই ঘটুক, সব কিছু ছাপিয়ে নবকুমারের প্রাণটা হাহাকারে ভরে উঠল এই ভেবে—এই অ-সাধারণ বৌ নিয়ে ঘর করা হল না নবকুমারের

মা হয় বৌকে 'মড়িপোড়ার ঘাটে' পাঠাবে, নয় জন্মের শোধ বাপের বাড়ি বিদেয় করে দেবে।

মার চিৎকার উত্তরোত্তর আকাশে উঠছে।

আর দলে দলে পড়শীরা নবকুমারের বাড়ির দিকে দৌড়চ্ছে।

নবকুমার যাত্রাগানের দর্শকের মত পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে সেই দৃশ্য।

একুশ

ত্রিবেণীর ঘাটে এসেছিলেন রামকালী। রোগী দেখতে নয়, যোগে গঙ্গাস্নান করতে। একাই আস্ত একটা পারানী নৌকা ভাড়া করেছিলেন স্নানের জন্য। পাঁচজনের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে নৌকা বোঝাই হয়ে যেতে রামকালী ভালবাসেন না। দরকার হলে একাই ভাড়া করেন।

আগে অবশ্য এমন একা নৌকাভ্রমণ সহজ হত না। কারণ রামকালী যোগের স্নান করতে ত্রিবেণী যাচ্ছেন, কি কাটোয়া যাচ্ছেন, কি নবদ্বীপ যাচ্ছেন টের পেলে সত্যবতী একেবারে নাছোড়বান্দা হয়ে পেয়ে বসত। পায়ে পায়ে ঘুরে কাকুতি-মিনতি করা মেয়েকে রামকালী এড়াতে পারতেন না, সঙ্গে নিতেন। অগত্যাই নেড়ু আর পুণ্যি। ওদের ফেলে রেখে শুধু নিজের মেয়েকে নিয়ে কোথাও যাবেন, এমন দৃষ্টিকটু কাজ রামকালীর পক্ষে সম্ভব নয়।

ওরা যেত।

রামকালী জলে সাবধান করতেন। আর স্নানের শেষে ঠাকুর-দেবতা দেখিয়ে নিয়ে ফিরতেন। ঘাট আর পথ, নৌকা আর মন্দির-প্রাঙ্গণ মুখর হয়ে উঠত ছোট্ট একটা বাক্যবাগীশ মেয়ের বাক্যস্রোতে।

আজকে শুধু জলের উপর দাঁড়টানার ছপাৎ ছপাৎ শব্দ। উন্মুক্ত গঙ্গাবক্ষের দিকে তাকিয়ে ছোট একটা নিশ্বাস ফেললেন রামকালী।

আকাশের পাখিটা খাঁচায় বন্দী হয়ে কেমন আছে কে জানে!

পুণ্যিটারও বিয়ের ঠিক হয়ে আছে।

গত ক-মাস "অকাল" ছিল বলে বিয়ে হয় নি। কিন্তু পুণ্যি অন্য ধরনের মেয়ে। নেহাৎ সত্যর "প্রজা" হিসেবে দস্যিচাল্লি করে বেড়িয়েছে, নচেৎ একান্তই ঘরসংসারী মেয়ে সে। খাঁচার পাখি হয়েই জন্মেছে পুণ্যি, আর পুণ্যির মত মেয়েরা।

কিন্তু সত্যর মত দ্বিতীয় আর একটা মেয়ে আর দেখলেন কই রামকালী? যে মেয়ে প্রতিপদে প্রশ্ন তুলে জানতে চায় "কী" আর "কেন"!

খোলা গঙ্গার দিকে তাকিয়ে আর একবার মনে হল রামকালীর, কতদিন যোগে স্নান করি নি! মনে হচ্ছে যেন দীর্ঘকাল। আর একটা নিশ্বাস পড়ল।

মাঝিটা একবার কথা কয়ে উঠল, "খুকী শ্বশুরঘরে কত্তাবাবু?"

রামকালী বললেন, "হুঁ।"

আর বার দুই ছপাৎ ছপাৎ করে মাঝিটা ফের বলে উঠল, "থাকবে এখন?"

সংক্ষেপে "দেখি" বলে আলোচনায় ইতির সুর টানলেন রামকালী। পুণ্যির বিয়ে আসছে, এই যা একটু আশার আলো দেখা যাচ্ছে, নইলে থাকবে ছাড়া আর কি। চিরকালই থাকবে সেখানে। আর সেইটাই তো কাম্য। মোক্ষদার মত অনবদ্য রূপ আর অশেষ তীক্ষ্ণতা নিয়ে আজীবন বাপের ঘরে বসে জ্বলতে থাকবে, এমন ভাগ্য কেউ মেয়ের জন্যে প্রার্থনা করে না। ঘরে থাকা মেয়ে মানেই দুর্ভাগা মেয়ে। অথচ মাঝে মাঝে পালে-পার্বণে কি ভাত-পৈতে-বিয়ের কুটুম্বের মত যে আসা, সে আশায় মায়ের প্রাণ ভরতে পারে, বাপের ভরে না। অতএব তাতে ইতি হয়ে গেছে।

কিন্তু শুধু মেয়ে-সন্তান কেন, পুত্র-সন্তান হলেই বা কতটুকু তফাৎ? ছেলে ঘরে থাকে, ছেলের ওপর জোর খাটে, এই পর্যন্ত। ছেলে বড় হয়ে গেলে, আর কি তাকে দিয়ে মন ভরে? তাই হয়তো মানুষ জীবনের মধ্যে বারে বারে নতুন শিশুকে ডেকে আনে জীবনকে সরস রাখতে, ভরাট রাখতে। আবার তার পরেও আশ্রয় খোঁজে 'টাকার সুদে'র মধ্যে।

নিত্যানন্দপুর ঘাট থেকে ত্রিবেণী ঘাট সামান্য পথ।

মাঝি নৌকা বাঁধল।

আর ঘাটে নেমেই প্রথম যার সঙ্গে চোখোচোখি হল রামকালীর, সে হচ্ছে "রানার" গোকুল দাস। দূর থেকে রামকালীকে নামতে দেখে ছুটে ছুটে আসছে সে।

কাদার উপরই আভূমি এক প্রণাম করে, কৃতার্থম্মন্য গোকুল সবিনয় হাস্যে বলে, "আজ আমার কী ভাগ্যি কত্তাবাবু, কী ভাগ্যি!"

রামকালী মৃদু হেসে বলেন, "সক্কাল বেলা হঠাৎ ভাগ্যের এত জয়-জয়কার যে গোকুল!"

গোকুল বলে, "তা জোকার দেব না আজ্ঞে? এই আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। নইলে তো যেতে হত সেই নিত্যেনন্দপুরে। এই নিন, পত্তর আছে আপনার!"

পত্র!

কলকাতা থেকে আসছে! অভাবনীয়!

বিস্মিত হলেন রামকালী, কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। খামে আঁটা চিঠিটা নিজের পরিত্যক্ত গাত্রবস্ত্রের উপর রেখে দিয়ে বললেন, "আচ্ছা ঠিক আছে। ভাল তো সব?"

"আপনার আশীব্বাদে আজ্ঞে।" বলে ঈষৎ উস্‌খুস্ করে গোকুল বলে ফেলে, "কলকেতার চিঠি আজ্ঞে?"

"তাই তো দেখছি", বলে রামকালী গামছা কাঁধে ফেলে জলে নামেন। প্রথম সূর্যের কাঁচা রোদ ঝলসে ওঠে কাঁচা সোনার রঙের দীর্ঘ দেহখানির উপর। গোকুল হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। থাকতে থাকতে মনে ভাবে—"ইস্, যেন আকাশের দেবতা! কী দিব্য অঙ্গ!"

পত্রের কথা মন থেকে সরিয়ে ফেলে, যথাকৃত্য সব সেরে উত্তরীয়ের কোণে পত্রখানা বেঁধে মন্দির-দর্শনে অগ্রসর হলেন রামকালী। অগত্যাই গোকুল আর একটা সাষ্টাঙ্গ সেরে বিদায় নিল। কলকেতা থেকে কার পত্র এল সে কৌতূহল আর মিটল না তার।

নৌকোয় বসে চিঠি খুললেন রামকালী।

আর পড়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন!

এই সকালের আলো তার সমস্ত উজ্জ্বলতা হারিয়ে যেন আসন্ন সন্ধ্যার মত মলিন হয়ে গেল। সদ্য গঙ্গাস্নানে নির্মল রামকালী যেন একটা অপবিত্র দ্রব্যের সংস্পর্শে এসে নিজেকে অশুচি বোধ করলেন।

চিঠি কোন পরিচিতের নয়। অজ্ঞাত ব্যক্তির।

তাছাড়া নিচে কোন নাম-দস্তখতও নেই।

বেনামী এই চিঠিতে শুধু সম্বোধনের বাগাড়ম্বর অনেক। কিন্তু সেটাই তো কথা নয়। চিঠির বক্তব্য এ কী ভয়ঙ্কর!

বার বার পড়ার পর আরও একবার চিঠিখানা সামনে মেলে ধরলেন রামকালী।

হস্তাক্ষর সুছাঁদের, লাইনগুলি পরিপাটি, বানান বিশুদ্ধ। কোন "লিখিত পড়িত" লোকের দ্বারা লেখা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; উপরে "শ্রীশ্রীবাগ্‌দেবী শরণং" দিয়ে শুরু—

"মহামহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত রামকালী চট্টোপাধ্যায় বরাবরেষু—যথাযোগ্যসম্মান-পুরঃসর নিবেদনমেতৎ, অত্রপত্রে এই জ্ঞাত করাই যে, মহাশয়ের কন্যার অতীব বিপদ! তিনি তাঁহার শ্বশ্রূগৃহে যারপরনাই লাঞ্ছিতা উৎপীড়িতা ও অপমানিতা রূপে কালযাপন করিতেছেন। বলিতে মন শিহরিত ও কলেবর কম্পান্বিত হইলেও জ্ঞাতার্থে লিখিতেছি, আপনার কন্যা তাঁহার পূজনীয়া শ্বশ্রূমাতা কর্ত্তৃক প্রহারিতাও হইতেছেন। সেই অবলা বালিকাকে রক্ষা করে, নিষ্ঠুর পাষাণপুরীতে এমন কেহই নাই। আপনার জামাতা ধর্মপত্নীর এবম্বিধ নির্য্যাতনে অবিরত অশ্রু বিসর্জ্জন সার করিয়াছে। গুরুজনদিগের উপর তাহার আর কি বলিবার সাধ্য আছে? এবম্প্রকার অবস্থায় মহাশয় যদি সত্বর কন্যাকে নিজগৃহে লইয়া যান তবেই মঙ্গল। নচেৎ কি যে হইতে পারে চিন্তা করিতে মস্তক ঘূর্ণিত হইতেছে। মনুষ্যজনোচিত কর্ত্তব্য বোধে ইহা আপনার গোচরে আনিলাম। নিজ গুণে ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিয়া কৃতার্থ করিবেন। অলমতিবিস্তারেণ। ইতি—"

না, নাম-স্বাক্ষর নেই।

পত্র-লেখকের বাচালতা বা বাগাড়ম্বরে কৌতুক বোধ করবেন, এমন মানসিক অবস্থা থাকে না রামকালীর। চিঠিটা আস্তে আস্তে মুড়ে মেরজাইয়ের পকেটে রেখে দিয়ে এই রৌদ্রকরোজ্জ্বল পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি।

এত আলো পৃথিবীতে, তবু পৃথিবীর মানুষগুলো এত অন্ধকারে কেন!

কিন্তু কে এই পত্র-লেখক?

সত্যর শ্বশুরবাড়ির কোন শত্রু? এভাবে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে পত্র লিখে তাঁদের অনিষ্টসাধন করতে চায়? কিন্তু তাহলে চিঠিতে কলকাতার ছাপ কেন? কলকাতা থেকে এ চিঠি আসে কি করে?

ভেবে ভেবে অবশ্য একটা সিদ্ধান্তে পৌছলেন রামকালী। পত্র-লেখকের অবশ্যই কলকাতায় যাতায়াত আছে, এবং নিজেকে গোপন রাখতে কলকাতায় অবস্থানকালে পত্র প্রেরণ করেছে।

তবু একটা সমস্যা থেকেই যায়।

পত্রের মধ্যস্থিত ওই বীভৎস সংবাদটা সত্যি, না শত্রুপক্ষের মিথ্যা রটনা?

রামকালী কি একেবারে নিজে গিয়েই তদন্ত করবেন, না লোক পাঠাবেন? বাইরের লোক গিয়ে কি ভিতরকার প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করতে পারবে? এক যদি কোন স্ত্রীলোককে পাঠানো যায়!

যারা বারো মাস রামকালীর সংসারে খেটে খায়, চিঁড়ে-কোটানি মুড়ি-ভাজুনি, ইত্যাদি, তাদেরই কারো একজনকে একটা সঙ্গী ও রাহা খরচ দিলে খবর এনে দিতে পারে। পল্লীগ্রামে সচরাচর এরাই এসব কাজ করে। কিন্তু রামকালীর ওদের কথা ভেবে চিত্ত বিমুখ হল। কোন খবর ওরা জানা মানেই সাতখানা গ্রামের লোকের জানা! ঈশ্বর জানেন কী খবর আনবে, আর সেই নিয়ে সারা গ্রামে আলোচনা চলবে।

মনে হল সত্য যদি নিজে চিঠি লিখত!

চিঠি লেখবার মত বিদ্যে সত্য অর্জন করেছে। কিন্তু করে আর লাভ কি? পিত্রালয়ে নিজের খবর জানিয়ে চিঠি দেবে এমন সাধ্য বা সাহস তো হবে না! তবে আর মেয়েদের লেখাপড়া শিখে লাভ কি?

বুকের মধ্যেটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠল স্থিতপ্রজ্ঞ রামকালী কবরেজের। চোখের সামনে ভেসে উঠল সত্যর সেই দৃপ্ত মুখচ্ছবি। সেই সত্য পড়ে মার খাচ্ছে! এ যে বিশ্বাস করা একেবারে অসম্ভব।

না না, এ মিথ্যা চিঠি!

শত্রুপক্ষের কাজ!

নইলে কেনই বা? ভাবলেন রামকালী, সত্যর ওপর নির্যাতন চালাবে কেনই বা? অকারণ এত হিংস্র কখনো হতে পারে মানুষ? তাছাড়া শুধু তো শাশুড়ী নয়। তার শ্বশুর রয়েছেন। হাজার হোক একটা ভদ্রব্যক্তি, তাঁর জ্ঞাতসারে এ রকমটা হওয়া কখনই সম্ভব নয়। আর বাড়ির লোকেরও অজ্ঞাতসারে যদি কোন পীড়ন চলে, পাড়ার লোকে টের পাবে কি করে?

আবার ভাবলেন রামকালী, সত্যবতী তাদের একমাত্র পুত্রবধূ। বিনা প্রতিবাদে রামকালী তাকে শ্বশুরঘর করতে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তার সঙ্গে ঘর-

বসত হিসাবে প্রচুর সামগ্রী পাঠিয়েছেন, যাতে অন্তত শাশুড়ীর মন ভোলে। তবু তারা সত্যকে নির্যাতন করবে ?

তাই কখনও সম্ভব ?

বললে দোষ, ভাবতে বাধা নেই, মেয়ের বিয়ের সময় ঘটক আনীত নানা পাত্রের মধ্যে এই পাত্রটিকেই পছন্দ করেছিলেন রামকালী, কেবলমাত্র তাদের পরিবারের লোকসংখ্যা কম বলে। সেই শৈশব থেকেই লক্ষ্য করেছেন, তাঁর মেয়ে জেদী তেজী অনমনীয়। বৃহৎ গোষ্ঠীর অনেকের মন যুগিয়ে চলা হয়তো তার পক্ষে সহজ হবে না, সে বোধ রামকালীর ছিল, তাই ভেবেছিলেন, এই-খানেই ভাল। বাপের একমাত্র ছেলে ? দোষ কী ? সত্যও তো তার বাপের একমাত্র মেয়ে !

ঘরজামাইয়ের সাধ একেবারেই ছিল না রামকালীর। শুধু এইটুকু মনে মনে ভেবেছিলেন, ছেলেটা যেন নেহাত রাঙামূলো না হয়। লেখাপড়ার একটু ধার যেন ধারে। তা সে সাধটুকু মিটেছিল রামকালীর, মিটছিলও। জামাই তখনই ছাত্রবৃত্তি পাস, টোলে সংস্কৃত শিখছে।

তারপর লোক-পরম্পরায় শুনেছিলেন, জামাই নাকি ইংরিজি ভাষা শিখতে উদ্যোগী হয়েছে। শুনে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন রামকালী। নিজে সামনে উপস্থিত না হলেও জামাইয়ের খবর তিনি লোক মারফত নিতেন, এবং এটুকু জেনে নিশ্চিন্ত ছিলেন, ছেলেটা কুসঙ্গে মেশে না, বদ খেয়ালের দিকে যায় না।

সবই তো একরকম ছিল, হঠাৎ এ কী বিনামেঘে বজ্রাঘাত !

অবশেষে আবার ভাবলেন, এ শত্রুপক্ষের কাজ।

কিন্তু মনের মধ্যে যে আলোড়ন উঠেছিল, সেটাকে একেবারে চেপে ফেলে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারলেন না রামকালী, স্থির করলেন তিনি একবার নিজেই যাবেন বেহাইবাড়ি।

মান খাটো হবে ?

তা যেদিন জামাইয়ের হাঁটু ধরে কন্যা-সম্প্রদান করেছেন, সেইদিনই তো মান গেছে। সেকালের মত তো রামকালী মেয়েকে স্বয়ম্বরা করতে পারেন নি !

তাছাড়া একেবারে অকারণ জামাইবাড়ি যাওয়ার অগৌরবটা পোহাতে হবে না। পুণ্যির বিয়েকে উপলক্ষ করে মেয়ে নিয়ে আসতে চাইবেন।

সেই সঙ্গে জামাই-বেহাইকেও নিমন্ত্রণ করে আসা হবে। রামকালী নিজে গিয়ে নিমন্ত্রণ করছেন, এর চেয়ে সৌজন্য আর কি হতে পারে?

ত্রিবেণী থেকে ফিরে রামকালী দীনতারিণীর কাছে সংকল্প ঘোষণা করলেন, "মনে করছি একবার বারুইপুর যাব।"

বারুইপুর! সত্যর শ্বশুরবাড়ি?

দীনতারিণী চমকে উঠে বললেন, "কেন, হঠাৎ? সত্যর কোন রোগ-ব্যামো হয় নি তো?"

"কী আশ্চর্য! রোগ-ব্যামো হবে কেন?" রামকালী শান্তভাবে বললেন, "ভাবছি পুণ্যিটার বিয়ে হয়ে যাবে, তারপর দুজনের কবে দেখা-সাক্ষাৎ হয় না হয়, গলাগলি বন্ধু দুটোতে! বিয়ের আগে কিছুদিন একসঙ্গে থাক।"

দীনতারিণী ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এত সহজ ভাষা, এত সহজ কথা! রামকালীর মুখে!

ছেলেকে তো তিনি "পাথরের ঠাকুর" আখ্যা দেন।

সহজ কথা।

তবু রামকালীর মুখ থেকে উচ্চারিত হয় বলেই কেউ সহজভাবে নিতে পারে না।

মোক্ষদা থরথরিয়ে বলেন, "এ আর অমনি নয়, লিখিপড়ি-উলি বিদ্যেবতী মেয়ে, নিঘ্ঘাত লুকিয়ে বাপকে চিঠি লিখেছে, 'বাবা আমায় নিয়ে যাও, আর ঘোমটা দিয়ে থাকতে পারছি নে'।"

শিবজায়া আনতমুখী ভুবনেশ্বরীর দিকে কটাক্ষপাত করে কাতর কাতর মুখে বলেন, "আমার কিন্তু তা মন নিচ্ছে না ছোটঠাকুরঝি। মনে হচ্ছে কোন কু-খবর আছে, রামকালী চাপছেন।"

বলা বাহুল্য এর পর আর ভুবনেশ্বরীর ডুকরে কেঁদে ওঠা ছাড়া গতি থাকে না।

ভুবনেশ্বরীর একমাত্র অন্তরের সুহৃদ অসমবয়সী এবং অসমসম্পর্ক হলেও ভাসুরপো-বৌ সারদা। কিন্তু এমনি কপালের দুর্দৈব ভুবনেশ্বরীর যে, সারদা আজ চার মাস কাল বাপের বাড়ি।

দ্বিতীয় সন্তানের আবির্ভাব ঘোষণাতেই তার এই পিতৃগৃহে স্থিতি।

না, সেই এক অন্ধকার রাত্রে রাসুর সঙ্গে কলহ করে ডোবার জলে ডুবে মরে নি সারদা। শুধু অন্য ঘরে ননদদের কাছে গিয়ে শুয়েছিল। সে শুধু একটাই রাত। রাতের পর রাত পারবে কেন?

শ্বশুরবাড়ির বৌয়ের রাতটুকুই তো মরুভূমিতে সরোবর! মৃত্যুপুরীর মধ্যে জীবন। যত বড় দুর্জয় মানই হোক, সে মান খাটো না করে উপায় থাকে না তাদের।

সকলেরই তাই। রাত্রে ভুবনেশ্বরীরও কান্নার বেগ অসম্বরণীয় হয়ে ওঠে। রামকালী অপর চৌকি থেকেও সেটা টের পান। কিছুক্ষণ ঘুমের ভান করে চুপচাপ থাকলেও শেষ পর্যন্ত আর চুপ করে থাকা সম্ভব হয় না। মৃদুস্বরে বলেন, "অকারণ কাঁদছ কেন?"

বলা বাহুল্য, এ প্রশ্নে যা হয় তাই হল।

কান্নার আবেগ আরও প্রবল হল।

রামকালী বললেন, "ছেলেমানুষি করো না। এস, কাছে এস, কান্নার কারণটা শুনি।"

ভুবনেশ্বরী চোখ মুছতে মুছতে উঠেই এল। এসে স্বামীর বিছানার এক প্রান্তে বসে চোখে আঁচল ঘষতে লাগল।

রামকালী ক্ষুব্ধস্বরে বলেন, "তুমিও যদি ওই সব গিন্নীদের মত হও, তাহলে তো নাচার। অপরাধের মধ্যে বলেছি পুণ্যির বিয়ে উপলক্ষে সত্যকে কিছুদিন আগেই আনব। নিজে গেলে আর ওরা অমত করতে পারবে না। কিন্তু এই সহজ কথাটা না বুঝে সবাই মিলে এমন কাণ্ড করছ যে, মনে হচ্ছে বুঝি কি একটা অমঙ্গলই ঘটে গেছে। আশ্চর্য!"

"তা কিছু নয়।" ভুবনেশ্বরী কষ্টে বলে, "মেয়েটার জন্যে প্রাণটা উতলা হচ্ছে তাই—"

"হচ্ছে ঠিকই। হওয়াও স্বাভাবিক!" রামকালী স্নেহ-গম্ভীর স্বরে বলেন, "তোমার একমাত্র সন্তান! কিন্তু কান্নাকাটি করলেই তো আর কিছু সুরাহা হয় না! মায়ের প্রাণ উতলা হয়, বাপের প্রাণই কি একেবারে কিছু হয় না?" আর একটু ক্ষুব্ধ হাসি হাসলেন রামকালী।

ভুবনেশ্বরীর পক্ষে এ কথার জবাব দেওয়া সম্ভব নয়।

অপ্রতিভ হয়ে বসে থাকে বেচারা।

একটু পরে রামকালী বলেন, "যাও, ভগবানের নাম স্মরণ করে শুয়ে পড় গে। দেখি যদি নিয়ে আসতে পারি।"

ভুবনেশ্বরী সহসা আবার কেঁদে ভেঙে পড়ে বলে, "আমার মন বলছে ওরা পাঠাবে না।"

রামকালী আর কিছু বলেন না, 'দুর্গা দুর্গা' বলে পাশ ফিরে শুয়ে পড়েন। ভুবনেশ্বরী অনেকক্ষণ কেঁদে অবশেষে এসে শোয়।

পরদিন মেয়ের বাড়ি যাত্রার আয়োজন করেন রামকালী।

ইংরিজি পড়া আপাতত বন্ধ আছে, কারণ ভবতোষ মাস্টার গ্রামে নেই। ছাত্রদের জন্য 'সেকেণ্ড বুক' সংগ্রহ করতে কলকাতায় গেছে। নবকুমারের তাই এখন অনেক অবসর। কিন্তু হায়, অবসরকে কুসুমমণ্ডিত করে তুলবে, এ ভাগ্য নবকুমারের কই? বাড়িতে যে দু-দণ্ড বিশ্রামসুখ উপভোগ করবে, খাবে মাখবে থাকবে, তারও জো নেই। সেখানে জাগন্ত অবস্থায় যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই ভয়ে হৃৎকম্প হতে থাকে তার।

কিন্তু ঘুমন্তই বা থাকে কতক্ষণ?

রাত্রে এখন আর সেই মহিষ-বিনিন্দিত ঘুম নেই নবকুমারের। বিছানায় শুয়ে ঘুম আসে না, ওঠে, বসে, পায়চারি করে, জল খায়, আবার শোয়, এইভাবে অনেকটা সময় কাটে। দিনের বেলা কর্মহীনের কর্ম, নিষ্কর্মার গতি, পুকুরে ছিপ ফেলা!

বন্ধু নিতাই আর সে দুজনে সারা দুপুর সেই কাজটা করে। আজও করছিল। ফাৎনা থেকে চোখ তুলতে হঠাৎ চোখ পড়ল নিতাইয়েরই।

বলল, "অমন বাহারে পালকি চড়ে কে আসছে বল্ দিকি?"

নবকুমার তাকিয়ে বলল, "তাই তো! দিব্যি পালকিখানা! তবে আসছে না বোধ হয়, গাঁ পার হচ্ছে।"

বলল, কিন্তু দুজনের একজনও চোখ ফেরাতে পারল না।

আর কম্পিত চিত্তে ভীত পুলকে দেখল পালকি তাদের দিকেই আসছে।

নবকুমার বলল, "ছিপ ফেলে রেখে চোঁ চাঁ দৌড় দিই আয়।"

নিতাই সবিস্ময়ে বলে, "কেন, পালাব কেন?"

"আমার মন বলছে এ পালকি নিত্যানন্দপুরের!"

"অ্যাঁ! চিনিস বুঝি?"

"চিনব কেন, অনুমান! মেয়ে নিতে পাঠিয়েছে নিয্যস। নিতাই, আমি পালাই।"

নিতাই ওর কোঁচার খুঁট চেপে ধরে বলে, "পালাবি মানে? হেস্তনেস্ত দেখবি না?"

আর একটু তর্কাতর্কি হয় দুই বন্ধুতে, এবং সত্যি বলতে, নবকুমার যতই পালাবার চিন্তা করুক, নড়তেও পারে না। টিকটিকির শিকারী দৃষ্টির সম্মোহনী শক্তিতে আকর্ষিত কীটের মত নির্জীব হয়ে বসে থাকে।

পাল্‌কি এই দিকেই আসে, আরোহীর নির্দেশে বেহারারা এখানেই নামায়, এবং আরোহী না নেমেই হাতছানি দিয়ে ডাকেন ওদের। ঘাটের ধার থেকে দুজনেই উঠে আসে কোঁচার খুঁটটা টেনে গায়ে দিতে দিতে।

"তোমরা এ গ্রামের?"

ভরাট গম্ভীর এই কণ্ঠস্বরে বুক কেঁপে ওঠে দুজনেরই। এবং যদিও নবকুমার শ্বশুরকে চেনে না, বিয়ের সময় তাকিয়ে দেখেও নি, দু-দুবার ষষ্ঠি-বাটায় নেমন্তন্ন করেছিল, অসুখের ছুতো করে যায় নি। ভয়েই যায় নি। তবু তার মন বলতে থাকে, এ সেই! এ সেই!

হ্যাঁ, রামকালীই। তিনি ওদের ঘাড়নাড়া উত্তরের পর আবার বলেন, "এ গ্রামের ছেলে, না ভাগিনেয়?"

নিতাই এগিয়ে এসে বলে, "আজ্ঞে আমি ভাগিনেয়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন দত্ত আমার মাতুল। আমার নাম নিতাইচন্দ্র ঘোষ। আর এ বাঁড়ুয্যেবাড়ির ছেলে নবকুমার বাঁড়ুয্যে। আমার বন্ধু।"

নবকুমার বাঁড়ুয্যে!

রামকালীর দুই চোখে একটা বিদ্যুতের আভা খেলে যায়, নিশ্চিন্ত হন অনুমান ঠিক। আর একবার ভাল করে আপাদমস্তক দেখে নেন ছেলেটার। দেখে নেন ওর মেয়েলি মেয়েলি দুধেআলতা-গোলা রং, আলতা-গোলা ঠোঁট, আর রোদে ঝলসানো টুকটুকে লালরঙা মুখ। তার পর নেমে আসেন পাল্‌কি থেকে।

গম্ভীরতর স্বরে বলেন, "আমি রামকালী চাটুয্যে।"

বসে পড়বার একটা সুযোগ পেয়েই বোধ হয় বেঁচে যায় ছেলে দুটো, তাড়াতাড়ি বসে পড়েই রামকালীর চরণ-বন্দনা করে।

"থাক থাক" বলে উভয়ের মাথাতেই একটু হাতের স্পর্শ দিয়ে রামকালী একবার নিতাইয়ের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে নবকুমারকে উদ্দেশ করে বলেন, "এ যখন তোমার বন্ধু, তখন এর সামনে কথা বলতে বাধা নেই, জিজ্ঞেস করছি, এইভাবে মাছ ধরেই দিন কাটাও নাকি ?"

নবকুমারের থুতনি বুকে ঠেকে। কিন্তু কায়স্থ বংশধর নিতাই, ওর থেকে অনেক চটপটে চৌকস। আর নির্ভীকও বটে।

সে তাড়াতাড়ি বলে, "না আজ্ঞে, অন্যদিন দুপুরবেলা আমরা মাস্টারের বাড়ি পড়তে যাই। আজ তিনি—"

"কি পড়তে যাও ?"

নবকুমার পিছন থেকে প্রবল চিমটি কেটে বন্ধুকে নিষেধ করে, যাতে ইংরিজি পড়াটার কথা না বলে ফেলে। বলা যায় না, ম্লেচ্ছ ভাষা অধ্যয়নের সংবাদে ক্ষেপে ওঠে কিনা এই ভয়ঙ্কর লোকটা।

ভয়ঙ্কর ?

অন্তত নবকুমারের তাই লাগছে।

কিন্তু নিতাই নিষেধের মান্য রাখে না। বরং একটু বিনয়-আচ্ছাদিতে গর্বিত ভঙ্গীতেই বলে, "আজ্ঞে ইংরিজি।"

"ইংরিজি! তা বেশ! কতদূর পড়েছ ?"

"ফার্স্ট বুক সেকেণ্ড বুক সারা হয়ে গেছে আজ্ঞে! এখন—"

"ভাল, শুনে সুখী হলাম। তা আজ পড়তে যাও নি যে ?"

প্রশ্নটা নবকুমারকে, তবু উত্তরটা দেয় নিতাই-ই, "মাস্টার মশাই বই আনতে কলকাতায় গেছেন।"

"কলকাতায়! ওঃ! হুঁ। যাক বাবাজী, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। জানতে চাইছি, গ্রামে তোমাদের কোন শত্রু আছে ?"

"শত্রু!"

নবকুমার বিহ্বল ভাবে তাকিয়ে থাকে।

কোনও শত্রু!

এলোকেশীর মতে তো গ্রামসুদ্ধ সকলেই তাদের শত্রু।

"হ্যাঁ শত্রু! মানে যে তোমাদের অনিষ্টকামী। মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে তোমাদের ক্ষতি করতে চায়। এমন কোনও লোক আছে মনে হয় ?"

নবকুমার আস্তে আস্তে নেতিবাচক মাথা নাড়ে, কিন্তু ততক্ষণে নিতাই

অন্ত উত্তর দিয়ে বসেছে, "আজ্ঞে গাঁয়ে তো সবাই সবাইয়ের শত্রু। ওই ওপরেই দেখন-হাসি। আর নবুর মার মেজাজের জন্যে তো—"

"থাক ও কথা—", মৃদু ধমক দিয়ে ওঠেন রামকালী, মেঘমন্দ্র স্বরে বলেন, "গ্রামের সকলের হাতের লেখা চেন ? বলতে পার এ লেখা কার ?"

মেরজাইয়ের পকেট থেকে চিঠিখানা বার করে সামান্য একটু মেলে ধরেন রামকালী।

কিন্তু মেলে ধরবার দরকারই বা কি, ওরা তো জানে এ লেখা কার! ভবতোষ মাস্টারের। আর লেখার প্রেরণা নিতাই নিজে। মাস্টারের কাছে হতভাগ্য নবকুমারের ধর্মপত্নীর যন্ত্রণাময় জীবনের কাহিনী দিব্য বিশদ করেই বলেছিল সে, এবং সহসা ভবতোষ মাস্টার ঘোষণা করেছিল, "আচ্ছা, আমি এর প্রতিকার সাধনে যত্নবান হব। সাহেবদের দেশে কদাপি কেউ স্ত্রীজাতির প্রতি নির্যাতন সহ্য করে না।"

"কি, চিনতে পারলে বলে মনে হয় ?"

দুজনেই প্রবল বেগে মাথা নাড়ে। বলা বাহুল্য নেতিবাচক। "হ্যাঁ" বলে কে সিংহের মুখবিবরে মাথা গলাতে যাবে ?

"ঠিক আছে। আমি তোমাদের ওখানেই যাচ্ছি। তোমার বাবা বাড়ি আছেন অবশ্যই !"

"আছেন।" অস্ফুট এই শব্দটি এতক্ষণে রামকালীকে নিশ্চিন্ত করে, তাঁর জামাতা বাবাজী বোবা নয়।

পাল্কি-বেহারাদের ডেকে জনান্তিকে কি যেন নির্দেশ দিয়ে রামকালী বলেন, "চল, এটুকু তোমাদের সঙ্গে হেঁটেই যাই।"

"আমি আজ্ঞে একটু দৌড়ে গিয়ে খবরটা দিয়ে আসি—", বলেই বন্ধু নিতাই বিশ্বাসঘাতকের মত নবকুমারকে অথই জলে ফেলে রেখে দৌড় মারে।

রামকালী কয়েক পা অগ্রসর হয়ে সহসা স্বভাব-বহির্ভূত স্বরে একটা প্রশ্ন করে বসেন, "আমার মেয়ে কি তোমাদের গৃহে কোন উৎপাত ঘটাচ্ছে ?"

"আঁ—আঁজ্ঞে, সে—এ কী !"

তোতলা হয়ে ওঠে নবকুমার।

"না তাই প্রশ্ন করছি। সে বালিকা মাত্র, অবুঝ হওয়া অসম্ভব নয়।"

"আঁ—আঁজ্ঞে। না—না।"

কালঘাম ছুটে যায় নবকুমারের। সে গায়ের একমাত্র আচ্ছাদন কোঁচার খুঁটটুকু টেনে কপালের ঘাম মুছতে থাকে।

রামকালী মৃদু হাস্যে বলেন, "অধীর হবার কিছু নেই, আমি কৌতূহল-পরবশ হয়ে প্রশ্ন করছিলাম মাত্র। যাক্, আমি যার জন্য এসেছি তোমাকে জানাই, কারণ তুমি আমার জামাতা। বাড়িতে একটি শুভকাজ আসন্ন, সে কারণ আমার কন্যাকে আমি নিয়ে যেতে মনস্থ করেছি। বিবাহের সময় অবশ্য যথারীতি নিমন্ত্রণ আসবে, তুমি এবং তোমার পিতা যাবে। তোমাকে কয়েকদিন থাকবার জন্য মেয়েরা অনুরোধ করতে পারেন, সে সম্পর্কে আমি তোমার পিতা-মাতাকে জানিয়ে যাব। থাকবার জন্যে প্রস্তুত থেকো।"

এ সবের আর কি উত্তর দেবে নবকুমার ?

ভয়ে আর আনন্দে, আশায় আর উৎকণ্ঠায় তার তো মুহুর্মুহু স্বেদ-কম্প-পুলক দেখা দিচ্ছে।

বাড়ির দরজার কাছাকাছি আসতেই নবকুমার সহসা কাতরকণ্ঠে বলে ওঠে, "আমি যাই।"

"কী আশ্চর্য, যাবে কেন ?"

"হ্যাঁ, আমি যাই। নিতাই আছে—", বলে এদিক ওদিক তাকিয়ে শ্বশুরের পায়ের কাছে মাটিতে একটা খাবল দিয়ে ছুট মারে নবকুমার।

রামকালী সেদিকে চেয়ে একটা নিশ্বাস ফেলেন।

লেখাপড়া শিখছে !

কিন্তু মানুষ হচ্ছে কি ?

ঠিক এই সময় নিতাই নবকুমারদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে, আর নীলাম্বর বাঁড়ুয্যে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটি সুনিপুণ হাস্য সহযোগে বলেন, "বেহাই মশাই যে ? কী মনে করে ?"

বাইশ

বেলা না পড়তেই আবার রামকালীর পাল্‌কি ফিরতি মুখ ধরেছে, একা রামকালীকে নিয়েই। এখন পাল্‌কির খোলা দরজা দিয়ে পড়ন্ত সূর্যের স্বর্ণাভা উঁকি মারছে, শেষ ফাল্গুনের উড়ু উড়ু বাতাস যেন দুষ্টু শিশুর মত মাঝে মাঝে ঝুপ করে ঢুকে পড়ে একটা 'টু' দিয়ে যাচ্ছে।

আকাশে বাতাসে গাছে পাতায় সর্বত্রই একটা আলো ঝলসানো আনন্দের আবেশ। কিন্তু প্রকৃতির এই মধুর রূপে মন দেবার মত মন এখন নেই রামকালীর। কী এক দুরন্ত ক্ষোভে মনটা যেন হাহাকার করছে। মনে হচ্ছে কোথায় যেন মস্ত একটা হার হয়ে গেছে তাঁর।

ভদ্রতাবোধহীন নীলাম্বর বাঁড়ুয্যের কাছে কি পরাজয় ঘটেছে রামকালীর? মেয়েকে নিয়ে আসতে পারেন নি এই ক্ষোভেই মন এখন অস্থির?

কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তো তা নয়। নীলাম্বর তো ভদ্রতার চূড়ান্ত দেখিয়েছেন।

'মেয়ে নিতে এসেছেন' এ প্রস্তাব তোলামাত্রই নীলাম্বর অমায়িক হাস্যে বলেছেন, "বিলক্ষণ বিলক্ষণ, এ তো অতি উত্তম কথা। আপনার কন্যা আপনি নিয়ে যাবেন, যত দিন ইচ্ছে রাখবেন, এতে আমার কি বলবার আছে? ওরে কে আছিস, পঞ্জিকাটা একবার নিয়ে আয় তো!"

রামকালী বলেছিলেন, "পঞ্জিকা আমি দেখেই এসেছি। আগামী কাল সর্বশুদ্ধা ত্রয়োদশী। বারও ভাল। কালই নিয়ে যাব। রাত্রিবাস না করে উপায় থাকছে না। কাজেই গ্রামে কোনও ব্রাহ্মণ-বাড়িতে শয়নের একটু ব্যবস্থা করে দিন। কিন্তু অনুগ্রহ করে কোনও আহারাদির আয়োজন করতে যাবেন না। বেহারাদের জলপানির ব্যবস্থা ওদের সঙ্গেই আছে!"

নীলাম্বর মেয়েদের ভঙ্গীতে গালে হাত দিয়ে বলে উঠেছিলেন, "বলেন কি বেহাই মশাই! আমার এত বড় বাড়ি, এত বড় ঘরদালান থাকতে আপনি অন্যত্র—"

রামকালী গম্ভীর হাস্যে থামিয়ে দিয়েছিলেন, "বেহাই মশাই কি হিন্দু বাঙালীর লোকাচার বিস্মৃত হচ্ছেন? জামাতৃ-গৃহে রাত্রিবাস কি লোকাচারসম্মত?"

নীলাম্বর হাসির সঙ্গে একটি "হ্যা হ্যা" শব্দ করে বলেছিলেন, "তা অবশ্য,

তা অবশ্য। কিন্তু আপনার কন্যার সন্তান জন্মের পর তো আর এ জেদ রাখতে পারবেন না ?"

রামকালী আরও গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলেছিলেন, "সন্তান নয়, পুত্রসন্তান! কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতের আলোচনায় বৃথা সময় অপচয়ে দরকার কি ? এখন কন্যার সঙ্গে একবার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করুন।"

"বিলক্ষণ, এর আবার ব্যবস্থা কি ? ওরে সদু, তোদের বৌকে একবার মাঝের ঘরে নিয়ে আয়, বেহাই মশাই একবার দেখবেন।"

তবে ? নীলাম্বরের ব্যবহারে খুঁত কোথায় ?

এর চাইতে ভদ্র ব্যবহার আর কি করা যায়? কত বাড়িতে তো বৌয়ের বাপ-ভাই এলে বাইরে থেকেই জল-পান খাইয়ে বিদায় দেওয়া হয়, মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয় না। তা ছাড়া অনেক বাড়িতে বহু সাধ্য-সাধনায় যদি বা মেয়ের দর্শন মেলে, সঙ্গে একজন পাহারা থাকে। সে জায়গায় কিনা চাওয়া মাত্রই পাওয়া ? রামকালীর তো কৃতার্থ হয়ে যাওয়া উচিত।

কিন্তু আশ্চর্য মানুষের মন! রামকালীর মনে হল নীলাম্বরের ওই "সদু" না কাকে ডেকে হুকুম দেওয়া, ওটা যেন তাচ্ছিল্য প্রকাশের একটা চরম অভিব্যক্তি। ওই সুরটার মধ্যে এই কথাগুলোই ঠিক খাপ খেত—"ওরে কে আছিস, একমুঠো ভিক্ষে দিয়ে যা তো, ভিখিরিটা চ্যাচাচ্ছে।"

নিজেকে গ্লানিযুক্ত, আর সমস্ত পরিবেশটা অশুচি মনে হল রামকালীর। কিন্তু উপায় কি ? জামাইয়ের বন্ধু সেই ছেলেটা উঠোনে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখা যাচ্ছে, নিজে সে গেল কোন্ দিকে ?

এদিক ওদিক তাকালেন, হদিস পেলেন না।

সদু কে ? ছেলে না মেয়ে ? কর্তার তো শুনেছি মেয়ে নেই।

এক ঝাঁক ভাবনার মাঝখানে হঠাৎ বোধ করি সেই মাঝের ঘরেরই দরজার শিকলটা নড়ে উঠল।

নীলাম্বর কোমরের কসি গুঁজতে গুঁজতে উঠলেন। ভিতরে ঢুকে কি বললেন কি করলেন ঈশ্বর জানেন, তার পর বেরিয়ে এসে ডাক দিলেন, "আসুন বেহাই মশাই!"

রামকালী ভিতরে ঢুকলেন।

দেখলেন একটা অন্ধকার-অন্ধকার ঘরের মধ্যে একটা চৌকির ধারে

একগলা ঘোমটা ঢাকা একটি বালিকা-মূর্তি। পরনের শাড়ীখানা জমকালো। বোধ করি পিতৃ-সন্নিধানে আসার উপলক্ষে তাকে খানিকটা সাজিয়ে ফেলা হয়েছে।

ঘরের বাইরে একটি কমবয়সী মেয়ে দাঁড়িয়ে, মাথায় ঘোমটা কম। রামকালী এসে ঢুকতেই মেয়েটি তাড়াতাড়ি তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে খাটো গলায় বলল, "ওই যে, কথাবার্তা কন।" তার পর আরও খাটো গলায় হঠাৎ "মেয়ে নিয়ে যাবেন" বলেই টুক করে পাশের একটা দরজা দিয়ে কোথায় ঢুকে গেল। কিন্তু ওর ওই অস্ফুট কথাটা পরিপাক করবার আগেই আর একটা চাপা অথচ তীব্র কথা কানে এল তাঁর, "বৌকে একলা রেখে চলে এলি যে বড় ?"

"বাঃ, আমি আবার সঙের পুতুলের মত কি দাঁড়িয়ে থাকব, লজ্জা করে না ?" উত্তরের এই কথাটুকুও কানে এল। তারপর আবার সেই তীব্র স্বর, "ওরে আমার লজ্জাউলি লজ্জাবতী! একলা হয়ে এখন বাপের কাছে সাতখানা করে লাগাক !"

এর উত্তর আর কানে এল না রামকালীর, কিন্তু ইতিপূর্বের তিক্ত মন, কী একরকম বিকল হয়ে বিস্বাদ হয়ে গেল, কন্যা-সন্দর্শনের প্রথম আনন্দটাই শিথিল হয়ে গেল।

সেই অবকাশে গুণ্ঠনবতী সত্য নিতান্ত নীরবে বাপকে একটি প্রণাম করল। প্রণাম করে যথারীতি পায়ের ধুলো মাথায় বুলাতেও ভুলে গেল না।

কিন্তু রামকালী সহসা এমন বিচলিত হলেন কেন ?

সত্যর এই আচরণে বুকের ভিতরটা হাহাকার করে উঠল তাঁর কেন ? যে হাহাকার এখনো থামাতে পারছেন না এই স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষটা ? রামকালী কি আশা করেছিলেন তাঁর সেই সত্য অবিকল তেমনি আছে ? বাপকে দেখেই ছুটে এসে ঢিপ করে একটা প্রণাম ঠুকে গিন্নীদের মত বলে উঠবে, "কি বাবা, এত দিনে মেয়েটাকে মনে পড়ল ? ধন্যি বলি বাপের প্রাণ, এতদিনে একবার দেখতে আসতে ইচ্ছে হল না মেয়েটা মরল কি বাঁচল ? যাই ভাগ্যিস পুণ্যিপিসির বিয়েটা লেগেছিল, তাই না—"

অথবা এইটাই কি মনে করেছিলেন, সত্য আর আগের সত্য নেই, একেবারে বদলে গেছে ? তাই প্রত্যাশিত হৃদয়ে অপেক্ষা করেছিলেন,

দেখামাত্রেই ঝাঁপিয়ে এসে পিতৃবক্ষে আশ্রয় নিয়ে নিঃশব্দে কেঁদে ভাসাবে সে! আর তার সেই অবিরল অশ্রুধারায় রামকালীর জ্বালা করা বুকটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে!

কিন্তু এই ইচ্ছে তো রামকালীর হবার কথা নয়। আবেগপ্রবণতা তো রামকালীর সম্পূর্ণ রুচিবিরুদ্ধ। মন-কেমন করা বা অনেক দিন পরে দেখা হওয়া ইত্যাদি উপলক্ষ করে কেউ কাঁদছেকাটছে দেখলে ভুরু কুঁচকে ওঠে তাঁর। স্বয়ং রামকালী-দুহিতাই যদি সেই খেলো আর সস্তা পদ্ধতিতে আবেগ প্রকাশ করে বসে, রামকালী অসন্তুষ্ট হতেন না কি?

বহু বিচিত্র উপাদানে গড়া মানব মন কখন কি চায় বলা বড় শক্ত। কি চায় সে নিজেই বুঝতে পারে না, শুধু এক-একসময় একান্ত বেদনায় বলে, "এ কী হল! এতো আমি চাই নি!"

তাই চির-অবিচলিত রামকালী হঠাৎ আজ নিজের মেয়ের এই শান্ত সভ্য বধূ-মূর্তি দেখে বিচলিত হয়ে ভাবলেন, "এ কী হল!"

কথা যোগায় নি রামকালীর। মৃদু গম্ভীর কণ্ঠ থেকে শুধু একটু কুশল প্রশ্ন উচ্চারিত হয়েছিল, "ভালো আছ তো?"

সত্য তেমনি মাথা নিচু করে বলেছিল, "হ্যাঁ বাবা! বাড়ির সব খবর মঙ্গল?"

ঠাকুমা পিসঠাকুমার দল থেকে শুরু করে বাগদী ঝিটা পর্যন্ত বাড়ির প্রত্যেকটি সদস্যের নাম করে কে কেমন আছে জিজ্ঞেস করল না সত্য, শুধু জিজ্ঞেস করল 'বাড়ির সব মঙ্গল'?

আশ্চর্য! আশ্চর্য! শ্বশুরঘরে এলে কি এমনি করেই মেয়েরা তাদের আজন্মের আশ্রয়কে—তাদের ধুলোমাটির গড়া খেলাঘরের মতই ভেঙে ফেলে? মন থেকে মুছে ফেলে? তাই শকুন্তলাকে আর কোন দিন কণ্ব মুনির আশ্রমে দেখা যায় নি, জনক রাজার ঘরে সীতাকে? মহাকবিদের মহৎ লেখনীও এই অমোঘ নিয়মকে সহজ সত্য বলেই মেনে নিয়েছিল, তাই সে লেখনী নির্মম ঔদাসীন্যে শুধু সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে, পিছু ফিরে তাকায় নি?

নারী আর নদী, এরা তবে এক ধাতুতে গড়া!

কিন্তু গিরিরাজ-দুহিতা উমা?

না, উমা তো ইতিহাসের নয়, পুরাণের নয়, মহাকবিদের অমর লেখনীর

অনবদ্য সৃষ্টি নয়, সে যে শুধু ঘরোয়া মানুষের মনের মাধুরী দিয়ে গড়া অমিয় ছবি। মানুষের প্রত্যাশা আর কল্পনা, আশা আর আকাঙ্ক্ষা দিয়ে গড়া ভালবাসার মূর্তি!

রামকালীর মনের মধ্যে অনেক ভাব-তরঙ্গের একটা আলোড়ন উঠেছিল, যেমনটা তাঁর সচরাচর হয় না। ভাবলেন, তবে কি সত্য সম্পর্কে এতদিন যে মূল্যবোধ তাঁর মনের মধ্যে ছিল, সত্য তার উপযুক্ত নয়? সত্য সেই সাধারণ মেয়ে, যারা সহজেই বদলে যায়? ভাবলেন, তবে কি মার খাওয়ার কথাটাই সত্যি, আর সত্য একেবারে নেহাৎ একটা ভীরু মেয়ে মাত্র? যে মেয়েরা পড়ে মার খায়, আর মার খেয়ে ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে, নিজেকে প্রকাশ করতে সাহস পায় না?

সত্যর সম্পর্কে এত হতাশ হয়েই বুঝি রামকালীর মধ্যে এত আলোড়ন।

তবু সে আলোড়নকে সংহত রেখে রামকালী বলেছিলেন, "হ্যাঁ, সব সংবাদ মঙ্গল। পুণ্যির বিয়ে ষোলই বোশেখ, তাই তোমাকে নিয়ে যাবার সংকল্প করে এসেছি।"

হ্যাঁ, ঠিক এই কথাটা উচ্চারণের পরই বুকের মধ্যে যেন একটা হাতুড়ির ঘা খেলেন রামকালী।

"বাবা গো তুলি কী ভাল!" বলে আহ্লাদে চেঁচিয়ে উঠল না সত্য, তার বদলে বলল, "বোশেখের মাঝামাঝি বিয়ে, আর এখন তো সবে ফাগুনের শেষ, এত আগে থেকে নিয়ে যেতে চাইলে এরা কিছু মনে করতে পারে বাবা!"

রামকালী সুগভীর একটা নিশ্বাস গোপন করে বলেছিলেন, "ওঁরা অমত করেন নি।"

"করে নি সে ওদের ভদ্দরতাই, কিন্তু বাবা আমাদেরও তো একটা বিবেচনা করা দরকার। এদের অসুবিধেয় ফেলে—"

"তোমার তাহলে এখন যাওয়ায় মত নেই?"

আর একটা নিশ্বাস গোপন করতে হয় রামকালীকে।

সত্য এবার মুখ তুলে তাকায়। সোজাসুজি একেবারে বাপের চোখের দিকেই। বাহারে শাড়ীর ঘোমটাটা খসে পিঠের ওপর পড়ে যায়, তাই সত্যর সেই বাগ-না-মানা কোঁকড়া চুলে ঘেরা মুখটার সবটাই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়, আর চোখের দৃষ্টিটা তার বেশ একটু সময় নিয়েই বাপের মুখের দিকে নিবদ্ধ থাকে।

তার পর চোখ নামিয়ে নিয়ে খসে পড়া আঁচলটা মাথায় তুলতে তুলতে উত্তর দেয় সত্য, "তা কার্যক্ষেত্রে মত নেই-ই বলতে হয় বৈকি। ঠাকরুনের শরীর-স্বাস্থ্য ভাল নয়, একা ননদের ঘাড়ে সমগ্র সংসার—"

রামকালী ঈষৎ বিস্মিত প্রশ্নে বলেন, "ননদ! নবকুমারের ভগিনী আছেন নাকি?"

"সহোদর বোন নন, তবে সহোদরের বাড়া বাবা! পিসতুতো ননদ—ওই যে যিনি তোমাকে এ ঘরে এনে পেঁাছে দিলেন।"

"ও!" ননদ-প্রসঙ্গে ইতি টেনে রামকালী বলেন, "যাবার যখন উপায় নেই, তখন আর কি করবার আছে! অতএব রাত্রে আমার আর এ গ্রামে অবস্থান করারও প্রয়োজন দেখি না। এখনি রওনা দেব। তার আগে একটা প্রশ্ন তোমায় করছি, তুমি তো লেখাপড়া কিছু শিখেছিলে, পত্রাদিও পড়তে পার মনে হয়, এই চিঠিটা পড়ে মানে বুঝতে পারবে?" জামার পকেট থেকে চিঠিটা বার করেন রামকালী।

চিঠিখানা কিন্তু সত্য তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে নেয় না। মৃদুস্বরে বলে, "কার পত্তর?"

"সেটাই তো আমার জানা নেই। তুমি হয়তো জানতে পারবে!"

অতঃপর চিঠিটা হাতে নিয়ে কয়েক ছত্র পড়ে সত্য, ঈশ্বর জানেন ঘোমটার মধ্যে তার মুখের চেহারা কেমন হয়ে ওঠে, কিন্তু গলাটা তো ঠিকই থাকে। ঠিকঠাক শান্ত গলায় বলে ওঠে সে, "এত বড় একটা জ্ঞানবান বিচক্ষণ বেক্তি হয়ে বুঝতে পারলে না বাবা, এ কোনো শত্তুরের কাজ!"

"এমন কে শত্রু আছে তোমাদের?"

"তা কে জানে বাবা? অনেক শত্তুর তো ওপরে ভালমানুষ সেজেও থাকে!" চিঠিটা সব না পড়েই বাবার হাতে ফিরিয়ে দিয়েছিল সত্য।

রামকালী সেটা ফের পকেটে পুরে, দীর্ঘনিশ্বাস গোপন না করেই বলেছিলেন, "তাহলে এখানে তোমার কষ্টের কোন কারণ নেই? তোমার সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা করবারও কিছু নেই আমার! ঈশ্বর মঙ্গল করলেন। তাহলে এই কথাই বলে সান্ত্বনা দিতে পারব তোমার মাকে।"

"মা!" সত্য একটু চমকে বলে, "এ পত্তরের বিষয় মা জানেন?"

"না। তিনি অবশ্য জানেন না কিছু", রামকালী ঈষৎ হাসির মত করে বলেন, "তবে 'মেয়ে মেয়ে' করে একটু উতলা হয়েছেন তো। যাক।

তোমার প্রতি যে কোন দুর্ব্যবহার হয় না এইটাই শান্তির বিষয়। আর বিশ্বাস করব তুমি ঠিক কথাই বলছ।"

সত্য আর একবার তেমনি মুখ তুলে তাকায়। এবার যেন ভয়ঙ্কর একটা অভিমানের ছায়া ভৎসনার মত ফুটে ওঠে সে-চোখে। তারপর চোখ নামে। মৃদু আর দৃঢ়কণ্ঠে বলে সত্য, "পেতল কাঁসার ঘটিটা বাটিটাও একত্রে থাকলে মধ্যে মধ্যে ঠোকাঠুকি লাগে বাবা, আর এ তো জলজ্যান্ত মানুষ! একেবারে ঠোকাঠুকি লাগে না, লাগবে না, এ কথা কি জোর করে বলা যায়? তবে এটুকু বিশ্বেস মেয়ের প্রতি রেখো বাবা, কোনও অন্যায়ই সে করবেও না, সইবেও না।"

তারপর রামকালী চলে এসেছিলেন।

সত্য আর এক দফা প্রণাম করেছিল।

কিন্তু এখানেই তো ইতি নয়।

"মেয়েকে না নিয়েই যে চললেন বেহাই মশাই?" এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছিল রামকালীকে। আর মিথ্যা কথা বানিয়ে বলতে না পারার জন্যে বিদ্রূপ-হাস্যরঞ্জিত বিস্ময়-প্রশ্নও শুনতে হয়েছিল।

সত্যর শ্বশুর সেই তাঁর মেয়েলি ভঙ্গীতে গালে হাত দিয়ে বলেছিলেন, "বলেন কি বেহাই মশাই, মেয়ে বাপের ঘর যেতে চায় না! এ যে বড় তাজ্জব কথা শোনালেন দেখছি!"

নিজের জন্যেও ততটা নয়, রামকালীর মনে হয়েছিল, কুকুরের কামড় হাঁটুর নিচে, কিন্তু সত্যর শ্বশুর সম্পর্কে যে তাঁর ওই প্রবাদটা সহজেই মনে আসতে পারল, এটাও তো কম গ্লানির কথা নয়।

আশ্চর্য, ওদের ব্যবহারে বিনয় আর সৌজন্য প্রকাশের ঘটা তো কম ছিল না, তবু কেন রামকালীর ওদের স্থূল অমাজিত মনে হয়েছিল? জামাইটা অবশ্য নেহাৎ বোকা বোকা, প্রকৃত কেমন কে জানে। তা সেই তো মাত্র একবার দেখা দিয়েই উধাও হয়ে গেল।

বন্ধুটাকে তবু আবার দেখলেন, কিন্তু জামাইকে নয়।

বন্ধুটা যে সত্যর শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

শ্রদ্ধার যোগ্যই নয় ওরা।

তবু, আর একবার বুকটা কেমন মুচড়ে উঠল রামকালীর, তবু সেই শ্বশুর-বাড়ির সঙ্গে দিব্যি মিশে গেছে সত্য। এমন মিশে গেছে যে, শাশুড়ীর শরীর-স্বাস্থের অজুহাতে, বাপের বাড়ি যাওয়ার প্রলোভন ত্যাগ করল।

সুযোগ পেয়েও বাপের বাড়ি যেতে চাইল না, এ রকম মেয়ে রামকালী কি তাঁর এতখানি জীবনে এর আগে কখনো দেখেছেন? অথচ ঠিক বোঝাও যাচ্ছে না তাকে।

হয়তো তাকে আর কোন দিনই বোঝা যাবে না। রামকালীর মেয়ে রামকালীর কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে, হয়ত আরও অনেক অনেক দূরে চলে যাবে। সেই সত্যকে আর কোনদিনই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

চিরনিঃসঙ্গ রামকালীর অন্তরের একটিমাত্র ছোট্ট সঙ্গী, রামকালীর আকাশের আলো-ঝিকঝিকে ছোট্ট একটি তারকা, চিরদিনের মত হারিয়ে গেল!

হঠাৎ চিন্তায় ছেদ পড়ল।

চোখে পড়ল পালকির পাশ দিয়ে বেহারাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আর একটা মানুষও দৌড়চ্ছে।

কখন থেকে দৌড়চ্ছে?

হঠাৎ কোথা থেকেই বা এল? কিছু বলতে চায় নাকি?

রামকালী বেহারাদের আদেশ দিলেন থামাতে।

আর তার পরই নজরে পড়ল এ সেই নিতাই, তাঁর জামাইয়ের বন্ধু।

"কি খবর?"

কিসের একটা প্রত্যাশায় রামকালীর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কি ভাবলেন তিনি? তাঁর সত্যবতীই কি আবার বাপকে ফিরিয়ে আনতে ডাক দিয়েছে? এখন কেঁদে ফেলে বলবে, "মেয়ের মুখের কথাটাই তুমি দেখলে বাবা, তার অভিমানটাকে দেখলে না? একবার 'না' করেছি তো রাগ দেখিয়ে চলে গেলে?"

অনেকগুলো কথা মনের মধ্যে হুড়োহুড়ি করে উঠল, তবু সংযত কণ্ঠেই প্রশ্ন করলেন রামকালী, "কি খবর?"

নিতাই হাঁপাচ্ছিল।

একটু জিরিয়ে নিয়ে বলে, "বাচালতা মার্জনা করবেন তালুই মশাই, বলতে

এসেছি—এ কী করলেন? মেয়ে নিতে এসে খালি হাতে ফিরে যাচ্ছেন? বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের কাছে হেরে গেলেন?"

রামকালীর মুখ লাল হয়ে ওঠে।

কষ্টে আত্মসংবরণ করে বলেন, "বাচালতা মার্জনা করা শক্ত হচ্ছে!"

"বুঝেছি। কিন্তু বড় আশায় হতাশ্বাস হয়েই ছুটে এসেছি। আপনার কন্যেকে নিয়ে গেলেন না বটে, কিন্তু এর পর আর হয়তো মেয়েকে জীবিত দেখতে পাবেন না। হয়তো আত্মঘাতী হয়ে—মেয়ে তো আপনার ভাঙে তো মচকায় না।"

সহসা রামকালী চাপা ভারী গলায় প্রবল একটা ধমক দিয়ে ওঠেন, "দেখতে তো বেশ ভদ্রসন্তান বলে মনে হচ্ছে, প্রকৃতি এমন ইতরের মত কেন?"

ইতরের মত!

নিতাই বিহ্বলভাবে তাকিয়ে থাকে।

রামকালী স্বভাবগম্ভীর স্বরে বলেন, "অপর গৃহের কুলবধূ সম্পর্কে কোন আলোচনা ইতরতারই নামান্তর।"

"বেশ!" নিতাই অভিমান-ক্ষুব্ধ মুখে মাথা নিচু করে বিদায়-প্রণাম করে বলে, "আর কি বলব বলুন! তবে একা আমিই আস্পর্দা করি নি। আপনার জামাই নবকুমারই—", ঢোঁক গিলে বলে নিতাই, "সে বলছিল—চোখের সামনে স্ত্রীহত্যে দেখব, প্রতিকার করব না? তাই আমি—"

নিতাই আস্তে আস্তে চলে যায়।

রামকালী স্তব্ধ হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকেন।

আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে রামকালী কি ওকে ফিরে ডাকবেন?

কিন্তু ডেকে, তারপর?

আদ্যোপান্ত ঘটনা জেনে নিয়ে, ফের আবার ছুটবেন জামাইবাড়ি?

তারপর?

আবার তাদের বলবেন, 'না আমার ভুল হয়েছে, মেয়ে বালিকা, খামখেয়ালের বশে কি বলেছে, সে-কথা কথাই নয়, ওকে নিয়ে যাব?'

আচ্ছা তার পর?

যদি সত্য আবার বলে, "সে কি বাবা, আবার ফিরে এলে কি বলে? আমি তো বলেছি এখন যাওয়া হবে না?"

তখন ?

তখন কি করবেন রামকালী ? সত্যর ওই কথার পর ? বলবেন, 'পাগলী মেয়ে পাগলামি রাখ্, তোর মা তোকে না দেখে কেঁদে দিন কাটাচ্ছে।' বলবেন, 'তোকে না নিয়ে একা ফিরতে আমার প্রাণটা হাহাকার করছে ! বলবেন—না, তা হয় না, আত্মমর্যাদাকে আর কত বিসর্জন দেবেন রামকালী ?

"তোল পালকি !"

বেহারাদের হুকুম দেন রামকালী।

তারা যথারীতি গৃহাভিমুখেই চলতে থাকে।

আর রামকালী বিস্ময়ে মূক হয়ে বসে থাকেন সেই একক পালকিতে।

ধীরে ধীরে বিস্ময়ের ধূসরতা ফিকে হয়ে আসে।

কার্যকারণের চেহারাটা চোখে ভেসে ওঠে।

নীলাম্বর বাঁড়ুয্যের কাছে হেরে যান নি রামকালী, হেরে গেছেন আপন আত্মজার কাছে। বুদ্ধির খেলায় রামকালীকে পরাজিত করেছে সত্য। বাপের কাছে প্রতিপন্ন করেছে, শ্বশুরবাড়িতে সুখে আছে সে, সন্তোষে আছে। তাই শ্বশুরবাড়ির কর্তব্যের কাছে বাপের বাড়ির তীব্র মধুর আকর্ষণও তুচ্ছ করতে পারা অসম্ভব হল না তার।

জীবনের বিনিময়েও বাপের শান্তি বজায় রাখবে সত্য।

আর রামকালী ? রামকালী সত্যর সেই কৌশলে বিভ্রান্ত হলেন, অভিমানে অন্ধ হলেন, আপন অহঙ্কার নিয়ে ফিরে এলেন !

আর এখন ফিরে যাওয়া যাবে না।

অপেক্ষা করতে হবে ন্যায্য সময়ের জন্য। পুণ্যির বিয়ের তারিখ ঘেঁষে কুটুম্বের মত আসবে সত্য। আসবে—যদি ততদিন বেঁচে থাকে।

চোখ দুটো হঠাৎ লঙ্কার ঝাল লাগার মত জ্বলে উঠল। স্বভাব-বহির্ভূত তীব্রতায় পালকি থেকে মুখ বাড়িয়ে বেহারাদের উদ্দেশে বলে উঠলেন রামকালী, "কচ্ছপের মত সমস্ত মাটি মাড়িয়ে হাঁটছিস যে তোরা, পায়ে জোর নেই ?"

চিঠিখানা যে "শত্তুরের রটনা", এ কথাটা নেহাৎ ভুল নয়। বৌকে এলোকেশী নিত্যপ্রহারে জর্জরিত করেন, এ বললে এলোকেশীর প্রতি

অন্যায় অবিচার করা হয়। মেরেছিলেন সেই একদিনই। বৌয়ের চুল বাঁধতে বসে। অবশ্যি একটু আশ মিটিয়েই মারবেন বলে উঠোনের রোদে মেলে দেওয়া জ্বালানি কাঠ থেকে একখানা তুলে এনেছিলেন, কিন্তু সে কাঠ আর বৌয়ের পিঠে ভাঙবার সুখ তাঁর হয় নি। সর্বনেশে সৃষ্টিছাড়া বৌ হঠাৎ ঝট করে কাঠখানা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বেশ মজবুত গলায় বলে উঠেছিল, "দেখ গুরুজন আছ, গুরুজনের মতন থাক, শিরোধার্য্যে রাখব। নচেৎ তোমার ললাটে দুঃখু আছে। আমাকে তুমি চেন না, তাই ভেবেছো আমার ওপর যা-খুশি করবে। সে বাসনা ছাড়।"

কথা শেষ না হতেই এলোকেশী হঠাৎ মড়াকান্না কেঁদে উঠে পাড়ার লোক জড়ো করেছিলেন।

তার পর তো সে এক হৈ-হৈ কাণ্ড, রৈ-রৈ ব্যাপার!

কিন্তু সত্যকে আর সে রঙ্গমঞ্চে দেখা যায় নি।

পাড়ার পাঁচজনের বিস্ময়োক্তিকে সদু থামিয়েছিল, "নতুন ফাগুনের গরমে" মামীমার মাথাটা গরম হয়ে উঠেছে বলে। বলেছিল অবশ্য নেপথ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপিচুপি। জনে-জনেই বলেছিল।

তারপর মামীকে চুপিচুপি বলেছিল, "সাপের ন্যাজে পা দিতে যেও না মামী, বৌটি তোমার যেমন তেমন নয়।"

এলোকেশী সদুকে ন-ভূতো ন-ভবিষ্যতি গালমন্দ করে চিৎকার করে জানিয়েছিলেন—আচ্ছা, ওই বৌকে তিনি মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গাঁয়ের বার করে দিতে পারেন কিনা দেখবে গাঁসুদ্ধু সবাই।

কিন্তু আশ্চর্য, কার্যক্ষেত্রে আর তা করে উঠতে পারলেন না! এই কথার পিঠে বৌ সদুকে উদ্দেশ করে বেশ স্পষ্ট গলায় বলে দিয়েছিল, "ঘরের বৌকে মাথায় ঘোল ঢেলে গাঁয়ের বার করে দিলে যদি গাঁয়ের কাছে তোমাদের মুখোজ্জ্বল হয়, তো তা করতে বল ঠাকুরঝি তোমার মামীকে। তবে বিবেচনা করে দেখতে বলো, তা করলে কার গায়ে ধুলো দেবে লোকে!"

এলোকেশী তেড়ে এসে বলেছিলেন, "তবে আয় তোকে আজ কেটে রক্তগঙ্গা করে নিজে ফাঁসি যাই। উঃ, বৌ-মানুষের এত কথা!"

সত্য নিঃশব্দে রান্নাঘরের দাওয়া থেকে মাছ কাটবার বড় বঁটিটা তুলে

এনে এলোকেশীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, "তাই তবে কর, তখন তো আর আমি দেখতে আসব না কার মুখটা পুড়ল।"

আশ্চর্য, এই ঘটনার পরই এলোকেশী কেমন নিথর হয়ে গিয়েছিলেন। আর একটিও বাক্ সরে নি তাঁর মুখ থেকে। কিছুক্ষণ সেই বঁটিখানার চকচকে ফলাটার দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে সরে গিয়েছিলেন।

আর তদবধি—

তর্জন-গর্জনের পথ থেকে সরে এসে বাক্যালাপ বন্ধর পথ ধরে চলেছিলেন এলোকেশী। এবং তলে তলে ক্রমাগত নীলাম্বরকে মন্ত্রণা দিচ্ছিলেন, বৌয়ের গহনাগাঁটি সব কেড়ে নিয়ে, কোন ছলে-ছুতোয় বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে। একবার পাঠিয়ে দিতে পারলে জীবনেও আর ওই সর্বনেশে জাঁহাবাজ মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে আসছেন না।

কিন্তু ছলছুতো খুঁজতে খুঁজতে দিন গড়িয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ এমনি সময় রামকালীর আবির্ভাব।

হাতে চাঁদ পেয়েছিলেন এলোকেশী। এবং নিশ্চিত ঠিক করে ফেলেছিলেন, এই সূত্রে বৌকে জন্মের শোধ বিদায় দেবেন। কারণ ইত্যবসরে আর একটি মেয়ে এলোকেশীর দেখা হয়ে গেছে, বয়স সাত-আট, ধরন-ধারণ খুব নিরীহ, সর্বোপরি তার বাপ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে চীনে-সোনার গহনায় মেয়ের সর্বাঙ্গ মুড়ে দেবে।

ঐ মহামন্ত্রটি স্বামীকে অনবরত জপিয়েছেন এলোকেশী।

অতএব এক কথায় রাজী হয়েছিলেন নীলাম্বর বৌ পাঠাতে। স্বপ্নেও ধারণা করতে পারেন নি, বৌ নিজে বেঁকে বসবে।

রামকালী চলে যেতে—এলোকেশী পতির প্রতি জ্বলন্ত কটাক্ষ করে বলেন, "বুঝলে? বুঝলে কত বড় জাঁহাবাজ ধড়িবাজ মেয়ে? বলি নি তোমায় আমি, ও মেয়ের হাড়ে ভেলকি খেলে!"

নীলাম্বর বলেন, "দেখছি বটে!"

"তা হলে বল, ওই বৌ নিয়ে ঘর করতে হবে আমায়? একে তো ওই লক্ষ্মীছাড়ি সদিকে নিয়ে হাড়ে হাড়ে জ্বলছি, তার সঙ্গে আবার ওই বৌ! আর দুটিতে মিল কত! আরো ওই জন্যেই বৌকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় করতে চাই! আর—আরও একটা কথা," চুপি চুপি বলেছিলেন এলোকেশী, "এখনো ঘরে দিই নি তাই। ওই ছক্কা-পাঞ্জা বৌ যেই সোয়ামীকে

হাতে পাবে, সেই তো একেবারে 'জয়' করে নেবে। আর কি আমার নবু আমার থাকবে? তার থেকে আমার বকুলফুলের ওই ছাওর-ঝিটা হাবা-গোবা মতন আছে—"

কিন্তু বেয়াই যখন চলে গেলেন, তখন কিন্তু আর নীলাম্বর এ কথা বলতে পারলেন না, "ভাল চান তো মেয়ে নিয়ে যান মশাই, নইলে কুলোর বাতাস দিয়ে বার করে দেব।"

নীলাম্বরের একটা ত্রুটি আছে। বুকের পাটাটা তাঁর যতই থাক, মুখের জোরটা কম।

এলোকেশী গালে মুখে চড়িয়ে বললেন, "কী বলব, ব্যাই বেটাছেলে, তার সঙ্গে তো আমার কথা কওয়া সাজে না, নইলে একবার দেখে নিতাম সে বা কত বড় ঘুঘু, আর—আর ওই বাপ-সোহাগী বেটিই বা কত হারামজাদী!"

বৌয়ের সঙ্গে কথা বন্ধ ছিল, সে পণ আর রাখতে পারলেন না এলোকেশী। সত্য যেখানে বসে পান সাজছিল, সেখানে তেড়ে গিয়ে বললেন, "বাপ নিতে এসেছিল, গেলি না যে বড়?"

সত্য একবার চোখ তুলে, চোখ নামিয়ে পান মোড়ায় মন দিল।

"কী, কথার উত্তুর দিলি না যে বড়? গেলি না কেন বাপের সঙ্গে পিসির বিয়েতে?"

সত্য মৃদু গম্ভীর ভাবে বলে, "বিয়ের তো এখনও দেরি।"

"তা বাপ তো আদিখ্যেতা করে নিতে এসেছিল?"

"বাবার কথায় ও-রকম অচ্ছেদ্দা করে কথা কইবে না।" বলে মোড়া পানগুলো ডাবরে ভরে ভিজে ন্যাকড়া ঢাকা দিয়ে ধীর মন্থর গতিতে উঠে কুলুঙ্গীতে তুলে রাখে সত্য।

এলোকেশী রাগে দিশেহারা হয়ে বোধ করি আর কোন কথা খুঁজে না পেয়েই বলেন, "সর্বনাশী লক্ষ্মীছাড়ি, কি ভেবেছিস তুই? বাপের ঘরে যাবি না, চিরকাল আমার বুকে বসে দাড়ি ওপড়াবি?"

সত্য একবার ফিরে তাকিয়ে শাশুড়ীর দিকে একটি অন্তভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে, "তা সর্বনাশকে যখন কুলো ডালা দিয়ে বরণ করে ঘরে এনেছ, তখন চিরকাল তার বোঝা বইতে হবে বৈকি।"

নবকুমার খবরটা পেল ভয়দূতের কাছে।

নিতাই বলে গেছে, "তোর শ্বশুর আমাকে শুধু ভস্ম করতে বাকী রেখেছে।"

কিন্তু নিতাইয়ের কথাগুলো নবকুমার গায়ে মাখল না।

'নির্যাতিতা ধর্মপত্নীকে নির্যাতন থেকে উদ্ধার করবার সাধু সংকল্প নিয়ে নবকুমার অসমসাহসিক কাজ করেছিল, কিন্তু রামকালী ফিরে যাবার পর হঠাৎ নিজের মনের দিকে তাকিয়ে আবার বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল নবকুমার। আশ্চর্য, সত্যবতীর যাওয়া হল না দেখে তার মনের মধ্যে যেন একটা পুলকের ঢেউ উথলে উঠছে।

নবকুমার এ রহস্যের কিনারা করতে পারল না।

/

কিন্তু নবকুমারের জন্যে যে আরও কী অদ্ভুত রহস্য তোলা ছিল, তা কি সে দণ্ডখানেক আগেও ভেবেছিল ?

রাত খুব বেশী নয়, সন্ধ্যেরাত্তির।

এলোকেশী যথারীতি বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন, আর নীলাম্বর যথারীতি রাতসফরে বেরিয়েছেন, সদু রান্নাঘরে কাঠের 'দেল্‌কো'র উপর মাটির প্রদীপ বসিয়ে রান্না করছে। নবকুমার বাড়ি ফিরে সন্তর্পণে অন্ধকার দালানটা পার হচ্ছিল, হঠাৎ পাশের ঘরের দরজার কাছ থেকে একটা চাপা মৃদু অথচ দৃঢ় গলায় কে বলে ওঠে, "একটু দাঁড়াতে হবে।"

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না নবকুমার এবং দাঁড়িয়ে যে পড়ে সেটা আদেশপালনার্থে নয়, চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলে বলেই পড়ে।

এ কণ্ঠস্বর তার বাপের নয়, মার নয়, সদুর নয়।

অতএব ?

বাড়িতে আর কে আছে ? নবকুমারের স্বপ্নলোকবাসিনী ছাড়া ?

অন্ধকারে কেউ কাউকে স্পষ্ট দেখতে পায় না—শুধু গলাটাই শোনা যায়, "নিত্যানন্দপুরে চিঠি পাঠিয়েছিল কে ? আমার দুঃখু কাহিনীর ব্যাখ্যানা করে ?"

বলা বাহুল্য নবকুমার দারুমূর্তিতে পরিণত। আর দারুমূর্তির কথা কইবার ক্ষমতা থাকা সম্ভব নয়।

"উত্তুর নেই যে ?"

নবকুমার একবার অস্ফুটে বলে, "কি বলব ?"

"পষ্ট উত্তুর দেবে। আমার বাবাকে চিঠি দিয়েছিল কে ?"

এ কণ্ঠের প্রশ্নে নিরুত্তর থাকা নবকুমারের সাধ্যাতীত। কষ্টে বলে, "আমার সঙ্গে কথা কইছ, কে কমনে দেখে ফেলবে।"

"আচ্ছা সে চিন্তে আমার। কথাটার উত্তুর ফাঁকি না দিয়ে হক্ জবাবটা দাও।"

নবকুমার ঢোক গিলে, ঘাড় চুলকে, ঘেমে-টেমে বলে, "আমি চিঠির কথা কি করে জানব ? কিসের চিঠি ?"

"ছাখো, মিথ্যে কথা কয়ো না, নরকেও ঠাঁই হবে না।" সত্যবতী রুদ্ধকণ্ঠে বলে, "আমার নিয্যস জ্ঞান, এ তোমার কাজ !"

সহসা নবকুমারের স্বামিত্ব প্রভুত্ব এবং পৌরুষ ধিক্কার দিয়ে ওঠে তাকে। তাই সেও সহসা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে, "যদি দিয়েই থাকি, দোষটা কি হয়েছে ? নিজেই তো মরছিলে !"

অন্ধকার থেকে মৃদু তীক্ষ্ণ স্বর দ্রুত কথা কয়, "মরছিলাম সেটা ঢাক পিটিয়ে বলে বেড়াবার, কুটুমের কানে তোলার মতন কথা নয়। যারা নিজের মায়ের গালে চুনকালি দেয়, তাদের আবার বিদ্যে-বুদ্ধির বড়াই ! ঘর-শত্তুর বিভীষণকে ত্রিজগতের লোকে ছিছিক্কার করেছে বৈ ধন্যি ধন্যি করে নি। এই বুঝে কাজ করো।"

ঘরের অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যায় দরজায় দাঁড়ানো মূর্তিটার আভাস।

কণ্ঠস্বরের অনুরণনটুকুও বাতাসে মিলিয়ে যায়, অথচ নবকুমার ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রথম পত্নী-সম্ভাষণের যে বহুবিধ রোমাঞ্চময় এবং আবেশময় মধুর কল্পনা নবকুমারের লাজুক হৃদয় এতদিন ধরে লালন করে আসছিল, তার উপর কে যেন একটা কালির দোয়াত উপুড় করে দিয়ে গেছে।

স্ত্রীর সঙ্গে জীবনের প্রথম বাক্যবিনিময় এইভাবেই শেষ হয় নবকুমারের।

তেইশ

সত্যর বেহায়াপনার কথা জানতে আর বাকী থাকে না কারো এ তল্লাটে। বাপ নিতে এসেছিল, শ্বশুর-শাশুড়ী এক কথায় মত দিয়েছিল, অথচ সত্য যায় নি, নিজে ফিরিয়ে দিয়েছে বাপকে, এ অভাবনীয় সংবাদটা যেন খড়ের চালে আগুন লাগার মত ছড়িয়ে পড়ল এ পাড়া থেকে ও পাড়া। পাড়ার অন্য বৌরা ভাবল, বাঁড়ুয্যে-বাড়ির বৌটার নানা নিন্দেবাদ শুনেছি, এতদিনে তার মানে পাওয়া গেল, বৌটা পাগল!

আহা বেচারা নবকুমার!

বেয়াইয়ের বিষয়ের লোভে বাপ কিনা একটা পাগল বৌ গলায় চাপিয়েছে ছেলের!

তা সত্য সম্পর্কে এ ধরনের আলোচনা আরো একবার হয়ে গেছে ইতিপূর্বে, সত্যর বাপের বাড়ির দেশেই হয়েছে। যখন চাউর হয়ে গেল, রামকালী কবরেজ মেয়ে পাঠাতে চান নি, মেয়ে নিজে বলেছে "পাঠিয়ে দাও বাবা", তখন এর থেকে বেশী বৈ কম ছিছিক্কার পড়ে নি।

ভুবনেশ্বরী অবিরল কেঁদে মাটি ভিজিয়েছে, সত্যর বন্ধুরা গাল থেকে আর হাত নামাতে পারে নি, সত্য নিশ্চল থেকেছে। শুধু যখন সারদা বলেছে, "নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারলে ঠাকুরঝি?" তখন বলেছে, "কুড়ুল তো বাবা সেই আট বছর বয়সে গলায় বসিয়ে রেখেছেন বৌ, নতুন আর কি হল?"

"তবু আরো একটা বছর থাকতে পেতে—"

"এতখানি জীবনে একটা বছর কম-বেশীতে আর কি বা হবে বৌ? রাগের মাথায় তারা ওই আবার বিয়ে না কি বলেছে, তাই করলে তো সারা জীবন সতীনের জ্বালায় জ্বলতে হবে!"

সারদা একটা নিশ্বাস ফেলে চুপ করেছে।

আর যখন ভুবনেশ্বরী কেঁদেকেটে মেয়ের হাত ধরে বলেছে 'আমাদের জন্যে তোর মন কেমন করছে না সত্য'? তখন সত্য অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে উদাস গলায় বলেছে, "করছে কি করছে না সে কথা কি ঢাক পিটিয়ে বলতে হবে?"

"তবে স্বেচ্ছায় যেতে চাইলি কেন?"

"কেন কথার মানে নেই। নিজেরাই তো বল, 'মা বড় নির্বোধ কেঁদে কেঁদে মর, আপনি ভাবিয়া দেখ কার ঘর কর।' তবে?"

ভুবনেশ্বরী এতেও চৈতন্যলাভ করে নি, বলেছিল, "আমার তো তবু এপাড়া ওপাড়া—তোর মতন দশ-বিশ ক্রোশ দূরে নয়।"

কথা শেষ হয় নি।

এই সময় আর বাঁধ রাখতে পারে নি সত্য, হাপুসনয়নে কেঁদে ফেলে বলেছে, "তা সে কথাটা সময়কালে ভাব নি কেন? একটা মাত্তর মেয়ে আমি তোমাদের, চোখছাড়া দেশছাড়া করে এক অ-গঙ্গার দেশে বিদেয় করে দিয়েছ, মায়া-মমতা থাকলে পারতে তা? এই তো পুণ্যি মোটে একটা বছরের ছোট আমার চেয়ে, দিব্যি ড্যাংডেঙিয়ে বেড়াচ্ছে, আর আমায় সেই কোন্ কালে পরগোত্তর করে দিয়ে—", গলাটা ঝেড়ে নিয়ে কথাটা শেষ করেছে সে, "তা না দিলে, পারতো কেউ আমার গলায় গামছা দিয়ে টেনে নে যেতে? বাবা মেয়ে বলে মায়া করেন নি, 'গৌরীদান' করে পুণ্যি করেছেন, আমারও নেই মায়া-মমতা। নির্মায়িক বাপের নির্মায়িক মেয়ে—", বলেই হঠাৎ মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে ডুকরে ডুকরে কেঁদেছে দীর্ঘসময় ধরে।

তবু শ্বশুরবাড়ি যাওয়া রদ হয় নি।

রামকালী আর রামকালীর মেয়ে দুজনেই সমান। দুজনের মতেই 'কথা' যখন দেওয়া হয়ে গেছে, তখন আর নতুন বিবেচনা চলে না।

বাপের আড়ালে আর মায়ের সামনে আলোচনার ঝড় বয়েছিল।

এবারের পালা এই।

এবারে মোটামুটি সত্যর আড়ালেই। শুধু সদু বলেছিল, "ধন্যবাদ তোমাকে বৌ, নমস্কার! ছিছিক্কার দেব, না পায়ের ধুলো নেব, ভেবে পাচ্ছি না।"

সত্য এর উত্তরে নিজেই হেঁট হয়ে সদুর পায়ের ধুলো নিয়ে হেসে বলেছিল, "দুগ্‌গা, দুগ্‌গা গুরুজন তুমি! ছিছিক্কারই দাও বরং! জন্মাবধি যা পেয়ে আসছি!"

সত্যর মধ্যে যে বিরাট সমুদ্রের আলোড়ন চলছে তা কি সত্য লোকের সামনে মেলে ধরবে? হ্যাঁ, সমুদ্রের আলোড়নই। তবু বাপ চলে যাবার পর ভেঙে পড়ে নি সে। যথারীতি তার পরই তেল সলতে নিয়ে বসেছে

পিদিম সাজাতে, তার পর ঘাটে গেছে গা ধুয়ে কাপড় কেচে মস্ত ঘড়াটা ভরে এনে দাওয়ায় বসিয়ে ভিজে কাপড়েই 'ঠাকুরঘরে' সন্ধ্যে দেখিয়ে শাঁখ বাজিয়ে তুলসীমঞ্চে জল দিয়ে শুকনো কাপড় পরে রাত্তিরের রান্নার ব্যবস্থা করতে বসেছে।

রাত্তিরের রান্নাটা সত্যই করে আজকাল। সদুকে বলে বলে এ অধিকার অর্জন করেছে সে।

শুধু রান্না করতে করতে যে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল তার, ফাল্গুনের শেষ থেকে বৈশাখের মাঝামাঝি আসতে কদিন লাগে, কিছুতেই হিসেব মেলাতে পারে নি, তার কোনো সাক্ষী নেই।

কিন্তু সত্যর জীবনে কি সেই 'বৈশাখের মাঝামাঝি'টা দেখা দিয়েছিল আনন্দের মূর্তি নিয়ে? আলো-ঝলমলে উজ্জ্বল মূর্তি নিয়ে?

নাঃ!

সে দেখা পায় নি সত্য।

পুণ্যির বিয়েতে যাওয়া হয় নি তার। ঠিক সেই সময় এলোকেশী রক্ত-আমাশায় পড়ে মরতে বসেছিলেন। আর কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকা মানুষটাই খিঁচিয়ে উঠে বলেছিল, "কী বললি সদু, বাপের বাড়ির লোকের সঙ্গে যাবে বলে নাচছে হারামজাদী? বাপ যখন সোহাগ করে নিতে এসেছিল তখন যাওয়া হল না, এখন আমি মরতে বসেছি—! বলে দিগে যা যাওয়া হবে না, যে নিতে এসেছে ধুলোপায়ে বিদেয় হোক!"

মামী মরতে বসেছে বলে যে সদু ছেড়ে কথা কইবে, তা কিন্তু করে নি। ঝঙ্কার দিয়ে বলেছিল সে, "তারা তোমার লোককে টাটের শালগেরামের মতন পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়ে বসিয়ে খাইয়ে, মাখিয়ে, আর এক পোঁটলা জিনিস দিয়ে বুক ভরিয়ে বিদেয় দিলে, আর তুমি তাদের লোককে ধুলোপায়ে বিদেয় দেবে? তা ভালো, মুখটা খুব উজ্জ্বল হবে। কিন্তু আমি বলি কি দু-দশ দিনের জন্যে পাঠিয়েই দাও। ছেলেমানুষ—তাছাড়া শুনেছি ওই পিসিই চিরকালের খেলুড়ি—"

এলোকেশী চিঁচিঁ করে বলেছিলেন, "তবে বল যেতে। তুমিই বা থাকবে কেন? তুমিও বিদেয় হও। শুধু যাবার আগে একখানা ছুরি এনে আমার গলায় বসিয়ে দিয়ে যাও।"

সত্ন ছুরি দেয় নি, নিজেও বিদেয় হয় নি, শুধু সত্যর যাওয়ার ব্যবস্থা করছিল, কিন্তু মস্ত বাদ সাধল নবকুমার।

হঠাৎ 'পুরুষকর্তার' ভূমিকা নিয়ে বেশ সোচ্চারে ঘোষণা করে বসল, "যাওয়া-টাওয়া হবে না কারুর! আমার মা মরছে, আর লোকে এখন খুড়তুতো পিসির বিয়ের ভোজ খেতে ছুটবে! বলে দাও সত্নদি, সে গুড়ে বালি! যাওয়া বন্ধ থাক।"

নবকুমারের ঘোষণায় কর্তা-গিন্নী পরম পুলকে নির্লিপ্ত সেজে বললেন, "আমরা আর কি বলব? নবা যখন—"

তবু সত্ন চেষ্টা করেছিল। বলেছিল, "সব সময় বুঝি নবার কথাতেই ওঠো বসো তোমরা?"

কিন্তু কাজ হয় নি। এলোকেশী শাপমন্যি দিয়ে ভূত ভাগিয়েছিলেন।

সত্যবতী বলেছিল, "আমি বাবাকে কথা দিয়েছিলাম বিয়েতে যাবো—"

নবকুমার সত্ন মারফৎ সে কথা শুনে জবাব দিয়েছিল, "সমাজে আমাদের মুখটা হেঁট হয় এই যদি কেউ চায় তো যাক!"

সত্ন ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ হেসে ফেলে বলেছিল, "খুব তো বিজ্ঞের মতন কথা বলছিস, আসল ব্যাপারটা কি বল্ দেখি? বৌকে তো এখনও ঘরে পাস নি, তবু এত মন-কেমন?"

সত্নর এই কথায় হঠাৎ নবকুমারের কর্তাত্বি ঘুচে গিয়েছিল। "যাঃ" বলে ঝপ্ করে সরে গিয়েছিল। বোধ করি এ কথাও ভেবেছিল, সত্নদি কি অন্তর্যামী?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যবতীই বেঁকে বসল। সত্ন যখন বহু চেষ্টায় রফা করেছিল, নেমন্তন্ন রক্ষা করতে নবকুমার যাবে সেই সঙ্গে বৌও যাবে তিনটি দিনের কড়ারে, বরকনে বিদেয় হবে ওরাও চলে আসবে, তখন সত্যবতী হঠাৎ বলে বসল, "দরকার নেই আমার এই একমুঠো ভিক্ষের! তিন দিনের মধ্যে তো পাড়া ভেসে যাক, বাড়ির সব লোকগুলোর মুখও দেখে ওঠা হবে না, সে যাওয়ায় লাভ? লোকে শুনবে সত্য এসেছিল, সত্য চলে গেছে। ছিঃ!"

"দেখ কথা! ভাত পায় না—গয়না চায়। মুষ্টিভিক্ষেই যে জুটছিল না তবু বিয়েটাও তো দেখতে পাবি?"

"থাক্ নাই দেখলাম। যার নেমন্তন্ন রক্ষের কথা সে যাক!"

"সে আর গিয়েছে!"

সহু মন্তব্য করে। এবং ঠিকই করে। নবকুমার জোড়হাতে বলে, "রক্ষে কর বাবা!"

অতএব শেষরক্ষে করেন নীলাম্বর।

তিনি রামকালীর প্রেরিত লোকের হাতে পত্র দিয়ে দেন, "নবকুমার বাবাজীবনের গর্ভধারিনী মৃত্যুশয্যায়, সে কারণ কাহারও যাওয়া সম্ভবপর হইল না, পত্রবাহকের হাতে লৌকিকতা বাবদ দুই টাকা পাঠালাম!"

রামকালী সেই পত্র পেয়ে দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে আস্তে বলেছিলেন, "ও টাকা দুটো তুই জলপানি খাস রাখ্!···আর শোন্, বাড়ির মধ্যে বলে দিগে যা সত্যর শাশুড়ী মরমর, তাই আসা সম্ভব হল না।"

তারপর যথানিয়মে বিয়ে হয়ে গেছে, বৈশাখ কেটেছে, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় সব কেটে গেছে, রামকালী তাঁর জামাতা বাবাজীবনের গর্ভধারিণীর মৃত্যু সংবাদ পান নি।

এই না পাওয়াটা কি একটা মরুভূমির রুক্ষ বাতাসের মত? যে বাতাস সমস্ত কোমলতা আর সরসতা মুছে নিতে পারে? নইলে রামকালী আস্তে আস্তে এমন নীরস কঠিন হয়ে গিয়েছেন কেন? কেন বেহাইয়ের সঙ্গে ভদ্রতারক্ষা হিসেবে বেহানের কুশল সংবাদ প্রার্থনা করেন নি? কেনই বা ভেবেছেন মেয়ে আনার জন্যে হ্যাংলামি করার মধ্যে অগৌরব আছে?

অন্তঃপুরের মধ্যে একখানি বিচ্ছেদ-ব্যাকুল মাতৃহৃদয় যে রামকালীর এই কাঠিন্যের সামনে মূক বেদনায় স্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে, সেটা বোঝবার ইচ্ছে হয় নি কেন রামকালীর?

রামকালী কি ভেবেছিলেন এবারও সেই এক ফোঁটা মেয়েটাই বাপের কাছে অহঙ্কারের পরিমাপ দেখিয়েছে? দৃঢ়তার অহংকার, কাঠিন্যের অহঙ্কার! বলতে চেয়েছে, "দেখ, আমিও কম যাই না!" তাই অভিমানাহত পিতৃহৃদয়টি এই অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে চুপ করে থেকেছে? আর ভেবেছে, "দেখা যাক!"

কিন্তু কতদিন দেখবেন রামকালী?

অসমবয়সী এই দুটো মানুষের দাবা খেলার চালের অবসরে কত ব্যাপারই

ঘটে গেল। যে ব্যাপারের একটা ঘটলেও মেয়ে বাপের বাড়ি ছুটে আসতে পারে। কিন্তু বলা তো চাই? মেয়ের বাপ গলায় বস্তর দিয়ে আবার আর্জি পেশ করবে তবে তো?

তা করছেন না রামকালী।

অতএব আরো একবার বর্ষা শরৎ শীত বসন্ত পার হয়ে গেল নিজস্ব নিয়মে।

চব্বিশ

নীলাম্বর বাঁড়ুয্যে নিত্যনিয়মে সন্ধ্যা-গায়ত্রী আহ্নিকপূজো ইত্যাদি সেরে গৃহদেবতা নারায়ণশিলার প্রসাদী বাতাসা দুখানি মুখে দিয়ে জল খেয়ে হাঁক দিলেন, "সদু, আজ আর আমার জলখাবার গোছাস নে, শরীরটা তেমন ভাল নেই।"

সদু দুটি চালভাজায় তেল-নুন মাখছিল মামার জন্যে। ঘরে ক্ষীরের তক্তি আছে, আছে নারকেল কোরা, ওতেই হবে। আজকাল আর রাত্রে বেশী কিছু খান না নীলাম্বর।

মামার কথায় বেরিয়ে এসে বলে সদু, "কেন, শরীরে আবার তোমার কি হল মামা?"

"কি জানি কেমন খিদে নেই।"

বলে যথারীতি বেনিয়ানটি গায়ে এঁটে আলোয়ান কাঁধে ফেলে নিত্যনিয়মিত রাত-চরতে বেরিয়ে যান নীলাম্বর।

সত্যবতী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলে, "শরীর খারাপ যদি, ঠাকুর আবার এই শীতের রাত্তিরে বেরোলেন কেন ঠাকুরঝি?"

সদু হাসি চেপে বলে, "কেন বেরোলেন, তুই নিজে জিজ্ঞেস করলেই পারতিস বৌ!"

"শোনো কথা, আমি কথা কই?"

"ও তা বটে!"

বলে সদু মুখ টিপে হাসে।

সত্য হঠাৎ সদুর হাত চেপে ধরে সন্দিগ্ধ স্বরে বলে, "আচ্ছা ঠাকুরঝি, ঠাকুর বেড়াতে বেরোলেই তুমি অমন হাস কেন বল তো? কোথায় যান?"

সদু অমায়িক মুখে বলে, "ওমা হাসি আবার কখন! যান বোধ হয় দাবা-পাশার আড্ডায়।"

"তা শরীর খারাপ হলেও যেতে হবে? ঝড়বৃষ্টি বজ্রাঘাত কোনমতেই কামাই চলবে না? বারণ করতে পার না তোমরা?"

"বারণ? ও বাবা! ও আকর্ষণ যমের আকর্ষণের বাড়া!" বলে আর একবার হাসি চাপে সদু।

"আমি ঠাকুরের সঙ্গে কথা কইলে ঠাকুরের ওই মারাত্মক নেশা ছাড়িয়ে দিতাম।"

"তা সেই চেষ্টাই নয় করিস! নিজে বলতে না পারিস বরকে দিয়ে বলাস। সে উপযুক্ত ছেলে—বাপের এই বদনেশা যদি ছাড়াতে পারে!"

সদু এবার হাসি চাপে না, হাসে।

কথাটা যে সত্যর মনে লাগল তা নয়, বরং সদুর কথার মধ্যে সে একটা প্রচ্ছন্ন কৌতুকের আভাস পেল। তার শ্বশুরের এই আড্ডার আকর্ষণটা যে ঠিক দাবা-পাশার আড্ডা নয়, এই সন্দেহই বদ্ধমূল হল।

রাত্রে তাই ঘরে ঢুকেই প্রথম ওই কথাটাই পাড়ে সত্য, "আচ্ছা, রোজ রাত্তিরে ঠাকুর কোথায় যান বল তো?"

হ্যাঁ, কিছুদিন হল রাত্রির অধিকার পেয়েছে সত্য। সদুরই প্রচেষ্টায়—আর সদুর প্রচেষ্টাটা নবকুমারের প্রতি করুণাতেই। নইলে বৌ তো কিছুতেই হেলে দোলে না।

নববধূর স্বপ্নে বিভোর নবকুমার অবশ্যই এ হেন প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাই থতমত খেয়ে বলে, "কোথায় আবার! তুমি জান না?"

"জানলে তোমায় শুধোতাম না।"

নবকুমার গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, "বাপ গুরুজন, তাঁর কথা নিয়ে আলোচনা না করাই ভাল।"

সত্য ভুরু কুঁচকে বলে, "গুরুজনের নিন্দে করাই না হয় ভাল নয়, গুরু-জনের কথা মাত্তরই কওয়া দোষ?"

নবকুমার গম্ভীরতর হয়ে বলে, "তা এ তো নিন্দেরই কথা। বামুনের

ছেলে হয়ে বাগদীপাড়ায় যাওয়া, তাদের হাতের পান-জল খাওয়া, এসব কি আর খুব গুণের কথা?"

বাগদীপাড়ায় যাওয়া!

তাদের হাতে পান-জল খাওয়া!

সত্যকে যেন তার স্বামী হঠাৎ ধরে ধোবার পাটে আছাড় মারল।

সত্যও তাই থতমত খায়।

বলে, "ও কথার মানে?"

সত্যর বয়সের দিকে তাকায় না নবকুমার, বৌ সকল জ্ঞানের আধার হবে, এইটাই ধারণা তার। তাই উদাস গলায় বলে, "মানে যদি না বোঝ তো নাচার। বাপের সম্পর্কে পষ্ট করে আর কী বলব? কথায় বলে—পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম—! নইলে পথেঘাটে যখন উল্লাসী বাগদিনীকে দেখি, তখন কি আর রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে যায় না? কিন্তু কী করব, মনকে প্রবোধ দিতেই হয়, ভাবতে হয় যতই হোক মাতৃতুল্য।"

পূজনীয় পিতৃদেব সম্পর্কে "কিছু বলব না" বলেও সবটুকুই বলে ফেলে নবকুমার নিশ্চিন্ত হয়ে স্ত্রীকে সমাদর করে কাছে টানতে যায়।

কিন্তু এ কী!

নিত্যকার প্রফুল্ল-প্রতিমা সহসা প্রস্তর-প্রতিমায় পরিণত হল কেন? সত্যিই সত্যর সর্বশরীর যেন পাথরের মতই কঠিন হয়ে উঠেছে।

আর সেই শরীরের মধ্যেকার মনটা?

সেই মনটাও কি কাঠ হয়ে উঠল? অজানিত একটা ভয়ে?

হ্যাঁ, ভয়ই!

অনেক অনেকদিন আগে বালিকা সত্যর নিঃশঙ্ক চিত্ত যেমন ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল কাটোয়ার বৌ শঙ্করীর সম্পর্কে এক অজানা অন্ধকার-লোকের বার্তা শুনে, তেমনি ভয়ে। কিন্তু সেদিন ছিল শুধুই অন্ধকার, শুধুই ভয়। কিন্তু আজ সেই অন্ধকারের মাঝখানে জ্বলে উঠেছে একটা তীব্র বিদ্যুৎশিখার চোখ-ধাঁধানো আলো।

আজকের সত্য সেদিনের অবোধ বালিকা নয়, সংসার-তত্ত্বের অনেক কিছুই তার জানা হয়ে গেছে। তাই ভয়ের গাঢ় অন্ধকারের মাঝখানে দপদপ করে জ্বলে উঠছে ঘৃণার বিদ্যুৎশিখা।

বার দুই চেষ্টার পর নবকুমার হতাশ হয়ে বলে, "হলটা কি তোমার?

সারাদিনের পর ছুটো, সুখ-দুঃখের কথা কইব, একটু হাসি-আনন্দ দেখব এই আশায় হাঁ করে থাকি—"

সত্য রুদ্ধস্বরে বলে, "হাসি-আনন্দ তো কুমোরবাড়ির হাঁড়ি-কলসী নয় যে, ফরমাশ দিলেই পাওয়া যায়, হাসি-আনন্দের মতন মন না থাকলে?"

নির্বোধ নবকুমার পরিহাসের ব্যর্থ চেষ্টায় বলে, "তা এতে আর তোমার এত মন খারাপের কী আছে? আমি তো আর কোনও বাগদিনীর সঙ্গে ভালবালা—"

"থামো থামো—", তীব্র ধিক্কারের স্বর ছড়িয়ে পড়ে বন্ধ ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে।

শীতের রাতের সুবিধেয় একটু বা গলা খুলে কথা কওয়া চলে। আর সত্যি কথা বলতে, সত্য এমন কিছু লজ্জাবতী বৌও নয়। গলার শব্দ তার যখন তখন শুনতে পাওয়া যায়।

ধিক্কার দিয়ে সত্য গায়ের কাঁথাটা টেনে গলা পর্যন্ত ঢেকে ওদিকে মুখ করে শুয়ে বলে, "ওই ঘেন্নার কথা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে লজ্জা হয় না তোমাদের? আমি কিন্তু এই পষ্ট বলে দিচ্ছি, এর পর থেকে যদি ঠাকুরকে আমি ছেদ্দাভক্তি না করতে পারি দুষো না আমায়।"

এর পর নবকুমার কথা কইবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে মনে মনে নিজেকে গালাগাল দিতে থাকে! ছি ছি, কী একটা গাধা সে! বললেই হত, "বাবা কোথায় যায় আমি জানি না।" বৌকে তো সে চেনে। ভাল মেজাজে আছে তো গঙ্গাজল, মেজাজ বিগড়ে গেল তো আগুনের খাপরা।

বাবা, কী যে একবগগা মেয়ে! কবে একদিন সে-ই নবকুমারের কী একটা মিথ্যে কথা ধরে ফেলে! একেবারে পাঁচদিন কথা বন্ধ। অবশেষে নবকুমার নিতাইয়ের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে একটা শাস্তরের শ্লোক আউড়ে বোঝায়, পরিবারের সঙ্গে মিথ্যে কথায় পাপ নেই, তবে বৌয়ের মুখের কুলুপ খোলে। অবিশ্যি শাস্ত্রবাক্য মেনে নিয়ে নয়, মুখ খোলে প্রতিবাদের মুখরতায়।

সেদিন তেজের সঙ্গে বলেছিল সত্য, "থাক থাক, আর শাস্তর আওড়াতে হবে না। যে শাস্তরে বলে মিথ্যে কথায় পাপ নেই, সে শাস্তরে আমার অরুচি। পরিবার বুঝি একটা মানুষ নয়, ভগবান বাস করে না তার মধ্যে? এর পর আর তোমার কোন কথা মন-প্রাণ দিয়ে বিশ্বেস করব আমি?"

সে যাই হোক, তবু ঝগড়ার সূত্রেও কথার দরজা খুলেছিল। এবার আবার কি না জানি হয়।

আর সত্য ?

সে ভাবছিল, ছি ছি, এই চরিত্র তার শ্বশুরের! যাকে 'ঠাকুর' বলে সম্বোধন করতে হয় তাকে! চরিত্রের অন্য বহুবিধ ত্রুটি সে দেখেছে শ্বশুরের, নীচতা ক্ষুদ্রতা স্বার্থপরতায় গিন্নী এলোকেশীর থেকে কিছু কম যান না তিনি, এযাবৎ সে সবই মনে মনে মেনে নিয়েছে সত্য, আর ভেবেছে ত্রিসংসারে আমার বাবার মতন আর কজন হবে ?

কিন্তু এ কী !

এ যে ঘৃণায় লজ্জায় সমস্ত রক্তকণা ছি ছি করে উঠছে। এই বয়সে এই প্রবৃত্তি! আর সব চেয়ে আশ্চর্য কথা, এরা সে কথা সবাই জানে! অথচ, সত্য নির্বোধ সত্য ন্যাকা, তাই এতদিন দেখেও শ্বশুরের এই রাত-চরার অর্থ কোনদিন আবিষ্কার করার চেষ্টা করে নি! সত্যরা ঘুমিয়ে পড়ার অনেক পরে যে তিনি বাড়ি ফেরেন এ কথা তো বরাবরই দেখেছে। তার মানে বোঝে নি ? না না, এ শ্বশুরকে সে ভক্তি-ছেচ্ছা করতে পারবে না, তাতে সত্যকে যে যাই বলুক।

হঠাৎ সত্যর সর্বশরীর আলোড়ন করে প্রবল একটা কান্নার উচ্ছ্বাস আসে, আর এই দীর্ঘকাল পরে বাপের ওপর তীব্র অভিমানে হৃদয় বিদীর্ণ হতে থাকে তার।

এ সংসারে এসে অনেক নীচতা অনেক ক্ষুদ্রতা অনেক হৃদয়হীনতা দেখেছে সত্য, সবই এদের অশিক্ষা কুশিক্ষার ফল বলে সহ্য করে নিয়েছে, কিন্তু আজকে এই একটা বুড়ো লোকের চরিত্রহীনতার নোংরামি তাকে যেন আছড়ে আছড়ে মারছে।

তাই, যে সত্য শত উৎপীড়নেও কখনো কাঁদে না, সে আজ কেঁদে বালিশ ভিজিয়ে বলতে থাকে, "বাবা বাবাগো, দশটা নয় পাঁচটা নয়, একটা মাত্তর মেয়ে আমি তোমার, না দেখেশুনে এমন ঘরেও দিয়েছিলে! এত তুমি বিচক্ষণ, আর এই তোমার বিচার!"

অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে সত্য।

কিন্তু রাতে কম ঘুমিয়েছে বলে সকালে বেলা পর্যন্ত ঘুমোবে, এত সুখ

তো আর বৌ-মানুষের ভাগ্যে ঘটে না। যথারীতি ভোরে উঠে স্নানশুদ্ধ হয়ে নারায়ণের ঘরের গোছ করতে ঢুকল সত্য ভারাক্রান্ত মনে, আর অভ্যাসমত চন্দন-পাটাখানা টেনে নিয়ে চন্দন ঘষতে গিয়েই কথাটা একটা বিদ্যুৎ-শিহরণ এনে দিল ওর মধ্যে।

সত্যর এই যত্ন করে চন্দন ঘষা, ফুল তুলসী বাছা, ধূপ-ধুনোয় ঘর ভর্তি করে তোলার মূল্য কি?

এসব উপকরণ নিয়ে পূজো করবেন তো এখন নীলাম্বর বাঁড়ুয্যে! তাঁর আবার কাশির ধাত বলে প্রাতঃস্নান করেন না, মুখ-হাত ধুয়ে তসর ধুতিখানা জড়িয়ে এসে পূজোর আসনে বসেন।

কিন্তু স্নান করলেই বা কি?

দেহ মন আত্মা সবই যার অশুচি, স্নানে আর কী শুদ্ধ হবে সে?

হাত গুটিয়ে চুপ করে বসে থাকে সত্য হাঁটুতে মুখ রেখে। ফুল তোলা হয় না, তুলসী চয়ন হয় না।

অনেকক্ষণ পরে সৌদামিনী কি কাজে এদিকে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, "কী হল বৌ, অমন করে বসে যে?"

সত্য অবশ্য নির্বাক।

সদু ব্যগ্রভাবে দরজার চৌকাঠ অবধি এগিয়ে এসে বলে, "শরীর খারাপ করছে?"

সত্য মাথা নাড়ে।

"তবে? বাপের বাড়ির জন্যে মন উতলা হচ্ছে বুঝি? সত্যি, কতকাল হয়ে গেল—"

সত্য হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে, "বাপের বাড়ির জন্যে মন উতলা হতে কখনও দেখেছ ঠাকুরঝি, তাই বলছ?" সদু তার বড় ননদ, তবু এটুকু প্রশ্রয় তার কাছে আছে।

সদু হেসে ফেলে বলে, "তা দেখি নি বটে, তা হলে বরের সঙ্গে কোঁদল?"

"বকো না ঠাকুরঝি, অত তুচ্ছ ব্যাপারে তোমাদের বৌ হারে না। আমার মন ভাল নেই, আজ থেকে পূজোর ঘরের কাজ আর আমি করব না।"

সদু হঠাৎ এই অভাবিত ঘোষণায় স্তম্ভিত হয়ে বলে, "সে কী কথা বৌ?"

"ওই কথা ঠাকুরঝি। গুরুজনের কথায় বলতে কিছু চাই নে, কিন্তু ঠাকুর এসে পূজোর আসনে বসবেন মনে করে পূজোর গোছ করবার প্রিবৃত্তি আমার হরে যাচ্ছে।"

সদু ভয়ের চোটে নিজের মুখখানাতেই একবার হাত চাপা দিয়ে আস্তে-ব্যস্তে বলে, "ও কি সব্বনেশে কথা বৌ, মামীর কানে গেলে আস্ত থাকবি?"

সত্য মুখটা ফিরিয়ে শুকনো গলায় বলে, "এ সংসারে আর আস্ত থাকবার বাসনা আমার নেই ঠাকুরঝি!"

সদু প্রমাদ গণে।

এ আবার কী কথা রে বাবা! এর মূল কারণ যে সত্যর কালকের সেই শ্বশুর-সম্পর্কিত প্রশ্ন, তাতে আর সন্দেহ নেই, বোধ করি প্রশ্নের উত্তর তার জানা হয়ে গেছে। কিন্তু তার সঙ্গে এই রণমূর্তির সঠিক সম্বন্ধ অনুমান করতে পারে না সদু।

পারবার কথাও নয়।

সদুর অনেক বয়স হয়েছে, এসব ব্যাপার তার কাছে কিছুই নয়। আশে-পাশে অহরহ দেখতে দেখতে হাড়মাস কালি। কাজেই নিজের স্বামী-পুত্র ব্যতীত আর কারো চরিত্রহীনতায় যে এত বিচলিত হওয়া সম্ভব, এ সদুর বোধের বাইরে।

কিন্তু অন্য বিষয়ে সদু বুদ্ধিমতী, তাই এ কথা নিয়ে বেশী বাজাবাজি না করে বলে, "আচ্ছা বেশ, আমি চট্ করে চানটা সেরে এসে দিচ্ছি গুছিয়ে, তুমি চলে এস।"

"রাগ করো না ঠাকুরঝি, আমার মন কিছুতেই নিচ্ছে না তাই। তোমার কি কি কাজ আছে দেখিয়ে দাও, আমি করছি।" বলে সত্যিই পূজোর ঘর থেকে বেরিয়ে আসে সত্য।

কিন্তু পূজোর ঘরের তুলসী-চন্দনের দায় না হয় সদু সামলালো, বধূজনোচিত আরও যে একটা কাজ রয়েছে সকালবেলাকার।

সে দায় কে সামলাবে?

সকালবেলা জল মুখে দেবার আগে শ্বশুর-শাশুড়ীর পদবন্দনা, সত্যর নিত্যকর্ম পদ্ধতির একটি অঙ্গ। এলোকেশীই শিখিয়েছেন সদু মারফত।

সত্যও অবশ্য সে শিক্ষা মেনেই চলেছে এযাবৎ।

কিন্তু আজ সত্যর ভয়ানক এক দুঃসাহসিক সংকল্প। 'আস্ত' তাকে না

থাকতে হয় তাও ভাল, তবু ওই অপবিত্র মানুষটার পায়ের ধুলো মাথায় নেবে না সে।

গুরুজন ?

তা আর কি করা যাবে ? গুরুজন যদি ইতরজনের মত আচরণ করে ?

এলোকেশীও নিত্য সকালবেলা স্নান সেরে এসেই পূজোর ঘরে ঢোকেন সাংসারিক কাজের তো কোন দায় নেই। সদু আছে বৌ আছে। আর এলোকেশীর আছে দেব-দ্বিজে পরমা ভক্তি। নীলাম্বরও সারা সকাল ওইখানেই থাকেন, চণ্ডীর পুঁথি পড়েন, মহিম্নস্তব আওড়ান।

কর্তাগিন্নীর যাবতীয় বিশ্রম্ভালাপ এইখানেই। কারণ সে আলাপের যেটা প্রধান সময় সে সময়টা তো এলোকেশীর হাতের বাইরে। মশারি-বক্তৃতার উপায় কোথা ?

তা এইখানেই রোজ একত্রে দুজনকে প্রণাম করে যায় সত্য।

কিন্তু আজ আর সত্যর দেখা নেই।

এলোকেশী কিছুক্ষণ পরে সদুকে ডেকে বিরক্তি-ব্যঞ্জক স্বরে বলেন, "আজ আর নবাব-নন্দিনীর দেখা নেই যে ! গেলেন কোথা ?"

ব্যাপার বুঝতে সদুর দেরি হয় না। এবং বৌয়ের এই বেখাপ্পা গোঁয়ে একটু বিরক্তই হয় সে, তবু সামলে নিয়ে বলে, "যাবে আর কোথায় ? ওই তো ওই দিকে—"

বলে কল্পিত 'ওদিকে'র দিকে তাকায় সদু।

এলোকেশী বলেন, "ছেদ্দায় অছেদ্দায় দৈনিক একবার শ্বশুর-শাশুড়ীর পায়ে মাথাটা নোয়ানো, আজ থেকে বুঝি সে বরাদ্দ বন্ধ ?"

নীলাম্বর মহিম্নস্তবের মাঝখানে উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন। ততক্ষণে সদু হাওয়া। ওখানে গিয়ে ত্রস্তেব্যস্তে বলে, "কী রে বৌ, এখনো পেন্নামটা ঠুকে আসিস নি বুঝি ?"

সত্য হাতের কাজ সেরে উদাস মুখে বসে ছিল। ঘাড় না ফিরিয়েই বলে, "না।"

"শাশুড়ীর টনক নড়েছে। যা যা, চট্ করে সেরে আয়।"

যেন ভুলে গেছে সত্য, তাই মনে পড়িয়ে দেওয়া !

সত্য গম্ভীরভাবে বলে, "দুজনে একত্রে বসে, একজনকে প্রেণাম

করলাম, একজনকে করলাম না, ভাল দেখায় না। ঠাকুরুন এদিকে আসুন, তখন হবে।"

সদু এবার বিরক্তি গোপন করে না। বলে, "তোর আবার বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি বৌ? স্বভাব-দোষ আর কটা বেটাছেলের নেই? তালুই মশাইয়ের মতন দেবচরিত্র কি আর সবাই? তা বলে স্বভাব-দোষের অপরাধে শ্বশুরের পাওনা পেন্নামটা রদ হয়ে যাবে?"

"বাবার কথা তুলে কাজ নেই ঠাকুরঝি, তবে আমার যাতে মন নেয় না, সে কাজ আমি করতে পারি না। এক হিসেবে উনি তো পতিত! শালগেরামের পুজো ওঁর দ্বারা হওয়াই উচিত নয়।" বলে সত্য জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে থাকে। বোধ করি মানসিক উত্তেজনাতেই।

সদুর কিছুক্ষণ আর বাক্‌শক্তি থাকে না।

খানিক 'থ' বনে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলে, "তোর মত লেখাপড়া শিখি নি বৌ, এত কথা বোঝবার ক্ষমতা নেই। আমি সার বুঝি, যে যা করে করুক, আমার কর্তব্য আমি করে যাব।"

"মনে অভক্তি পুষে ভক্তি দেখানোটাই কি কর্তব্য ঠাকুরঝি?"

সদু চট্ করে এ কথার উত্তর দিতে পারে না, কি যেন একটা বলতে যায়, কিন্তু ইত্যবসরে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন বাঘিনী। মনের মধ্যে তাঁর সন্দেহের ধোঁয়া। যেন বুঝেছেন একটা কিছু হয়েছে।

বাঘিনীর মতই হাঁক করে রঙ্গস্থলে পড়েন তিনি, "কোত্যব্য অকোত্যব্যর কথা কি হচ্ছে রে সদু?"

সদু চুপ।

সত্যও চুপ।

এলোকেশীই ফের প্রশ্ন করেন, "মুখে কথা নেই কেন? কী শলা-পরামর্শ হচ্ছিল দুজনে শুনি? তুই সদু আমার খাবি পরবি আর আমারই বৌ ভাঙাবি? কবে বিদেয় হবি তুই আমার সংসার থেকে?"

কথাটা নতুন নয়, এটাই এলোকেশীর কথার মাত্রা। প্রতিবাদ সদু কোনদিনই করে না, কিন্তু আজ হঠাৎ বিচলিত স্বরে বলে ওঠে, "শলা-পরামর্শ আমি তোমার বৌকে কোন দিন দিই নে মামী, সৎ পরামর্শই দিই। সত্যি-মিথ্যে বৌই বলুক।"

বৌয়ের অবশ্য শাশুড়ীর সামনে কথা বলবার কথা নয়। কিন্তু সত্য যখন

তখনই নিয়মলঙ্ঘন করে বসে, তাই আজও ফস করে বলে, "সে কথা হাজারবার সত্যি। ঠাকুরঝি আমাকে সৎ পরামর্শই দিতে এসেছেল। কিন্তু সে পরামর্শ আমার মনে 'নেয্য' বলে না ধরলে? তুমি ইদিকে এসেছ ভালই হয়েছে"—বলে সত্য মুহূর্তে হাত বাড়িয়ে শাশুড়ীর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলে, "যতই যা হোক, তুমি সতীলক্ষ্মী।"

সতীলক্ষ্মী অবশ্য প্রথমটা বেশ কিছু হকচকিয়ে যান, তারপর বলেন, "এ সবের মানে কি সদি?"

"মানে বুঝতে আমিও অপারগ মামী," সদু বেজার মুখ বলে চলে যায়, "বৌ পারে তো নিজে বুঝিয়ে বলুক!"

সত্যিই আজ তার ভারী রাগ হয়েছে। এ আবার কী রে বাবা! তিলকে তাল করা! ডেকে অশান্তি টেনে আনা! বিশ্বভুবনে যে কথা কেউ কখনো শোনে নি, বলে নি, ভাবে নি, সেই কথা ওই একফোঁট্টা মেয়ের মাথায় আসেই বা কী করে! আর বুকের পাটা? এযাবৎ সত্যর অনেক বুকের পাটা দেখেছে সদু, দেখে মূর্ছিত হব হব হয়েছে, কিন্তু আজকের সঙ্গে যেন কোন দিনের তুলনাই হয় না।

তা সত্যিই তুলনা হয় না।

কারণ সদু চলে যেতে যেতেও শুনতে পায় সত্য বলছে, "বলতে মাথা কাটা গেলেও না বলে পারছি নে, ঠাকুরের পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকাবার প্রিবৃত্তি আর আমার নেই। যতদিন না জানতাম, ততদিন—"

কথার শেষাংশ শোনবার ক্ষমতা আর হয় না সদুর। ঝপ করে বিনা প্রয়োজনে একটা ঘড়া নিয়ে ঘাটে চলে যায়।

অনেকক্ষণ পরে ঘড়া কাঁখে নিয়ে আস্তে আস্তে খিড়কির দরজায় দাঁড়ায়। না, কোন শব্দ নেই, সব যেন নিথর। তবে কি একটা হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে? এটা শ্মশানের নিস্তব্ধতা?

দাওয়ায় উঠে কিন্তু অবাক হয়ে গেল সদু। দেখে মাঝের ঘরের দরজার কাছে গোটা দুই তিন গামছাবাঁধা পুঁটলি, আর মামা-মামী দুজনে মিলে একখানা ছেঁড়া কাপড়ে বড় একটা ধামা বাঁধছেন। ধামা অবশ্য বোঝাই। কি আছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এটা অপ্রত্যাশিত। সদুর বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।

এই সময়টুকুর মধ্যে এত গোছগাছ হয়ে গেল? আর কেনই বা হল?

এঁরা কি তা হলে বৌয়ের সঙ্গে পেরে না উঠে দেশত্যাগী হচ্ছেন?

কথাটা তাই। এ আর এক অভিনব রূপ এলোকেশীর।

সত্যর সঙ্গে চোখোচোখি হতেই এলোকেশী বলেন, "ননদ-ভাজে পুণ্যির সংসার কর্ সত্য, পাপী-তাপীরা বিদেয় হয়ে যাচ্ছে।"

সত্য ঘড়া নামিয়ে বসে পড়ে বলে, "মামী তুমি কি ক্ষেপেছ?"

"তা ক্ষেপলে জগৎ তুষতে পারবে না সত্য! দশে-ধর্মে সবাইকে শুধিয়ে এস, এতেও যদি মানুষ না ক্ষ্যাপে তো কিসে ক্ষ্যাপে!"

"ও তো একটা পাগল! ওর কথা আবার ধর্তব্য!" গলা নামিয়ে বলে সত্য।

"পাগল! আঝাড়া কেউটে! তুই আর বৌয়ের হয়ে ওকালতি করতে আসিস নি সদি! এত বড় একটা মান্যিমান মানুষ, পুতবৌয়ের ধিক্কারে জীবনে বিসর্জন দিতে যাচ্ছিল। অনেক বুঝিয়ে নিবিত্তি করে, যাচ্ছি এখন গুরুপাটে। তার পর যা আছে অদৃষ্টে!"

জোরে জোরে গাঁঠরি বাঁধতে থাকেন এলোকেশী।

সত্যর ইচ্ছে করছিল যে ছুটে গিয়ে বৌকে বলে, "ভাল চাস তো পায়ে ধরে মাপ চাই গে যা।" কিন্তু জানে সে কথা বলা বৃথা। স্বয়ং বৈকুণ্ঠের নারায়ণ এলেও সত্যকে স্বমতে আনতে পারবেন না। অনেক গুণ আছে বৌয়ের, কিন্তু ওই এক মহৎ দোষ। জেদ! মেয়েমানুষের এত জেদ? আজকের ব্যাপারটাকে সত্য যেন কোন দিক থেকেই সমর্থন করতে পারছে না।

তাই চেষ্টা সে এদিক থেকেই করে।

"তা বাড়ি ছেড়ে তোমরা যাবে কেন শুনি? বাড়ি কি তোমার ছেলে-বৌয়ের?"

"না হোক, যেখানে ওর মুখ দেখতে হবে সেখানে থাকব না, ব্যস।" এতক্ষণে মুখ খোলেন নীলাম্বর, এ কথাটি বলেন তিনিই।

"তা বাড়ি থেকে তো অমনিমুখে যাওয়া চলবে না, ভাত-ডাল চড়িয়েছি আমি। মুখে দিতে হবে।" এ যেন আপাততঃ সমুদ্রে বালির বাঁধ।

চড়িয়েছিল সত্যিই, কিন্তু রান্নাঘরের অবস্থা সম্পর্কে এখন আর কোন জ্ঞান নেই সত্যর। কাঠ পুড়ে উনুন নিভে ঠাণ্ডা হয়ে বসে আছে নিশ্চিত।

সহসা নীলাম্বর একটা প্রবল হুঙ্কার দিয়ে মাটিতে পা ঠোকেন, "ভাত-ডাল! এ ভিটেয় আমি আর জলগ্রহণ করব ভেবেছিস তুই?"

সদুর বুকটা ধড়ফড় করে ওঠে। মামীর সঙ্গে সে অনেক কথা চালাতে পারে, কিন্তু মামা? উল্লাসীর হাতে পান-জল খাওয়া ইত্যাদি করে বহু ইতিহাসই তো তার জানা। তবু তো কই ভয় মরে নি। আর ওই বৌ, কোথায় পেল সেই ভয়-জয়ের মন্ত্র? যে মন্ত্রের জোরে স্বচ্ছন্দে বলা যায় 'উনি তো পতিত, শালগ্রামের পুজো করা ওঁর উচিত নয়?"

বেশী গভীরে ভাববার ক্ষমতা থাকে না সদুর, শুধু ভাবতে থাকে, নবাটা আবার আজকেই হাটে দেরি করছে। আর এই ভয়ানক দুর্দিনে কি হাটবারও হতে হয়?

সদু কি করবে?

গিয়ে বৌয়ের পায়ে ধরবে? নাকি রান্নাঘরে শেকল তুলে দিয়ে কোথাও আঁচল বিছিয়ে শুয়ে থাকবে? তারই বা এত ভয় পাবার কী আছে? তার দোষে তো আর নবকুমারের মা-বাপ দেশত্যাগী হচ্ছে না?

সাহস দেখে কি সাহস জন্মায়?

দুঃসাহস দেখে দুঃসাহস?

তাই সে হঠাৎ অন্যমূর্তি ধরে। "ঠিক আছে, চুলোয় জল ঢেলে দিই গে" বলে চলে যায়।

আশ্চর্য, আশ্চর্য!

গিয়ে দেখে সত্য কিনা রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে শাক বাছছে! মুখ দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না!

সদুর আর সহ্য হয় না। সে বলে ওঠে, "ও পিণ্ডির কাজ করে আর কী হবে? গিলবে কে? বাড়ির কর্তা-গিন্নী তো সংসার ত্যাগ করছে।"

সদুকে অবাক করে দিয়ে সত্য বলে, "সংসার ত্যাগ করা অত সোজা নয় ঠাকুরঝি! সংসার ত্যাগ করতে বসে কেউ সমস্ত সংসারটাকে পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে যেতে চায় না। মিছে ভাবছ। কেউ কোথাও যাবে না। উনুনে আমি কাঠ ঠেলে দিয়েছি, তুমি দেখ এইবার।"

তা সত্যর কথাই ঠিক।

শেষ পর্যন্ত কর্তা-গিন্নী দেশত্যাগের সংকল্প বর্জন করে থেকেই গেলেন। শুধু ভাত খাবার সময় একটু বেশী সাধ্য-সাধনা করতে হল সদুকে।

থেকে গেলেন অবশ্য তাঁরা নবকুমারের নির্বেদে। নবকুমার দুজনের পায়ে মাথা খুঁড়ে "রক্তগঙ্গা" হতে চাইল, আর মায়ের পা ছুঁয়ে শপথ করল বৌকে শাসন করে দেবে।

ছেলের এতটা কাতরতা সহ্য করতে না পেরেই বোধ করি ওঁরা এ যাত্রায় যাত্রা স্থগিত রাখলেন।

আর এই এতদিনের মধ্যে কখনো যা করে নি নবু, আজ তাই করে বসল। দিনের বেলায় কথা কয়ে বসল বৌয়ের সঙ্গে।

কিন্তু বৌকে কি বাগ মানাতে পেরেছিল নবু? বকে, খোশামোদ করে, পায়ে পড়তে গিয়ে? না, এ কথা সত্যর মুখ দিয়ে বার করাতে পারে নি নবকুমার, "আমার অন্যায় হয়েছে।" শুধু শেষ পর্যন্ত যখন নব আত্মঘাতী হবার ভয় দেখিয়েছিল, তখন সত্য বলে উঠেছিল, "ঘেন্না ধরে যাচ্ছে সবেতেই। পুরুষ না হয়ে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাও নি কেন তুমি, এই বিধেতার রহস্য। বেশ, ছেদ্দাশূন্য পেন্নামে যদি তোমাদের এত দরকার থাকে তো, করব কাল থেকে সেই ন্যাকরা।"

রাত্রে অবশ্য নবকুমারের ভিন্ন রূপ।

সুন্দরী তরুণী স্ত্রীর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধের দুঃসহ কষ্ট বহন করবার মত শক্তি তার নেই, তাই যেচে বলে, "মা-বাপকে শুনিয়ে শুনিয়ে একটু শাসন করতে হল, নইলে বলবে, 'ছেলে বৌকে মাথায় তুলে রেখেছে'।"

"আজ আমার কথা কইতে মন নেই, ক্ষ্যামা দাও।"

বলে পাশ ফিরে শুয়েছিল সত্য।

আর বেশ কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বলেছিল, "আমি কলকাতায় যাব।"

নবকুমার চমকে বলে, "কলকাতায়! কলকাতায় যাবে তুমি? এতক্ষণে বুঝতে পারছি মাথাটাই বিগড়েছে তোমার!"

"কেন, মাথা না বিগড়োলে কলকাতায় যায় না কেউ? তোমার মাস্টারের মাথা খারাপ?"

"মাস্টার? মাস্টারের সঙ্গে তোমার তুলনা? তিনি বেটাছেলে, একা

যাচ্ছেন একা আসছেন, গিয়ে বন্ধুর বাসায় উঠছেন, তুমি এসবের কোন্‌টা করবে?"

সত্য তীব্রস্বরে বলে, "বেটাছেলে আমি নয়, তুমি তো? তুমি যেতে পারবে না? তোমার সঙ্গেই যাব। বাসা করে থাকবো।"

নবকুমার স্তম্ভিত হয়ে বলে, "তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমি তো উন্মাদ হই নি! মা-বাপ দেশ-ভিটে ছেড়ে, যাব কিনা কলকাতায় বাসা করতে? কেন শুনি?"

"কেন তা শুনবে? দেখতে যাবে তোমাদের এই বারুইপুরের বাইরেও আরও জগৎ আছে!"

"দেখে আমার দরকার?"

সত্য চরম ধিক্কারের স্বরে বলে, "দরকার? কী দরকার, তাও তোমাদের এই বারুইপুরের গর্তয় পড়ে থেকে বোঝার ক্ষ্যামতা হবে না।"

নবকুমার এ কথার অর্থ ধরতে পারে না, একটা জোরালো যুক্তিই জোর দিয়ে বলে, "মেয়েমানুষ কলকাতায় যাবে? জাতধর্ম কিছু আর থাকবে তা হলে?"

সত্য গম্ভীর স্বরে বলে, "ঠাকুরের যদি এখনো জাত থেকে থাকে, শালগেরাম নাড়ার অধিকার থেকে থাকে তো, আমারও কলকাতায় গিয়ে জাতের হানি হবে না।"

"আবার সেই এক কথা, পুরুষের আড়াই পা বাড়ালেই শুদ্ধ, মেয়েমানুষের তাই হবে? চামড়া দেওয়া কলের জল খেতে হবে তা জান?"

"খেতে হলে খাব। সেখানের আরও দশজন ব্রাহ্মণ-সজ্জনের যা গতি হচ্ছে তাই হবে। কেন, হালদার বাড়ির মেজ ছেলে যায় নি কলকাতায়?"

"বৌ নিয়ে যায় নি।"

"তা মরা বৌকে কি আর শ্মশান থেকে তুলে নিয়ে যাবে?"

"হালদারদের ছেলে গেছে চাকরি করতে—"

সত্য দৃঢ়ভাবে বলে, "তুমিও তাই যাবে।"

"আমি?" উপহাসের হাসি হেসে ওঠে নবকুমার, "আমি যাব কলকাতায় চাকরি করতে?"

"কেন নয়? তুমি যত ইংরিজি শিখেছ, এ তল্লাটে আর কেউ শিখেছে?"

অন্যদিন হলে নবু অবশ্যই স্ত্রীর এই স্বীকৃতিতে বিগলিত হত, কিন্তু আজ তার প্রাণে সে সুখ নেই, নেই সে সুর। তাই বলে, "শুধু বিদ্যে থাকলেই তো হবে না—"

সত্য জোড়া ভুরু কুঁচকে বলে, "তা আর কি থাকা দরকার?"

বিপদের মুখে ফস্ করে সত্যি কথাই বলে বসে নবু, "দরকার সাহসের।"

সত্য এক মিনিট চুপ করে থেকে ঝুপ করে শুয়ে পড়ে বলে, "আচ্ছা, সেটা আমি যোগান দেব।"

কিন্তু এত বড় আশ্বাসেও কি বিশেষ কাজ হল? হল না। নবকুমার ক্রুদ্ধ প্রশ্ন করলো, "পরের চাকরি করতে যাবই বা কেন? ঘরে আমার ভাতের অভাব? দেখেশুনে চালাতে পারলে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে কাটিয়ে দিতে পারি তা জানো? কি জন্যে করবো দাসত্ব?"

সত্য গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "বসে খাবো এ বাসনা ঘোচাবার শিক্ষে পেতেই যাওয়া দরকার।"

চলল অনেক কাথা-কাটাকাটি। আর—বহুক্ষণ কথা-কাটাকাটি করে নবকুমার এই কথাই ব্যক্ত করল, "আমার দ্বারা হবে না, এই পষ্ট বলে দিচ্ছি।"

সত্যও দৃপ্তস্বরে বলে উঠল, "আমিও পষ্ট বলে রাখছি, কলকাতায় আমি যাব যাব যাব। মেয়েমানুষ কলকাতায় গেলে আকাশের বজ্জর এসে মাথায় পড়ে কিনা তা দেখব।"

কিন্তু সে দৃশ্য কবে দেখতে পেয়েছিল সত্য? তখুনি কি?

না, দেখতে তার আরো অনেক দিন লেগেছিল।

ভিজে ন্যাকড়াকে তাতিয়ে শুকিয়ে সে ন্যাকড়ায় সলতে পাকিয়ে তবে প্রদীপ জ্বালতে হলে, সময় একটু লাগবে বৈকি। ততদিনে সত্য দুটি ছেলের মা হয়েছে।

পঁচিশ

শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্তের অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলার শৃঙ্খলে বন্দী এই নিয়মতান্ত্রিক পৃথিবী রাজ্যটার প্রধান প্রজা মানুষগুলোর জীবনের কিন্তু না আছে নিয়মের নিশ্চিন্ততা, না আছে শৃঙ্খলার আশ্বাস। তাকে না বিধাতা, না প্রকৃতি, কেউ কোনদিন দেয় নি নিশ্চিত নিয়মের ভরসা।

তাই সহজ সুস্থ মানুষও রাতে ঘুমুতে যাবার আগে স্থির বিশ্বাস নিয়ে বলতে পারে না সকালের আলো সে দেখবেই! বলতে পারে না, তার ভরা বসন্তের মাঝখানে বজ্রের অভিশাপ নেমে আসবে না, শরতের সোনালী আলোকে মুছে দিয়ে শুরু হয়ে যাবে না অপ্রতিরোধ্য ধারা-বর্ষণ!

না, জোর করে এসবের কিছুই বলতে পারে না মানুষ। সে জানে না কখন তার আশায় গড়া সুখের ঘরখানি তচনচ করে দিয়ে যাবে অতর্কিত মৃত্যুর নিষ্ঠুর থাবা অথবা সে ঘরকে বিকল করে দিয়ে যাবে আকস্মিক দুর্ঘটনা অথবা দুরারোগ্য ব্যাধি। কে বলবে এই অনিয়মের দেবতা কোথায় বসে আছেন তাঁর অমোঘ নিয়ম নিয়ে।

তবু রামকালী কবরেজের সংসারের উপর্যুপরি দুর্ঘটনাগুলো দেশসুদ্ধ লোককে যেন হতচকিত করে দিল।

আগুন লেগে বাইরের বড় আটচালা ভস্মীভূত হয়ে যাওয়াটাতেও কেউ অতটা বিস্ময় বোধ করে নি, কারণ হুতাশনের ক্ষুধাটা ভাগ্যের মার হলেও তার মধ্যে মানুষের অসতর্কতা অথবা মানুষের কারসাজির ছাপটা স্পষ্ট দেখা যায়। তা ছাড়া রামকালীর উপর ভাগ্যের মারটা সেই প্রথম।

না, রামকালীর আটচালায় আগুন লাগার মধ্যে কেউ শত্রুর কারসাজি আবিষ্কার করতে যায় নি। ওটা যে নিতান্তই অসতর্কতার ফল এটা সবাই বুঝেছিল। ব্যাপারটা এই—

এ বাড়ি থেকে আগুন সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়া কাছাকাছির প্রায় প্রতিটি পড়শীরই নিয়ম। বরাবরই সে সব বাড়ির কেউ না কেউ নিজেদের প্রয়োজন মাফিক সময়ে এসে এ বাড়ির রান্নাঘর থেকে একখানা জলন্ত কাঠ নিয়ে যায়। ঘরে তাদের উনানে শুকনো নারকেলপাতা, খটখটে ঘুঁটে অথবা সরু করে কুচনো কাঠ-কুটো ডালপালা সাজানোই থাকে, জলন্ত কাঠখানা এনে তাতে সংযোগ করে দিতে পারলেই মিটে গেল কাজ।

রামকালীর বাড়িতে নিত্য সকালে তিন-চারটে করে উনুন জ্বলে। অতএব পড়শীরা নিজেদের সংসারে আবার আগুন জ্বালাবার অযথা হাঙ্গামার কথা ভাবতে যাবে কেন? কাজটা তো ঝঞ্ঝাটের। সোলার কাঠি বানাও, চকমকি ঠোকো, সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, তার চাইতে—। তা সেদিনও যথারীতি ওই ও-বাড়ির ঘোষাল-গিন্নীর বিধবা মেয়ে তরু প্রহরখানেক বেলা নাগাদ একখানা জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে এ বাড়ি থেকে নিজেদের বাড়ি যাচ্ছিল, হঠাৎ মাথা বরাবর খোলা আকাশে একটা দাঁড়কাক বিশ্রী করে ডেকে উঠল।

দাঁড়কাকের ডাক অপয়া, এ আর কে না জানে। ঘোষালের মেয়ে তরুও জানত। তা ছাড়া এও জানা ছিল—তার যেদিন বৈধব্যদশা ঘটে, সেদিন কোথায় যেন অনবরত দাঁড়কাক ডেকেছিল। তার উপর আবার আজ চতুর্দশী।

তরুর বুকটা কেঁপে উঠল। তাড়াতাড়ি পা বাড়ালো।

কিন্তু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে যেতে গিয়েও আবার বাধা পেতে হল। কাকটা আরও নেমে এসে প্রায় তরুর মাথার উপরে একটা পাক খেয়ে ডেকে উঠল—কঃ! বুকটা হিম হয়ে হিতাহিতজ্ঞান লোপ পেয়ে গেল তরুর, কী কাজের কী পরিণাম খেয়ালে এল না, হাতের সেই জ্বলন্ত কাঠটা সে কাকটার উদ্দেশে ছুঁড়ে মারল।

বলা বাহুল্য আগুন দাঁড়কাকের পালকাগ্রেও লাগল না, পড়ল গিয়ে রামকালীর বারবাড়ির বড় আটচালার মাথায়। বৈঠকখানা বাড়ি, চণ্ডী-মণ্ডপ, এসব রামকালীর পাকা কোঠা, কিন্তু কাজে-কর্মে পূজোআর্চায় বেশী লোক সমাগমের প্রয়োজনে প্রকাণ্ড দুখানা খড়ের আটচালা তিনি করিয়ে রেখেছিলেন, পাশাপাশি, গায়ে গায়ে। অগ্নিদেবতার জোড়া নৈবেদ্য হল সে দুখানা।

তরু শুধু অসতর্কই নয়, অন্যমনস্কও।

কাঠখানা কোথায় গিয়ে পড়ল, অথবা পড়ে কি করল, সে সম্পর্কে খেয়ালমাত্র না করে তরু আবার এ বাড়িতে ফিরে এসে আর একখানা জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে বাড়ি ফিরল। কি কাজ করেছে সে টের পেল তখন, যখন লেলিহান আগুনের প্রচণ্ড শিখায় আর অজস্র ধোঁয়ায় আকাশ ভরে গেছে, আর পাড়াসুদ্ধ লোকের চিৎকার আকাশ ছাড়িয়েছে।

বোকা তরু এই বলে বুক চাপড়াতে উদ্যত হয়েছিল, "ওগো এ সর্বনাশ যে আমিই ডেকে আনলাম", তরুর কাকা ইশারায় "চুপ চুপ" বলে থামিয়ে দিল তাকে।

কিন্তু আগুনকে থামানো গেল না। আর থামাবার উপায়ই বা কি? পুকুর থেকে ঘড়ায় করে জল এনে দূরে থেকে ছুঁড়ে মারা বৈ তো নয়।

সে চেষ্টায় লাভ নেই।

রামকালী গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষণা করলেন "আগুনে জল দেবার দরকার নেই, তাতে আরো ছড়াবে! চণ্ডীমণ্ডপের দেয়ালে জল ঢালো। যাদের যাদের কাছাকাছি বাড়ি, তারা আপন আপন বাড়ির দেয়াল ঠাণ্ডা কর।"

তবু সকলে যখন হায় হায় করতে করতে বাড়ি ফিরল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। রামকালী চাটুয্যের মত নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক অগ্নিতেজা মানুষটার চালায় আগুন লাগল কেন, এই নিয়ে জল্পনাকল্পনার শেষ রইল না।

কিন্তু এ তো সবে প্রথম।

এর কয়েক দিন পরেই দীনতারিণী ঘাট থেকে চান করে এসেই হঠাৎ "শরীর কেমন করছে" বলে পক্ষাঘাত হয়ে পড়লেন।

পক্ষাঘাত পাতক রোগ, দীনতারিণীর তা অজানা নয়। ছেলের দিকে তাকিয়ে তিনি অশ্রু-কলঙ্কিত চোখের ইশারায় কাতর আবেদন করলেন তাঁকে তাড়াতাড়ি "পার" করতে।

রামকালী শুধু কপালের ঘাম মোছার ছলে একবার কপালে হাত ঠেকালেন।

দিন তিনেক পরেই মারা গেলেন দীনতারিণী।

না, অত বড় বদ্যি হয়েও মাকে বাঁচাতে পারলেন না বলে কেউ দুষল না রামকালীকে। বরং দীনতারিণীর ভাগ্যিকে "ধন্যি ধন্যি" করতে লাগল সবাই। বলল, "খুব গিয়েছে বুড়ী! ভুগল না, ভোগাল না— এমন মৃত্যুই তো কাম্য।"

তবে এ কথা বলতে ছাড়ল না, "বছরটা একটু সাবধানে থেকো রামকালী, একে অগ্নির কোপ, তায় মহাগুরু নিপাত, সময়টা তোমার ভাল যাচ্ছে না।"

পাড়ার বয়োজ্যেষ্ঠরাই বলেন, এ ছাড়া আর কার সাহস?

রামকালীর কাকা দাদা তো সাধ্যপক্ষে তাঁর সামনে আসে না। সামনে

আসে রাসু, কবরেজী শেখে কাকার কাছে। তবে প্রায়ই হতাশ করে কাকাকে। রামকালী কখনো ভ্রূকুটি করেন, কখনো হেসে ফেলে বলেন, "তোর কিছু হবে না রাসু!"

কিন্তু শুধুই কি রাসুর?

কুঞ্জর কোন্ ছেলেটার-ই বা কি হয়েছে? পাঠশালায় গিয়ে অনাসৃষ্টি অনাসৃষ্টি খেলা উদ্ভাবন করা ছাড়া "মাথা" আর খেলতে দেখা যায় না রাসুর কোনো ভাইটারই। রাসু তো তবু ছাত্রবৃত্তি পাস করেছে, টোলেও পড়েছে কিছুদিন। তাছাড়া চেহারাটা সুকান্তি আর বেশ মার্জিত ভাব।

অনেকটা কাকার ধাঁচের রং গড়ন তার। তাই সামনে দাঁড়ালে একটা মানুষের মত দেখতে লাগে। আরগুলো তো তাতেও না।

তাছাড়া কবরেজী বিদ্যে মাথায় না ঢুকুক, অনেক ব্যাপারেই রাসু রামকালীর ডানহাত। ··এই যে দীনতারিণীর শ্রাদ্ধের অত বড় কাণ্ডটা, রাসু সামনে না থাকলে রীতিমত বেগ পেতে হত না কি রামকালীকে? কারণ স্বপাক হবিষ্যান্ন, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, ইত্যাদি করে বহুবিধ নিয়মের পাকে বাঁধা থাকায় নিজে তো ঠিক 'মুক্তজীব' ছিলেন না?

রাসু 'কাজকর্মের' ব্যাপারে যথেষ্ট পারগ।

'দানসাগর' করলেন রামকালী মাতৃশ্রাদ্ধে, সেই সমারোহে সত্য এল। নবকুমারও এল।

রাসুই আনতে গেল।

ঠাকুরমা মারা যাওয়ার খবরে সত্যর প্রাণটা আকুলিব্যাকুলি করছিল, রাসুকে দেখে যেন স্বর্গের চাঁদ দেখল। এ সময় যে বাবা রাখু কি গিরি তাঁতিনীকে পাঠান নি, খুব ভাল করেছেন।

সাড়ে তিন বছর পরে এই প্রথম বাপের বাড়ি যাওয়া।

কিন্তু সত্যর দেহের অন্তঃপুরে তখন যে আর এক "প্রথম" সম্ভাবনার সূচনা দেখা দিয়েছে, সে কি সত্য জানত না? না বুঝতে পারে নি?

তা সত্য না পারুক, সদু পেরেছিল বুঝতে। কিন্তু রণচণ্ডী মামীকে এই সূচনা মাত্রতেই জানাতে সাহস করে নি সদু। ভেবেছিল যাক আর গোটা-কতক দিন, তেমন প্রবল লক্ষণ ধরা পড়লে আপনিই জানবে বুড়ী।

এই সময় দীনতারিণীর বার্তা।

সদু ভয় পেল। এ সময় এই!

ভাবল, মামীকে বলি কি না বলি।

কিন্তু বলা আর হয়ে উঠল না।

বলতে দিল না তার মমতা। এ খবর শুনে যদি এলোকেশী আবার বৌয়ের "যাত্রায়" বাদ সাধেন!

আহা বেচারা এই এতদিন এসেছে, একনাগাড়ে আছে। আপন বুদ্ধির দোষেই হোক আর যার দোষেই হোক, আছে তো! এই ছুতোয় যেতে পারে তো যাক। ভগবান ভালই করবেন।

তবে যাত্রাকালে চুপি চুপি সাবধান করে দেয় সত্যকে, "বাপের বাড়ি যাচ্ছিস, দীর্ঘকাল পরে যাচ্ছিস, কিন্তু সাবধান! বাঁধা-গরু ছাড়া পাওয়ার মত লাফঝাঁপ করিস নে। আমার বাপু সন্দ হচ্ছে—"

সত্য একটু ভাবনার মত তাকিয়ে অস্ফুটে বলে ফেলেছিল, "কি?"

"এই দেখ। পষ্ট করে না বললে হবে না বুঝি? এদিকে তো পাকা গিন্নী! সন্দ হচ্ছে পেটে বাচ্চা-কাচ্চা কিছু এসেছে, বুঝলি? সাবধানে থাকা দরকার।"

ভয় না আহ্লাদ? ভয়, ভয়, সম্পূর্ণ ভয়। তবে এক অদ্ভুত ভয়!

নিজের মধ্যে কী এক অজ্ঞাত রহস্য বাসা বেঁধেছে, এ কথা ভাবলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে

গরুরগাড়ির ভিতরে বসে, ঘোমটার মধ্যে থেকে বার বার নবকুমারকে দেখে সত্য, আর মানুষটাকে যেন নতুন মনে হয়।

এ খবর ও পেলে?

কী না জানি হবে সেই অবস্থাটা!

গরুরগাড়িতে বেশ ঝাঁকুনি লাগছিল।

একসময় তাই বলেও ফেলে চুপি চুপি, "পালকি আনলে না কেন বড়দা?"

রাসু অপ্রতিভ মুখে বলে, "খুব কষ্ট হচ্ছে, না রে? আমি বলেছিলাম, তা খুড়োমশাই বললেন—", একটু ইতস্তত করে বলেই ফেলে রাসু, "বললেন, 'কাজের বাড়িতে চারিদিক থেকে আত্মকুটুম্ব আসবে সবাইকে তো আর পালকি যোগানো যাবে না'—! আমি তাও অবিশ্যি বলেছিলাম, সবাই

আর জামাই তো সমান নয়? তাতেও বললেন, 'জামাইও তো বাড়িতে একটি নয় রাসু?' ওঁকে আর কে বোঝাবে বল?"

সত্য অন্যমনস্কে 'চুপি চুপি'টা ভুলে বেশ স্পষ্ট গলাতেই বলে ওঠে, "তা এর আর বোঝবার কি আছে বড়দা, সত্যিই তো! জামাই সবাই সমান। নিজের জামাইটি বলে সারপর করলে চলবে কেন? বরং পুণ্যির নতুন বিয়ে হয়েছে—" কথা শেষ না করেই নবকুমারের উপস্থিতি স্মরণ করে জিভটা কেটে চুপ করে।...

কিন্তু সমুদ্রে বালির বাঁধ কতক্ষণ? আবার একসময় কথা কয়ে ওঠে সে।

কত প্রশ্ন, কত ঔৎসুক্য!

এই সাড়ে তিনটে বছরে কত ঘটনা ঘটেছে, কত জন্ম-মৃত্যুর লীলা-খেলা হয়েছে, কত ছোট্ট মানুষ বড় হয়েছে, কত আইবুড়োর বিয়ে হয়ে গেছে, সেই সব তথ্যগুলো তো কম মূল্যবান নয়, জানতে হবে না সে সব?

"তুমি কিন্তু একটুও বদলাও নি বড়দা!"

সহাস্য মুখে বলে সত্য।

আর নবকুমার বিগলিত বিস্ময়ে সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বিস্ময়? তা বিস্ময় বৈকি। সত্যর এই মুখ সে কবে দেখেছে? সত্যর মুখটা যে হেসে উঠলে এমন অপূর্ব লাবণ্যময় দেখায় সে কথাই বা কবে জেনেছে?

তা সত্যর সেই প্রশ্নে রাসুও হেসে উঠে বলে, "আমি আবার এই কদিনে বদলাবো কি?"

কদিন!

সত্যর যে মনে হচ্ছে কত যুগ-যুগান্ত পার হয়ে গেছে। সেই কথাই বলে সে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে, "কদিন! বল কি বড়দা, সাড়ে তিনটি বছর—ক'দিন হল?"

"সাড়ে তিন বছর?" রাসু আবার হেসে ওঠে, বলে, "সাড়ে তিন বছর হয়ে গেল এর মধ্যেই? তা ওই শুনতেই তিনটে বছর, কোথা দিয়ে কেটে গেছে।"

সত্য নিশ্বাস ফেলে বলে, "তা তোমাদের আর না কাটবে কেন? স্বাধীন সুখী মানুষ! আমাদেরই মনে হচ্ছে যেন আর একটা জন্ম পেরিয়ে এলাম।"

তা বাপের ভিটেয় পা দিয়েও ঠিক সেই কথাই মনে হয় সত্যর। যেন আর একটা জন্ম পার হয়ে এল।

কিন্তু কোথায় এল?

ঠিক যে জায়গাটা থেকে চলে গিয়েছিল, সেই জায়গাটায় কি? সেটা কি এখনো তেমনি পড়ে আছে? ফাঁকা, খালি?

হয়তো ছিল, হয়তো আছে, কিন্তু এই জন্মান্তর পার হয়ে আসা মেয়েটাকে কি আর এখন সেই খাঁজে ধরবে? কোনো মেয়েকেই কি ধরে? গোত্রান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই কি অন্তরের বিরাট একটা পরিবর্তন হয় না?

যে মেয়েটা হয়তো উঠতে বসতে বকুনি খেয়েছে আর নিতান্ত অবহেলায় খেয়ে খেলিয়ে বেড়িয়েছে, সে হয়ে ওঠে আদরের অতিথি, সমীহর কুটুম্ব! কোনখানে তবে আশ্রয় পাবে সেই মেয়েটা?

এত বড় কাজের বাড়ি, তবু ওরা সত্যর সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে। সারদা, ভুবনেশ্বরী, শিবজায়ার নাতনী দুটো, এমন কি মোক্ষদা পর্যন্ত! সত্য কি খাবে, সত্য কোথায় শোবে, সত্য কোথায় বসবে, সতার কিছু চেয়ে না পাওয়া হল কিনা, এই সব। ভুবনেশ্বরীর তো কথাই নেই। তার শাশুড়ী গেছেন, মহা অশৌচ, ছুঁয়ে নেড়ে কিছু করার ক্ষমতা নেই, তবু বলে বলেই যা পারে।

ব্যাপারটা স্বস্তিকর নয়, এ যেন প্রতি মুহূর্তে মনে পড়িয়ে দেওয়া, "তুমি কুটুম, তুমি অতিথি।"

একসময় ঝেঁজেই উঠল সত্য।

মার ওপরই উঠল।

"কী চাও বল তো তোমরা? এক্ষুনি আবার শ্বশুরবাড়ি চলে যাই? বাবাঃ, তোমাদের এই আদরের ঠ্যালা সামলানো আমার কম্ম নয়। বাড়িতে তো আরো 'শ্বশুরতি' মেয়ে এসেছে, কই তাদের নিয়ে তো এত হৈ-চৈ করছ না?"

কথাটা সত্যি।

আরো শ্বশুরঘর করা মেয়ে এসেছে। পুণ্যি তো এসেইছে, কুঞ্জর দুই গিন্নীবান্নী মেয়ে এসেছে, শিবজায়ার মেয়ে এসেছে, রামকালীর যে ছোট খুড়ো নেই তাঁর তিন-তিনটে মেয়ে এসেছে, কুঞ্জর সহোদর বোনের মেয়েরা এসেছে, তারা ঝাঁকের কৈ হয়ে রয়েছে। শুধু সত্যকে নিয়েই—

ভুবনেশ্বরী মেয়ের এই ঝঙ্কারে অপ্রতিভ হয়ে বলে, "তারা সবাই পেরায় পেরায় আসে। তোর মতন কে এমন ঘরবসতে গিয়ে একেবারে তিন-চারটে বছর—"

কথা শেষ করতে পারে না ভুবনেশ্বরী।

সত্য মার এই রুদ্ধবাক মুখের দিকে তাকিয়ে একটু নরম হয়ে বলে, "বুঝলাম! কিন্তু আছি তো দিনকতক! কাজ মিটতেই তো পালাচ্ছি না, সে-কথা হয়ে গেছে ওখানে। তখন কোরো মেয়েকে আদরগোবর। এখন তোমার শাশুড়ীর ছেরাদ্দ, এখন মানায় মেয়ে নিয়ে সোহাগ করা?"

ভুবনেশ্বরী সজল চোখে বলে, "কদিন থাকবি তুই-ই জানিস—"

"থাকবো বাবা, মাস দুই অন্ততঃ থাকবো, হয়েছে সে-কথা।···চল্‌ পুণ্যি, আমাদের সেই বটতলায় খেলাঘরটা দেখে আসি!"

বলে পুণ্যির হাতটা চেপে ধরে প্রায় টেনেই বার করে নিয়ে যায় তাকে সত্য খিড়কির দোর দিয়ে।

ওদের ওই "খেলাঘর"টা বাস্তবিকই একটি মনোরম ঠাঁই। স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে প্রশংসা অর্জন করতে পারে ওরা।

প্রকাণ্ড একটা বুড়ো বটগাছ ঝুরি নামিয়ে নামিয়ে খানিকটা জায়গা এমন একটি ছায়াপূর্ণ আশ্রয়গৃহ নির্মাণ করে রেখেছে যে, দু-এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেলেও বোধ করি সেই গৃহবাসীর মাথা ভিজবে না। রোদের তো কথাই নেই, প্রায় প্রবেশ নিষেধ তার।

এইখানেই সত্যদের শৈশবের খেলাঘর। তা শ্বশুরবাড়ি যাবার কদিন আগে অবধিও খেলেছে সে। এখনই পরিত্যক্ত ভূমি। এখনকার ছোটদের অন্য খেলাঘর।

নিকোনো-চুকোনো গাছের গোড়াটা এখন ধুলোভর্তি হয়ে থাকলেও সারি সারি ছোট্ট ছোট্ট উনুনগুলো এখনও পুরনো স্মৃতি বহন করে পড়ে আছে ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে।

কী যত্নেই এই উনুনগুলি পেতেছিল ওরা!···

কিছুক্ষণ গাছের গোড়ায় বসেই থাকল সত্য চুপ করে। ঠিক এই মুহূর্তে যেন কথা কইবার শক্তি নেই। অগত্যা পুণ্যিও চুপ।

অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সত্য বলে, "আশ্চয্যি দেখেছিস পুণ্যি, সবাই বদলে গেছে, সবই বদলে গেছে, অথচ এই তুচ্ছু জিনিসগুলো অবিকল আছে।"

পুণ্যিও নিশ্বাস ফেলে, "সত্যি, যা বলেছিস!"

সত্য আস্তে আস্তে দেখিয়ে দেখিয়ে বলে, "এই উনুনটা পুঁটির, এটা খেঁদির, এটা টেঁপির, এটা গিরিবালার, এটা সুশীলার, এটা তোর, তাই না?"

নিজের কথাটা আর বলে না।

পুণ্যি বলে সে কথা, "এইটে তোর ছিল। দেখ্ ভাঙা হাঁড়িকুঁড়িগুলোও রয়েছে পাঁশকুড়ে!"

হ্যাঁ, খেলাঘরের 'পাঁশকুড়'ও একটা ছিল বৈকি! সবই তো থাকা প্রয়োজন। পাঁশকুড়, পুকুরঘাট, গোয়াল, ঢেঁকিঘর, অনুষ্ঠানের ত্রুটি হবে কেন? বড়রা যে 'খেলাঘর' নিয়ে মত্ত, ওরা তো তারই নিখুঁত অনুকরণ করবে। ওদের মাটির আর কাঠের পুতুলগুলোও ঘাটে বাসন মেজেছে, ক্ষার কেচেছে, ঢেঁকিতে পাড় দিয়েছে, রেঁধেছে, কুটনো কুটেছে, বাটনা বেটেছে, ছেলে ঘুম পাড়িয়েছে, কর্তব্যে তিলমাত্র ফাঁকি দিতে পায় নি। তাদের কাজের ছুতোয় মুখর হয়ে উঠেছে এই বুড়ো বটতলা।

বসে থাকতে থাকতে—হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় সত্য।

বলে, "চ পুণ্যি, আর দেখতে ইচ্ছে করছে না, বুকের ভিতরটা কেমন মুচড়ে মুচড়ে উঠছে।

তা পুণ্যির মধ্যেও সেই মোচড় পড়ছিল, সেও বলে, "চ, আর মায়া করা বিড়ম্বনা। যেদিন পরগোত্তর করে দূর করে দিয়েছে, সেদিন থেকেই তো সব ঘুচেছে। মেয়ে জন্মটাই ছাই।"

সত্য আর একবার বড়সড় একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, "মেয়ে জন্মটাই ছাই নয় রে পুণ্যি, আমাদের বিধেন-দাতারাই ছাই। পরগোত্তর করে দিয়ে জন্মের শোধ পর করে দেবার হুকুম ভগবান দেয় নি। এই যে তুই আমার চিরকালের বন্ধু, তোর বিয়েতে আসা হল না, এ দুঃখু কি মলেও যাবে? যাবে না। তবু তো এলাম না। এসব কি ভগবান বলেছে?"

তা নিশ্বাস ফেলছে বলে যে, হাসছে না গল্প করছে না, পাড়া বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে না, সেকথা ভাবলে ভুল হবে, সেটা যথারীতিই চলছে। গল্পের

সমুদ্র, কথার পাহাড়। পাড়ার কোন্ মেয়েটা শ্বশুরবাড়ি গেছে, কোন্ মেয়েটা বাপের বাড়ি আছে, তার তল্লাস করে বেড়ানো আর গল্পে মুখর হয়ে ওঠা, এটা প্রবল প্রবাহেই চলছে। নিশ্বাসটা নিভৃতে।

একান্ত নিভৃতে, মনের অন্তরালে রয়েছে সেই নিশ্বাস। এত পূর্ণতার মধ্যেও কোথায় যেন একটা সুগভীর শূন্যতা, সেই শূন্যতার ওপরই বুঝি পা রাখতে হয়েছে সত্যকে, তাই পায়ের নিচে মাটি খুঁজে পাচ্ছে না।

সে শূন্যতা—সত্য আর এদের নয়। এ সংসার সত্যর নয়।

বিরাট কাজের বাড়িতে কে কোথায় ঠাঁই পেয়েছে কে জানে। মেয়েরা মেয়েমহলে, পুরুষরা বারমহলে। কোটাঘরে সব জামাই কুটুম, আর নবনির্মিত আটচালার নিচে জ্ঞাত-গোত্তর।...নবকুমার যে কোনখানে আছে সত্য জানে না, মাঝে মাঝে সেটা মনে পড়ছে। আহা মানুষটা মুখচোরা লাজুক, কোথায় কি ভাবে আছে কে জানে! এসে অবধি তো দেখা হয় নি।...বাবা সহস্র কাজে বেড়াচ্ছেন, বাবার এমন সময় নেই যে জামাই নিয়ে তদারকি করে বেড়াবেন! যা করে পাঁচজনে।...কি ভাবছে ও আমাকে কে জানে।

থেকে থেকেই সেই মানুষটার কথা মনে পড়ছিল। মনকেমন মনকেমন ভাবটা ছিল, আবার একটু অহঙ্কারী অহঙ্কারী দুষ্টুবুদ্ধিও ছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল একবার লোকটাকে ডেকে বলে, "দেখছ তো? সবই দেখছ? বুঝতে পারছ, তোমার মা যতই হেলাফেলা করুন, নেহাৎ হেলাফেলা ঘরের মেয়ে আমি নই।"

কিন্তু এসব বলার সুযোগ কোথা?

বিয়েবাড়ি নয় যে, সবাই রঙ্গরসে মাতবে। মাতৃদায় উদ্ধার বলে কথা। তাছাড়া অনেকের মধ্যে একজন হলেও দীনতারিণীর পদটা বাড়ির গিন্নীর ছিল, ছোট ননদদের তিনি যতই ভয় করে চলে থাকুন, আর ছেলেকে যতই সমীহ করে আসুন, সবাই জানতো গিন্নী বলতে দীনতারিণীই। সেই গিন্নীর জায়গা শূন্য হয়ে গেলে সবাইয়েরই ফাঁকা ফাঁকা লাগে বৈকি। খেটে খেটেও জেরবার হচ্ছে সবাই, এর মাঝখানে কার আর এ কথা মনে উদয় হবে, সত্যর সঙ্গে সত্যর বরের দেখা করিয়ে দিই কোনো ছলছুতোয়। তাছাড়া চাতক পক্ষীর অবস্থা তো নয় সত্যর! এই দীর্ঘকাল নিশ্ছিদ্র

বরের ঘর করে এসেছে সে। সত্যর বরকে সত্যর দেখতে ইচ্ছে হবে, এ চিন্তা তাদের মনে উদয় হবার কথা নয়।

উদয় হচ্ছে এক ভুবনেশ্বরীর।

কিন্তু সে তো সব দিকেই বন্দিনী। একে তো শাশুড়ী মরার নিয়ম-নীতির দায়, তার উপর মেয়ের ভয়ের দায়। ওরকম চেষ্টা করতে গেলে সত্য যে ক্ষেপে উঠবে না, এ প্রতিশ্রুতি কে দেবে ভুবনেশ্বরীকে?

কিন্তু সত্যর মা কি সত্যকে সবটা বুঝে উঠতে পেরেছে?

পারে নি।

সত্য যে ছলছুতো খুঁজে বেড়াচ্ছিল এ তার ধারণার বাইরে।

তা অবশেষে হয়ে গেল যোগাযোগ।

নিয়মভঙ্গের যজ্ঞি মিটতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেছল, সত্য পুকুরঘাট থেকে আঁচিয়ে একবার নিজের মামার বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিল মামীদের সঙ্গে, জোরপায়ে ফেরার সময় নেড়ুর সঙ্গে দেখা।…

নেড়ু দাঁড় করাল।

মুখটা রহস্যে উদ্ভাসিত করে বলল, "এই সত্য, তোর ভূতের ভয় আছে?"

"ভূতের ভয়!"

"হুঁ-হুঁ! গেছো ভূতের ভয়! নির্ঘাত আছে, তাই না?"

"নির্ঘাত আছে—", সত্য মুখ নেড়ে বলে, "এলেন আমার গণৎকার ঠাকুর!"

"নেই ভয়? ঠিক বলছিস? এই ঝিকিমিকি বেলায় তোদের সেই বটগাছতলায় যেতে পারিস? সে যেতে আর হয় না। হুঁ! জনমনিষ্যি যায় না সেখানে!"

"ওরে আমার কে রে! কেউ যায় না সেখানে? তুই যাস না তাই বল্! তুইও কম খেলিস নি সেখানে, তবু মায়া-মমতা নেই! আমাদের কথাই আলাদা, আমি আর পুণ্যি যাই নি যেন!"

"গিয়িছিলি?"

"নিষ্যস! তুই হঠাৎ এমন ন্যাকা হচ্ছিস কেন রে নেড়ু? পেঁচার চোখ গুনতে যেতাম না আমরা?"

"আহা সে তো আগে। এখন শ্বশুরঘর করে করে সাহস হয়ে যায় নি?"

"ইল্লি রে! গেলেই হল! চল্ না দেখিয়ে দিচ্ছি, একপো'র রাত অবধি বসে থাকতে পারি তা জানিস?"

বলে গটগট করে এগিয়ে যায় সত্য নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে, এই 'কনে দেখা' আলোতেও যেখানটা প্রায় গভীর অন্ধকার!

কিন্তু কে ওখানে!

কে! কে!

প্রায় চেঁচিয়েই উঠছিল সত্য, সামলে নিল নেড়ুর ভয়ে। শুনতে পেলে আর রক্ষে রাখবে? সত্যর ভয়ের কথা ঢাক পিটিয়ে বেড়াবে।...কিন্তু লোকটা যে এদিকেই আসছে। পালাবে সত্য? উঁহু, এ নির্ঘাত নেড়ুর কোন কারসাজি, তা নইলে—

হঠাৎ একটা সম্ভাবনায় পা থেকে মাথা অবধি একটা তড়িৎপ্রবাহ বয়ে যায়, আর পরক্ষণেই সম্ভাবনাটা প্রত্যক্ষের মূর্তিতে দেখা দেয়।

"ইস! তুমি! তুমি এখানে যে—"

জেনে বুঝেও বিস্ময়ের ভান করে সত্য।

নবকুমার হতাশ গলায় বলে, "কেন আর? তোমারই দর্শন আশায়। উঃ বাপের বাড়ি এসে একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে গেছ, লোকটা মরল কি বাঁচল খোঁজও নেই!"

সত্য পুলক গোপনের ব্যর্থ চেষ্টায় হেসে ফেলে বলে, "আহা, কথার কি ছিরি রে! আমিই তো খোঁজ করে বেড়াব!"

"তা একবার দেখা তো দেবে? আমি হতভাগা যাই অনেক বুদ্ধি খেলিয়ে—"

"তা তো দেখতেই পাচ্ছি। নেড় ছাড়া আর কারুর কানে গেছে নাকি?"

"নাঃ। শুধু ও—"

"যাক, তবে ঠিক আছে। নেড়ু বিশ্বাসঘাতুক নয়। তা বলি দরকারটা কি?"

"দরকার!" নবকুমার আরো হতাশ গলায় বলে, "বিনি দরকারে বুঝি নিজের পরিবারকে একটু দেখতে ইচ্ছে করে না? তোমার মতন পাষাণ হৃদয় তো নয়!"

"পাষাণ হৃদয়! তা বটে!

সত্য অনুচ্চস্বরে হেসে ওঠে। তারপর বলে, "কেমন লাগছে?"

"খুব ভালো!" নবকুমার অকপটে বলে, "মাইরি বলছি স্বপ্নেও ভাবি নি শ্বশুরবাড়িটা আমার এমন! কী ঐশ্বয্যি, কী দব্‌দবা! দেশটাও চমৎকার! মা গঙ্গা দেখলে প্রাণ জুড়োয়!"

সত্য একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, "তবেই বোঝ, মেয়েমানুষকে কতটি ত্যাগ করতে হয়!"

"তা সত্যি!"

নবকুমার আরও একবার অকপটে স্বীকার করে, "এসে অবধি সেই কথাই ভাবছি! বলতে গেলে তুমি তো একটি রাজকন্যে! সে তুলনায় আমি—"

আবেগের মাথায় বেশী কিছু বলে ফেলার আগে সত্য সামলে দেয়, "দুগ্‌গা দুগ্‌গা, ও কি কথা! তুমি হলে স্বামী গুরুজন! রাজকন্যের কথা নয়, তবে প্রাণটা হু-হু করতে পারে কিনা!"

"একশোবার পারে! হাজারবার পারে!"

বলে নবকুমার অসমসাহসিকতায় ভর করে হাতটা বাড়িয়ে সত্যর কাঁধে একটা হাত রাখে।

তা সত্য কি এই স্নেহস্পর্শে অথবা প্রেমস্পর্শে পুলকিত হয় না? হয়। তবু মেয়েলি সাবধানতায় চুপি চুপি বলে, "এই সরে দাঁড়াও, কে কমনে দেখে ফেলবে, এরপর আর তাহলে জনসমাজে মুখ দেখাবার জো রইবে না। খিড়কির পুকুর বৈ গতি থাকবে না!"

নবকুমার কিন্তু এ ভয়ে ভীত হয় না। বরং আরও একটা হাত স্ত্রীর আরও একটা কাঁধে দিয়ে ঈষৎ আকর্ষণের ভঙ্গীতে বলে, "কেন পরপুরুষ নাকি?"

"না হোক! লোক-লজ্জা বলে একটা জিনিস তো আছে—"

"সে যদি বলো, এখানে নিরালায় চুপি চুপি দেখাতেই নিন্দে হতে পারে। কিন্তু তোমার ভাই তো বলেছে এখানে কেউ আসে না।"

"তা আসে না বটে!" সত্য ঈষৎ নরম সুরে বলে, "ওই জন্যেই তো আম বাগান জামবাগান ছেড়ে এই বটবৃক্ষের ছায়াটুকু বেছে নিয়েছিলাম খেলাঘর পাততে। বটের কিছুই তো লোকের কাজে লাগে না; না ফল না ফুল, না পাতা, না কাঠ। তাই মানুষের পা পড়ে না। শুধু ছায়ার আশ্রয়।"

সন্ধ্যের অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছে—

নবকুমার হঠাৎ একটা কবি-কবি কথা বলে বসে, "তা সত্যি! তোমার বাবাকে—ইয়ে শ্বশুরঠাকুরকে দেখলে আমার এমনি বটবৃক্ষের কথা মনে আসে। বিরাট বটবৃক্ষ।"

সত্য চমকে ওঠে।

সত্য অভিভূত হয়।

আর তারই আবেগে হঠাৎ 'লোকলজ্জা' ভুলে নবকুমারের হাত দুটো দুহাতে চেপে ধরে বলে, "সত্যি বলছ? আমার বাবাকে তোমার ভাল লেগেছে?"

"ভাল লাগার কথা বলতে পারছি না, বলছি ভক্তির কথা! সমীহর কথা! বিরাট বটবৃক্ষ দেখলে যেমন সমীহ আসে—"

"কথা কয়েছ বাবার সঙ্গে?"

"কথা? ওরে বাস! তিনি কোথায়, আমি কোথায়? কত ব্যস্ত মানুষ, দূরে থেকেই দেখছি—"

সত্য আবছা বিহ্বল গলায় আস্তে বলে, "বাবাকে সবাই দূরে থেকেই দেখে! সব্বাই! মা পর্যন্ত। শুধু এই সত্য মুখপুড়ীই—"

লোকলজ্জা আরও বিস্মৃত হয়ে সত্য নবকুমারের তৃষিত বক্ষে মাথাটা রাখে।

নবকুমারও অবশ্য বেশ কিছুটা সময় এই মধুর আস্বাদের সুযোগ গ্রহণ করে নেয়, তারপর চুপি চুপি বলে, "নতুন জামাই, প্রথম এলাম এমন একটা শোক-দুঃখুর উপলক্ষে! কারুর বে-থায় এলে অবিশ্যিই আমাদের দুজনকে ঘরে দিত, কি বলো?"

সত্য এই মেয়েলি কথাটা শুনে হেসে ফেলে। হেসে বলে, "দিলেই বুঝি নিতাম?"

"নিতে না?"

"পাগল! ঘটে লজ্জা নেই বুঝি? 'বর' বস্তুটা শ্বশুরবাড়িতেই ভাল, বুঝলে?"

নবকুমার অভিমানভরে বলে, "বুঝলাম! তাই এই হতভাগা চলে যাবার পর আরও দু'মাস ভাল করে থাকা হবে—"

সত্যর মনের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ-শিহরণ খেলে যায়। দু মাস কি কত মাস কে জানে। পিস্‌ঠাকুমা তো সেই মোক্ষম কথাটা বলে বসেছে। আসার সময় সদুদি যা বলে ভয় জন্মিয়ে দিয়েছিল।··ক্রমশঃ সত্যও যেন অনুভব করছে শরীরের মধ্যে কোথাও একটা অস্বস্তি বাসা বেঁধেছে। ···মনে হচ্ছে যেন গলার কাছটাতেই প্রধান অস্বস্তি। কেবলই যেন ভেতর থেকে ঠেলা মারছে, খাদ্যবস্তু নামতে চায় না, উঠে আসার তাল করে।···ওই খাওয়া থেকেই ধরে ফেলেছে পিস্‌ঠাকুমা। আর সঙ্গে সঙ্গে নানান্‌খানা বিষয়ের উপদেশ দিয়ে জব্দ করেছে। তার মধ্যে প্রধান নিষেধ ছিল, সাঁঝ-সন্ধ্যেয় আগানেবাগানে গাছতলায় ছাঁচতলায় না যাওয়া।

তা সত্য নিষেধটা মানছে ভাল।

হঠাৎ একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে সত্য। বলে, "যাই, রাত হয়ে যাচ্ছে, বকবে!"

"এখানে আবার বকবে কে?" নবকুমার নিশ্চিন্তে বলে, "এখানে তো তুমি মহারানী! নেড়ু আমায় সব বলেছে। কী আদুরে মেয়ে তুমি কী লাঞ্ছনাতেই পড়েছ—"

সত্য এবার নিজস্ব দৃঢ়তায় ফেরে।

দৃঢ়স্বরে বলে, "ওসব কথা বলছ কেন? যার যা নিয়তি! শ্বশুরঘরে বকুনি-ঝকুনি আর কোন্ মেয়েটার নেই; ছাড়ো ওকথা। যাচ্ছি"

"নিতান্তই যাবে? কি আর বলব? আবার কবে দেখা হবে?"

"তা কি করে বলি?"

"আমি তো এই সামনের বুধবারে চলে যাব। তার মধ্যে একবার হবে না?"

"আচ্ছা দেখি!"

নবকুমার আস্তে আস্তে বলে, "ইচ্ছে হচ্ছে এখানেই থেকে যাই! কী বাড়ি! সদাই সরগরম। আর আমাদের বাড়িতে যেন—"

"তা হোক! নিজের যা তাই ভাল!"···সত্য আবার দৃঢ়স্বরে বলে, "তুমিও কালে-ভবিষ্যতে দশের একজন হবে, তোমার সংসারও এমনি সরগরম হবে।"

"আমার? হুঁঃ! সে যাক, কবে আবার গরীবের ঘরে যাবে?"

সত্য ঝপ করে বলে বসে, "বলতে পারছি না, ছ মাস এক বছরও হতে পারে!"

"ছ মাস এক বছর!" নবকুমার বিহ্বলভাবে বলে, "তার মানে?"

"আছে মানে।" বলে হঠাৎ ত্বরিতগতিতে দৌড় দেয় সত্য।

যদিও ঘরে পরে সবাই বলছে "কী বড়ই হয়েছে সত্য!" বলছে "রূপ যেন ফেটে পড়ছে, কী বাড়বাড়ন্ত গড়নই হয়েছে—" তথাপি দৌড়ঝাঁপের কমতি নেই তার।

তবে পিসঠাকুমার সামনে আর দৌড়ঝাঁপ চলবে না মনে হচ্ছে।

নবকুমার অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আকাশ পাতাল চিন্তা করে। তারপর সিদ্ধান্তে আসে, আর কিছুই নয়, মেয়ে অনেক দিন শ্বশুরঘর করছে, মা-বাপ এবার হাতে পেয়ে আটকে ফেলবে।

হেসে খেলে পাড়া বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিল সত্য, এখানে আসার প্রাক্কালে সদু যে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল সেটাকে চোখ বুজে অস্বীকার করে। ভিতরে যদি কোনো অস্বস্তির আলোড়ন অজানা এক ভয়ের ছায়া ফেলেও থাকে, বাইরের আলোড়নে সেটা মুছে গেছে।

চট্ করে কারো কোনো সন্দেহও আসে নি, কারণ সত্য কতক্ষণই বা কার চোখের ওপর আছে? বৃহৎ যজ্ঞের আনুষঙ্গিক জের নিয়ে ব্যস্ত সবাই। হঠাৎ একদিন সন্দেহ জাগল ভুবনেশ্বরীর! যে মানুষটার চোখ দুটো সহস্র কাজের মধ্যেও সত্যর চোখমুখের কাছাকাছিই আছে।

সন্দেহ জাগতেই চুপি চুপি সারদার কাছে ব্যক্ত করল ভুবনেশ্বরী, আর সারদাও লক্ষ্য ঘনীভূত করে নিঃসংশয় হল।

ব্যস, মুহূর্তে এ-মুখ থেকে ও-মুখ, এ-কান থেকে ও-কান। গ্রামসুদ্ধ মহিলা খবরটা জেনে ফেললেন একটা বেলার মধ্যেই। মহিলাদের মারফৎ পুরুষরাও।

কিন্তু রামকালীর কানে উঠতে কিছুটা দেরি হয়েছিল। কারণ মাতৃবিয়োগের পর থেকে আর বাড়ির ভিতর ঢুকছিলেন না রামকালী। পুরোপুরি কালাশৌচের কালটা যে এই নিয়মেই চলবেন তিনি, সেটা যেন অদৃশ্য কালিতে লেখা হয়ে গিয়েছিল।

ভুবনেশ্বরী তবে কোন্ উপায়ে এই ভয়ঙ্কর আনন্দের বার্তাটা তাঁর কানে পৌঁছে দেবে?

উপায় হচ্ছে না, অথচ এই অপরিসীম আনন্দের ভারটা একা একা বহন করাও কঠিন মনে হচ্ছে।

দু দিনেই দু বছর হয়ে ওঠে ভুবনেশ্বরীর।

তবু এ ইচ্ছেও হচ্ছে না, আর কেউ বলে ফেলুক। এই মধুর সুন্দর ভয়ঙ্কর রমণীয় খবরটি ধীরে ধীরে একটি উপহারের মত ধরে দেবে স্বামীকে, এই বাসনায় মর্মরিত হয়ে ওঠে ভুবনেশ্বরী।

কিন্তু নিজ কণ্ঠে সে উপহার দেওয়া আর ঘটে উঠল না তার। রামকালীর খেতে বসার সময় হঠাৎ মোক্ষদা দুম্ করে বলে বসলেন। বললেন, "বললে তোমার মাথায় থাকবে কিনা জানি না, তবু বলা কর্তব্য তাই বলছি, দাদামশাই হতে চললে!"

রামকালী চমকে তাকালেন।

কথাটা যেন ঠিক বোধগম্য হল না।

মোক্ষদা এসব পছন্দ করেন না। অতএব তিনি আরও স্পষ্ট প্রখর ভাষায় বলে ফেলেন, "বাংলা বৈ উর্দু-ফার্সি বলছি না বাবা, বলছি সত্যর ছেলেপুলে হবে।"

রামকালী সহসা 'বিষম' খেলেন।

জলের গ্লাসটা মুখে ঠেকিয়ে নামিয়ে রাখলেন, তারপর ঘাড় নিচু করে যেন পাতের ভাতের মধ্যে কথাটার অর্থ খুঁজতে লাগলেন।

না, কথা তিনি এখন কইবেন না। আচমন করে বসেছেন। কালাশৌচের বছরটা রীতিমত বিধিনিষেধের মধ্যে থাকতে চান। এসবে বিশ্বাসী তিনি কোনদিনই নন, কিন্তু মানুষের মন যে কত বড় জটিল জিনিস, দীনতারিণীর মৃত্যুতে তা আর একবার দেখা গেল রামকালীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আচারনিষ্ঠা দেখে!

কথা কইবেন না। অতএব উত্তরও মিলবে না।

তবু এই সময়টুকু ছাড়া রামকালীকে পাচ্ছে কে? কাজেই যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় এই সময়েই রামকালীর কর্ণকুহরে ঢালার পক্ষে প্রকৃষ্ট।

'বিষম' খাওয়া শেষ হলে মোক্ষদা আর একবার বলেন, "আমি এই

জানিয়ে দিলাম, এখন তোমার গুণবতী বেয়ানকে জানাবার কি ব্যবস্থা করবে তা দেখ! মাগীকে তো দিয়েথুয়েও মন পাওয়া যায় যা। এক ঝাঁকা মণ্ডা, আর এক জালা তেল দিয়ে পাঠাও কাউকে, তার সঙ্গে পাদ্য-অর্ঘ্য!"

রামকালী খেয়ে চলেছেন, ওদিকে ভুবনেশ্বরীর চোখে জল। যে খবর শুনে রামকালীর আহ্লাদে প্রাণ উথলে ওঠার কথা, সেই খবর দেওয়া হল কিনা তাঁর মৌনকালে। কেন খাবার সময় ছাড়া আর বলা যেত না?

তাছাড়া ভুবনেশ্বরীর আশা-আকাঙ্ক্ষা আর উদ্বেগ-আনন্দে কম্পমান হৃদয়টি তার দল মেলে বিকশিত হয়ে উঠতে পেল না।

অবিশ্যি এত সুচারু করে কি আর ভাবতে পারল ভুবনেশ্বরী?

তা নয়।

শুধু চোখের সেই জলের ধারাটা যেন অবিরল হয়ে উঠল নানা অনুভূতি আর অব্যক্ত বেদনার ধাক্কায়।...

মোক্ষদা শেষ অস্ত্রটি ত্যাগ করেন, "আর একটা কথা না বলে বাঁচছি না, মেয়ে তো তোমার এতদিন শ্বশুরঘর করেও কিছুমাত্তর বদলায় নি। যে ধিঙ্গী সেই ধিঙ্গী। সাঁঝ-সন্ধ্যে মানে না, ডিঙোনো-মাড়ানো গেরাহ্য করে না, আগান-বাগান, ঘাট, পুকুর, ছিষ্টি মাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আমি বারণ করতে গিয়ে শুধু হাস্যাস্পদ হয়েছি মাত্তর। এখন তুমি দেখ যদি শাসন করতে পারো।"

রামকালীর কি আজ গলা দিয়ে ভাত নামছে না? তাই এত দেরি হচ্ছে খেয়ে উঠতে?

মোক্ষদারও এত অবসর নেই যে বসে থাকবেন, "বড়বৌমা দেখো শ্বশুর আর কিছু নেয় কিনা" বলে চলে যান মোক্ষদা।

রাগ হয়েছে তাঁর। হলেই বা মাতৃশোক, তাই বলে এমন সুখবরে মুখটা প্রসন্ন করবে না? এত কী! যাক, সত্যর শ্বশুরবাড়ি খবর পাঠানোর ব্যবস্থা তাঁকেই করতে হবে। এ তিনি জানেন। এটা মেয়েলি কাজ।

সারদা অদূরে বসে আছে পাখা হাতে, তার ওপরই শ্বশুরকে দেখার নির্দেশ।

হ্যাঁ, সারদাই বসে একগলা ঘোমটা দিয়ে। এটা তার সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। দীনতারিণী মোক্ষদা কাশীশ্বরী শিবজায়া যে কেউই কাছে থাকুন, খাওয়ার তদারকি করুন, সারদা তফাৎ বাঁচিয়ে বসে পাখা নাড়বেই।

আর কে করবে ?

ভুবনেশ্বরী তো আর এই একবাড়ি গিন্নীর সামনে লজ্জার মাথা খেয়ে স্বামীর খাওয়ার তদারক করতে আসবে না !

মোক্ষদা চলে যেতে রামকালী উঠলেন।

দাওয়ার ধারে চকচকে করে মাজা গাড়ু ও তার উপর পাট করা কাচা গামছা রক্ষিত আছে আঁচানোর জন্যে, তবু হঠাৎ কি ভেবে চলে গেলেন ঘাটে। হবিষ্যের সময় ঘাটে মুখ প্রক্ষালন করাটা বিধি ছিল বটে, কিন্তু এখন কেন ?

যে জন্যেই যান—

আজ ভুবনেশ্বরী ভয়ঙ্কর এক অসমসাহসিক কাজ করে বসল। দ্রুতপায়ে রান্নাঘরের পিছন গলির বেড়ার দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে, মেয়েঘাটের আব্রুস্বরূপ আড়াল করা যে ঝোপঝাড়গুলো আছে, তার পাশ দিয়ে এগিয়ে প্রায় পুরুষঘাটের কাছ বরাবর দাঁড়িয়ে থাকল।

রামকালী হাতমুখ ধুয়ে ফেরার পথে চমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলেন, "এ কী, তুমি এখানে ?"

ভুবনেশ্বরী ঘোমটার মধ্যে থেকেই রুদ্ধকণ্ঠে বলে, "তা কি করবো ? চোরে কামারে তো দেখা নেই। একটা কথার দরকার থাকলে—"

রামকালী প্রায় বিরক্ত স্বরে বললেন, "তা এইটা কি কথার জায়গা ?"

ভুবনেশ্বরীর চোখে যে ধারাশ্রাবণ, তা ঘোমটার মধ্যে থেকেই ধরা যায়।

সেই শ্রাবণ-বর্ষণের মধ্যেই তার কথা শোনা যায়, "কখন তোমায় পাচ্ছি ?"

রামকালী ঈষৎ শান্তস্বরে বলেন, "তা কথাটা কি বলে নাও চটপট! চারিদিকে লোকজন—"

"বলছি—সত্যর কথা—"

রামকালীর গলায় কেমন একটা বিরূপ গম্ভীর স্বর বাজে, "হ্যাঁ, শুনলাম। ওর দিকে একটু লক্ষ্য রাখবে। বেশী দৌড়ঝাঁপ না করে। যাও, বাড়ির মধ্যে যাও।"

ভুবনেশ্বরীর সর্বশরীর একটা মূক অভিমানে কেঁপে ওঠে, আর কথা বলে না সে, আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে সরে আসে।

তার গতিভঙ্গীর দিকে তাকিয়ে রামকালীর একবার মনে হয়, আর একটু নরম করে কথা বললে ভাল হত। নির্বোধ মানুষটা মেয়ের এই সংবাদে ভয়ে সারা হচ্ছে। কিন্তু কি করবেন রামকালী, এটা তো আর স্ত্রীর সঙ্গে গালগল্পের জায়গা নয়!

ভাবেন, কোনো একসময় বলে দেবেন, ভয় পাবার কিছু নেই।

কিন্তু কোন্ সেই সময়?

রামকালী জানেন কি?

জানেন কি স্ত্রীর সঙ্গে গালগল্প করা কি বস্তু? স্নেহ প্রেম ভালবাসা—এগুলো ব্যক্ত করার বস্তু নয়, এটাই জানেন রামকালী।

সত্যর শ্বশুরবাড়িতে খবর পাঠাতে কাকে নির্বাচন করা যায়, তাই ভাবতে ভাবতে চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে বসেন রামকালী।

মোক্ষদা চলে আসেন।

এবং তোড়জোড় লাগিয়ে দেন সত্যর শ্বশুরবাড়িতে খবর দেবার।

গিরি তাঁতিনী যাবে।

গরুরগাড়ি নিয়ে রাখুও যাবে। গিরির জন্যে তসর শাড়ী আসে, রাখুর জন্যে হলুদে ছোপানো ধুতি-চাদর। মস্ত একটা পেতলের হাঁড়িতে এক হাঁড়ি ঘানিভাঙা তেল, আর মস্ত একটা "মটকি"তে বোঝাই কাঁচাগোল্লা। এ দৃশ্য দেখলেই ঘটনাটা বুঝতে পারবে সত্যর শাশুড়ী, মুখ ফুটে বলতেও হবে না!

ওরা বেরোবার মুখে রামকালী হঠাৎ থামান। মোক্ষদাকে উদ্দেশ করে একগেঁজে টাকা বাড়িয়ে ধরে বলেন, "সেখানে লোকজন সবাইকে যেন পরিতোষ করে আসে, দিয়ে দাও গিরির হাতে!"

সংসারসুদ্ধ সবাই আহ্লাদে ভাসছে, দীনতারিণীর মৃত্যুশোক এ আহ্লাদকে পরাভূত করতে পারছে না। শুধু রামকালীই যেন পরাভূত হয়ে যাচ্ছেন, চেষ্টা করেও তেমন আহ্লাদ আনতে পারছেন না।

যেন রামকালীর কী একটা লোকসানই ঘটেছে!

সত্য বড় হয়ে যাচ্ছে, সত্য বড় হয়ে গেছে!

গিয়েই তো ছিল। তবু যেন কোথায় একটু আশা ছিল। মাতৃশ্রাদ্ধের

বিরাট কাজের মধ্যে দেখছিলেন সত্যর ছুটোছুটি আসাযাওয়া গালগল্প। মনে করছিলেন—যা ভেবেছিলাম তা নয়, শুধু শ্বশুরবাড়ির চাপে পড়েই—

ভাবছিলেন হাতের কাজটা হালকা হলেই সত্যকে ডেকে কাছে বসিয়ে কথা বলবেন।

কাজ না মিটতেই মোক্ষদা এলেন ভগ্নদূতের মূর্তিতে।

আর কাকে "কাছে" বসাবেন রামকালী ?

অনেক দূরে চলে গেল যে সে !

নাঃ, কাছে আর কোনোদিন পাবেন না তাকে রামকালী।

এক নতুন চক্রের চক্রান্তে পড়ে অন্য আর এক রাজ্যের প্রজা হয়ে গেছে সত্য।

সে রাজ্য প্রমীলার রাজ্য, সে চক্রান্ত বিধাতার চক্রের।

ছাব্বিশ

নবকুমার চলে গিয়ে পর্যন্ত এই কটা দিন আরো "টো-টো" করে বেড়াচ্ছিল সত্য, বাঁধা গরু ছাড়া পাওয়ার ধরনে। নবকুমারের উপস্থিতিতে সামান্য যেটুকু সাবধান হতে হচ্ছিল, তাও ঘুচেছিল, হঠাৎ শ্যেনদৃষ্টি মোক্ষদার মোক্ষম আবিষ্কারের ফলে স্বাধীনতা সাংঘাতিক রকম খর্ব হয়ে গেল তার।

বিদ্রোহ করা চলছে না, উঠতে বসতে উপদেশের ঠেলা। "দরজায় বসিস নি, দুজনের মাঝখান দিয়ে যাস নি, সাঁঝ-সন্ধ্যে হয়ে গেলে উঠোনে নামিস নি, শনি-মঙ্গলবারে পথে বেরোস নি, ঘাটেপুকুরে একা যাস নি", নিষেধের বৃন্দাবন একেবারে। তা ছাড়া আছে "বিধি"।

পায়ের আঙুলে রুপোর আঙটি পরে থাকো, চুলের আগায় আর শাড়ীর 'কোল-আঁচলে' সর্বদা গিঁঠ বেঁধে রাখো, শত্রুপক্ষ জাতীয় কোনো মহিলাকে দেখলেই সরে থাকো, এবং "নজর-খরা" কোনো মহিলার নজরে পড়ে গেছ সন্দেহ হলেই দেহের কোনোখানে লোহা পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দাও, রাত্রে খোঁপায় খড়কে রাখো, এইসব অনুশাসনের শাসনে চলতে হচ্ছে সত্যকে।

সত্যকে যেন বেঁধে মারছে এরা।

তবু সত্য যখন তখনই ভয়ানক ভয়ানক অঘটন ঘটিয়ে বসছে।

যেমন অন্যমনস্কতায় পান-ধোওয়া জল মাড়িয়ে গেল, মাছ-ধোওয়া জল ডিঙিয়ে গেল, ছেঁচতলায় নিজের শাড়ীখানা মেলে দিয়ে বসল, এইসব সর্বনেশে কাণ্ড!

ভুবনেশ্বরী কেবল বলে, "অ সত্য, কখন কি করে বসবি, আয় না আমার কাছে এসে একটু বোস না!"

এক আধবার বসে সত্য।

হয়তো ভিতরের কোনো ক্লান্তিতেই। কিন্তু বেশীক্ষণ মায়ের কাছে কাছে থাকতে তার লজ্জা করে। তাছাড়া চিরচঞ্চল চিত্ত তার দীর্ঘকাল শ্বশুরঘর করেছে অচঞ্চলের ভূমিকা নিয়ে, আর সে সহজ ক্লান্তির কাছে হার মানতে রাজী হয় না, রাজী হয় না মমতার কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে।

অতএব একদিন রামকালীর কাছে নালিশ পৌঁছল। বলা হল 'তুমি শাসন করো'।

কিন্তু রামকালী কি করলেন শাসন?

নাকি চিকিৎসক-জনোচিত নিষেধের বাণী বর্ষণ করলেন?

না, সে সব কিছুই করলেন না রামকালী। কেন কে জানে ভিতরে ভিতরে একটা পীড়া বোধ করছেন তিনি। কেমন যেন একটা বিমুখতা। যেন শেষ সম্বলটুকুও হারিয়েছেন, তাই মনের মধ্যে নির্লিপ্ত শূন্যতা।

রামকালী শুধু একদিন মেয়েকে ডেকে বললেন, "গুরুজনরা যা বলছেন, মন দিয়ে শুনবে। ওঁরা বোঝেন, ওঁদের কথা মেনে না চললে ক্ষতি হতে পারে।"

অভিমানে সত্য তিন দিন শুয়ে রইল।

ভুবনেশ্বরী অনুযোগ করলে বলল, "এই তো চাও তোমরা। বেশ তো, যা চাও তাই হচ্ছে।"

সত্যিই হঠাৎ চুপচাপ হয়ে গেল সত্য।

কিন্তু ক্ষতিকে কি রোধ করা গেল?

না, রামকালী এখন গ্রহের কোপে পড়েছেন।

রামকালী "মহাগুরু নিপাতের" বিপাক মুক্ত হতে পারছেন না।

তাই রামকালীর প্রথম দৌহিত্র সন্তান পৃথিবীর আলোয় উদ্ভাসিত না হতেই অন্ধকারের রাজ্যে হারিয়ে গেল।

তা ছাড়া আর কি কারণ?

সত্য তো সব কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলছিল ইদানীং।

মোক্ষদা অবশ্য বললেন, "এ সেই গোড়ার কালে ধিঙ্গীপনা করার ফল।" কিন্তু চিকিৎসক রামকালী তা বলেন না। রামকালীর হঠাৎ মনে হয়, এ বোধ করি তাঁর নিজেরই অবহেলার ফল। পিতা হিসাবে না হোক, চিকিৎসক হিসেবে তাঁর আর একটু কর্তব্য ছিল।

তবু এটাও তো সত্যি, এ পরিবারভুক্ত আত্মীয় আশ্রিত মিলিয়ে যে গোষ্ঠীটি, সে গোষ্ঠীতে বছরে গড়ে অন্ততঃ পাঁচ-সাতটা শিশুর জন্ম হচ্ছে, নিতান্ত সহজে, প্রায় কর্তা-পুরুষদের অজ্ঞাতসারেই।

না, অত্যুক্তি নয়। ওই ছেলেমেয়েগুলো একটু বড় হয়ে যখন অন্যের ট্যাঁকে চড়ে বহির্জগতে বেরোয়, তখন এঁরা কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করেন, "কার এটা?"

অতএব অপরাধটা কোথায় রামকালীর?

এই কটা দিন আগে "তেল-সন্দেশ" সহকারে খবর পাঠানো হয়েছিল সত্যর শ্বশুরবাড়িতে, এবং এলোকেশী হেন মানুষও খবরদাত্রীকে একখানি নতুন কাপড়দানে পুরস্কৃত করেছিলেন, বৌকে বাপের ঘরে রাখার অনুমতিও দিয়েছিলেন দীর্ঘকালের জন্যে, আবার এখন এই বার্তা পাঠাতে হবে।

ঘটা করে মেয়ের 'সাধ' দিচ্ছিলেন বৌয়ের বড়লোক বাপ, তা নয়, মূলে হাবাৎ! হয়েছিল অবিশ্যি মেয়েসন্তান, তবু প্রথম সন্তান তো! সত্য তো "ভাঙা" হয়ে গেল। আর তো সত্য "অখণ্ড পোয়াতি" রইল না। কোনো শুভকর্মে নিয়ম-লক্ষণের কাজে আগবাড়িয়ে আসতে তো পারবে না সত্য!

কড়া হুকুম দিলেন এলোকেশী, শরীর-স্বাস্থ্য একটু ভাল হলেই যেন মেয়েকে পাল্‌কি চড়িয়ে সাবধানে পাঠিয়ে দেন বেহাই। আহ্লাদে মেয়ে বাপের বাড়ি গিয়ে আহ্লাদেপনা করেই যে এইটি ঘটিয়েছেন, তাতে আর সন্দেহ কি!

ঐ বচন হজম করতে হল রামকালীকে।

এ নির্দেশ মানতেই হল।

আবার রাস্থকে যেতে হল সত্যর শ্বশুরবাড়ি, কেঁদে কেঁদে চোখ-ফোলানো ম্রিয়মাণ সত্যকে নিয়ে।

কিন্তু রামকালীর গ্রহের কোপ কি কাটল ?

মহাগুরু নিপাতের বছর পূর্ণ হয়েও তো আরো বছর কেটে গেল, তবু রামকালীর সংসারে অঘটন ঘটতেই লাগল কেন? কোনোখানে কিছু নেই, "নেড়ু" নামক নিরীহ ছেলেটা হঠাৎ একদিন হারিয়ে গেল। যেমন করে একদিন রামকালী হারিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু নেড়ু তো খড়মপেটা খায় নি!

অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন রামকালী, কুঞ্জ অনেক কাঁদলেন মেয়েমানুষের মত, নেড়ুর বার্তা পাওয়া গেল না। এর কমাস পরেই কাশীশ্বরী মারা গেলেন, আরো কমাস পরে শিবজায়ার বড় মেয়ে বিধবা হয়ে বাপের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিল, একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে।

এ সমস্তই যে রামকালীর গ্রহবৈগুণ্য, একথা কে না বলবে ?

এর সব 'হ্যাপা'ই তো রামকালীকে নিতে হচ্ছে।

আর মজা এই, শত অসুবিধের মধ্যেও রামকালী কাউকে বলেন না, "সুবিধে হবে না"। শত ঝঞ্ঝাটেও বলে ফেলেন না, "আর পারা যাচ্ছে না"।

বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি আসা খুড়তুতো বোনের বিয়ের যুগ্যি মেয়ে দুটোর জন্যেও তোড়জোড় করে পাত্র খুঁজতে ঘটক ঠিক করে, স্যাকরা ডেকে পাঠালেন। পাত্র খোঁজা হোক, গহনাপত্রও প্রস্তুত হোক। বোনের ছেলে চারটের কথাও ভুলে থাকলেন না, যথাযথ হিসেবে তাদের কাউকে টোলে, কাউকে পাঠশালে ভর্তি করে দিলেন।

কর্তব্যের ত্রুটি করছেন না রামকালী, করছেন না কোনো অনাচার, তথাপি বারেবারেই ভাগ্যের মার পড়ছে তাঁর উপর।

কিন্তু "ওস্তাদের মার" নাকি শেষরাত্রে, আর ভাগ্য নামক ব্যক্তিটির মত এমন ওস্তাদ আর কে আছে ?

তাই—

রাত্রি-শেষের ছায়াচ্ছন্ন আলো-আঁধারি মুহূর্তে সে তার প্রধান মারের খেলা দেখিয়ে গেল।

ঘণ্টা কয়েকের ভেদবমিতে ভুবনেশ্বরী মারা গেল!

রামকালী কবরেজের 'ডেকে কথা কওয়া' ওষুধের সমস্ত মাহাত্ম্য কি ব্যর্থ হল? হয়তো ব্যর্থই হত, নিয়তিকে কে পারে ঠেকাতে? কে পারে অপ্রতিরোধ্যকে রোধ করতে? তবু, চেষ্টা করবার সময়টাও যে পেলেন না

রামকালী। হয়তো সময়টা পেলে আক্ষেপটা কম হত। কিন্তু লাজুক ভুবনেশ্বরী, নির্বোধ ভুবনেশ্বরী সে চেষ্টাটুকুর অবকাশ দেয় নি। সে মাঝরাত্রে বিছানা থেকে উঠে সেই যে ঘাটের ধারে গিয়ে পড়েছিল, আর উঠে আসে নি, কাউকে জানায় নি। হয়তো বা পারেও নি।

বাগদী-বুড়ী শেষরাত্রে ঘাটে গিয়ে আবিষ্কার করল এই ভয়ঙ্কর ঘটনার দৃশ্য।

"ও মা আঁ আঁ—" করে চেঁচাতে চেঁচাতে এসে সে আছড়ে পড়ল। তার আর্তনাদ থেকে ব্যাপারটা বুঝতেও কিছুক্ষণ গেল লোকের।

কিন্তু দু-পাঁচ মিনিট আগে বুঝেই বা কী এমন লাভ হত? তখন তো একেবারে শেষ সময়। চোখমুখ বসে গেছে, নাড়ী ছেড়ে গেছে।

রামকালী নাড়ীটায় একবার হাত দিয়েই, আস্তে সেই প্রায়-স্পন্দনহীন হাতখানা নামিয়ে রাখলেন। ঝুঁকে বসে রুদ্ধ-কম্পিত স্বরে বললেন, "মেজ বৌ, এ কী করলে?"

রাসু হাতে ধরা প্রদীপটা রোগিণীর মুখের আরো কাছে এগিয়ে আনল, ভুবনেশ্বরী কষ্টে চোখের পাতা টেনে চোখ দুটো খুলল একবার। কি একটা বলতে গেল, ঠোঁট নাড়তে পারল না। চোখের কোণ থেকে দু ফোঁটা জল রগ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

এ রোগে রোগীর শেষ অবধি জ্ঞান থাকে, চৈতন্যাবলুপ্তি ঘটে না। কিছু একটু বলবার জন্যে ভয়ঙ্কর একটা আকুলতা যে সেই মৃত্যুপথযাত্রিনীর ভিতরটাকে তোলপাড় করছে তা সেই বাতাসে-কাঁপা ক্ষীণ প্রদীপশিখার আলোতেও ধরা পড়ল।

রামকালী তেমনি রুদ্ধগম্ভীর আবেগকম্পিত গলায় বললেন, "মেজবৌ, এমন কঠিন শাস্তি কেন?"

মুহূর্তের জন্য রোগিণীর ভিতরকার সেই আকুলতার জয় হল। ঠোঁটটা নড়ে উঠল। উচ্চারিত হল, "ছি!"

"সত্যকে না দেখেই চললে?"

হঠাৎ সেই কাঠ হয়ে আসা দেহটা বিদ্যুতাহতের মত নড়ে উঠল, একঝলক জল সেই কোটরগত চোখের চারধার থেকে উথলে উঠে গড়িয়ে পড়ল।

রাসুর হাতের প্রদীপটা নিভে গেল বাতাসের ঝটকায়।

গত রাত্রে সহজ সুস্থ ভুবনেশ্বরী সংসারের বহুবিধ কাজ সেরে, আগামী সকালের রসদ বাবদ তিন-তিনটে মোচা কুটে রেখে, এক জামবাটি ডাল ভিজিয়ে ঘুমোতে গিয়েছিল, আজ আর সে সেই সকালের মুখ দেখতে পেল না। ভোরের প্রথম আলো একজোড়া ঘুমন্ত চোখের ওপর এসে স্থির হয়ে পড়ে রইল ব্যর্থতার গ্লানি বহন করে।

রাসু মেয়েমানুষের মত হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। কেঁদে উঠল যে যেখানে ছিল সকলেই।

মোক্ষদার তীব্র তীক্ষ্ণ চিৎকার প্রথম ভোরের স্নিগ্ধ পবিত্রতাকে যেন দীর্ণ বিদীর্ণ করে ধিক্কার দিয়ে উঠল।

কুঞ্জ ভাসুরমানুষ, বেশী কাছে আসবেন না, দূরে বসে বুক চাপড়ে বলে উঠলেন, "জীবনভোর এত লোককে বাঁচালে রামকালী, সোনার প্রতিমা ঘরের লক্ষ্মীকে বাঁচাতে পারলে না? হেরে গেলে?"

রামকালী শুধু একবার সেই হাহাকারের দিকে ফিরে তাকালেন, বললেন না, "যুদ্ধের অবকাশ পেলাম কই?"

অজাতশত্রু ভুবনেশ্বরী মরণকালে তার পরমদেবতার সঙ্গে যেন ভয়ঙ্কর একটা শত্রুতা সেধে গেল।

সেজকর্তা ভাঙা ভাঙা গলায় মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গীতে বললেন, "নারায়ণ! নারায়ণ! অন্তিমে নারায়ণ! রামকালী, আত্মা এখনো এখানেই অবস্থান করছেন। নারায়ণের নাম কর।"

"আপনারা করুন।" বলে রামকালী উঠে দাঁড়ালেন।

এমন অকস্মাৎ মৃত্যুতে ঘরের পাশের লোকের সঙ্গেই দেখা হয় না, তা গ্রামান্তরের! মায়ের এ হেন মৃত্যু সত্যবতীর দেখবার কথা নয়, কিন্তু মাতৃশ্রাদ্ধও দেখা হল না তার।

হ্যাঁ, শ্রাদ্ধ ভুবনেশ্বরীর ভাল করেই হল।

বাড়িতে পাঁচটা বুড়ী আছে বলে যে আর কেউ তার প্রাপ্য পাওনা পাবে না, এমন নীতিতে বিশ্বাসী নন রামকালী। আয়োজন দেখে ক্ষুব্ধ মোক্ষদা রামকালীকে বললেন, "আমাদের কথা না হয় ছেড়েই দিলে, কিন্তু তোমার খুড়ো এখনো বেঁচে, তাঁর চোখের সামনে একটা কচি বৌয়ের ছেরাদ্দয় এত ঘটা করা কি বেশ বিবেচনার কাজ হচ্ছে রামকালী?"

রামকালী পিসীর মুখের দিকে না তাকিয়েই উত্তর দিলেন, "তোমাদের কথা ছেড়ে দেবার কিছু নেই, কারুর কথাই আমি ছেড়ে দিচ্ছি না, যেটা বিধি সেটাই করছি।"

মোক্ষদা একটা ঈর্ষাকাতর নিশ্বাস ত্যাগ করে বলেন, "পাঁচটা বুড়ীর চোখের ওপর ওই কচি বৌটার সমারোহ করে ছেরাদ্দ করাই তাহলে বিধি ?"

রামকালী তেমনি মুখ ফিরিয়েই বললেন, "আত্মার বয়স নেই।"

"কিন্তু চোখে যে সহ্য করতে পারা যায় না রামকালী!"

বললেন মোক্ষদা।

রামকালী মৃদুস্বরে বললেন, "জগতে অনেক জিনিসই সহ্য করে নিতে হয়। ও নিয়ে বৃথা আলোচনায় ফল কি ?"

মোক্ষদা চুপ করে গেলেন। কথাটা সত্যি বৈকি। কনিষ্ঠজনের মৃত্যুটাই যদি সহ্য করে নেওয়া যায়, তার সেই প্রিয় পরিচিত মূর্তিটা আগুনে পুড়িয়ে শেষ করে চিতায় জল ঢেলে এসেই আবার খাওয়া যায় ঘুমনো যায়, তবে আর কোন্ মুখে বলা চলে "তার পারলৌকিক কাজটা চোখ মেলে দেখে সহ্য করার ক্ষমতা আমার নেই!"

কিন্তু মায়ের শ্রাদ্ধ চোখে দেখবার ক্ষমতা ছেলেমানুষ সত্যবতীর হবে না বলেই কি নিয়ে আসা হল না তাকে ?

না, তা নয়, নিজেরই তার আসা সম্ভব হল না। সে যখন মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেল, তখন দুদিনের ছেলে নিয়ে আঁতুড়ঘরে। ভুবনেশ্বরী যেদিন ভোরে মারা গেছেন ঠিক সেইদিনই সকালবেলা সত্যর দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। পুত্রসন্তান।

দু পরিবার থেকে দুজন লোক কুটুমবাড়ি এসেছে খবর জানানানি করতে। একজন জন্মের, আর একজন মৃত্যুর খবর বহন করে।

কিন্তু সত্য কেন প্রসবের প্রাক্কালে বাপের বাড়ি আসে নি ? বিশেষ করে বাপ যার অত বড় চিকিৎসক ?

আসে নি তার কারণ আছে। যদিও ধরতে গেলে কারণটা নিতান্তই মেয়েলি, কিন্তু এসব ক্ষেত্রে মেয়েলি প্রথা আর মেয়েলি কুসংস্কারই জয়ী হয়, সত্যর বেলাতেও তার অন্যথা হয় নি। সত্যর প্রথমবারের ঘটনাটাই এমন

অনিয়মের কারণ! বাপের বাড়িতে যখন অমন একটা অপয়া ব্যাপার ঘটে গেছে, তখন পালা বদল হোক।

তাই এবারে দুপক্ষ থেকেই একমত হয়ে স্থির করা হয়েছিল, সত্যর এবারের সন্তান মাতুলালয়ে ভূমিষ্ঠ না হয়ে পিত্রালয়ে ভূমিষ্ঠ হবে।

সত্য তাই ওখানেই আছে।

ভালই আছে। বেটাছেলেটি কোলে এসেছে। এলোকেশী বড় মুখ করে লোক পাঠিয়েছিলেন বড়লোক কুটুমবাড়ি। তাকে বলে দিয়েছিলেন, "শুভ সংবাদের বকশিশ হিসেবে পেতলের গামলাটা সরাটা দিলে নিবি না। বলবি ঘড়া কই?"

কিন্তু ঘড়া গামলা কিছুই চাওয়া হল না তার। এসে শুনল এই বিপদ।

ওদিকে সত্যবতীও পুলকে আনন্দে আশায় গর্বে প্রত্যাশিত হয়ে বসেছিল কখন সংবাদদাতা ঘড়া নিয়ে ফিরবে। কিন্তু তার ফেরা পর্যন্ত আর অপেক্ষা করে বসে থাকতে হল না। লোক এল ওদিক থেকে।

এলোকেশী আঁতুড়ের দরজায় এসে মুখটা কঠিনে কোমলে করে বললেন, "আঁতুড়ঘরে কাঁদতে নেই, কাঁদলে ছেলের অকল্যাণের ভয়, নাড়ীর দোষ হবার ভয়, সাবধান করে দিয়ে খবরটা বলি বৌমা, ভেদবমি হয়ে তোমার মা-টি মরেছেন। লুকোছাপা করে চেপে রাখবার তো খবর নয়, চতুর্থী করা না হোক, দুদিন মাছভাতটা তো বন্ধ দিতে হবে! তাই জানিয়েই দিলাম। দেখি ভট্চাযকে জিজ্ঞেসাবাদ করতে পাঠাই, এক্ষেত্তেরে কী বিধি-ব্যবস্থা!"

একটা সগুপ্রসূতি তরুণী মেয়ের নিঃশঙ্ক বুকে বেপরোয়া একখানা ধারালো ছুরি বসিয়ে দিয়ে, নিতান্ত সহজভাবে সেখান থেকে সরে গেলেন এলোকেশী। ছুরিটার ক্ষমতার বহরও তাকিয়ে দেখে গেলেন না।

কিন্তু পাড়ায় বেরিয়ে এলোকেশী তাঁর প্রিয় সখীমহলে এই সরেস খবরটি পরিবেশন করে বলে বেড়ালেন, "দেখলি তো? মিথ্যে বলি কাঠপ্রাণ? মা মরার খবর শুনে প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে বসে রইল, ডুকরে কেঁদে উঠল না!"

সত্যিই ডুকরে কেঁদে সত্যবতী ওঠে নি।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে শুকনো চোখ দুটি মেলে বসেই ছিল অনেকক্ষণ। তার

পর কখন একসময় নবজাত শিশুটা তার দেহের ওজনের চেয়ে অনেক গুণ বেশী ওজনে চীৎকার করে উঠেছে, ধীরে ধীরে তাকে কোলে তুলে নিয়ে এদিকে পিঠ ফিরিয়ে চুপ করে বসে থেকেছে দেওয়ালের দিকে মুখ করে।

ওদিকে যদি একটুকরো জানলা থাকত, সত্যর প্রাণটা বুঝি তাহলে সেই খোলা পথটুকু দিয়েই দৃষ্টির খেয়া-নৌকো চড়ে অসীম আকাশ সাঁতরে সাঁতরে আছড়ে গিয়ে পড়ত সেই তার শৈশবনীড়ে।

যেখানে "মেজবৌ" পরিচয়ে চিহ্নিত একটি নিটোল মুখ, ফর্সা রং, ছোট-খাটো মানুষ ভীরু কুণ্ঠিত পদক্ষেপে সারাদিন শুধু সকলের মনোরঞ্জন করে বেড়াচ্ছে। আর তারই আশেপাশে এখানে সেখানে, তাকে প্রায় বিস্মৃত হয়ে দৃপ্ত পদপাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি গাছকোমর-বেঁধে-কাপড়-পরা স্বাস্থ্যবতী বালিকা। কিন্তু এই আঁতুড়ঘরের এধারে ওধারে কোনধারেই জানলা নেই। তিনদিকেই গোবর-লেপা নিরেট মাটির দেয়াল। দৃষ্টি সেখানে অচল হয়ে থেমে থাকে।

মা কেন সর্বদা এমন ভয়ে ভয়ে থাকে, এই নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করত সত্যবতী। বলত, "ভয় ভয় ভয়! ওই ভয়ের জ্বালাতেই সগ্‌গো পাবে না তুমি মা, দেখে নিও।"

সত্যবতীর মা কি স্বর্গ পায় নি?

সত্যবতীর প্রাণটা তবে কেন 'স্বর্গ' নামক সেই এক অদৃশ্যলোকের অসীম শূন্যতায় হাহাকার করে বেড়াচ্ছে?

"মা নেই, মাকে আর দেখতে পাবো না," এ কথা মনে করতে পারছে না সত্য, শুধু মনে হচ্ছে সেই চিরমমতাময়ী মানুষটা যেন ভয়ঙ্কর এক নিষ্ঠুর খেলায় মেতে একছুটে কোন্ দূর-দূরান্তর লোকে পৌঁছে গিয়ে সত্যকে 'ছুয়ো' দিয়ে ব্যঙ্গহাসি হাসছে।

বলছে, "কি গো, রাতদিন তো নিজের খেলা নিয়েই উন্মত্ত হয়ে বেড়াতে, 'মা' বলে যে একটা মানুষ ছিল সংসারে, তার দিকে তাকিয়ে দেখেছিলে কোন দিন? মনে রেখেছিলে তুমি তার একমাত্র সন্তান, তুমি ছাড়া 'আপনার' বলতে আর কেউ নেই তার?"

"মা মারা গেছেন" এ দুঃখের চেয়ে দুরন্ত হয়ে উঠছে সত্যর, ছেলেবেলাকার সত্যর সেই মার প্রতি ঔদাসীন্যের দুঃখ। মাকে কেন ভাল করে দেখে নি সত্য, দু-দণ্ড কেন স্থির হয়ে এসে বসে নি মার কোলের কাছে! কেন রাতে

আর পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে ঠাকুমার ঘরে শোয়ার বদলে মায়ের গলাটি জড়িয়ে ঘুমোয় নি! প্রায়ই তো সেই কুণ্ঠিত মানুষটি ভীরু ভীরু মুখটি হাসিতে উজ্জ্বল করে চুপি চুপি অনুনয় করত, "এ ঘরে আমার বিছানায় শুবি আয় না। রূপকথার গল্প বলব।"

যার কাছে এই অনুনয়, সে কোনদিনই তার মান রাখত না। নিতান্ত তাচ্ছিল্যে বলত, "হুঁঃ, কতই না গল্প জান তুমি! ওঘরে বলে আমার বন্ধুরা সবাই, ওদের ছেড়ে তোমার কাছে শুতে আসব আমি! বলিহারী কথা বটে!"

কী পাষাণ ওই মেয়েটা গো! কী পাষাণ!

গোবরলেপা ওই নিরেট দেয়ালটায় মাথা কুটেকুটে মাথার মধ্যেকার ভয়ঙ্কর যন্ত্রটাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে ইচ্ছে করে সত্যর।

ভগবান, একবারের জন্যে সেই দিনটা এনে দিতে পারো না? সত্য তাহলে সেইদিনের সেই নিষ্ঠুর মেয়েটার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে!

সেই ছোটখাটো দেহটাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ গুঁজে বলে, "মা মাগো, নিষ্ঠুর ছিল না সে মেয়েটা, শুধু অবোধ ছিল।"

ইদানীংএর মাকে, শ্বশুরবাড়ি থেকে ঘুরে গিয়ে দেখা মাকে, কিছুতেই যেন মনে পড়াতে পারে না সত্য, ঘুরে ফিরে শুধু মার সেই নিতান্ত বধূ-মূর্তিটিই রামকালী কবরেজের মস্ত বড় বাড়িটার সর্বত্র সঞ্চরণ করে ফেরে।

সত্য যদি এখুনি মরে যায়, 'স্বর্গ' নামক সেই জায়গাটায় কি দেখা হবে মার সঙ্গে? তা হলে সত্য তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠবে, "মা মাগো, এত পাষাণ তুমি কী করে হলে মা!"

আত্মবিস্মৃত সত্য কি মনে করে বসেছিল সত্যিই সেখানে পৌঁছে গেছে? ঝাঁপিয়ে পড়েছে মার বুকে? আর তার ডুকরে ওঠাটা এত তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে যে, মর্ত্যলোকের এইখানে এসে ধাক্কা দিয়েছে?

নইলে এলোকেশী ছুটে আসবেন কেন? কেন কঠিন গলায় ধমকে উঠবেন, "বৌমা, একটাকে বিসর্জন দিয়ে আশ মেটে নি, এটাকেও দিতে চাও? ওই আঁতুড়েষষ্ঠির ছেলে কোলে নিয়ে মড়া-কান্না? বুকের পাটাকেও ধন্যি! বলি মা-বাপ কি কারো চিরদিনের? তবু তো বিধাতা পুরুষের সুবিচার হয়েছে, বাপ না গিয়ে মা গিয়েছে। শাঁখা সিঁদুর নিয়ে এয়োসতী

ভাগ্যবতী ড্যাংডেঙিয়ে চলে গেল, দেখে আহ্লাদ কর, তা নয় মা-মা করে চীৎকার তুলছ। বলি আর বেশীদিন বাঁচলে কপালে দুর্ভোগ ছাড়া কি ছাই সুখভোগ আসত? হাত শুধু করে থান পরে বোগনো বেড়ির ঘরে ভর্তি হতে হত না? চোখের জল যদি ছেলের গায়ে পড়ে বৌমা, তোমায় আমি খাপান্ত করে ছাড়ব তা বলে দিচ্ছি, মা-মা করে ন্যাকামি করা বার করে দেব।"

চোখের জল ছেলের গায়ে!

সত্য আঁচলটা তুলে ঘষে ঘষে চোখটা শুকনো করে ফেলে সভয়ে তাকিয়ে দেখে ছেলের গায়ে কোথাও জলের ফোঁটা লেগে আছে কিনা।

এই তো এই যে! এই যে জলের ফোঁটা! শিউরে ওঠে সত্য।

হে মা ষষ্ঠি, রক্ষা করো মা! এমন বুদ্ধিহীনের মত কাজ আর কখনো করবে না সত্য।

কল্পিত সেই জলের ফোঁটা আঁচলের কোণ দিয়ে মুছে নিয়ে ছেলেকে নিবিড় করে ধরে সত্য। মৃত্যুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে জীবনের মুখোমুখি বসে।

সাতাশ

কথায় বলে "ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়!" রাসুর বৌ সারদা অবশ্য নিজেকে খুব একটা ভাগ্যবতী মনে করে না, বরং যখন তখন "আমার যেমন ভাগ্য" বলে আক্ষেপ করতে ছাড়ে না, কিন্তু এক হিসেবে এযাবৎ ভগবান তার বোঝা বয়ে এসেছেন। বয়ে এসেছেন গ্রহ-নক্ষত্রের একটি সুকৌশল সমাবেশ ঘটিয়ে।

নইলে পাটমহলের লক্ষ্মীকান্ত বাঁড়ুয্যের নাতনীর তো এখনো পাটমহলেই পড়ে থাকবার কথা নয়। কিন্তু তাই পড়ে আছে সে, সারদাকে নিঃসপত্ন রাজ্যভোগের সুযোগ দিয়ে।

লক্ষ্মীকান্ত নেই, কিন্তু তাঁর পুত্র শ্যামকান্ত বাপের ঠাট-বাট বজায়

রেখেছেন। সর্ববিধ শাস্ত্রীয় আচার-আচরণ মেনে চলেন তিনি। নড়তে চড়তে পাঁজী-পুঁথি দেখেন, এবং গ্রহ ফাঁড়া ঠিকুজি কোষ্ঠী ইত্যাদি গোলমেলে ব্যাপারে প্রত্যেক সময় কাশী-প্রত্যাগত জ্যোতিষার্ণব ঠাকুরের উপদেশ গ্রহণ করে থাকেন।

জ্যোতিষার্ণবই পটলীর কোষ্ঠী দেখে তার পতিগৃহ যাত্রা সম্পর্কে একটি বিশেষ বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলেন।

ঘোষণা করেছিলেন, আঠারো বছরে পদার্পণের আগে পটলীর স্বামী সন্দর্শনে বিপদ আছে। উক্ত কালাবধি তার পতিসুখস্থানে রাহুর কটাক্ষ।

জ্যোতিষার্ণবের ঘোষণায় অবশ্য আশ্চর্য কেউ হয় নি, বরং যেন এ ধরনের একটা কিছু না হলেই আশ্চর্য হত। কারণ পটলীর পতিসুখস্থানে যে রাহুর দৃষ্টি সে আর জ্যোতিষীকে বলতে হবে কেন! সে তো তার বিয়ের দিনই হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া গেছে!

নেহাৎ নাকি ওর বাপের পূর্বজন্মের পুণ্যি ছিল, তাই সেই বিয়ের বর রামকালী কবরেজের দৃষ্টিপথে পড়ে গিয়েছিল। নয়তো পটলীকে তো বাসররাতেই শাঁখা-নোয়া খুলতে হত। আর নয়তো 'দ-পড়া' আধাবিধবা হয়ে জীবনটা কাটাতে হত।

রামকালী কবরেজ ভগবান হয়ে এসে উদ্ধার করেছেন। কিন্তু "অদৃষ্টের ফল কে খণ্ডাবে বল"! তাই গ্রহ-নক্ষত্ররা আঙুল তুলে নিষেধ করে রেখেছে, "পটলী, তুই স্বামীর দিকে চোখ তুলবি না। অন্তত আঠারো বছর বয়স হবার আগে নয়।"

লক্ষ্মীকান্তর শ্রাদ্ধের সময় সামাজিক আচার অনুযায়ী জামাইকে শ্যামকান্ত নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তবে বাড়িতে কড়া শাসন করে রেখেছিলেন, মেয়ে জামাইয়ে যেন দেখাশুনো না হয়। কিন্তু ভাগ্যচক্রে জামাইয়ের আসাই হল না। সেইদিনই নাকি জামাইয়ের রক্ত-আমাশা দেখা দিল। কে জানে সের দুই কাঁচা দুধ খাবার ফল কিনা সেটা।

যাক সে সব তো অতীত কথা।

শ্যামকান্ত মেয়ের শ্বশুরকে তার কোষ্ঠীঘটিত বিপর্যয় জানিয়েছিলেন। কাজেই এতদিন ওপক্ষ থেকে বৌ নিয়ে যাবার প্রস্তাব ওঠে নি। দীনতারিণীর অত বড় সমারোহের শ্রাদ্ধেও শ্বশুরবাড়ি আসা হল না তার।

"একঘাট' করতে যে যেখানে জ্ঞাতিগোত্র ছিল সবাই এসে জড় হল,

সত্য পুণ্যি কুঞ্জর পাঁচ-পাঁচটা শ্বশুর-ঘরন্তী মেয়ে, শিবজায়ার দৌত্তুরগুষ্টি বাকী কেউ থাকে নি, বাকী ছিল শুধু পটলী, যে নাকি সর্বপ্রধানের এক প্রধান।

কিন্তু এবার সময় এসেছে।

আঠারো বছরে পদার্পণ করেছে পটলী। কুঞ্জগৃহিণী অভয়া ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন নতুন বৌকে আনতে। মুখে বলছেন অবশ্য "আর ফেলে রাখলে কি ভাল দেখায়?" কিন্তু ভিতরের উদ্দেশ্য আরো গভীর। উদ্দেশ্য বড় বৌয়ের তেজ অহঙ্কার ভাঙা। সারদার যত তেজ, তত অহঙ্কার। দিন দিন যেন বাড়ছে। সংসারে ভুবনেশ্বরীর শূন্য স্থানটা কেমন করে কে জানে আস্তে আস্তে সারদার দখলে এসে গেছে, ভুবনেশ্বরীর মতই এখন সারদা ভিন্ন যেন সব দিক অচল। কিন্তু ভুবনেশ্বরীর নম্র নীরবতা সারদার মধ্যে নেই, সারদা যতটা চৌকস, ততটাই প্রখর। শাশুড়ীকেও সে ডিঙিয়ে যেতে চায়।

অথচ দীনতারিণীর মৃত্যুতে গিন্নীর যে পদটা অভয়ার পাবার কথা, সেটা যেন অভয়া পেলেন না। অভয়ার সেই 'হেঁসেলের চাকরি'র উর্ধ্বে নতুন কিছু হল না বরং সেটাই আরও জটিল হয়ে উঠেছে। কারণ কাশীশ্বরী তো নেই-ই, হঠাৎ পড়ে গিয়ে হাত ভেঙে মোক্ষদাও কেমন কমজোরি হয়ে গেছেন। কাজেই অভয়াকে সন্ধ্য-স্নানান্তে ওঁদের ঘরেও কিছু গুছিয়ে দিয়ে আসতে হয়। বাটনাটা জলটা।

মোক্ষদা "হাতী হাবড়ে পড়ার নীতি"তেই সেই চির অস্পৃশ্যার জলস্পর্শ করেন।

অতএব সমগ্র সংসারটা অনেকটা বেলা পর্যন্ত সারদার হাতেই থাকে। সঙ্গে থাকেন অবশ্য শিবজায়া, থাকেন আরও জ্ঞাতি মহিলারা, কিন্তু আশ্চর্য, সবাই যেন 'আম দুধে' মিশে গেছে। আর অভয়া-রূপিণী আঁঠির ঠাঁই হয়েছে ছাইগাদায়। অন্তত অভয়ার তাই ধারণা।

বৌয়ের এই প্রতাপ, এই দপদপা আর সহ্য করতে পারছেন না অভয়া। টিট করতে ইচ্ছে করছে বৌকে। তা অস্ত্র তাঁর হাতে এসে গেছে এবার। শ্যামকান্ত জানিয়েছেন আঠারো বছরে পা দিয়েছে পটলী।

শুনে বুকের জোর বাড়ল অভয়ার।

ভাবলেন বড়বৌমার "তেজ আসপদ্দা" কমুক একটু।

পরেছিল, ঘাটের যে ধারটায় স্নান করিয়েছিল পটলীকে,
নে বাস করেছিল সে, এইরকম একটু একটু। আর বিশেষ

মেয়েমানুষের মধ্যে কে যে তার সতীন, সে কথা বুঝতেই পারে
া ছাড়া বোঝবার চেষ্টাই বা করেছে কে? কেঁদে কেঁদে যার
চো!

শ্বশুরবাড়ি আসার কান্না নয়, নিজেকে ভয়ঙ্কর একট অপরাধী
কান্নার যোগ হয়েছিল তার সঙ্গে সত্যি পটলীর মত মহা-অপয়া
আর কে আছে?

য়র বর বিয়ে করতে এসে রাস্তায় মরে, এমন কথা কে কবে শুনেছে?
র আবার এ বাড়ি? বৌভাতের যজ্ঞির দিন বাড়ি যখন রমরম করছে,
কনা বাড়ির একটা জলজ্যান্ত বৌ হারিয়ে গেল! শুনে 'হাঁ' হয়ে
ল পটলী।

মানুষ রাস্তায়-ঘাটে বেরিয়ে সাপের পেটে বাঘের পেটে কি চোর
... বিশেষ কর
হাতে পড়ে হারিয়ে যেতে পারে, কিন্তু মেয়েমানুষ?
মানুষ? ঘরের মধ্যে থেকে হারিয়ে যাবে কি? ভূতে উড়িয়ে নিয়ে
ওয়া ব্যাপার ছাড়া, আর কিছু ব্যাখ্যা করা চলে না এর।
সেই ব্যাখ্যাতেই নিশ্চিন্ত হয়ে সকল কারণের মূল নিজের উপর ধিক্কারে
ার ভয়ে যখন খালি কেঁদে আকুল হয়ে যাচ্ছিল, তখন সত্য এসে জ্ঞান
দয়েছিল তাকে।

হ্যাঁ, ওই আর একটা বস্তু মনে আছে পটলীর।

সত্য!

আগুনের মতন চকচকে সেই বড় বড় দুটো চোখ, আর তার উপরকার
া জোড়াভুরু, এখনও যেন স্পষ্ট মনে পড়ে যায় পটলীর।

লীর কান্নার কারণ শুনে সেই ভুরু কুঁচকে বলেছিল সত্য,
'অপয়া' বলে কেঁদে মরছ কেন? ভগবান যার ভাগ্যে যা
রেখেছে তার তাই হবে। নিজেকে সমস্ত ঘটন-অঘটনের হেতু
ভেত? তুমি যদি না জন্মাতে এই পৃথিবীর কলকব্জা বন্ধ

...লী. তার সেই প্রায় সমবয়সী খুড়তুতো ননদের

সতীন এনে বুকে দিলে মেয়েমানুষ যেমন টি…
কিসে?

ওদিকে পাটমহলে মস্ত তোড়জোড়।

ফাঁড়া কেটেছে, এতদিন পরে ঘরবসত হচ্ছে মেয়ের, ঘরভরা জি… বাসনা পটলীর মা বেহুলার। জিনিস গোছাচ্ছে, আর উঠতে বসতে উপদেশ দিচ্ছে কিসে মেয়ে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে "একজন" হতে পারে। যে বড় ন্যাকা-হাবা, তাই ভাবনা বেহুলার।

তবে অন্যদিকে একটা মস্ত ভরসা আছে পটলীর মার। অলং… মুহূর্তে মেয়ের দিকে তাকিয়ে ছাখে আর সেই ভরসার আলো মুখে ফু… পটলীর সতীনের বয়সটা মনে মনে হিসেব করে সে আলো আরও … হয়। পটলীর সঙ্গে কার তুলনা?

একে তো ভরন্ত বয়েস, তায় আবার এইকাল অবধি বাপের ঘরে … ভাত খেয়ে খেয়ে গড়ন হয়েছে পুরন্ত বাড়ন্ত আর রূপ? সে … … ডাকসাইটে।

ঘরে পরে সবাই বরং ওই রূপের জন্যেই খোটা দেয় তাকে। বলে, "'বড় সুন্দরী না পায় বর' শাস্তরের এ কথাটা নতুন করে প্রমাণ করছিস তুই! এর থেকে আমাদের কালো খেঁদি মেয়েরা অনেক ভাল। তোর বয়সী সবাই তিন-চার ছেলের মা হল।"

এখন আবার ভয়ও দেখাচ্ছে অনেকে।

বলছে, "সতীন এখন হুলফুল দিলে হয়! এযাবৎ … পাটেশ্বরী রয়েছে। পটলীর মা, তুমি মেয়ের গলায় কোমরে ভালমতন রক্ষাকবচ দিও। কে জানে কার মনে কী আছে!…মেয়েকে বারণ করে দি… সতীনের হাতের পান জল না খায়।"

আশা আর আশঙ্কা, স্বপ্ন আর আতঙ্ক, এই নিয়ে দিন কাটাতে অবশেষে একদিন পটলীর জীবনের সেই পরম দিনটি এসে পড়ে। যাত্রা করে পটলী।

বাড়িটার খানিক খানিক ঝাপসা …
উঠোনটার বৌছত্তরের ওপর গিয়ে …

কথা শুনে। তার জীবনে এ হেন কথা সে কখনো শোনে নি। তাও আবার এতটুকু মেয়ের মুখে।

অথচ এই কদিন ধরে অনবরত সব গুরুজনের মুখে শুনছে পটলী, পটলীই নাকি সকল অঘটনের কারণ।

পটলীর দোষেই নাকি যত কিছু খারাপ।

সেই ননদ এখন নিশ্চয় শ্বশুরবাড়ি। কোন্ মেয়েটা আর পটলীর মত ফাণ্ডন নিয়ে বাপের বাড়ি বসে থাকে ?

তোড়জোড় এ বাড়িতেও চলছিল।

অভয়া যেন একটু বেশী-বেশীই করছেন।

করছেন ভালবেসে যতটা না হোক, লোক জানাতে। সারদা এবং সারদার 'সুয়ো'রা যাতে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, যে আসছে সে কারো করুণার ভিখিরী হয়ে নয়। আসছে রীতিমত অধিকারের দাবি নিয়ে।

অবিশ্যি 'ঘর'টা সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু উচ্চারণ করতে পারেন নি, বসে ইশারায় ইঙ্গিতে ব্যক্ত করছেন, এখন থেকে সারদার উচিত ছেলেদের শুধু এদিককার ঘরে শোওয়া। ছেলে ডাগর হয়ে উঠেছে, আর এখন 'ঘ আগলানো কেন ?

তবে সারদা এসব ইশারা-ইঙ্গিত গায়ে মাখে না। বড় ছেলে ডাগর হয়ে ওঠা অবধি তো তাকে তার কাকাদের কাছে ভর্তি করে দিয়েছে সারদা। নিজের এলাকা ঠিক রেখেছে।

বড় ছেলে 'বন্থ' বা বনবিহারী তো ছোটকাকা নেড়ুর প্রাণপুতুল ছিল, নেড়ু হারিয়ে যাওয়া অবধি অন্য কাকাদের। প্রাণপুতুল অবশ্য সকলেরই, কিন্তু সর্বেসর্বা প্রথম নাতিটিকে অভয়া যেন তেমন দেখতে পারেন না। ছেলেটা শুধু সারদার পেটের বলেই নয়, বড্ড বেশী মা-ঘেঁষা বলেও। তাই যখন তখনই তাকে খিঁচিয়ে বলতেন, "রাতদিন ছোটকাকা ছোটকাকা' ছোটকাকা যখন বিয়ে হয়ে যাবে ?"

মেজকাকা থাকতে ছোটকাকার বিয়ে কেন হবে, অথবা বিয়ে হলে ভাইপোর সঙ্গে সংঘর্ষ বাধবার কারণটা কি, এ প্রশ্ন করত না ছেলেট, শুধু সবেগে বলে উঠত, "ছোটকাকাকে বিয়ে করতে দেবই না।"

অভয়া আরও খিঁচিয়ে বলেন, "তা দিবি কেন ?

নেই, ভাগ নিয়ে কাজ নেই। একা তোর মা-ই সর্ব্বস্ব দখল করে বসে থাকুক।" তা' তার সেই ছোটকাকা নিরুদ্দেশই হয়ে গেল, বিয়ে আর হল না।

অভয়া ভাবেন এ ঐ অপয়া ছেলেটার বাক্যির ফল।

আর বাক্যিগুলো মার 'শিক্ষা'র ফল।

সারদা হাতের বাইরে বলে, অভয়া হাতের মুঠোয় পুরতে পারেন এমন একটি হাতের পুতুলের বাসনা করছেন। তাকে নিয়ে অভয়া সাজাবেন খাওয়াবেন চোখের ইশারায় ওঠাবেন বসাবেন।

"মেজবৌটা এলেও হত!"

অথচ অভয়ার মেজছেলের বিয়ের কথা মুখেও আনছেন না রামকালী। বরং একদিন বড় ভাইয়ের মুখের ওপরই স্পষ্ট বলেছিলেন, "ওই অপদার্থ টার বিয়ে দিয়ে কি হবে?"

"অপদার্থ" বলে যে বেটাছেলের বিয়ে হবে না, এমন ছিষ্টিছাড়া কথা কে কবে শুনেছে? কিন্তু কুঞ্জ চিরদিনই ছোট ভাইয়ের ভয়ে কাঁটা! সমালোচনা যা করেন, সে আড়ালে। তাই যা বলেছেন আড়ালেই বলেছেন। নিজে সাহস করে বিয়ের ব্যবস্থা করতে যান নি।

যাক, এতদিনে অভয়ার একটা নিজস্ব বস্তু পাবার আশা হচ্ছে।

কিন্তু একেবারে নিঃসংশয় সুখ জগতে কোথা?

নতুন বৌয়ের বয়সের কথা ভেবে বুকের মধ্যে তেমন স্বস্তি নেই।

বুড়ো শালিখ কি পোষ মানবে?

পাকা বাঁশ কি নুইবে?

কিন্তু পটলী কি পাকা বাঁশ?

কে জানে পটলী কি!

মেয়েমানুষ যতক্ষণ না নিজের স্বার্থ-কেন্দ্রে এসে দাঁড়ায়, ততক্ষণ তাকে কে চিনতে পারে? 'ভাল মেয়ে' 'লক্ষ্মী মেয়ে' এসব বিশেষণ কত ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়ে যায়।

[illegible] না জানলেও পটলীর ফাঁড়া কাটার খবর পাওয়া পর্যন্ত [illegible] কে যেন সেই বাঁশ দিয়ে অহরহ ডলছে তাকে।

রাসুরও যন্ত্রণার শেষ নেই।

মনের মধ্যে দারুণ এক ভয়, অথচ পুলককম্পিত আবেগ। না জানি সেই সাত বছরের মেয়েটি আঠারো বছরের হয়ে কেমনটি হয়েছে? এখান থেকে পত্তর নিয়ে যে গিয়েছিল, সেই রাখুর মা তো এসে বলেছে, "বৌ তো নয়, যেন পদ্মফুল!"

শুনে অবধি এক অবর্ণনীয় সুখকর যন্ত্রণা রাসুর মনকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

সেই পদ্মফুল কি রাসুর পুজোয় লাগতে দেবে সারদা? নাকি বহুদিন আগের সেই এক দুর্বল মুহূর্তের শপথটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বঞ্চিত করে রাখবে রাসুকে?

সারদা কোনদিনই পদ্মফুল নয়।

পদ্ম গোলাপ চামেলী মল্লিকা কিছুই নয়, ফুলের সঙ্গেই যদি তুলনা করতে হয় তো বলতে হয় বরং অপরাজিতার গা-ঘেঁষা।

কিন্তু শ্যামলা রং হলেও তীক্ষ্ণ মুখশ্রী আর অনবদ্য গঠন-সৌকুমার্যের জোরে এ বাড়ির বড়বৌ হয়ে ঢোকবার সৌভাগ্য তার হয়েছিল।

আর এখন প্রবল ব্যক্তিত্বের জোরে বাড়ির একেবারে শীর্ষস্থানীয় হয়ে বসে আছে সে। কিন্তু রাসু এখনো জীবনরসের সন্ধানী নবীন যুবক। প্রখরা আর মুখরা সারদাকে সে আজকাল ভয় করে।

অবশ্য স্বামীসেবার নিখুঁত নৈপুণ্যে বরকে আয়ত্তে রেখে দিয়েছে সারদা নিখুঁতভাবেই। এখনো গরমকালের রাতে পাখা ভিজিয়ে বাতাস করে স্বামীকে, শীতের রাতে পিদ্দিমে হাত তাতিয়ে ঠাণ্ডা সিরসিরে হাত-পা গরম করে দেয় তার।

আর সংসারের কাজে রান্নাঘরের গরমে যতই গলদঘর্ম হোক, শৌখিন বরটির কাছে রাতে শুতে আসার সময় গা-হাত ধুয়ে কোঁচানো মিহি শাড়িখানি পরতে ছাড়ে না, মাথায় দু তেলটি দিয়ে একটু চকচকে হয়ে আসতে ভোলে না।

কিন্তু প্রস্ফুটিত পদ্মের সঙ্গে কি গন্ধ তেল পাল্লা দিতে পারবে?

বৌ এসে দাঁড়াতেই একটা 'ধন্যি ধন্যি' রব উঠল। উঠল দু কারণেই। একে তো বৌয়ের রূপ, তার উপর ঘরবসতের সামগ্রীর বহর।

রামকালী কবরেজের সংসারে প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রাচুর্য, ঘর-সংসারের জিনিসপত্র তিনি অপ্রয়োজনেই কতকগুলো করে করিয়ে রেখে দেন, কোন একটা উপলক্ষ হলেই। খুঁজলে বাড়িতে ছোটয়-বড়য় খানবারো জাঁতা মিলবে, খানষোল শিল। জলের ঘড়া না হোক গোটা চল্লিশ-পঞ্চাশ। তবু মেয়েদের মন!

সেই শিল-নোড়া জাঁতা-কুলো ঘড়া-ঘটি ইত্যাদি করে সংসার নির্বাহের তুচ্ছ উপকরণগুলোই তাদের মন আহ্লাদে ভরে তোলে।

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে, 'কুটুমের নজর আছে।' ঠানদি নন্দরাণী হেসে বলে, "না-দেওয়ার মধ্যে দেখছি ঢেঁকি। একটা ঢেঁকি দিলেই রাসুর শ্বশুরের ষোলকলা দেওয়া হত! ঘরবসতে বৌমার বেহাই ওইটেই বা বাকী রাখল কেন?"

না, ঢেঁকিটা পটলীর বাবা দেয় নি।

কিন্তু পটলীকে দিয়েছে!

আর পটলীই ঢেঁকির মুষল হয়ে অন্ততঃ একজনের বুকের গহ্বরে পাড় দিতে শুরু করেছে।

তবু সেই ঢেঁকির পাড়ের মধ্য থেকেই শক্তি সঞ্চয় করে নেয় সারদা। সংকল্প করে এ সতীনকে সে স্বামীর ধারে কাছে আসতে দেবে না। সেই 'সিংহবাহিনীর' শপথটা রীতিমত কাজে লাগাবে।

তা ছাড়া আর উপায় কি!

রাসুকে তো চিনতে বাকী নেই সারদার। এই রূপসীর কাছে আসতে পেলে, রাসু তো তদ্দণ্ডেই মাথা মুড়িয়ে তার চরণে নিজেকে বিকিয়ে দেবে।

প্রথম দিন অবিশ্যি অভয়াই বৌকে কাছে নিয়ে শুলেন এবং অনেক রাত পর্যন্ত জেগে আর জাগিয়ে বৌকে জ্ঞানদান করতে চেষ্টা করলেন—এ সংসারে তার কে আপন, কে পর। কাকে সমীহ করতে হবে, আর কাকে সন্দেহ করতে হবে।

কিন্তু পরদিন কি হবে?

অথবা তারও পরদিন?

পর পর চিরদিন?

সারদা সেই কথাই ভাবতে থাকে।

আজ তো গেল। কিন্তু কাল?

এবং চিরকাল?

রাসুর জন্যে না হয় সিংহবাহিনীর শপথ। কিন্তু সংসারের আর দশজনের জন্যে কী ব্যবস্থা? তাদের প্রশ্নবাণ যখন বিষের প্রলেপ মেখে বুকে এসে বিঁধবে? কি উত্তর দেবে সারদা?

ঘরের প্রদীপ নেভানো, রাসু এখনো বারবাড়ি থেকে আসে নি।

বৈশাখের দুরন্ত বাতাসে বৈশাখী চাঁপার মদির গন্ধ, ছোট ছোট গবাক্ষ-পথেও সেই বাতাস ঝলকে ঝলকে ঢুকে পড়ছে, আর সারা ঘরে ছড়িয়ে দিচ্ছে তার সুবাস।

এই রাত্রি, এই মোহময় বাতাস, আর এই ব্যথায় টনটনে বুক। এর মাঝখানে কি মনে আনা যায়, সারদা অনেকদিন স্বামীসঙ্গ পেয়েছে, সারদার ছেলের বয়স এখন বারো!

ভাবা যায়, সারদার আর জীবনের ভোগপাত্রের দিকে হাত বাড়ানো শোভন নয়, স্বামীর অধিকার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে, ভাঁড়ারের হাঁড়িকুঁড়ির মধ্যে জীবনের সার্থকতা খুঁজে বার করাই এখন তার উচিত?

আশ্চর্য, আশ্চর্য, কিছুতেই কেন বিশ্বাস হচ্ছে না এই ঘর সারদা এত দিন ভোগ করছে?

বরং দৃষ্টি-অন্ধকার-করে-দেওয়া অশ্রু-বাষ্পের সঙ্গে বারে বারে মনে হচ্ছে, ক'দিনই বা!

মাঝে মাঝে কদাচ কখনো যে বাপের বাড়ি গিয়ে থেকেছে, সেইগুলোই যেন এখন মনে হচ্ছে বিরাট এক-একটা বিরতি!

কিন্তু গরীব গেরস্ত বাপ সারদার, কতই বা নিয়ে যেতে পেরেছে মেয়েকে? ওর এই ষোল-সতেরো বছরের বিবাহিত জীবনের মধ্যে দিন মাস ঘণ্টা মিলিয়ে হিসেব করলে না হয় চার-পাঁচটা বছর।

তা হলেও তো হাতে থাকে এক যুগ।

কখন কোথা দিয়ে পার হয়ে গেল সেই দীর্ঘ এক যুগ?

আস্তে আস্তে ঘরে এসে ঢুকল রাসু। বরাবর যেমন ঢোকে। সারদা যে ধরনটাকে ব্যঙ্গহাসিতে অভিষিক্ত করে বলে "চোরের মতন"।

এই নতুন বিয়ের বয়ের ভঙ্গীটা আর কোনদিনই বদলাল না রাসুর!

তবে কি সেও টের পায় নি কবে কখন তার বয়স আঠারো থেকে চৌত্রিশে এসে পৌঁচেছে? টের পায় নি, মাঝখানের সেই বয়সগুলো হাত ফসকে পালাল কি করে?

তাই আজও শয়নমন্দিরে ঢুকতে তার লজ্জা।

আজ কিন্তু সমস্তটা দিন রাসুর বড় যন্ত্রণায় কেটেছে। অব্যক্ত সেই যন্ত্রণাটা যেন ধরা-ছোঁওয়া যাচ্ছে না, শুধু মনটা ভারাক্রান্ত করে রেখেছে।

তা যন্ত্রণার কারণ আছে বৈকি।

এ যন্ত্রণা শুধু যে রূপসী স্ত্রীকে এখনো চোখে দেখতে পায় নি বলে তা নয়। কর্তব্যনির্ধারণের দ্বন্দ্বই বেচারী রাসুকে এত বিচলিত করছে।

অতঃপর রাসুর কর্তব্য কি?

পূর্ব শপথ স্মরণ করে দ্বিতীয়ার মুখদর্শন না করা? সারদার প্রতিই একান্ত অনুরক্তি রেখে চলা? না শপথটা একটা মুখের কথামাত্র বলে উড়িয়ে দিয়ে—

যন্ত্রণা এইখানেই।

উড়িয়ে দিলে সারদা যদি ভয়ঙ্কর একটা কিছু করে বসে? তা ছাড়া সারদা মর্মাহত হবে, সারদা রাসুকে ধিক্কার দেবে, ঘৃণা করবে, এ কথা ভাবতেও তো বুকটা ফাটছে।

অথচ সারদার প্রতি সেই আনুগত্যের শপথ রক্ষা করতে গেলে আর একটা নির্দোষ অবলা সরলার প্রতি অবিচার করা হয়। এত দিন পরে স্বামীগৃহে এসে স্বামীর এই নিষ্ঠুরতা দেখে, সেও কি দুঃখে লজ্জায় অভিমানে অপমানে দেহত্যাগ করতে চাইবে না? এতখানি আঘাত তাকে দেওয়া যাবে? যে নাকি "বৌ নয়, যেন পদ্মফুল!"

এই দোটানায় রাসু সারাদিন টুকরো টুকরো হচ্ছে।

তবু ঘরে ঢুকে সহজ হবার চেষ্টা করল রাসু। বলল, "উঃ, কী অন্ধকার!"

একটামাত্র মাটির প্রদীপে মস্ত একখানা ঘরের অন্ধকার দূরীভূত হয়, এ কথা রাসুর আমলে হাস্যকর ছিল না। তাই সেই দীপশিখাটুকুর অভাবেই রাসু বলল, "উঃ, কী অন্ধকার!"

কিন্তু ও পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে কোন সাড়া এল না।

রাসু যথানিয়মে দরজার হুড়কোটা এঁটে সরে এসে বলল, "পিদ্দিম জ্বাল নি যে ?"

এবার সারদা কথা বলল।

আর আশ্চর্য, ভিতরকার সেই বেদনা-বিধুর হাহাকার যখন 'কথা' হয়ে বেরিয়ে এল, এল তীক্ষ্ণ তীব্র একটি ব্যঙ্গের মূর্তিতে! হয়তো এইজন্যই 'স্বভাব' জিনিসটাকে মৃত্যুর ওপার পর্যন্ত বিস্তৃতি দেওয়া হয়েছে।

সারদা তীক্ষ্ণ হুল ফোটানোর সুরে বলে উঠল, "আর পিদ্দিম জ্বালার দরকার কি ? বাড়িতে যেকালে পূর্ণিমা চাঁদের উদয় হয়েছে !"

"পূর্ণিমা চাঁদ !"

রাসু সরল, রাসু অবোধ, রাসু এইমাত্র স্বর্গ হতে খসে পৃথিবীতে এসে পড়েছে। "পূর্ণিমা চাঁদ মানে ?"

"ও, মানে জান না বুঝি ?" স্বামীকে যেন বিদ্রূপে খানখান করে দেয় সারদা, "কেন, বাড়িসুদ্ধু সবাই এত ধন্যি ধন্যি গাইছে, আর তোমার কানে ওঠে নি ? তোমার দ্বিতীয়পক্ষর রূপেই তো ভুবন আলো গো! তাতেই আর তেল খরচা করে আলো জ্বালি নি !"

রাসু হঠাৎ বল সঞ্চয় করে বলে ওঠে, "মেয়েমানুষ বড় হিংসুটে জাত।"

"কী! কী বললে ?" সারদা যেন তীক্ষ্ণতার প্রতিযোগিতায় নেমেছে, "মেয়েমানুষ হিংসুটে জাত ?"

"তবে না তো কি ?"

"মহাপুরুষ পুরুষজাতটা একেবারে দেবতা, কেমন ?" সারদা ক্ষুব্ধ গর্জনে বলে, "কি বলব—মুখ ফুটে তুলনা করে দেখাতে গেলে মহাপাতকের ভয়, তবু বলি—মেয়েমানুষের অবস্থার সঙ্গে একবার নিজেদের অবস্থা মিলিয়ে দেখ না! পরিবার যদি একবার পরপুরুষের দিকে তাকায়, তা হলে তো মহাপুরুষদের মাথায় খুন চাপে।"

রাসু ধিক্কার-বিজড়িত কণ্ঠে বলে, "ছি ছি, কিসের সঙ্গে কী! পর-পুরুষের নাম মুখে আনতে লজ্জা করল না তোমার ? দ্বিতীয়পক্ষ বুঝি পরস্ত্রী ? ছিঃ !"

সারদা কিন্তু এ-হেন ধিক্কারেও বিচলিত হয় না, তাই অনমনীয় কণ্ঠে বলে, "তা দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ যত ইচ্ছে 'পক্ষ' জুটলে আর পরস্ত্রীতে দরকার ? মেয়েমানুষের তো আর সে সুবিধে নেই ?"

রাসু হতাশ কণ্ঠে বলে, "হিংসের জ্বালায় তোমার দিগ্বিদিক জ্ঞান ঘুচে গেছে বড়বৌ, তাই যা নয় তাই মুখে আনছ! নতুন বৌকে আমি আনাতে যাই নি, গুরুজনরা বুঝেসুঝে এনেছে। নইলে এতাবৎ কাল তো সেখানেই পড়ে ছিল!"

"ওঃ ইস! দুঃখু যে উথলে উঠছে দেখছি! পড়েই ছিল! আহা-হা, মরে যাই, অথই জলে পড়ে থেকেছিল একেবারে!"

সারদা ছুরি দিয়ে কেটে কেটে কথা বলে, "আমি কিন্তু সাফ কথা কয়ে দিচ্ছি, ভাগাভাগির ইল্লুতেপনায় আমি নেই। আমায় চাও তো ওকে স্পর্শ করতে পাবে না, আর ওকে চাও তো, আমি—"

হঠাৎ কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায় সারদার। আর এই রুদ্ধ কণ্ঠেই বড় ভয় রাসুর।

আরও হতাশ গলায় বলে সে, "তা আমায় কি করতে বলো? মাথার ওপরকার গুরুজনরা যে ব্যবস্থা দেবে তাই মানব, না চেঁচামেচি করে তার প্রতিবাদ করব?"

"কি করবে সে তোমার নিজের বিবেচনা! তুমিও কিছু কচি খোকাটি নও। মাথার ওপরকার গুরুজন যদি বিষ খেতে বলে, খাবে? খুড়োঠাকুর ধম্ম করলেন, ভদ্দরলোকের জাত রক্ষে করলেন আমার বুকে বাঁশ ডলে! এতই যদি ধম্মজ্ঞান, নিজেই কেন—"

"বড়বৌ!" হঠাৎ ধমকে ওঠে রাসু, "কি বলছ কি? উন্মাদ হয়ে গেলে নাকি?"

সারদা ঝপ করে বিছানায় শুয়ে পড়ে গম্ভীর গলায় বলে, "উন্মাদ হবার ঘটনা ঘটলে মানুষ উন্মাদ হবে, এ আর আশ্চয্যি কি? খুড়োঠাকুর যদি তখন আমার ঘর না ভাঙতেন, তা হলে বরং আজ ওনার ভাঙা ঘর ভরত।"

"বড়বৌ! কাকে নিয়ে তুলনা? এসব অকথা কুকথা মুখে উচ্চারণ করলেও মহাপাতক হয় তা জান?"

"মুখে উচ্চারণ করলে মহাপাতক, কিন্তু মনে? মনকে কেউ শাসিয়ে রাখতে পারে? যাগ গে, ভাল-মন্দ কিছুই বলব না আমি। আমার যা বলবার বলেছি।"

রাসু আপসের সুরে বলে, "অতই বা খাপ্পা হচ্ছ কেন বড়বৌ? তুমি ঘরণী গিন্নী, বলতে গেলে জোয়ান ব্যাটার মা। তোমার জায়গা কে কাড়ে?

তবে লোক-ত্মাখতা একটা কথা আছে তো? ওকে একেবারে ভাসিয়ে দিলে—"

সারদা গম্ভীরভাবে বলে, "মা সিংহবাহিনীর নামে দিব্যি গেলেছিলে, সে কথা বোধ হয় ভুলেই গেছ?"

"ভুলে যাব কেন," রাসু অসন্তুষ্ট স্বরে বলে, "কিন্তু লোকে কি বলবে, সেটাও তো চিন্তা করতে হবে?"

সারদা আবার ঝপ করে উঠে বসে। বলে, "কেন, লোককে বোঝাবার উপায় নেই? লোক বোঝাতে কত কল-কাঠি আছে! লোককে বলতে পারবে না, কোনও সাধু-ফকির তোমার হাত দেখে বলেছে, ওই দ্বিতীয় পক্ষের পরিবারকে স্পর্শ করলে তোমার পরমায়ু-ক্ষয় যোগ আছে?"

আটাশ

সংসারসুদ্ধ সকলেই আশা করেছিল প্রস্তাবটা সারদার দিক থেকেই উঠবে। কারণ সত্যিই কি আর এতটা বেয়াক্কেলে আর চক্ষুলজ্জাহীন হবে সে? কিন্তু আক্কেল সম্পর্কে নিতান্ত উদাসীন হয়েই অনেকগুলো দিন কাটিয়ে দিল সারদা। চক্ষুলজ্জার প্রকাশ দেখা গেল না।

তাহলে?

চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো ছাড়া তো উপায় নেই। কিন্তু সেই আঙুলটা বাড়ায় কে? যে মুখরা সারদা, সুযোগ পেলে গুরুজনকেও রেয়াত করে কথা কয় না। ঘোমটার মধ্যে থেকেই এমন কুটুস কামড়টি দেয়, তাতে কামড়াহতের সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরে যায়!

কাজেই আড়ালে-আবডালে সমালোচনা উদ্দাম হয়ে ওঠে। বস্তুতঃ এখনকার অবস্থা এই, সারদা যখনই যে কাজে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গিয়ে পড়ে, দেখে দু-তিনটি মুখ একত্র হয়ে গুঞ্জরণ করছে, সারদা গিয়ে পড়তেই ঝপ করে গুঞ্জরণটা থেমে যায়, এবং মুখগুলি বিভক্ত হয়ে গিয়ে সহসা যা হোক একটা কাজের কথা নিয়ে সোরগোল শুরু করে দেয়।

সারদা কি বোঝে না কি কথা হচ্ছিল ওদের? বোঝে বৈকি। বুঝে

মাথা থেকে পা অবধি 'রি রি' করে জলে ওঠে তার। তবু বুঝতে না পারার ভানটাই চালিয়ে যায় সে। চালায় এইজন্যে, জানে 'বুঝতে পেরেছি' বলার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত ব্যাপারটা নিরাবরণ হয়ে যাবে, যেটুকু চক্ষুলজ্জার আড়ালে-আবডালে রেখে ঢেকে বলছে ওরা, সেটুকু ঘুচে গিয়ে প্রকাশ্য আক্রমণের পথে নেমে আসবে। কাজেই, ওই মুখোমুখিটা যতক্ষণ এড়ানো যায়!

তা ছাড়া এমনিতেই সারদা বিশেষ আত্মস্থ, গায়ে পড়ে কিছু বলতে যাওয়া বা জবাব দিতে যাওয়া ওর স্বভাবই নয়।...

কিন্তু ওঁরাই এবার গায়ে পড়ে বলতে আসার সংকল্প গ্রহণ করেছেন। সারদার নিজের শাশুড়ী আর পিসশাশুড়ী শশীতারা। এই পিসশাশুড়ীটিকে জীবনে এই প্রথম দেখল সারদা। কারণ প্রায় বছর তিরিশ পরে তিনি পিত্রালয়ে এসেছেন। এতদিনের বিরতির কারণ অবশ্য বৈবাহিক-কলহ। তা দুই বৈবাহিকের একজন তো বহুদিন গত হয়েছেন, কুঞ্জ রামকালী আর শশীতারার বাবা জয়কালী। অপরটি, অর্থাৎ শশীতারার শ্বশুর নাকি এতদিন বেঁচে থেকে পুত্রবধূর পিত্রালয়ের পথের কাঁটাটি দৃঢ়মূল রেখেছিলেন।

সম্প্রতি তাঁর শ্রাদ্ধ চুকেছে, শশীতারা এত বছর পরে পিত্রালয়ে এসেছেন। এখন কিছুদিন থাকবেন।

এসে দিন দুই লেগেছে তাঁর সংসারের হালচাল বুঝতে, তারপর কার্যক্ষেত্রে নেমেছেন। সংসারে নিজের ভাই কুঞ্জর প্রতিপত্তিহীন অবস্থা, ও সতাতো ভাই রামকালীর 'বোলবোলাও দাপট'টা তাঁর বুকে শেল বিঁধেছে, এবং রাসুর 'প্রথম পক্ষ'র নির্লজ্জতায় গালে হাত দিতে বাধ্য হয়েছেন তিনি।

অবাক হয়ে বলেছেন, "হ্যাগা, ও বুড়োমাগী গায়ের জোরে বর আগলে বসে থাকবে, আর সোমত্ত যুবতী বৌটা শাশুড়ীর ঘরে শুয়ে ঘরের 'আড়া' গুনবে? এই তোমরা চলতে দিচ্ছ? বলি ছেলেটার কথাও তো ভাবতে হবে? তার টাটকাটি রইল ধামাচাপা দেওয়া, আর শুকনো বাসিটায় মন সন্তোষ করে থাকার জুলুম? এতখানি বয়সে এমন কথা শুনি নি দেখি নি।"

সারদার শাশুড়ী সুদীর্ঘকালের অদেখা ননদিনীটিকে পরম আত্মীয়ের

অধিকার দিয়ে বিগলিত স্বরে বলেন, "দেখ ঠাকুরঝি, দেখ। যত থাকবে ততই বুঝবে। একে তো তোমার দাদার ওই মিনমিনে স্বভাবের জন্তে আমি চিরদিন বড় হয়েও ছোট, হাঁড়ি-হেঁসেল ছাড়া আর কিছু দেখলাম না। তার ওপর বৌটি হয়েছেন জাঁহাবাজ। এমনিতে দেখবে ওকে কারুর দাতে-পাঁচে নেই, কিন্তু অহঙ্কারে মটমট। কারুর মতে চলাতে যাও দিকি? চলবে না। আর এমন রাশভারী প্রিকিতি, ডেকে একটা কথা বলতে সাহস হয় না।"

"তোমাদের হয় না, আমার হবে।" শশীতারা দৃঢ় রায় দেন, "এ নিঘিন্নেপনার বিহিত আমি করে ছাড়ব।"

বিহিত করতে ভাজকে নিয়ে এজলাসে এসে আসামীকে তলব করলেন শশীতারা।

সারদা এল, ঘাড় হেঁট করে বসে ঘোমটার মধ্যে থেকেই মৃদু অথচ স্পষ্ট স্বরে বলল, "কি বলছ?"

শশীতারা নড়েচড়ে বসে হাতপাখা নাড়তে নাড়তে বললেন, "বলছি একটা নেয্য কথা। মনে কিছু করো না। আক্কেল যাদের শরীরে নেই, তাদের আক্কেল করাতে হলে চোখে আঙুল দেওয়া ভিন্ন তো গতিও নেই। তাই দেব। তাতে চোখে যদি তোমার জ্বালা ধরে, আমায় কিন্তু দুষো না বাছা!"

সারদার কণ্ঠ থেকে একটু হাসির আওয়াজ পাওয়া গেল, "তোমাদের দুষব? এত আসপদ্দা আমার পিসীমা?"

"আসপদ্দা!" শশীতারা পাখার বেগটা বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, "না, আসপদ্দা তোমার দেখি না বটে, কিন্তু আক্কেলটুকুও তো তিলমাত্তর দেখি না বাছা? নতুন বৌমার দিকটা তো একেবারে ভাবছ না!"

পরক্ষণে শশীতারা আর তার ভাজকে অবাক করে দিয়ে সারদার মৃদুকণ্ঠের স্পষ্ট স্বর ধ্বনিত হয়, "আমি না ভাবলাম, তোমরা এতজনে তো ভাবছ!"

"এতজনে ভাবছি? আমরা এতজনে ভাবছি! তুমি যে অবাক করলে বড় বৌমা! আমরা ভেবে তার কী উবগারটা করতে পারব শুনি? তুমি এদিকে আত্মঘাতী হবার ভয় দেখিয়ে সোয়ামীকে শাসিয়ে রেখেছ, ভয়ে

কাঁটা হয়ে আছে সে, আমরা কি করব? এই তো সিদ্দিনকে রাত্তিরে ছোঁড়াকে হাত ধরে হিঁচড়ে এনে বললাম, 'রাসু, তুই ইদিকে আয়। ঘরের তো অভাব নেই বাড়িতে! এ ঘরে নবাবী পালঙ্ক না থাক, সোয়ামী পেলে নতুন বৌয়ের এখন আমতক্তাই রাজতক্ত।' তা আনতে কি পারলাম? ভয়ে সিটিয়ে হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে গেল। বলে কি, 'তাহলে তোমাদের বড়বৌ আপ্তঘাতী হবে।'···হ্যাঁ গা, বাপ তো তোমার শুনলাম ভালমানুষ, তোমার এ কী ছোটলোকমি!"

শশীতারার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে যেন একটা তীব্র বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে। বিদ্যুৎটা আর কিছু নয়, সারদার চোখের আগুন। হঠাৎ মুখ তুলতে গিয়ে মাথার ঘোমটাটা খসে গিয়েছিল সারদার। ঘোমটাটা আবার একটু তুলে মুখ প্রায় অনাবৃত রেখেই সারদা বলে, "দশচক্রে ভগবান ভূত হয় পিসীমা, তার মানুষ তো কোন্ ছার! পাকেচক্রে ভদ্দরলোকের মেয়ে ছোটলোক হয়ে উঠবে এতে আর আশ্চয্যি কি!"

একে মুখ খোলা, তাতে এই বাক্যি!

সারদার শাশুড়ী বোধ করি নিজের মর্যাদা সম্পর্কে এবার সচেতন না হয়ে পারেন না। তাই নথপরা মুখ ঘুরিয়ে বলে ওঠেন, "মুখের ঘোমটা খুলে শাশুড়ীদের সঙ্গে ঝগড়া করছ তুমি বড় বৌমা! বুকের পাটা তোমার এত কিসের! জান, জন্মের শোধ বাপের বাড়ি বিদেয় করে দিতে পারি তোমায়?"

এজলাসটা বোধ করি সারদার ধারণার জগতে ছিল, আর সওয়ালের জন্যে প্রস্তুতও ছিল সে। তাই তীক্ষ্ণ একটু হাসির সঙ্গে বললে, "জন্মের শোধ যদি যেতেই হয় তো বাপের বাড়ি যাব কেন? যমের বাড়ি তো কেউ কেড়ে নেয় নি!"

শশীতারা এবার চাকা নথ ঘুরিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, "যমের বাড়ির ভয় দেখিয়ে আমাদের জব্দ করতে পারবে না বড় বৌমা, আমরা রাসু নই। বলি ওই যে একটা বড়ঘরের মেয়ে এসেছে, যার বাপ ঘরবসতের দ্রব্যিতে বাড়ি ভরিয়ে দিয়েছে, তার দাবি-দাওয়াটা মানবে না তুমি? আর ওই রূপের কান্তি টাটকা পদ্মফুল, সোয়ামীকে তুমি এর ভোগ থেকে বঞ্চিত করছ, এতে যে তোমায় নরকেও ঠাঁই হবে না!"

হঠাৎ হেসে উঠে সারদা দিব্যি স্পষ্ট গলায় বলে, "ভালই তো পিসীমা!

নরকে ঠাঁই না হলে সগ্গে যাব। তুটো বৈ তো আর দশটা জায়গা নেই!"

তুটো গিন্নীকে হতবাক করে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় সারদা। "তালের বড়া খেতে চেয়েছে ছোট ঠাকুরপো, তালগুলো মেড়ে রাখিগে।"

অর্থাৎ তোমাদের কাঠগড়া থেকে ফসকে পালাচ্ছি এবার।

শশীতারা বোঝেন, যেমন ভেবেছিলেন ঠিক তেমনটি নয়। ধিক্কার দিয়ে বিচলিত করে কার্যসিদ্ধি করা যাবে না। অন্য চাল চালেন তিনি। বলেন, "সভ্যতা-ভব্যতার পাঠশালায় দেখছি একেবারেই পড় নি তুমি বড় বৌমা! গুরুজনের সামনে থেকে অনুমতি না নিয়ে উঠতে, আমি আমার শ্বশুরবাড়ির দিকের কোন ঝি-বৌকে কখনও দেখি নি। আমরা নিজেরাও—গুরুজন ডেকে একটা কথা শুধোলে ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ হুঁ' করে উত্তর দিয়েছি, উঠে যেতে না বললে ঘাড় গুঁজে বসে থেকেছি।"

সারদাকে এতেও অপ্রতিভ করা যায় না, সে তেমনি মৃদু হাসির সঙ্গে বলে, "বসবার অবকাশ থাকলে তো বসে থাকাও একটা সুখ পিসীমা!"

"হুঁ! কথার পিঠে কথা দেওয়াই তোমার রোগ দেখছি। হাবাগঙ্গা শাউড়ী পেয়েছ, তাই এমন তুরবস্থা হয়েছে। যাক বলি শোন, আপস-মীমাংসার কথাই কইছি। ঘরণী গিন্নী বেটার মা তুমি, অনেকদিন তো সোয়ামীকে ভোগ করলে! ওকে একেবারে ভাসিয়ে দিলে চলবে কেন? ওরও আগুন-সাক্ষী বিয়ে। আমি বলি কি একটা পালা ঠিক করো।"

মনে মনে হাসেন শশীতারা, একবার যদি রাসুকে নতুনের নেশা ধরিয়ে দেওয়া যায়, তার পর দেখা যাবে তোমার কত আদর থাকে! দেখা যাবে কোথায় থাকে তোমার ঐ তেজ! ওই বৌয়ের আস্বাদ পেলে, তুমি গলায় দড়ি দিলে, কি জলে ডুবলেও কিছু এসে যাবে না রাসুর!

'পালা'র বুদ্ধিটা মাথায় আসার জন্যে নিজেকে নিজে তারিফ করেন শশীতারা।

কিন্তু সারদা সে তারিফ বেশীক্ষণ বজায় থাকতে দেয় না। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে, "তোমাদের অনুমতি না নিয়েই যাচ্ছি, পিসীমা! এসব নিচু কথা শুনতে মাথা কাটা যাচ্ছে।"

"অ্যাঁ অ্যাঁ? কী বললি? আমরা নীচু কথা কইছি? ছোটলোকের বেটি.

হাঘরের মেয়ে! বলতে জিভ আড়িয়ে গেল না?" শশীতারা ধেই ধেই করে নেচে ওঠেন, "খুব উঁচু কথাটা তুমি কইছ বটে! একলা খাব, একলা পরব, একলা ভোগ করব, এই তো মহত্ত্বের কথা! 'পালা' করাটা নিচু কথা হল! বলি তাতে তো দু দিকই রক্ষে হয়!"

সারদার বোধ করি কী একটা কঠিন কথা মুখে আসে, কিন্তু সেটা কষ্টে দমন করে বলে, "দু দিক রক্ষের দরকার নেই, এক দিকই রক্ষে করো তোমরা।"

এরপর আর দাঁড়ানো চলে না।

মান-সম্মান বজায় রাখা শক্ত হবে। সারদার নিজের চোখই তাকে অপদস্থ করে ছাড়বে।

দু-দুটো গিন্নীকে পাথর করে দিয়ে চলে যায় সারদা।

এই চরম অপমানের মুহূর্তে ভুবনেশ্বরীকে মনে পড়ে তার। সারদার ভাগ্যটাই মন্দ, নইলে অমন একটা স্নেহের আশ্রয় হারায় সে? ভুবনেশ্বরীর কি এখন মরবার বয়স?

হ্যাঁ, সারদা নির্লজ্জ, সারদা বেহায়া, সারদা স্বার্থপর। কিন্তু পরার্থপরতায় উদার হবার ভাগ্য সে পেল কবে? ভাগ্য যে তাকে বঞ্চনাই করেছে। আর সে বঞ্চনা এসেছে তার গুরুজনদের হাত থেকেই।

গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা সম্মান তার আসবে কোথা থেকে? বিষপাত্রের বিনিময়ে কে অমৃতপাত্রের উপহার নিয়ে হাত বাড়ায়?

শশীতারা গালে হাত দিয়ে অভয়াকে উদ্দেশ করে বলেন, "মান্যে বড় গুরুজন তুমি বৌ, তোমার পায়ের ধুলো নেবারই কথা। তবু বলি তোমার পায়ের ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে ইচ্ছে করছে। এই কাল্‌কেউটে নিয়ে ঘর করছ তুমি?"

কুঞ্জ-গৃহিণী কপালে হাত ঠেকিয়ে বলেন, "অদেষ্ট ঠাকুরঝি!"

আসল কথা "অদেষ্ট"টা তাঁর নিজের কাছে ধরা পড়েছে এই সম্প্রতি। ননদিনীর দিব্যদৃষ্টির প্রভাবে। এবং এযাবৎ যত বোকামি করে এসেছেন, সুদে-আসলে সেটা উসুল করে নিতে ইচ্ছে হচ্ছে তাঁর!

"ওই কালনাগিনীর দিক থেকে রাসুর মন একেবারে ঘুরিয়ে দিতে পারি, এমন 'ওষুধ' আমার জানা আছে বৌ—" শশীতারা চাপা হিংস্রস্বরে বলেন,

"অব্যর্থ তুক। রাসু তোমার ছটফটিয়ে এসে নতুন বৌর পায়ে এসে পড়বে, বড়বৌকে জন্মের বিষ দেখবে!"

ভাজ অবাক হয়ে বলেন, "সত্যি ঠাকুরঝি, তেমন ওষুধ তোমার জানা আছে?"

শশীতারার মুখে একটি বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে, "জানা না থাকলে আর তোমার নন্দাইকে অমন কেনা গোলাম করে রেখেছি? বয়সকালে কি কম দুর্দান্ত ছিল নাকি? সম্পর্ক অসম্পর্ক মানত না, রূপসী মেয়েমানুষ দেখলেই উন্মাদ হয়ে উঠত। এক বাগদীবুড়ী শেখাল আমায় সেই তুক, তার পর থেকে এমন নেলাখেপা হয়ে গেল যে, আমি বৈ আর কিছু জানে না। আমি উঠতে বললে ওঠে, বসতে বললে বসে, খেতে বললে খায়, ঘুমুতে বললে ঘুমোয়। আমার মুখের দিকে ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে থাকে। আমি বলি থাক্, ওই আমার ভাল, নাই বা রোজগার করল, নাই বা হট্টগোল করে বেড়াল, ভাতের তো অভাব নেই ঘরে! আমার আঁচলটিতে তো বাঁধা রইল জন্মের শোধ!"

রাসুর মা ইতস্তত করে বলেন, "কোন শেকড়বাকড় নাকি? রাসুর কোন ক্ষেতি হবে না তো?"

"শোন কথা! সে কাজ আমি করব? এ আর কিছুটি নয়, শুধু একজনের থেকে মন ঘুরে আর একজনের ওপর পড়া। তাহলে বলি শোন, তোমার কপালক্রমে এই পরশুই আমাবস্তে আসছে—একেবারে দুপুররাতে নতুন বৌমা যদি এলোচুলে বিবস্ত্র হয়ে একটা কলাগাছের গোড়ায় এক ঠোকায় একটি ছুঁচ বিঁধে দিয়ে আসতে পারে, তাহলে—"

কথা শেষ হয় না শশীতারার, সারদার ছেলে দৌড়ে এসে বলে, "তোমরা শীগগির চলে এস, মেজঠাকুদ্দা অজ্ঞান হয়ে গেছে।"

মেজঠাকুদ্দা!

মানে রামকালী?

যিনি জ্ঞানের পারাবার! রামকালী অজ্ঞান হয়ে গেছেন, এ কী অদ্ভুত ভাষা?

সকলেই দৌড়ায়।

তবে কি রামকালীও ভুবনেশ্বরীর মত বিনা নোটিশে—

ব্যাপারটা এত জানাজানি হল, ভিতরবাড়িতে পড়ে গিয়ে। বারবাড়িতে পড়লে অন্ততঃ মেয়েমহলের দল এভাবে ধারে কাছে গিয়ে হা-হুতাশ করতে পারত না।

যাদের স্পর্শের অধিকার আছে, তারা মুখে মাথায় জল ঢেলে, গঙ্গা বইয়ে দিল, বাড়িতে যত হাতপাখা এনে জড় করল। এ শুধু দুর্ভাবনাই নয়, এক প্রকার রোমাঞ্চও। যে মানুষটার মুখের দিকে কেউ কোনদিন স্পষ্ট করে তাকিয়ে দেখবার সাহস পায় নি, সে মানুষটা অসহায় ভাবে চোখ মুদে পড়ে আছে, তাকিয়ে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কেমন তার নাকমুখ, করুণা করা যাচ্ছে তাকে জল দিয়ে বাতাস দিয়ে, এটা প্রায় সুখের পর্যায়েই পড়ে।

সারদাও একখানা হাতপাখা নিয়ে এসেছিল, আর দূর থেকে বাতাস করছিল, এবং ভাবছিল, আশ্চর্য, এতদিন ঘর করছি, মানুষটা কেমন দেখতে তা তো কোনদিন দেখি নি। একেই কি বলে "তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণাভাং—"

ভয়ঙ্কর একটা আবেগের আলোড়নে চোখে ছলাৎ করে জল এসে যায় সারদার, এ হেন স্বামীকে ফেলে চলে যেতে হয়েছে মেজখুড়ির? আর তাই বুঝি স্বর্গেও তিষ্ঠোতে পারছেন না, আকর্ষণ করে টেনে নিয়ে যেতে চাইছেন নিজের কাছে? মনের মত স্বামী এমনি জিনিস! তার পর চোখ মুছে ভাবল, মেজখুড়ো আমাদের মায়া কাটিয়ে চললেন!

কিন্তু আপাতত দেখা গেল সারদার আশঙ্কা অমূলক। চিরশান্ত চির-সুকুমার ক্ষীণশক্তি ভুবনেশ্বরীর আকর্ষণ মাধ্যাকর্ষণের চেয়ে জোরালো হল না।

রামকালী চোখ মেললেন।

চারিদিকে এতগুলো মুখ দেখে ভুরুটা ঈষৎ কুঁচকে গেল, আবার চোখ বুজলেন। আর অনেকক্ষণ পরে বললেন, "আমাকে বাইরে চণ্ডীমণ্ডপে বিছানা করে দাও।"

হ্যাঁ, বাইরেই শুলেন রামকালী। মেয়েদের এই হা-হুতাশ তাঁর অসহ্য, নিজের কাছে নিজে ভয়ানক লজ্জিত হচ্ছেন। রামকালীর পক্ষে এ হেন দুর্বলতা ক্ষমার অযোগ্য। রামকালী জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন, পাঁচজনে মুখে-মাথায় জল দিল, হা-হুতাশ করল, এর চাইতে ঘৃণ্য ব্যাপার আর কি আছে।

এ রকমটা হল কেন?

অনেকদিন থেকেই যেন ভিতরে ভিতরে একটা ক্ষয় চলছে, যেন একটা ভাঙনের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন। শরীর খারাপ হয়ে গেছে। সেই থেকেই গেছে।

রামকালীর মধ্যেও একটা আবেগের আলোড়ন উঠল। সেই ছোটখাটো মানুষটা, যাকে রামকালী কোনদিনই পুরো একটা মানুষ বলে গণ্য করেন নি, সে যে দৃঢ়কঠিন রামকালীর ভিতরের এতটা শক্তি হরণ করে ফেলবে, এ রামকালীর ধারণার মধ্যেই ছিল না।

ভুবনেশ্বরী সম্পর্কে যেন তাঁর একটা বাৎসল্যমিশ্রিত প্রীতি ছিল, জীবনের কোন আদর্শে, কোন চিন্তায়, কোন সুখদুঃখে তাকে ডাক দেন নি। আজ মনে হচ্ছে, সম্পূর্ণ বিচার করেন নি রামকালী স্ত্রীর উপর। চিরদিন যাকে ছোট ভেবে এসেছেন, সে হয়তো তেমন ছোট ছিল না, যাকে সামান্য ভেবেছেন, সে হয়তো সামান্য নয়। রামকালী যদি তাকে স্নেহের সঙ্গে কিছু শ্রদ্ধাও দিয়ে হৃদয়ের সহধর্মিনী করে তুলতে পারতেন, হয়তো সারাটা জীবন এতখানি নিঃসঙ্গ হয়ে থাকতেন না।

মৃত্যুর মহিমায় ভুবনেশ্বরী যেন বড় হয়ে উঠেছে।

বিছানায় শুয়ে শুয়েই সংকল্প করলেন রামকালী, শীঘ্রই তীর্থযাত্রা করবেন। বায়ু-পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছে।

বায়ু পরিবর্তন ভিন্ন ভাঙন ধরা স্বাস্থ্যের ক্ষয়পূরণ সম্ভব নয়।

তীর্থযাত্রার সংকল্প ঘোষণা করলেন রামকালী।

দু-তিনটে দিন রামকালী সম্পর্কে উদ্বেগ নিয়েই দিন গেছে সকলের, রাসু বারবাড়িতে চণ্ডীমণ্ডপেই রাত কাটিয়েছে কাকার নিষেধ সত্ত্বেও, চুপি চুপি—তাঁর অলক্ষ্যে।

আজ আবার স্বাভাবিকত্ব এল সংসারে। যদিও রামকালীর তীর্থযাত্রার সংকল্পে ভয় ভাবনা আতঙ্ক দেখা দিল, তবু সেটা তো আজই নয়। তীর্থযাত্রার অনেক তোড়জোড়।

রাসুকে আজ শশীতারা আবার ডেকে পাঠালেন। বললেন, "দেখ্ পুরুষের চামড়া যদি গায়ে থাকে তো, বৌয়ের নাকেকান্নায় ভিজিস নে। আপ্তঘাতী অমনি হলেই হল! আজ তুই ইদিককার ঘরে শুবি।"

তিন-তিনটে রাত বাইরের ঘরে কাটিয়ে রাসুরও মন চঞ্চল, এ প্রস্তাবে আরও চঞ্চল হয়ে ওঠে। অথচ সায় দেবার উপায় নেই। এ যেন পেটে খিদে, সামনে সুখাদ্য, অথচ মুখ বাঁধা!

তা ছাড়া রাসু সারদা নয় যে, এসব কথার পিঠে কথা কইবে। লজ্জায় ঘাড় হেঁট করে থাকে সে। শশীতারা বোঝেন মৌনং সম্মতি লক্ষণম্! হৃষ্টচিত্তে বলেন, "তোকে কিছু ভাবতে হবে না, তুই শুধু খাওয়ার পর আমার ঘরে এসে বসবি। পিসি-ভাইপোয় গল্প করবার ছুতোয় রাতটা একটু ঘোর করে দেব, তার পর—আহা নতুন বৌটার মনের দিকে একটু তাকাবি না তুই? ভাববি না তার কথা?"

রাসুর চোখে জল এসে পড়ে, সে তাড়াতাড়ি সরে যায়। নতুন বৌয়ের কথা ভাবছে না সে? অহরহই তো ভাবছে।

কিন্তু যাকে নিয়ে এত দুর্ভাবনা শশীতারার, সে কোথায়? পাটমহলের লক্ষ্মীকান্ত বাঁড়ুয্যের নাতনী পটলী!

সে যেন একটা অদ্ভুত ভয়ে কাঠ হয়ে আছে। এতদিন অবশ্য সে চিনে ফেলেছে কে তার সতীন। সতীনকে যে এতটাই ভীতিকর মনে হয় তা বুঝি ধারণা ছিল না তার। সারদার মুখের দিকে কোনদিন ভাল করে তাকাতে পারে না সে। কথা বলা তো দূরের কথা।

অথচ সারদা হরদমই তার সঙ্গে কথা বলে। সংসারের সবাইকে খেতে দেওয়ার ভার যে সারদারই হাতে—অগত্যাই পটলীকেও তার হাতে পড়তে হয়েছে। তার শাশুড়ী দু-চারদিন নিজের এক্তারে রাখবার চেষ্টা করে অক্ষমতাবশতই হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

সারদা ফি হাত ডাকে, "নতুনবৌ খাবে এসো,...নতুনবৌ এখন মুড়ি খাবে?...নতুনবৌ তুমি মাছের পেটি ভালবাস না দাগা?...নতুনবৌ তুমি ছ্যাঁচা আমের আচার খাও না?...নতুনবৌ আচারের তেল দিয়ে কৎবেল মেখে খেয়েছ কোনদিন? খাবে তো বল মাখি?"

নতুনবৌ যে কার নতুন বৌ সে কথা যেন জানে না সারদা। কুটুম্বের মেয়ে এসেছে, তাকে আদরযত্ন করছে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

আজও ফুলুরি আর তিলপিটুলি বেগুনভাজা করে একবাটি হাতে নিয়ে ডাকতে এসেছিল সারদা নতুনবৌকে, "খাবে গরম গরম?"

পটলী মাথা নেড়ে বলল, "না!"

সারদা একটু আশ্চর্য হল। কারণ নতুনবৌ কোনদিন কিছুতেই 'না' করে না। করে না বলে মনে মনে বরং একটু কৌতুকই অনুভব করে সারদা। ভাবে, ভাল করে খাইয়ে-দাইয়ে ঠাণ্ডা করে রাখা যাবে ওকে।

পটলী যে ভয়েই 'না' করতে পারে না, সেটা বোঝে না সারদা। হয়তো বোঝার কথাও নয়। আজ 'না' শুনে বলে, "কেন গো খাবে না কেন, খিদে নেই?"

পটলী মাথা আরও নিচু করে মাথাটা আর একবার নাড়ে।

সারদা একটু চুপ করে থেকে মুচকে হেসে বলে, "কেন বল তো নতুনবৌ? তোমার তো কখনও অগ্নিমান্দ্য দেখি নে?"

এরপর নতুনবৌয়ের দিক থেকে কোনও সাড়া আসে না, শুধু তার ঘাড়টা আরও নুয়ে পড়ে। সারদা চলে যেতে উদ্যত হয়ে বলে, "তবে নয় দুটো তিলেরনাড়ু পাঠিয়ে দিই গে, খেয়ে জল খাও।"

এবার হঠাৎ নতুনবৌ বলে ওঠে, "তুমি আমায় এত যত্ন করো কেন?"

সারদা বোধ করি এ প্রশ্নের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না, তাই হঠাৎ একটু থতমত খেয়ে যায়, তবে সে মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই তীক্ষ্ণ একটু হেসে বলে, "করব না কেন, যত্ন করবারই তো সম্পর্ক গো!"

এতক্ষণ ঘাড় নিচু ছিল, এবার বোধ করি অজ্ঞাতসারেই মুখটা তুলে ফেলে পটলী, আর দীর্ঘ পল্লবাচ্ছন্ন দুটি চোখের কোল বেয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে তার। সে চোখের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে একটা অসহায় ভর্ৎসনা। সে দৃষ্টি সারদার উপর নিবদ্ধ রেখেই বলে, "তামাশা করছ?"

মুখরা সারদা সহসাই যেন মূক হয়ে যায়। ওই দুফোঁটা চোখের জলের দিকে তাকাতে পারে না, আর ভগবান জানেন কোন্ এক অদ্ভুত হৃদয়-রহস্যে সারদার নিজের চোখ দুটোও জলে ভরে ওঠে।

তবু নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলে, "করলামই বা একটু তামাশা? করতে নেই?"

পটলীর বোধ করি এতক্ষণে খেয়াল হয় যে, তার চোখ দুটো শুধু দু ফোঁটা জল ফেলেই ক্ষান্ত হয় নি। তাই সে দুটোকে নামিয়ে ফেলে এবার। আর কষ্টে গলার স্বর পরিষ্কার করে বলে, "আমি তো তোমার শত্তুর, আমাকে বিদেয় করে দাও না? তুমি বাঁচ, আমিও বাঁচি।"

সারদা ঈষৎ বিষণ্ণ কৌতু-ক বলে, "আমি না হয় বাঁচব, তোর বাঁচবার হেতু ?"

"তোমার বুকের পাথর হয়ে আর সংসারসুদ্ধ সকলের দয়ার পাত্র হয়ে থাকতে হয় না, সেই বাঁচান !"

সারদা আর একবার মূক হয়। দেখে নতুনবৌয়ের হেঁটমুণ্ডের অন্তরাল থেকে জল ঝরে ঝরে তার কোলের উপর জড়ো-হয়ে-থাকা ফর্সা ফর্সা ফুলো ফুলো দুখানি করপল্লবের ওপর পড়েই চলেছে।

স্তব্ধ হয়ে অনেকক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে থাকে সারদা, তার পর সহসাই আত্মস্থ হয়ে শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে বলে, "চোখ মোছ্ নতুনবৌ, আর কাঁদতে হবে না।"

"তোমার পায়ে ধরি দিদি, আমায় পাঠমহলে পাঠিয়ে দাও।"

"শোন কথা, আমি কি পাঠিবে দেবার কর্তা ?" সারদা হেসে ওঠে, "বলে আমার ওপরই হুকুমজারি হয়েছে—"জন্মের শোধ বিদেয় ! সে যাক, বলি এত রূপ-যৌবন নিয়ে কেঁদে মরবি আর হেরে পালাবি কি লো ? লড়াই করে সতীনের কাছ থেকে বর কেড়ে নিবি নে ?"

"লড়াই-টড়াই আমি কিছু চাই না দিদি !"

"লড়াই চাস না ? কি মুশকিল তবে তো খয়রাত করতে হয়," সারদা তেমনি বিষণ্ণ কৌতুকে বলে, "তুই দেখছি আমার সব মজা মাটি করে দিলি। লড়াই করতে বসলে জোরের পরীক্ষে হয়, দান-খয়রাত করতে গেলে যে বেবাক সবটাই তুলে দেওয়া ছাড়া গতি থাকে না !"

"আমার কিছু চাই না দিদি !"

ব্যাকুল আবেগে উচ্চারণ করে নতুনবৌ।

সারদা হাসে, "কিছু চাস না ? বরও চাস না ?"

"না।"

সারদা বলে, "কিন্তু জগতের কি নিয়ম জানিস, না চাইলে সব জিনিস মেলে, চাইতে বসলেই হাতছাড়া !...ইস্, কথা কইতে কইতে এমন খাসা তিলপিটুলী বেগুনভাজাগুলো নেতিয়ে গেল ! খা, খেয়ে ফেল্, মন ভাল হবে।"

"মেজঠাকুদ্দা !"

রামকালী একখানা সরু খাতার উপর ঝুঁকে পড়ে আসন্ন তীর্থযাত্রার হিসেবের খসড়া করছিলেন, হঠাৎ রাসুর ছোট ছেলের এই ডাকে চমকে স্নেহকোমল স্বরে বললেন, "কি দাদা ?"

"মা বলছে, মা তোমার কাছে ভিক্ষে চাইবে।"

এ আবার কী অভূতপূর্ব কথা !

রামকালী বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেন।

দরজার ওপাশে রাসুর বৌয়ের উপস্থিতি টের পান। প্রায় বিচলিত স্বরে বলেন, "কি বলছ দাদা, বুঝতে পারলাম না তো !"

এবার মাধ্যমের ভূমিকা গুরুত্ব হারায়। মাধ্যমকে মাধ্যম মাত্র করে সারদা মৃদু কণ্ঠে বলে, "খোকন বল, মা বলছে কখনো তো কিছু চায় নি মা, বাড়ির বড়বৌ, একটা ভিক্ষে চাইছে—"

রামকালী ধারণা করেন, এ আর কিছু নয়, রাসুর দ্বিতীয়পক্ষ-ঘটিত নাটক। নির্ঘাৎ সপত্নী-অসহিষ্ণু এই মেয়েট সতীনকে তার পিত্রালয়ে পাঠানোর প্রস্তাব করতে এসেছে। বিরূপচিত্তে গম্ভীর হাস্যে বলেন, "ভিক্ষেটা কি, সেটা না জানলে তো সাদা কাগজে দস্তখত করা যায় না বড় বৌমা ! দেবার ক্ষমতা যদি আমার না থাকে ?"

"খোকা বল, আপনি ইচ্ছে করলেই হয় !"

রামকালী যদিও রাসুর বৌয়ের এই অসমসাহসিকতায় স্তম্ভিত হন, তবু ঈষৎ চমৎকৃতও হন। হঠাৎ একটা অতি অসমসাহসী মেয়ের কথা মনে পড়ে গিয়ে মনটা শিথিল হয়ে যায়। বলেন "মাকে বল দাদাভাই, ইচ্ছে করবার মত হলে অবশ্যই করব।"

"খোকা বল, আপনি তীর্থে যাচ্ছেন, আমার মাকে সঙ্গে নিন।"

এ আবার কি কথা !

এ যে রামকালীর ধারণার অগোচর, স্বপ্নের অগোচর। এই কথা বলতে এসেছে রাসুর বৌ ! মেয়েটা পাগল নাকি ! তবে নাকি নিতান্তই হাস্যকর অলীক কথা, তাই ঈষৎ কৌতুকের সুরে বলেন, "তোমার মাকে নিয়ে যাই এত সাধ্যি কি আমার আছে দাদাভাই ? তুমি বড় হও, মাকে নিয়ে যাবে।"

"মেজঠাকুদ্দা, মা বলছে তামাশা করে উড়িয়ে দিলে হবে না, মা সত্যি ভিক্ষে চাইতে এসেছে।"

রামকালী আর মাধ্যমকে গ্রাহ্য করেন না, বলেন, "বড় বৌমা, তোমার প্রার্থনাটা যে বড় অসম্ভব। আমি পুরুষমানুষ, কোথায় উঠব, কোথায় থাকব, কিভাবে ঘুরব—"

"মেজঠাকুদ্দা, মা বলছে, মা কষ্ট করতে হারবে না। তোমার রান্না-করা বাসন-মাজা এর জন্যেও তো একটা লোক চাই! মা সব করে দেবে।"

"দাদাভাই, তোমার মা ছেলেমানুষ, সবটা বুঝতে পারছেন না। সম্ভব হলে আমাকে দুবার বলতে হত না। তোমার মাকে বল, বাড়ির বড়বৌ বলে আমার কাছে একটা আবদার করলেন, রাখতে পারছি না, এটা আমারও কষ্ট আমি তার বদলে তাঁর নামে খাসে কুড়ি বিঘে ধানজমি লেখাপড়া করে দেব। তার আদায় থেকে উনি যা খুশি করতে পারবেন। আর তুমি যখন বড় হবে—"

"খোকা বল বাবা, বিষয়-সম্পত্তিতে মার কোন দরকার নেই।"

খাসে কুড়ি বিঘে ধানজমি!

এতেও একটু প্রলোভিত হল না মেয়েটা? আশ্চর্য তো! সত্যি বলতে কি, এ সংকল্প রামকালীর সহসা আজকের নয়। কিছুদিন থেকেই ভাবছিলেন তিনি, এই ধরনের একটা কিছু করবেন। ওই মেয়েটাকে তিনি যতই সাধারণ হিংসুটে মেয়েছেলে ভেবে আসুন, ওর সম্পর্কে কোথায় যেন একটু অপরাধবোধ তাঁকে হৃদয়ের গভীর স্তরে পীড়িত করত। তাই ভাবতেন ক্ষতিপূরণার্থে—

কিন্তু মেয়েটা বলে কি? বিষয় সম্পত্তিতে তার দরকার নেই?

একটু চুপ করে থেকে বলেন, "তবে আর কি করব বল দাদাভাই! যাতে লোকে নিন্দে করতে পারে এমন কাজ কি করে করা যায়?"

"মেজঠাকুদ্দা, তুমি তো লোকনিন্দেকে ডরাও না!"

"লোকনিন্দেকে ডরাই না?"

রামকালী যেন হঠাৎ অদ্ভুত অজানা একটা রহস্যের রাজ্যের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। এরা সব রামকালীকে ভাবে কী! রামকালী সম্পর্কে, রামকালীর অপরিচিত যে একটা জগৎ আছে, তাদের ধারণাটা কি! একটা কৌতুকের বিস্ময়ে স্বল্পবাক রামকালী আজ একটু বেশী কথাই বলে ফেলছেন।

"লোকনিন্দেকে ডরাই না, একথা কে বলে দাদু? ডরাই বৈকি। সত্যি নিন্দের কাজ করলে—" রামকালীও কথা সমাপ্ত করতে করতে ভাবেন—শেষ করতে গিয়ে থামেন। এই অবসরে এতক্ষণের নম্র আর মৃদু চাপা কণ্ঠস্বরটা প্রায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, "খোকা বল, আপনার যদি একটা দুঃখিনী মেয়ে থাকত, তাকে তীর্থে নিয়ে গেলে লোকে নিন্দে করত?"

রামকালী স্তব্ধ হয়ে যান।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, "আচ্ছা দাদু, তোমরা ভেতরে যাও। আমাকে একটু ভাবতে দাও।"

হ্যাঁ, ভাববেন রামকালী। অনেক কিছু ভাববেন। এইটুকু মেয়েটা কুড়ি বিঘে ধানজমির মোহ ত্যাগ করে তীর্থে যেতে চায় কোন্ মানসিক অবস্থায় তা ভাববেন, আর ভাববেন মোক্ষদাকে সঙ্গে নিয়ে রাসুর বৌয়ের প্রার্থনাটা পূরণ করা যায় কিনা! মোক্ষদার হাত ভেঙেছে, পা-টা তো মজবুত আছে। তাঁর জীবনেও তো কখনো কিছু হয় নি। এ কর্তব্যটা করা উচিত ছিল রামকালীর!

রান্না-ভাঁড়ার ঘরের জীবগুলো সম্পর্কে এত বেশী করে কখনও ভাবেন নি রামকালী।

একটা মেয়ে তাঁকে মাঝে মাঝেই ভাবাত। অনেকদিন সে রামকালীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। আশ্চর্য হয়ে ভাবছেন রামকালী, কতদিন তার কথা ভাবি নি!

সে পাছে ভাবে বলে রামকালীর অসুখের খবর দেওয়া হয় নি। কিন্তু তীর্থযাত্রার খবর? সেটাও কি না দিলে চলবে?

উনত্রিশ

জর-জর!

পক্ষকাল কাটল।

উত্তরোত্তর বাড়ছে বৈ কমছে না। ক্রমশঃ বিকার ধরল। হাত মুঠো করে আস্ফালন করছে রোগী, বিছানায় তেড়ে তেড়ে উঠছে। দু-দুটো লোক দুদিকে ঠায় বসে আছে রোগীকে বিছানায় চেপে ধরে রাখতে।

আর একজন তো অবিরত পানাপুকুরের ঠাণ্ডা জল এনে কলসী কলসী ঢালছে রোগীর মাথায়। কবিরাজ এসে ওষুধ দিচ্ছেন বটে, কিন্তু যেভাবে মুখ প্যাঁচা করে আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ছেন, তাতে ওষুধ সম্পর্কে ভরসা বোধ করছে না কেউ।

এদিকে বাড়িতে রথ-দোলের ভিড়!

পাড়ার লোকের যেন খেয়ে ঘুমিয়ে স্বস্তি নেই। তারা প্রতি মুহূর্তে চরম মুহূর্তের অপেক্ষায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। নাটকের শেষ দৃশ্যটা পাছে ফসকায়! অবিশ্যি অহিতৈষী কেউ নয়। সকলেই নিরীহ নবকুমারকে ভালবাসে! তেমন তেমন কেউ ওর নামে পূজো মানত করেছে, "গা শেতল" হবার আবদার নিয়ে গঙ্গাজলের ঘড়ার মধ্যে পাঁচ কড়া কড়ি ফেলে রেখেছে, আর ওলাইচণ্ডীতলা থেকে নিত্য মায়ের চরণামৃত এনে যোগান দিচ্ছে।

বাঁড়ুয্যে গিন্নীর ওই সবেধন নীলমণিটুকুর প্রাণের জন্য উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার আর অন্ত নেই লোকের! তবু আশা যখন ছাড়তেই হচ্ছে, বিশেষ নাট্য-মুহূর্তটিকে ছাড়বে কেন!

অতএব নিজের নিজের সংসারের রান্না-খাওয়া সংক্ষিপ্ত করে এ বাড়ির হাজরেটা বজায় রাখছে সবাই। তা ছাড়া প্রায় প্রত্যেকেই তো এক-একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক! সে চিকিৎসা-বিদ্যা কাজে লাগাবার যখন সুযোগ পাওয়া গেছে, কাজে লাগাবে না?

প্রকৃতপক্ষে এখন কবিরাজী চিকিৎসা বাতিল হয়ে গেছে, পাড়ার গিন্নীদের চিকিৎসাই চলছে। গতকাল হুটু স্যাকরার মার ব্যবস্থাপনায় পেটে পচা পুকুরের শ্যাওলার প্রলেপ দেওয়া হচ্ছিল। কারণ হুটুর মার এক ভাসুরপোর নাকি ঠিক এই অবস্থায় ওই দাওয়াই অব্যর্থ হয়েছিল।

না হবেই বা কেন?

কথায় বলে "মুড়ি আর ভুঁড়ি।" দুটোর মধ্যে দূরত্ব বেশ খানিকটা থাকলেও সম্বন্ধ যে অবিচ্ছেদ্য। একজনকে ঠাণ্ডা করতে পারলেই আর এক জন ঠাণ্ডা হতে বাধ্য। তাই পেটে শ্যাওলার প্রলেপ চাপিয়ে চাপিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করে আনবার চেষ্টা চলছিল—মাথায়-চড়ে-ওঠা রক্তকে চড় চড় করে নামিয়ে আনতে।

কিন্তু হুটুর মার কপাল! অত বড় অব্যর্থ প্রয়োগটাও বিফল হল। রোগী বিছানায় মাথা ঘষটাতে শুরু করল।

আজ তাই হরি ঘোষালের গিন্নীর দাওয়াই চলেছে। গায়ের তাপ "ধান দিলে খৈ ফুটছে", তাই ঘোষাল-গিন্নী বিধান দিচ্ছেন সপসপে করে ভেজানো ন্যাকড়ায় রোগীকে আষ্টেপৃষ্টে মুড়ে তার উপর জোর জোর করে পাখার বাতাস লাগাতে। সেই বাতাসে ন্যাকড়া শুকিয়ে উঠলেই আবার তাতে জলের আছড়া।

রোগী জ্ঞানশূন্য, অতএব সেবিকারা বাক্‌বিন্যাসে ভয়শূন্য। ঠিক এই অবস্থায় আর এই এই লক্ষণে কার জানাশোনা কটি রোগীর স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটেছে তারই হিসেবনিকেশের সঙ্গে সঙ্গে পাখা চলছিল উদ্দাম বেগে। নীলাম্বর বাঁড়ুয্যে অনেকক্ষণ বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ "বুক কেমন করছে" বলে পাশের ঘরে গিয়ে শুয়েছেন, সদু তাঁর চোখেমুখে জল দিচ্ছে, এমন সময় এলোকেশীর গলায় মরাকান্না উঠল।

যাঁরা খোদ রোগীর ঘরে বসে, তাঁরা বুঝলেন, "মাগী আর পারছে না, চেপে থেকে থেকে বুক ফেটে যাচ্ছে!"

যাঁরা এ বাড়ির বাইরে আছেন, তাঁরা উঠি তো পড়ি, পড়ি তো মরি করে ছুটে এলেন। নীলাম্বর, "যাঃ সব্বনাশ হয়ে গেল" বলে চৌকি থেকে ধড়মড়িয়ে নামতে গিয়ে হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেলেন, আর সদু তাঁকে তোলার পরিবর্তে চলে গেল ও-ঘরে, তবে একটু দাঁড়িয়েই চলে এসে সান্ত্বনা দিতে বসল মামাকে।

এলোকেশীর কাছে যাওয়া কর্তব্য ছিল, কিন্তু কোন্ কর্তব্যটা করবে? সে তো আর চতুর্ভুজা নয়।

এলোকেশী ঢেঁকিঘরে বসে কাঁদছেন!

সমাগতা মহিলারা সেইখানেই জমায়েত হলেন এবং এই হঠাৎ-কান্নার কারণ অবগত হয়ে গালে হাত দিয়ে বসে পড়লেন!

কয়েকজন এ কথাও বললেন, "পায়ের ধুলো দাও নবুর মা, তোমার একটু

পায়ের ধুলো দাও, মাথায় ঠেকাই, যদি তাতে তোমার মতন সহ্যশক্তি জন্মায়। ওই দজ্জাল বৌ নিয়ে এই অবধি ঘর করছ তুমি!"

জনৈকা আক্ষেপ করে বলেন, "আমি ভাবছিলাম আজ ভরসন্ধ্যেয় তোমার বৌকে নিয়ে চণ্ডীতলায় গিয়ে মায়ের পায়ে তার শাঁখা-সিঁদুর জমা দিয়ে "এয়োৎ বাঁধা রাখা"র মানুতি করে আনব। তোমার তো মাথার ঠিক নেই, পাঁচজনে না দেখলে চলবে কেন? কিন্তু যে বৌ তোমার, বলতে তো ভরসা হচ্ছে না!"

অপরা ফিসফিস করে, "বলো না দিদি বলো না! আমি বলি নি ভেবেছ? 'হাত বাঁধা'র কথা বলেছিলাম! কিন্তু সদুর কাছে নাকি বলেছে নবুর বৌ, আমি ডান হাতের বদলে বাঁ হাতে ভাত খেলে আমার স্বামীর পরমায়ু ফিরবে এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। উচিতমত ওষুধ না পড়লে কি অসুখ সারে?"

"অ্যাঁ! এই কথা বলেছে?"

"তাই তো বলল সদু। বলল, ওই নিয়ে আর বৌকে পেড়াপিড়ি করতে যেয়ো না খুড়ি, মানুষের মান-মর্যেদা তো রাখতে জানে না। হয়তো তোমার মুখের ওপরই 'না' বলে বসবে।"

"সাধে কি আর বলছি, নবুর মার পাদোদক খেতে হয়?"

কথাটা এলোকেশীর কানে যায়। তিনি বুকটা আর একবার চাপড়ে, আর একবার সেই চিরপরিচিত সুরের কান্নাটি কেঁদে ওঠেন।

"ওরে নবু রে—ওরে আমার সোনার গোপাল রে, তুই থাকতেই তোর বৌ আমাকে কী পায়ে দলছে ত্থাখ রে!"

যাঁরা রোগীর সেবা করছিলেন, তাঁরা সেবা ফেলে ছুটে আসেন।

হলটা কি?

এই দুঃসময়ে "পাহাড়ে" বৌ কী না কি করে বসল!

তা সে যা করে বসেছে তা চরম!

শাশুড়ীর মুখের ওপর বলেছে, "মানুষটাকে দশজনে মিলে কুপিয়ে কুপিয়ে না কেটে, একেবারে মা চণ্ডীর কাছে বলি দিয়ে দিলেই হত! মানুষটাও উদ্ধার পেত, দশজনেরও খাটুনি কমত!"

স্বামীর কথা নিয়ে যে বৌ এমনি করে গলা তুলে শাশুড়ীর সঙ্গে কথা বলতে পারে, সে বৌ তা হলে না পারে কি।

"ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দাও, ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দাও—" চাটুয্যে-গিন্নী দৃপ্তকণ্ঠে বলেন, "ওই ডাকাতের আওতাতে আওতাতেই ছেলে তোমার তুষ হয়ে গেছে নবুর মা! নইলে অমন ডবকা ছেলে, হঠাৎ এমন পিচেশ পাওয়া রোগেই বা ধরবে কেন?"

"তবু আমার নবু ওই বৌ-অন্ত প্রাণ চাটুয্যে-দিদি! বৌয়ের ভয়ে কাঁটা!"

দুটো অবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকলেও কথাটা বলেন এলোকেশী।

"তা ভগবান তেজ ভাঙছেন! অবিশ্যি তোমার মাথায়ও মুগুর মারছেন। কিন্তু ওই তো বিধাতার বিধান। একের পাপে আরের দণ্ড। তবু এও বলব, ওর দুঃখে শেয়াল-কুকুর কাঁদবে! পথের শত্তুর 'আহা' করে যাবে!"

এঁরা অধিকাংশই এলোকেশীর খাতক! গোপনে সুদী কারবার করে থাকেন এলোকেশী। ওঁদের অনেকেরই সোনাটা রূপোটা এলোকেশীর সিন্দুকে পচছে!

অবশ্য পাড়ায় স্পষ্টবক্তা ন্যায়দর্শীর একেবারে নেই তা নয়। কিন্তু তেমনদের সঙ্গে এলোকেশী ভাব 'চটিয়ে' রেখেছেন। তবু নবকুমারের 'মরণ-বাঁচন' অসুখ শুনে দেখতে আসছেন তাঁরা, ন্যায্য কথা দু-একটা বলেও যাচ্ছেন।

যেমন ভজুর পিসি বলে গেছলেন, "হ্যাঁ গা, বৌয়ের বাপের বাড়ি খবর দিয়েছ?"

এলোকেশী বাঁকা মুখে জবাব দিয়েছিলেন, "কেন, সেখানে খবর দিয়ে আবার কি হবে?"

"ওমা, তাদের হল গে জামাই! মুখের ওপর বলছি না, তবে ভগবানের মারের ওপর তো কথা নেই! একটা এদিক-ওদিক কিছু হয়ে গেলে জবাবটা কি দেবে?"

"জবাব?"

এলোকেশী মনোকষ্ট ভুলে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন, "কেন আমি কি তাদের উঠোনে বাস করি? আমি কি তাদের জমিদারির প্রজা? আমি কি তাদের খাতক? আমি কি কাঠগড়ার আসামী? যে জবাবদিহি দিতে হবে? কি বলব এখন আমার দুঃসময় চলছে, তাই! নইলে তোমায় উচিত কথা শুনিয়ে দিতাম কায়েত-ঠাকুরঝি!"

সনতের জেঠী একদিন বলেছিলেন, "নবুর শ্বশুর তো শুনেছি নামকরা কবরেজ, জামাইয়ের অসুখের খবর দিচ্ছ না কেন?"

এলোকেশী গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন, "আমার তো দশটা পাইক-পেয়াদা নেই দিদি, যে ছুট বলতে খবর দেব। বলে ছেলের ব্যামোতেই চোখে সরষে ফুল দেখছি। বেশ তো, তোমরা পাঁচজন আছ, খবর দাও না। বলে পাঠাও, 'এস তুমি! তোমার জামাইয়ের উচিত চিকিচ্ছে করে যাও'।"

এরপর আর কে কথা কইবে?

কিন্তু এলোকেশী কি সত্যিই এত মন্দ যে, নিজের ছেলের কল্যাণ-অকল্যাণ দেখেন না?

না, তা নয়।

আসলে এলোকেশী এ বিশ্বাস রাখেন না বৌয়ের বাপ ধন্বন্তরী! তা ছাড়া এটাও মনের মধ্যে কাজ করছে, যদি সত্যিই তা হয়, বৌয়ের বাপের গুণপনাতেই যদি তাঁর ছেলে সেরে ওঠে, সে অপমানের জ্বালা এলোকেশী জুড়োবেন কিসে?

আর বৌও কি তা হলে আরও সাপের পাঁচ পা দেখবে না? ছেলের প্রাণের জন্য শত সহস্রবার তেত্রিশ কোটি দেবতার চরণে মাথা খুঁড়ছেন এলোকেশী, কিন্তু বৌয়ের তেজ-দর্পটা কিছু খর্ব হোক, এটাও প্রার্থনা। দুটোর সামঞ্জস্য বিধান হয় না, কারণ 'মরা স্বামী' বেঁচে উঠলে তো দবদবার আর শেষ থাকে না মেয়েমানুষের। তেমন হলে বড় কেউ মায়ের পুণ্যবলের কথা তোলে না, তোলে পরিবারের এয়োতের জোরের কথা।

আবার সেই 'বেঁচে ওঠাটা'ই যদি বৌয়ের নিজের বাপের গৌরবে হয়! উঃ! রক্ষে করো! নবু তার নিজের বাপের পুণ্যে তরবে! নিত্য একশ আট তুলসী দেওয়া কি ব্যর্থ হবে?

হায়! এলোকেশীর ছেলের একশ বছর পরমায়ু হয়ে যদি বৌয়ের হাঁড়ির হাল হওয়া সম্ভব হত! তা হবার উপায় নেই। এলোকেশীর প্রাণের পুতুলই যে বৌয়ের অহঙ্কারের মাটি।

কিন্তু সত্য এ নাটকের কোন্ অঙ্কে?

সে কি একবারও স্বামীসেবার পুণ্য অর্জন করে না?

নাঃ, সে পুণ্য অর্জনের সৌভাগ্য তার হয় না। কারণ গুরুজনদের সামনে গিয়ে তো আর সে বরের গায়ে-পায়ে হাত বুলোতে বসবে না! ঘরে ঢুকবেই বা কোন্ লজ্জায়?

রাত্রে? সে তো শ্বশুর-শাশুড়ী দুজনে ছেলেকে বুক দিয়ে আগলে পড়ে থাকেন। আর সদু তাঁদের খিদমদগারি করে। সেখানে সত্য কে?

তা ছাড়া তার কোলে বাচ্ছা ছেলে। ছ মাসও হয় নি। আর তার গলাতেই সংসার!

স্বামীসেবার একটি অংশ তার ভাগে আছে। সেটা হচ্ছে ঔষধের অনুপান প্রস্তুত। বহুবিধ জিনিস নিয়ে ছ্যাঁচা, বাটা, গুঁড়ানো, সেদ্ধকরা, ইত্যাদিতে অনেকটা সময় ব্যয় হয় তার।

কবরেজ আবার ঔষধে ফল হচ্ছে না দেখে অবিরতই অনুপানের ত্রুটি আবিষ্কার করছেন! তেজী সত্য এসব সময় শুকনো চোখে ঠায় খাড়া থাকে। শুধু রান্নাঘরের কোণে যখন একা মুখ নিচু করে কাজ করে, আর রাত্রে যখন ছেলে দুটো ঘুমিয়ে পড়ে, তখন বাঁধমুক্ত করে অশ্রুর সাগরকে।

নবকুমার যদি সত্যিই না বাঁচে!

তোলপাড় হয়ে ওঠে আকাশ পাতাল পৃথিবী! যে মানুষটা সত্যর মনের জগতে একটা অবোধ অজ্ঞান নাবালকের দরে গণ্য ছিল, সে যে তার এত বড় আশ্রয় এ কথা এখন টের পেল সত্য? যখন সে মানুষটা যেতে বসেছে?

সত্য কেন তাকে কেবল বকেই এসেছে? কেন শুধুই ভালবাসে নি? কেন কেবল হেসে কথা বলে নি?

ঠাকুর, ওকে এবারের মত বাঁচিয়ে দাও, সত্য ওকে শুধু ভালবাসবে। ও বোকামি করুক, ভীরুতা করুক, ছেলেমানুষি করুক, কোন দোষ ধরবে না সত্য!

কিন্তু ও কি বাঁচবে?

মাকে অবহেলা করেছিল সত্য, মা বাঁচেন নি। আর স্বামীকে অবহেলা করে পার পাবে?

তখন না হয় বুদ্ধি ছিল না, মা কী বস্তু বোধ জন্মায় নি। কিন্তু এখন? এখন কী জবাব আছে?

সারারাত জেগে ঠায় বসে থাকে সত্য, কান খাড়া করে। হঠাৎ বুঝি

কোন সময় সেই ভয়ঙ্কর শব্দটা ওঠে। মাঝে মাঝে পা টিপে টিপে গিয়ে এ-জানলা ও-জানলা করে মরে। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। রাত্তিরে রুগীর ঘরের জানলা কে খুলে রাখবে? একে তো "সান্নিপাতিক জ্বর বিকার"— হাওয়া লাগলেই বিপদ। তা ছাড়া রাত্তিরে জানলা খোলা দেখলে অপদেবতায় উঁকি মারবে না? "হাওয়া বাতাস" লাগবে না? আর, ভাবতে বুক কাঁপলেও না ভেবে উপায় নেই, পথ খোলা দেখলে যমদূত ঢুকে পড়বে না? এলোকেশী কি সেই আসার পথ খোলা রাখবেন?

অতএব সত্য কানকে তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর করে তোলে।

কিন্তু এতেই কি সত্যর সকল কর্তব্য শেষ হয়ে গেল? আর কোন করণীয় নেই তার স্বামীর সম্পর্কে? ওরা মা বাপ, তা ঠিক! কিন্তু ওঁরা যদি অবোধ হন? তবে সত্যই বা কি কম অবোধ? এক মাস হতে চলল জ্বর চলছে নবকুমারের, দিন দিন বাড়ছে বৈ কমছে না, অথচ উচিতমত একটা ওষুধ পড়ল না তার পেটে?

আর সত্য নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছে!

সত্যর ভগবান কি এর পরও ক্ষমা করবেন সত্যকে?

এলোকেশীর সেই কান্নার পর এলোকেশীকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন মহিলারা। "কখনো কোনো দোষ করো নি, ঘাট করো নি, কারুর অহিত করো নি, পুত্রশোকের জ্বালা তোমায় কেন দেবে ভগবান?"

আবার সু-পরামর্শও দিচ্ছিলেন পরক্ষণে। "বলতে নেই, ছেলের যদি কিছু হয় নবুর মা, তো তুমি এক দোর দিয়ে ছেলেকে বিসর্জন দেবে, আর দোর দিয়ে ওই হারামজাদীকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দেবে। যে বৌ শাশুড়ীকে অত বড় কথা বলে—"

"ও বাতাসীর মা, শুধু কি ওই কথা বলেছে? বলি তবে শোন! রাতে বাইরে যাব বলে হঠাৎ দোর খুলে দেখি ঝপ্ করে কে দুয়োরের কাছ থেকে সরে গেল। ভয়ে হাঁকপাঁক করে চেঁচিয়ে উঠেছি 'কে কে বলে' চেঁচিয়ে উঠে দেখি না আমারই অবতার! রাগের চোটে মুখ দিয়ে কু-কথা বেরিয়ে গেল, বললাম, দোরের গোড়ায় কী করছিলি রে হারামজাদী? তুক না তাক? বলল কি জান?—'ছেলে মিত্যুশয্যেয়, তবু তোমার জিভের ধার কমে না? কেমন মা তুমি'?"

শ্রোত্রী মহিলা সঙ্গে সঙ্গে সবলে নিজের গালে ঠাঁই ঠাঁই করে দুটো চড়

কষিয়ে বলে ওঠেন, "ওমা আমি কোথায় যাব! ও নবুর মা, সে বৌয়ের মুখ তুমি নাথি দিয়ে ভেঙে দিলে না?"

এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থার জবাবে "উদারচরিতানাম" নবুর মা কী বলতেন কে জানে, সহসা অন্য এক ঝড় এসে লাগল! দেখা গেল গোয়ালের পাশের দরজা ঠেলে ঢুকে নাপিত-বৌ চুপি চুপি রান্নাঘরের দিকে এগোচ্ছে। অর্থাৎ সত্যর সন্ধানে যাচ্ছে।

বৌয়ের সঙ্গে নাপিত-বৌয়ের কিসের শলা? মুহ্যমান এলোকেশী গলা তুলে হাঁক দিলেন, "ওদিকে কোথায় যাওয়া হচ্ছে?"

চতুর নাপিত-বৌ বুঝল ধরা পড়েছে। অতএব মিছে কথা বলে চাপা না দিয়ে এদিকে এসে চুপি চুপি বলে, "বৌমা যে আমায় তেনার বাপের কাছে পাঠিয়েছেল গো, তার বাত্রাটা দিতে—"

কথা শেষ করতে পারে না সে। এলোকেশী রুদ্ধশ্বাসে বলেন, "কার কাছে পাঠিয়েছিল?"

"ওনার বাপের কাছে গো। ভারী মস্ত কবরেজ তো! পত্তর লিখে আমার হাত দে পাঠিয়েছেন, জামাইয়ের বিত্তান্ত জানিয়ে। এসে চিকিচ্ছে করতে—"

"তুই সে-কথা আমায় না জানিয়ে, স্বাধীনে চলে গিয়েছিলি?"

নাপিত-বৌ নরম হবার মেয়ে নয়। যেই দেখলে ধমকের পথ ধরেছে গিন্নী, সেও সতেজে বলে, "স্বাধীন পরাধীন বুঝি নে! বৌ-টো সোয়ামীর ভাবনায় ধড়ফড়াচ্ছে দেখে মায়া হল—"

"মায়া! মায়া হল? তুই আর ভূতের কাছে মামদোবাজী করতে আসিস নে নাপতে-বৌ! বিনি মজুরিতে তুই পরের জন্যে একটা হাই তুলিস না, আর তুই যাবি মায়ায় পড়ে—"

"বিনি মজুরিতে, তা তো বলি নি—" নাপিত-বৌ বেজার মুখে বলে, "তা করলে আমার চলবেই বা কেন? নেয্য মজুরি দিয়েছে। গিয়েছি—"

"দিয়েছে! বৌ তোকে নেয্য মজুরি দিয়েছে?" এলোকেশী ক্ষেপে ওঠেন, "সে কোথায় পাবে শুনি? তা হলে সে আমার বাক্স থেকে চুরি করতে শিক্ষে করছে। আর তুই তার মন্ত্রী হয়ে—"

সহসা পিছনে বজ্রপাত হয়।

এতগুলো গিন্নী সম্বন্ধে অবহিতমাত্র না হয়ে সত্য বলে ওঠে, "নিচু ঘরের

মতন কথা বলো না। নাপিত খুড়ীকে আমি রাহাখরচ বলে আমর মাল জোড়াটা দিয়েছি !”

মল জোড়াটা ! পাথর হয়ে যান মহিলারা।

শাশুড়ীকে না বলে-কয়ে গায়ের গহনা দানছত্র ! মুহুর্মুহু মূর্ছা গেলেও বোধ করি এই প্রবল আঘাতের বেগ রোধ হবে না।

এত বড় দুঃসাহস কেউ কল্পনাও করতে পারেন না।

এলোকেশী বুকে হাত চাপড়ে বলে ওঠেন, “ত্থাখ, তোমরা ত্থাখ ! দেখে বল আমায় ধরে ঝাঁটা মারবে কিনা, বৌকে আমি নিন্দে করি বলে। ওরে বাবারে, আমি কী করব রে—”

সত্য সেদিকে দৃকপাত না করে নাপিত-বৌয়ের দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে বলে, “বাবা কি চণ্ডীমণ্ডপে ছিলেন ?”

“ওমা শোন কথা !” নাপিত-বৌ গালে হাত দিয়ে বলে, “তিনি আবার কই ? তেনার হাতে নাকি কোন্ মরণ-বাঁচন রুগী, তাকে ফেলে আসতে পারল না। ওষুধ পাঠিয়ে দেছে। এসেছে তোমার বড় ভাই—তার হাতেই ওষুধ আর তোমার নামে পত্তর আছে !…ওমা ও কি ও কি, বৌ যে পড়ে গেল গো ! ওমা ই কী কাণ্ড !”

প্রবল একটা কোলাহল উঠল বাঁধ হারিয়ে ফেলা সেই ছড়িয়ে পড়া নদীটুকু ঘিরে।

“ভিরমি লেগেছে…ভিরমি !…ভিরমি না ভিটকিলেমি…মস্ত বড় একটা অপকম্ম করে ফেলে, এখন ধরা পড়ে—।”

নদীকে ঘিরে ঢেউ ওঠে অসংখ্য।

দীক্ষাগুরু নিপাতে তিন দিন অশৌচ শাস্ত্রীয় বিধি।

বিত্থারত্ন রামকালীর তথাকথিত মন্ত্রদীক্ষার গুরু ছিলেন না, আর রামকালীও ওই ধরনের শাস্ত্রীয় বিধি যে ঠিক অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন তা নয়। তবু বিত্থারত্নের মৃত্যুর পরের দিন রামকালী সমস্ত কাজকর্ম পূজা-পাঠ পরিত্যাগ করে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন বারমহলে।

তিন দিন ঔষধরূপী নারায়ণে হস্তক্ষেপ করবেন না, শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদি করবেন না, অন্নগ্রহণ করবেন না।

বিগত কয়েকদিন রোগীর বাড়িতে দিনে রাত্রে যমের সঙ্গে যুদ্ধ করে

পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছেন। মুখে সেই পরাজয়ের কালি-মাড়া ছাপ। চিন্তা করছেন এই অবস্থায় জামাতা-গৃহে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। কারণ চিকিৎসা করা থেকে যখন বিরত থাকতে হবে। ঔষধ এখন স্পর্শও করবেন না। মনে করছেন আগামী পরশু স্নানশুদ্ধির পর—

চিন্তায় বাধা পড়ল।

দেখলেন তাঁর পালকি ফিরছে। অর্থাৎ হয় রাসু, নয় রাসুর খবর। রাসুকে বলে দিয়েছিলেন, সত্য উদ্বিগ্ন হয়ে খবরটা দিয়েছে বটে, তবে যথার্থই রোগ কঠিন কিনা সেটা রাসু অনুধাবন করে শীঘ্রমধ্যে হয় নিজে ফিরে আসবে, নয় পালকি পাঠিয়ে দিয়ে ঘটনার গুরুত্ব জানিয়ে দেবে।

ঈষৎ কম্পিত বক্ষে অপেক্ষা করেন রামকালী, পালকি শূন্য না পূর্ণ দেখা পর্যন্ত।

না শূন্য নয়।

রাসু নামছে! যাক ঈশ্বর রক্ষা করেছেন! রাসু এসে নতমুখে প্রণাম করতে উদ্যত হতেই রামকালী পিছিয়ে গিয়ে বলেন, "থাক থাক, এ সময় প্রণাম নিষেধ। কি রকম দেখলে ?"

রাসু আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলে, "ভাল নয়।"

ভাল নয়!

সহসা রামকালীর মনশ্চক্ষে একটা মূর্তি ভেসে ওঠে! নিরাভরণ শুভ্র মূর্তি। শিউরে ওঠেন রামকালী, নিস্তেজ স্বরে বলেন, "ঔষধটায় ফল হল না ?"

"ঔষধ প্রয়োগ করা হয় নি—" রাসু জলদগম্ভীর স্বরে বলে, "সত্য ফেরত দিয়েছে !"

"ফেরত দিয়েছে ?"

সত্য রামকালীর ঔষধ ফেরত দিয়েছে! রাসু ওই দিশেহারা মুখের দিকে না তাকিয়েই হাতের পেটিকাটি আস্তে নামিয়ে রেখে বলে, "হ্যাঁ! আপনার পত্র নেয় নি, পড়ে নি।"

রামকালী ব্যাকুল ভাবে বলেন, "তোমার সঙ্গে দেখা করতে দেয় নি ?"

"না না, তা দিয়েছে! সত্যও অসুস্থ ছিল। আমি গিয়েছি মাত্র, ঠিক সেই সময়ই হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল নাকি! পরে সুস্থ হয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে বলল, বাবার যখন আসা সম্ভব হল না, চিঠি থাক বড়দা, ও

আর পড়ে কি করব! আর ওষুধও তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। যদি সতীমায়ের কন্যে হই, সেই পুণ্যেই আমার শাঁখা লোহা বজ্জর হয়ে থাকবে!"

জীবনে বোধ করি এই প্রথম রামকালী হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন, কথা খুঁজে পান না। এরপর কি আর 'স্নান-শুদ্ধ' হয়ে যাত্রা করবেন রামকালী, সত্যর কথা অবোধের কথা ভেবে?

তা সেই অবোধ সত্য তো তাহলে একথাও বলে বসতে পারে, "আবার তুমি এলে কেন বাবা, তোমার ওষুধ যখন খাওয়াচ্ছি না!"

ত্রিশ

এ তল্লাটে এ ইতিহাস এই প্রথম।

সায়েব ডাক্তার ডাকার ইতিহাস।

ভবতোষ মাস্টার, নিতাইচরণ, আর নীলাম্বর বাঁড়ুয্যের কুলমজানি পুতবৌ, এই তেরোস্পর্শের যোগে এ ইতিহাসের সৃষ্টি। খবর শুনে যে যেখানে ছিল, সে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল, যে যে বয়সে ছিল, সে সেই বয়সেই রয়ে গেল।

বাঁড়ুয্যের লক্ষ্মীছাড়া রণচণ্ডী বৌয়ের গুণপনা জানতে কারও বাকী ছিল না, শুধু ভেবে পেত না বৌকে ওরা এখনো ঘরে ঠাঁই কেন দিচ্ছে। গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে কেন দিচ্ছে না।

বলাবলি করেছে সবাই, ভেতরে কোনও রহস্য আছে···বাপের এক মেয়ে তো! আর বড়মানুষ বাপ! নির্ঘাত বাপ কোন কড়ার করে বিয়ে দিয়েছে।···বৌকে বাপের বাড়ি খেদিয়ে দিলে বোধ করি সেই বামুন 'বদ্যি'র বিষয়সম্পত্তিগুলো নবা পাবে না। তা নয় তো, সমস্যা সমাধানের সব চেয়ে সোজা উপায়টা ত্যাগ করে বাঁড়ুয্যেগিন্নী গালাগালি শাপশাপান্ত বুক চাপড়া-চাপড়ির ঘুরপথ ধরে মনের ঝাল মেটায় কেন!

বৌ বিদেয় করে দেওয়ার নাটকটা বার বার ঠিক জমে ওঠার মুহূর্তেই ভেস্তে গিয়ে গিয়ে ইদানীং সবাই হতাশ হয়ে গিয়েছিল। এবং নিত্য নতুন

একটা ঢেউয়ের যোগানদার হিসেবে সত্যকে বেশ এক রকমের পছন্দই করতে শুরু করেছিল।

আলোচনার একটা বড় খোরাক, আপন আপন ঘরের বৌ-ঝিকে সুশিক্ষা দেবার সুবিধার্থে একটা কুদৃষ্টান্ত, এটাও একটা লাভের অঙ্ক বৈকি।

কিন্তু নবুর জরবিকারে পড়া অবধি, নবুর বৌয়ের সমালোচনার উপযুক্ত ভাষাও আর খুঁজে পাচ্ছিল না কেউ। বেদে পুরাণে, যাত্রা নাটকে, এমন জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ তো কেউ কখনো দেখে নি, শোনে নি।

কাজেই ভাষাও সৃষ্টি হয় নি ওর জন্যে।

তবু এতদূর বুঝি কেউ দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করে নি। বৌ নাকি নবুর বন্ধু নিতাইয়ের সঙ্গে আড়ালে দেখাসাক্ষাৎ করে গলার দশভরির হারগাছা বিক্রী করিয়ে, ভবতোষ মাস্টারকে দিয়ে ব্যবস্থা করে কলকাতা থেকে সায়েব ডাক্তার আনিয়েছে!

আবার ভবতোষ মাস্টারের সঙ্গেও কথা কয়েছে!

সাহেব ডাক্তারের চিকিৎসায় নবু বাঁচুক আর মরুক সেটা এখন চিন্তনীয় বিষয় নয়, চিন্তনীয় হচ্ছে—বাঁড়ুয্যে সম্পর্কে অতঃপর কিংকর্তব্য?

ব্যাপারটা তো আর এখন গিন্নীদের এলাকায় নিবদ্ধ নেই, সমাজের মাথার মণি পুরুষদের মাথা টলিয়েছে। নবুর বৌ শাশুড়ীর সঙ্গে গলা তুলে কোঁদল করে, শ্বশুরের সামনে কথা কয়ে বসে, অথবা দজ্জালজনোচিত আরও বহুবিধ অকাণ্ড করে, এ তাঁরা এতাবৎ গৃহিণী মারফৎ শুনে এসেছেন, কিন্তু তাতে বৌটা সম্পর্কে বিরক্ত হওয়া ছাড়া আর কিছু করার ছিল না।

কিন্তু এখন আর "মেয়েলি কাণ্ড" বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। এখন "জাত যাওয়ার" প্রশ্ন উঠেছে। হতে পারে বাঁড়ুয্যে কর্তা সমাজের মাথা, কিন্তু মাথা বলেই তো আর সবাইয়ের মাথা হাতে কাটবার আবদার চলে না?

'বাগদিনীর ছোঁয়াচ'টা হাসাহাসির মধ্যে দিয়ে একরকম মেনে নেওয়া হয়েছে, আর ওটা এমন সৃষ্টিছাড়া নতুনও কিছু কথা নয়, কিন্তু ঘরে দোরে যদি সায়েব ঢোকে, ঘরের বৌ যদি পরপুরুষের সঙ্গে কথা কয়, সেটা মেনে নেবে, সমাজ এত নখদন্তহীন হয়ে যায় নি!

চণ্ডীমণ্ডপে বৈঠক বসে, এবং পাঁচ মাথা এক হয়ে এই স্থিরীকৃত হয়,

প্রথমে নীলাম্বর বাঁড়ুয্যেকে চাপ দেওয়া হবে পুত্তবৌকে ত্যাগ করবার জন্যে, তারপর যদি সে তাতে রাজী না হয়, বা না পেরে ওঠে, অবশ্যই পতিত করতে হবে নীলাম্বরকে।

সমাজে বাস করা তো আর ছেলেখেলা নয়? ওই মুমূর্ষু রোগীটা সত্যিই যদি সাহেব ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে বাঁচে, বাঁচতেও পারে, ওই লালমুখোদের ওষুধে ভেলকি খেলে শোনা যায়, ঈশ্বর করুন বাঁচুকই, ওকে একটা অঙ্গ প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে মহাপ্রসাদ খাওয়াতেই হবে।

আর ওই ভবতোষ মাস্টারটা!

ওটাকে জলবিছুটি দিয়ে গ্রামের বার করে দেবার কথা, কিন্তু শয়তানটা ডাক্তারের সঙ্গেই গট্ গট্ করে গাড়িতে গিয়ে উঠে কলকাতায় লম্বা দিল।

ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে এসেছে ডাক্তারের সঙ্গে!

তা ওর আর বাস ওঠাবার প্রশ্ন কোথায়, নিজেই তো প্রায় বাস উঠিয়ে কলকাতায় গিয়ে বাসা বেঁধেছে। পিসিটা আছে, তাই কালেকস্মিনে আসে।

আসামী বলতে হাজির শুধু নিতাইটা।

তা আপাতত ওকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সায়েব ডাক্তাররূপী আগুনটিকে ল্যাজে বেঁধে এনে লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়ে সরে পড়েছে।

এখন আগুনের কাজ আগুন করছে।

আগে ঘুণাক্ষরে কেউ টের পায় নি।

কোন্ ফাঁকে যে এসব যোগাযোগ করেছে সত্য, ঈশ্বর জানেন! গ্রামে এত জোড়া চোখের ওপর দিয়ে ভানুমতীর খেল দেখিয়ে দিল!

লোকে দেখল গ্রামের পথে ঘোড়ার গাড়ি।

নীলম্বর দেখলেন সে গাড়ি তাঁর দরজায় থামল। আর তা থেকে নামল এক বাঘা সাহেব।

বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল নীলাম্বরের। সন্দেহ নেই এ গাড়ি কালেক্টরের বা ম্যাজিস্টারের, নিশ্চয় কোন শত্রু নীলাম্বরের নামে কিছু লাগিয়ে ভাঙিয়ে এসেছে, আর সেই বাবদ হাতকড়া এসেছে নীলাম্বরের জন্যে।

কেন আসবে, কি সূত্রে আসা সম্ভব, এসব কথা ভাববার ক্ষমতা থাকে না নীলাম্বরের, খেয়াল থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে কে নামছে দেখবার। হাঁউ-মাউ করে গিয়ে প্রায় আছড়ে পড়েন তিনি সায়েবের সামনে।

ওদিকে পাড়ায় ঘরে ঘরে বেতার-বার্তা। নীলাম্বরের দরজায় ঘোড়ার গাড়ি থেকে সায়েব!

আইন-আদালত ছাড়া চট্ করে কারুর মগজে কিছু আসে না, এবং সকলে একবার করে জানলা একটু ফাঁক করে ছাখে আর বলাবলি করতে থাকে, "একেই বলে বিপদ একা আসে না! ওদিকে ছেলে শুষছে, এদিকে এই কাণ্ড!"

নীলাম্বরের বাড়িতেও উঁকি-ঝুঁকি চলতে থাকে।

কিন্তু সহসা একজনের চোখে পড়ল সায়েবের গলায় নল ঝুলছে।

"ডাক্তার···ডাক্তারি নল ঝুলছে গলায়!" একটা চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

ডাক্তার! সায়েব ডাক্তার এনেছে নবুর জন্যে! তলে তলে এই চালাকি খেলেছে নীলাম্বর, অথচ কারুর সঙ্গে কোন পরামর্শ নেই?

এ যেন প্রতিবেশীর গালে আচমকা একটা থাপ্পড় বসিয়ে দেওয়া! আবার সায়েবের পায়ে ধরে কাঁদতে বসেছে!

হ্যাঁ, প্রায় পায়েই পড়েছিলেন নীলাম্বর, "ও সায়েব আমি কিছু জানি না, আমি কোনও দোষে দুষী নয়। ঘরে আমার ছেলে মরছে—"

সায়েব যে ভারী গলায় আশ্বাস দিল, "ভয় না আছে। রোগী ভাল হইয়া যাবে—", তাও তাঁর কানে ঢুকল না।

কানে ঢুকল ভবতোষ মাস্টারের কথা।

"এ কী, এ রকম করছেন কেন? কলকাতা থেকে ডাক্তার এসেছেন, নবকুমারের চিকিৎসার জন্য।"

নীলাম্বর তাকিয়ে দেখলেন।

নিতাইকেও দেখলেন।

মুহূর্তে অনুভব করলেন, কোথাও একটা কিছু ষড়যন্ত্র ঘটেছে। আর সঙ্গে সঙ্গেই সেই ষড়যন্ত্রের নায়িকা হিসেবে সত্যের চেহারাটাই চোখের উপর ভেসে উঠল।

কিন্তু কি করে কী হল?

তা সে যে কয়েই হোক, এখন টুঁ শব্দ চলবে না। বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে ভবতোষ মাস্টারের সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘরে চোরের মত ঢুকলেন নীলাম্বর।

সত্য নিশ্চল প্রস্তর-প্রতিমার মত দাঁড়িয়েছিল সেই রুগীর মাথার কাছে বাগানের দিকের জানলায়। কপাটটা এমনভাবে আড় করে রেখেছিল, যাতে সে নিজে ঘরের মানুষদের দেখতে পায়, ঘরের মানুষরা তাকে দেখতে পায় না।

ভবতোষ মাস্টারের সঙ্গে সঙ্গে যখন তার চাইতে প্রায় হাতখানেক লম্বা দশাসই গড়ন লাল টকটকে মানুষটা ঘরে ঢুকল, কেন কে জানে বুকটা কেঁপে উঠল সত্যবতীর। তার পর হঠাৎ দু চোখ ভরে জল উপচে এল।

দৃশ্যতঃ হাতজোড় করল না, মনে মনে নম্র প্রণামে বলল, "বাবা, তোমার অসপদ্দাওলা অবাধ্য মেয়েটাকে মাপ করো। দূরে থেকে আশীর্বাদ করো যেন তার হাতের নোয়া সিঁথের সিঁদুর বজায় থাকে।···বুঝেছি তোমার বুকে দাগা দিয়েছি, কিন্তু আমি তো তোমারই মেয়ে। তেজ বল, অহঙ্কার বল, তোমার স্বভাব থেকেই তোমার মেয়েতে বর্তেছে।"

তার পর মার মুখখানা মনে করতে চেষ্টা করল। বলল, "মা, তোমার নামে দিব্যি গেলে বাবার ওষুধ ফেরত দিয়েছি, তোমার নামে যেন কলঙ্ক না পড়ে।"

কালী দুর্গা চণ্ডী শিব, এত সব জানে না সত্য, জীবনের সাক্ষাৎ দেবতাদের কাছেই বার বার আশীর্বাদ প্রার্থনা করে।

সায়েব ডাক্তারের ওষুধ ধন্বন্তরী হোক!

আবার তার চির-কৌতূহলী চিত্ত ওই ভয়ঙ্কর গম্ভীর মুহূর্তেও হঠাৎ অজান্তে কখন নেহাৎ ছেলেমানুষের মত কৌতূহলী হয়ে ওঠে। বিস্মিত পুলকে দৃষ্টি বিস্ফারিত করে দেখে ডাক্তার কিভাবে রোগীর বুকে পিঠে নল বসাচ্ছে, আর সেই নলের দুটো মুখ নিজের কানে ঢুকিয়ে গম্ভীর মুখে বসে আছে।

একটু পরে শুনতে পেল, ভারী ভারী একটা গলা উচ্চারণ করছে, "ভয় না আছে। ভাল হোয়ে যাবে।"

ম্লেচ্ছকে দেবতা ভাবলে কি পাপ হয়?

তারপর রঙ্গমঞ্চের সমারোহ মিটল।

যারা ডাক্তারকে নিয়ে এসেছিল, তারা তার সঙ্গেই সরে পড়ল। আর উদ্যত বজ্র হাতে নিয়ে দু-দুটো মানুষ নিশ্চেতনের মত নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে রইলেন।

বাঁড়ুয্যে আর বাঁড়ুয্যে গিন্নী।

মাটির পুতুলের মত বসে আছেন দুজনে। বুঝতে পারছেন না, এই অবস্থায় ঠিক কোন্ পথে চলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

না, বজ্র বোধ করি ওঁদের মাথায় পড়েছে।

নবুর কথা ভুলে গেছেন ওঁরা।

অপেক্ষাকৃত সচেতন ছিল সদু।

সে চলে যাবার আগে নিতাইকে হাতছানি দিয়ে ডেকে, ডাক্তার কি কি নির্দেশ দিয়ে গেল তা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে যেতে বলেছিল। এবং সেই ফাঁকেই ঝপ করে বলে বসেছিল, "টাকা কে দিল রে ? মাস্টার ?"

নিতাই মাথা চুলকে বলে, "না, মানে ইয়ে—ব্যাপারটা কি জান সদুদি, বৌঠান হঠাৎ সেদিন ঘাটের পথে ডেকে কেঁদে পড়ে—"

সদু থামিয়ে দেয়, ঈষৎ কঠিন সুরে বলে, "বৌ যার-তার কাছে কেঁদে পড়বার মেয়ে নয়। ভনিতা রেখে সত্যি কথাটা বল্! ঝপ করে বল্!"

নিতাই অতএব সত্যি কথাই বলে।

ঘাটের পথে নিতাইয়ের হাতে গলার হার খুলে দিয়ে বলেছে সত্য, আমার যেমন স্বামী, তোমারও তেমনি বন্ধু। সেই বুঝে কাজ করবে। কলকাতায় গিয়ে এই হার বিক্কিরি করে সায়েব ডাক্তার নিয়ে এস। ওপর হাতের তাগা-জোড়াটাও খুলে দিতে চাইছিল, নিতাই নিবৃত্ত করেছে।

রোগীর ঘরে কেউ নেই।

সত্য আসতে আসতে এসে বিছানার কাছে দাঁড়িয়েছিল, সদু ঢুকতে এসে ফিরে গেল। মনে মনে বলল, "বাঁচে যদি তো তোর পুণ্যেই বাঁচবে বৌ! বেহুলা মরা স্বামী নিয়ে স্বর্গ পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল, সাবিত্রী যমরাজের পেছনে ছুটেছিল। যুগে যুগে তারা সকলের পূজো পাচ্ছে।"

একটু পরে আবার যেতে গিয়ে শুনতে পেল বৌ শাশুড়ীর কাছে এসে নরম গলায় বলছে, "সায়েব ডাক্তারের ওষুধ তো তোমরা সর্বদা ছুঁতে পারবে না, রুগীর ভারটাই বরং আমাকে দিয়ে রান্নাঘরটা তুমি—"

এলোকেশী নড়েচড়ে শুকনো গলায় বলে ওঠেন, "তা এখন তুমি যা বলবে তাই শিরোধায্য - করতে হবে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিচেই তুমি! তা রান্নাঘরের ভার না হয় বাঁদী নিল, তোমার ছেলেদের ভার কে নেবে?"

সত্য আরও নম্র গলায় বলে, "ঠাকুরঝির কাছেই তো বেশী বেশী থাকে ওরা।"

"থাকে বলে গলায় চাপাতে হবে?"

জগতে সবই সম্ভব। সদুর দিকে টেনেও কথা বলেন এলোকেশী! সদু পরবর্তী কথা শোনবার জন্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আবার শুনতে পায় বৌয়ের আরও নরম গলা, "ঠাকুরঝি তো ওদের প্রাণতুল্য দেখেন। গলায় চাপা ভাববেন কেন মা?"

কিন্তু সত্যর এই নরম গলাটা কেন সদুর চোখে জল এনে দেয়! কেন যেন মনে হয় সত্যর গলায় এই নরম স্বর একেবারে মানায় না। ওর সেই জোরালো গলাটাই ভাল। অনেক ভাল।

একত্রিশ

সাহেব ডাক্তারের হাতযশে কি সত্যর শাঁখা-লোহার পুণ্যে, অথবা নবকুমারের নিজেরই পরমায়ুর জোরে বেঁচে গিয়েছিল নবকুমার। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কেন কে জানে সত্যকে সে নিজের জীবনদাত্রী বলেই ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে সেই থেকে।

অতএব সে জীবনটা নিয়ে সত্য যা করতে পারে করুক। যে দেশে অসুখ করলেই সাহেব ডাক্তার পাওয়া যায়, মৃত্যুভয় বলে বিভীষিকাটাই থাকে না, সত্য যদি নবকুমারকে সেই দেশে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, সেই চাওয়াটাকে আর হাস্যকর অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেয় না নবকুমার।

কাজেই সত্যর কাজ কিছুটা সহজ হয়ে এসেছে। হয়তো এই জন্যেই লোকে বলে থাকে 'ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে'। নবকুমারের এই মারাত্মক রোগটাও শেষ অবধি সত্যর জীবনে, অন্ততঃ সত্যর মতে, পরম

মঙ্গল ডেকে এনেছে। ছেলেদের 'মানুষ' করতে চায় সত্য, মানুষের মত মানুষ। আর সে মানুষ হতে হলে জগৎটাকে দেখতে হয়।

অবশ্য তার পরও কি আর কাঠখড় পোড়াতে হয় নি? অনেক হয়েছে। অবশেষে আস্তে আস্তে মেঘ কেটে সূর্যকিরণের আভাস দেখা যাচ্ছে।

ভবতোষ মাস্টারের চেষ্টায় নিতাই আর নবকুমারের এক-একটা চাকরি যোগাড় হয়েছে কলকাতায়। নিতাইয়ের রেলি ব্রাদার্সে, নবকুমারের সরকারী দপ্তরে।

অতএব ওদের এখন এক পা রথে এক পা পথে। নবকুমার অবশ্য মা বাপের কাছে নিজে প্রস্তাব করে নি, করতে পারে নি, সত্যকেই বলতে হয়েছে। তবে কথা বন্ধ করেছেন তাঁরা ছেলে বৌ দুজনের সঙ্গে।

এলোকেশী আজকাল খাওয়া শোওয়া ব্যতীত বাড়িতে থাকেন না বললেই হয়। আর নীলাম্বর সন্ধ্যার দিকে হরিসভায় যেতে শুরু করেছেন।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত সদু সত্যর উপর একটু খাপ্পা ছিল। কিন্তু সত্যর সাহেব ডাক্তার ডাকা-রূপ অসাধ্য সাধনের পর থেকে সদুও যেন কেমন মহিমাস্তব্ধ!

মাঝে মাঝে নিজের জীবনের খাতাটাও বুঝি উল্টে দেখতে শুরু করেছে আজকাল সদু। সদু যদি ওই রকম নির্ভীক হতে পারত! পারলে হয়তো সদুর জীবনটা এমন বরবাদ হয়ে যেত না। হয়তো বিপথগামী স্বামীকে সুপথে টেনে এনে সুখে সংসার করতে পারত। কিন্তু সত্যর মত সত্যর শক্তি সদুর নেই। সত্যর মত বলতে জানে না সদু, 'মনে-জ্ঞানে যে কাজে দোষ দেখব না, পাপ দেখব না, সে কাজে নিন্দের ভয় করব কেন? নিন্দে সুখ্যাতির ভয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকাও তো এক রকম স্বার্থপরতা। কিসে লোকে আমায় নিন্দে করবে, আর কিসে আমার সুখ্যাতি করবে এই চিন্তায় যদি স্বামী-পুত্তুরের ভালটি পর্যন্ত না দেখি, সেটা তো ঘোর স্বার্থক কাজ।'

সদু উঠে পড়ে লেগে স্বামীকে শোধরাতে পারত, তা পারে নি সদু, ভয় খেয়েছে। সদু মামার বাড়িতে এসে অকারণ মামা-মামীকে বাঘের মত ভয় করে মরেছে। ন্যায়-অন্যায় কথাটি কখনো বলতে পারে নি। সদু ভীতু।

সত্য সাহসী।

তাই সত্য আজ ডোবার ঘোলা জল থেকে মুক্ত হয়ে সাগরে তরী ভাসাতে গেল।

পাড়াপড়শীর ঘরে সত্যর বয়সী যেসব বৌ-ঝি আছে, তাদের মধ্যেও সত্য একটা আলোড়ন এনেছে বৈকি! তাদের দিনরাত্রির চিন্তার অনেকখানি দখল করে রেখেছে সত্য।

কী আশ্চর্য!

কী বিস্ময়!

কী অলৌকিক!

ঠিক তাদেরই মত একটা মেয়েমানুষ স্বামীপুত্র নিয়ে কলকাতায় 'বাসা'য় যাচ্ছে! আর কিসের কবল থেকে? না এলোকেশীর মত ভয়ঙ্করীর কবল থেকে। ওদের স্বামীরা এখন কিছুদিন যাবৎ দাম্পত্যসুখের মাধুর্য থেকে বঞ্চিত। কারণ সেই নিভৃত নির্জনে তাদের স্ত্রীরা এখন অনবরত নবকুমারের সাহস ও প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছে।

হতভাগ্য স্বামীরা নবকুমারকে 'স্ত্রৈণ' 'মেয়েমানুষের বশ' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করেও বিশেষ সুবিধে করতে পারছে না।

তবে বৌগুলোর অসুবিধে এই—সত্যর সঙ্গে একবার নির্জনে দেখা করে স্বামীদের স্ত্রৈণ করে তোলবার মন্তরটা শিখে নেবে এ উপায় নেই। বাঁড়ুয্যে-গিন্নীর বৌয়ের সঙ্গে মেশার ব্যাপারে তাদের প্রতি কড়া নিষেধ আছে, আর 'ঘাটে' আসার সময় শাশুড়ী পিসশাশুড়ী কি বড় ননদ, নিদেনপক্ষে একটা পুঁচকে ননদও পাহারাদার থাকে।

অতএব মন্তর শেখা হয় না।

অবশ্য ওপরওলাদের শুনিয়ে তারা সত্যকে ছিছিক্কার দেয়। যে মেয়েমানুষ বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবারূপ মহৎ কর্মে জলাঞ্জলি দিয়ে ছেলেদের 'ভাল ইস্কুলে পড়াব' ছুতো করে 'বাসা'য় যায়, সে মেয়েমানুষকে শত ধিক দেবে না আর মেয়েমানুষরা?

কিন্তু দিক।

সত্যর কানে এসব আসেও না।

এলেও সত্যর 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' পশে না। সে তখন শুধু যাবার প্রস্তুতিসাধনে যত্নবতী।

এই সময় কথাটা একদিন পাড়ল সত্য।

হয়তো সেটাকেও ওই প্রস্তুতি হিসেবেই ধরেছে সে। অথবা এক অনিশ্চিতের পথে পা বাড়াবার আগে জন্মের শোধ জন্মভূমিকে দেখবার বাসনা তাকে প্রবলভাবে পেয়ে বসে। কারণটা যাই হোক, কথাটা পাড়ে সত্য, "যাবার আগে একবার ওখানে ঘুরে আসব।"

'ঘুরে আসতে ইচ্ছে করছে—' অথবা 'ঘুরে আসলে ভাল হয়' কি 'ঘুরে আসা কর্তব্য,' এসব ভাষার ধার দিয়ে যায় নি সত্য।

'ঘুরে আসব!'

তার মানে ব্যাপারটা স্থির সিদ্ধান্তের কোঠায়। এখন ব্রহ্মার ব্যাটা বিষ্ণু এলেও সে সিদ্ধান্তের রদ হবে এ আশা নেই কারো।

এলোকেশী বিরস মুখে বলেন, "যাবে ভাল কথা। তা আমাকে বলতে এসেছ কেন? শুধোচ্ছ? নাকি অনুমতি নিচ্ছ?"

হ্যাঁ, কথা আবার কইছেন এলোকেশী বৌয়ের সঙ্গে। তার কারণ কথা কওয়াই তাঁর রোগ। মুখ বুজে দু-দণ্ড থাকা তাঁর কোষ্ঠীতে নেই। 'কথা বন্ধ করব' ভেবেও কয়ে ফেলেন।

সত্য তার বড় বড় চোখ দুটো একবার তুলে তাকিয়ে দেখে বলে, "নাঃ সে মিথ্যে রক্তর দরকার দেখি না। যাব যখন মনস্থ করেছি, যাওয়ার ব্যবস্থাই করতে হবে। জানানটা দিলাম, ঠাকুরকে বলবেন পঞ্জিকাটা একবার দেখে দিতে।"

এলোকেশী স্ব-স্বভাবে এসে পড়েন।

ভেঙিয়ে উঠে বলেন, "বাপ উদ্দিশ করে না। বাপের বাড়ি যাবে কোন্ সুবাদে?"

"বাপকে একবার পেন্নাম করতেই যাব।" সত্য আকাশের দিকে তাকিয়ে উদাস মুখে বলে, "মা-বাপেরই কর্তব্য আছে, সন্তানের নেই?"

"তা বেশ কোর্তব্য করো। যেও বাপকে পেন্নাম করতে। আমার ছেলে বিনি "আভ্যানে" যাবে না তা বলে রাখছি।"

সত্য উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "এমন এক-একটা অনাছিষ্টি কথা বল তুমি! তোমার ছেলেকে তুমি আটকাবে তো আমি এতখানি রাস্তা যাব কি পাড়ার লোকের সঙ্গে?"

"তোমার আবার সঙ্গ!"

এলোকেশী পিচ্ করে একটা পিচ্ ফেলেন। "ডাকাতে তোমায় দেখে ভয় পাবে মা!"

"পেলেই মঙ্গল!" সত্যও কথার ইতি টানে, "তবু লোকসাক্ষী একটা বেটাছেলে সঙ্গে থাকা ভাল! আর বাবাকে পেন্নাম করা তো বাবার জামাইয়েরও কাজ।"

"ইল্লিমারি টুস্কি! আরও কত শুনব! বলে, রাখালি কত খেলাই দেখালি! শ্বশুর আবার কবে কার গুরুঠাকুর হল, তা তো জানি না।"

"মেয়েমানুষের যদি এত হয় তো বেটাছেলের একেবারেই বা হবে না কেন, তাও তো জানি নে মা! মা-বাপ উভয় পক্ষেই গুরুজন।" বলে এবার উঠেই যায় সত্য।

জানত এই রকমই হবে।

তাই আর অনুমতি চাওয়ার প্রহসনটা করতে চেষ্টা করে নি।

প্রবলের জয় অবশ্যম্ভাবী।

পঞ্জিকা দেখে যাত্রার দিন দেখাও হয়, এবং শুভ মুহূর্ত অনুযায়ী "যাত্রা" করে স্বামী-পুত্রকে নিয়ে পাল্কিতে গিয়ে ওঠেও সত্য। বিশেষ কোনও বাধা আর আসে না। হালই ছেড়ে দিয়েছে তারা।

পাল্কি সত্যর শ্বশুরবাড়ির গ্রাম ছাড়ায়, পাল্কির দরজা সরিয়ে মুখ বাড়ায় সত্য।

নবকুমার বলে, "ঘোমটা খুলে মুখ বাড়াচ্ছ কেন? কে কোথায় দেখে ফেলবে।"

সত্য পুলক-কম্পিত স্বরে বলে, "দেখলেই বা! আর তো এখন আমি শ্বশুরবাড়ির বৌ নই!"

"বলি মেয়েছেলে তো বটে?"

"বলছি কি তা নয়? তবে মুখে তো লেখা নেই বৌ কি ঝি? দেখ না ওখানে গিয়ে কিরকম গাছকোমর বেঁধে দস্যিবিত্তি করে বেড়াই।"

বড় ছেলে "তুড়ু"র এসব আলোচনা হৃদয়ঙ্গম হবার বয়স হয়েছে। সে সহসা বলে ওঠে, "য্যাঃ! তুই আবার গাছকোমর বাঁধবি কি?"

"আবার তুই!" সত্য তীব্র ভর্ৎসনায় বলে ওঠে, "কত দিন বলেছি মাকে তুই বলতে নেই। তুমি বলতে হয়। তবু—"

সহসা কথার মাঝখানে হেসে ওঠে নবকুমার, "হয়েছে! খুব শাসন হয়েছে। বড্ড একটা মানুষ ও, তাই সুশিক্ষে দেওয়া হচ্ছে। আমি তো বুড়ো বয়েস অবধি মাকে তুই বলেছি।"

সত্যর মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। বলে, "তুমি যা যা করেছিলে বুড়ো বয়স অবধি, তার দিষ্টান্ত তুমি অন্য সময় ছেলের কানে ঢেলো। আমি যখন একটা শিক্ষাদীক্ষা দিতে আসব, তখন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাগড়া দিতে এস না।"

"বাবাঃ! কী হল? কিসে যে কি হয় তোমার বোঝা দায়।"

নবকুমার বোঝে একটু বেকায়দা হয়ে গেছে। ক্ষণপূর্বের সেই পুলকোচ্ছল লাবণ্যময়ী মূর্তি অন্তর্হিত হয়ে গেল ওই কাঠিন্যের আড়ালে। তাই আপসের সুর ধরে সে। সত্যি সত্যবতীর ওই চাপল্য, ওই লাবণ্য, ওই আহ্লাদে আলো হয়ে ওঠা মুখ কী অপূর্ব! কিন্তু বড় ক্ষণস্থায়ী। মুহূর্তে মেঘে ঢাকা পড়ে যায়।

আর যায় নবকুমারেরই বোকামিতে। অথচ নবকুমার কিছুতেই বুঝতে পারে না কিসে কি হয়ে যায়, কিসে কি হয়ে যেতে পারে।

সত্যবতীর নাগাল কোনদিনই কি পাবে সে?

কিন্তু সত্যর মুখের মেঘ কাটাতে পেরেছে নবকুমারের আত্মজ।

তুড়ু ইত্যবসরে মায়ের কোল ঘেঁষে বসে বলছে, "মামার বাড়ি গিয়ে ভাল ছেলে হতে হয়, না মা? না-না, সব বাড়িতেই ভালছেলে হতে হয়। শুধু মামার বাড়ি গিয়ে আরো বেশী বেশী ভাল হতে হয়। তা আমি তো সেসব জানিই, কিন্তু ওই খোকা বোকাটা? কিচ্ছু জানে না, মামার বাড়ি গিয়ে শুধু অ্যাঁ-অ্যাঁ করে কাঁদবে।"

ছেলের ওই অ্যাঁ-অ্যাঁ ভঙ্গীতে হেসে ফেলেছে সত্য।

না, অন্তত এই পথটুকুতে তেমন ভয় নেই নবকুমারের। মেঘ স্থায়ী হবে না। বুঝি গতির মধ্যেই আছে এক অপূর্ব পুলকের স্বাদ। তাই মুহূর্তে মুহূর্তে কিশোরীর মত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে সত্য।

"ওগো দেখ্ দেখ্, ওই মাঠে কী কালো গরুটা! ঠিক যেন গয়ার পাথর-বাটি।...তুড়ু দেখ দেখ, ওই পুকুরটায় কত পদ্ম ফুটেছে! ছোটবেলায় আমরা ওই পদ্ম গাদা গাদা তুলতাম।...মামার বাড়ি চল্, দেখাব তোকে সেই পুকুর।

…আচ্ছা হ্যাঁ গো, ওই গাছটা কি বল তো? ঠিক ধরতে পারছি না। পাতাগুলো বেশ কেমন নতুন ধরনের।…ওমা ওমা কী চমৎকার বুনো ফুল বুনো ফুল গন্ধ এল! ঠিক আমাদের ওখানের মতন।

নিজের খুশিতে নিজের সঙ্গেই কথা বলে চলেছে সত্য, স্বামী-পুত্র উপলক্ষ মাত্র।

নবকুমার হাঁ করে চেয়ে থাকে সেই মুখের দিকে।

এতদিন ঘর করছে, দু-দুটো ছেলের বাপ হল, এমন প্রকাশ্য দিনের আলোয় এত স্পষ্ট করে কবে এমনভাবে তাকিয়ে থাকতে পেরেছে তার লাবণ্যময়ী স্ত্রীর মুখের দিকে।

"বাসা"য় যাওয়ার ভয়টা একটু কমে এসেছে, এখন বরং একটু একটু রোমাঞ্চময় উন্মাদনা। সেখানে গুরুজনের রক্তচক্ষুর ভয় নেই, নেই পাড়াপড়শীর গুরুভয়।

শুধু নবকুমার আব সত্য!

চাকরির ভয়টা খুব জোর আছে। তবে ভবতোষ মাস্টার প্রচুর ভরসা দিয়েছেন। বলেছেন, নবকুমার যা ইংরিজি জানে, তার সিকি ইংরিজি শিখেও সাহেবের অফিসে কাজ করছে কত লোক। নবকুমার ঢুকতে না ঢুকতে 'সাহেবে'র নেকনজরে পড়ে যাবে নির্ঘাত। আর বলেছেন, গ্রামে পড়ে থেকে জমি-জমার উপস্বত্বে জীবন কাটানোর ইচ্ছেটা এযুগে অচল ইচ্ছে।

কলকাতায় গিয়ে দুটো কামিজ করাতে হবে, আর একজোড়া সু-জুতো। এ নইলে তো আর অফিসে যাওয়া যাবে না।

ভবতোষ তাদের জন্যে একটা বাসাও ঠিক করে রেখেছেন নাকি। নিজে তিনি মেসে থাকেন, কিন্তু নবকুমারের তো তা চলবে না। সে যখন 'ফ্যামিলি' নিয়ে যাচ্ছে। নিতাইটার মন্দ কপাল! ওর বৌকে বাসায় আনতে পারবে না। নিতাইয়ের মামা বলেছেন, বৌ কলকাতার বাসায় গেলে তার হাতে আর তাঁদের খাওয়া চলবে না।

এত বড় শাস্তির ভয় তুচ্ছ করে বরের সঙ্গে বাসায় যাবে এত সাহস নাকি নিতাইয়ের বৌয়ের নেই।

অতএব নিতাইকেও নবকুমারের হাঁড়িতে জায়গা দিতে হবে। বৌটাকে যদি আনতে পারত নিতাই! বেশ দুটো বৌতে থাকত একসঙ্গে। হোক

বামুন-কায়েত, কেউ কারুর ভাতের হাঁড়ি নাড়তে না যাক, দুজনে একত্রে বসা, গল্প করা, চুল বাঁধা, পান সাজা, এসব তো করতে পারত।

তা হবার জো নেই।

বেচারী নিতাইটাকে তাদেরই একটু যত্ন-আত্তি করতে হবে।

ভবতোষ বলেছেন খুব খাসা বাড়ি। তিন-চারখানা ঘর, মস্ত দরদালান। রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর, উঠোন, কুয়োতলা! জলের কলও নাকি আছে। বাড়ির ভেতরে নয়, দরজার কাছে। থাক। তার জল খেয়ে জাতজন্ম না খোওয়ানোই ভাল। কুয়োর জল যখন আছে!

সে যা হয় হবে।

প্রধান কথা ভাড়া। বড্ডই গায়ে লাগবে। বাপের কাছ থেকে তো আর টাকা চাইতে যাবে না নবকুমার।

কিন্তু ভবতোষ বলেছেন, কলকাতায় ও-রকম বাড়ি দশ টাকাতেও সহজে মেলে না, নেহাৎ বাড়িটা ভবতোষের এক বন্ধুর বাড়ি বলেই আট টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।

হোক।

নবকুমার তো তেমনি মাইনেও পাচ্ছে আটান্ন টাকা! এত বড় মোটা মাইনের চাকুরের পক্ষে ওতে কাতর হওয়া ঠিক নয়।

যাক তাই হোক!

তা বলে নিতাইয়ের প্রস্তাব সে নেবে না। নিতাই বলেছে, ভাড়ার ভাগ দেবে। না, ছিঃ! নবকুমারের এত বন্ধু নিতাই, তাই কখনো নেওয়া যায়?

কিন্তু কে জানে সেখানে সত্যর মেজাজ কেমন থাকবে? এখানে তো ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট, সেখানে যতই হোক, নিতাই একটা পর ছেলে! সত্য যদি তার সামনে মেজাজ দেখায়?

নাঃ, তা বোধ হয় করবে না।

সেদিকে সভ্য আছে।

এখন কবে সেই দিনটি আসে! যবে সেই অজানা অচেনা দরদালানে বসে দুই বন্ধু অফিসের 'ভাত' খাবে! আর সত্য এলোচুল দুলিয়ে কোমরে কাপড় জড়িয়ে ছুটোছুটি করে রান্না করবে! পরিবেশন করবে!

এ সমস্তই সম্ভব হবে সত্যর শক্তিতে।

বিগলিত প্রেমে সত্যর দিকে তাকিয়ে দেখে নবকুমার।

কিন্তু সত্যর তখন দৃষ্টি লক্ষ্যভেদী, নাসারন্ধ্র স্ফীত, সমস্ত চেতনা একাগ্র। সহসা চেঁচিয়ে ওঠে সে, "ওই তো ওই তো, জটা-দাদাদের বাড়ির চিলেকোঠা, ওই গাঙ্গুলী-কাকাদের উঠোনে বাজপড়া নারকোল গাছটা—ও বেহারারা, ডান দিকে ডান দিকে—"

পথ দেখিয়ে দেওয়ার ভার সে নিজে নিয়েছে।

পাল্‌কি নামাতেই একটা বিরাট চাঞ্চল্যের ঢেউ উঠেছিল, তার পর জানা হতেই আকাশ থেকে পড়ল সবাই। না বলা না কওয়া এমন করে মেয়ে কেন উপস্থিত? এমন তো হবার কথা নয়।

কী মূর্তি নিয়ে নামছে?

কে ফেলে দিয়ে যেতে এসেছে?

ওগো না গো না!

ষড়ৈশ্বর্যময়ী রাজরাণীর বেশে এসেছে সে কার্তিক-গণেশের হাত ধরে, ভোলানাথকে সঙ্গে করে!

মন কেমন করছিল তাই দেখতে এসেছে বাপকে, বাপের বাড়ির সবাইকে। এসেছে জন্মভূমি দেখতে।

বারবাড়ির কলরোল মিটিয়ে অন্দরমহলের দিকে এগোল সত্য, চারি-দিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে।

আর যেই ভেতর-বাড়ির উঠোনে পা ফেলল, তুমুল একটা কান্নার রোল উঠল।

বিলাপধ্বনি মিশ্রিত রোল।

আলাদা করে বোঝবার উপায় নেই গলা কার। ঐকতান বাদন! বাড়ির সকলের সঙ্গে পাড়ার মহিলারাও যোগ দিয়েছেন অনেকে।

কিন্তু নতুন কার জন্যে বিলাপ? ভুবনেশ্বরীর ঘটনা তো—অনেক দিনের হয়ে গেছে।

না বিশেষ কারও জন্যে বিলাপ নয়, আর সদ্য শোকের কাতরতাও নয়। খানিকটা সত্যর আবির্ভাবে আনন্দাশ্রু, আর বাকীটা সত্যর এই দীর্ঘ অনুপস্থিতিকালের মধ্যে সংসারে যা যা শোকাবহ ঘটনা ঘটেছে, তারই ফিরিস্তি জানিয়ে নতুন করে বিলাপ-ক্রন্দন।

এই ক্রন্দনরোলের মাঝখানে দিশেহারা সত্য ছেলে দুটোর হাত ধরে উঠোনের একধারেই দাঁড়িয়ে থাকে, আর বাববাড়িতে নবকুমার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকে। সামনে শ্বশুর বসে, কিন্তু তাঁকে প্রশ্ন করবে এত বুকের পাটা নবকুমারের নেই। সেই যে প্রণাম করে ঘাড় হেঁট করে বসেছে, বসেই আছে।

তা ছাড়া তিনি তো—দেখা যাচ্ছে—নির্বিকার। বাড়ির মধ্যে এত বড় ক্রন্দনরোল যখন ওঁকে তিলমাত্র বিচলিত করতে পারছে না, তখন ব্যাপারটায় গুরুত্ব নেই বলেই মনে হচ্ছে।

নবকুমারও পাড়াগাঁয়ের ছেলে। মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে এলে কান্না-কাটির ঘটনা তার একেবারে অজানা নয়, তাই ক্রমশঃ সে নিশ্চিন্ত হয়, আর রোলটাও আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে আসে।

ঈষৎ নড়েচড়ে রামকালীই কথা বলেন।

"কখন বেরিয়েছ ?"

"আজ্ঞে—!"

নবকুমার চমকে তাকায়।

রামকালী তাকিয়ে দেখেন। একটি স্বাস্থ্যবান সুকান্তি পুরুষের দেহে এখনো যেন একখানা লাজুক কিশোরের মুখ। সুন্দর সুকুমার, কিন্তু বুদ্ধির ছাপ খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে মনে মৃদু আক্ষেপের হাসি হাসেন। একে স্নেহ করা যায়, ভরসা করা যায় না। হয়তো এই জন্যেই ভগবান সত্যকে অমন দৃঢ় মজবুত করে গড়েছেন, ও লতার মত আশ্রয় চাইবে না, বনস্পতির মত আশ্রয় দেবে।

একটা নিঃশ্বাস পড়ল।

মনে করলেন সত্যর কপালে চির দুঃখ। রামকালীর মেয়ে রামকালীর ললাটলিপিই পেয়েছে। কত দুঃখী রামকালী! কত সুখী ছিল ভুবনেশ্বরী!

আগে স্বপ্নেও কল্পনা করেন নি রামকালী এমন করে কখনো ভাববেন। নিজেকে কখনো দুঃখীর কোঠায় ফেলবেন।

নবকুমারের ওই তটস্থ সুরের "আজ্ঞে" শুনে রামকালী মৃদু হেসে আর একবার বললেন, "কতক্ষণ বেরিয়েছ ?"

"আ—আজ্ঞে, সেই প্রাতঃকালে দুটো ফেনাভাত খেয়েই—"

কথাটা বলেই বোধ করি নিজের বেকুবিটা বুঝতে পারে নবকুমার, "প্রাতঃকাল"কে আরও মোক্ষম করে বোঝাবার জন্যে ওই ফেনাভাতের প্রসঙ্গটা না আনলেই হত! প্রাতঃকালই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মুখের কথা হাতের ঢিল।

রামকালী ব্যস্ত হয়ে বলেন, "সে কি! এতটা সময় লেগেছে? তা হলে তো—না না, আর বসে থাকা নয়। শীঘ্র হাতমুখ ধুয়ে—"

নবকুমার এবার কিঞ্চিৎ স্পষ্ট গলায় বলে, "না না, ব্যস্ত হবেন না। পথে পালকি নামিয়ে আহার হয়েছে। সঙ্গে জলপান ছিল।"

"তা হোক। বেলা পড়ে এসেছে। ওরে কে আছিস?"

একসঙ্গে অনেকগুলো নানা বয়সের ছেলে এসে দাঁড়ায়। অর্থাৎ এরা আশেপাশে উঁকিঝুঁকি মারছিল, শুধু সামনে আসতে ভরসা পাচ্ছিল না।

রামকালী বলেন, "অন্দরে গিয়ে বল গে, বাবাজীর হাতমুখ ধোওয়ার ব্যবস্থা করতে।"

"হাতমুখ ধোওয়াটা একটা সাঙ্কেতিক শব্দ। মূল অর্থ জলখাবারের ব্যবস্থা করা। ওরা দু-একজন ব্যস্ত হয়ে চলে যায়, দু-একজন দাঁড়িয়ে থাকে। আর কে একজন থপ করে বলে বসে, জামাইবাবুর কী মজা! কেমন কলকাতার বাসায় গিয়ে থাকবে!"

রামকালী ঈষৎ চমকে ওঠেন।

ভাবেন এটা আবার কি কথা!

সত্য তো ঘোমটা ঢাকা অবস্থায় একটা প্রণাম করেই ভেতরে চলে গেছে, নবকুমারের সামনে বাপের সঙ্গে কথা বলে নি, তা ছাড়া ছিল পাড়া-পড়শীর হুল্লোড়।

নবকুমার মেয়েদের মত লজ্জার ভান করে বসে আছে। রামকালী ঈষৎ কৌতুকের স্বরে বলেন, "কলকাতার বাসার কথা কি বলছে?"

প্রশ্নটা নবকুমারকে।

নবকুমার উত্তর না দিয়ে পারে না। তাই আস্তে আস্তে বলে, "হ্যাঁ সেই রকমই স্থির হয়েছে।"

"শুনে সুখী হচ্ছি! এখন কলকাতার উন্নতির নানাবিধ পন্থা হয়েছে। কোনও কর্মের চেষ্টা হয়েছে নাকি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। মাস্টার মশাই একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।"

রামকালীর জামাতা! তাই কর্তব্যবোধেই প্রশ্ন করেন রামকালী, "কোথায় ?"

"ইয়ে, আ—আজ্ঞে সরকারী দপ্তরে।"

"সুখের কথা। তা কোথায় থাকবার ঠিক করেছ ? মেসে ?"

"আজ্ঞে না। বাসায়। মাস্টার মশাই বাসাও ঠিক করে দিয়েছেন।"

রামকালী অবশ্য বেতন কত তা জিজ্ঞেস করেন না, শুধু সামান্য চিন্তিত স্বরে বলেন, "তা হলে তো পাচকেরও ব্যবস্থা করতে হবে। একা বাসা নিয়ে—"

নবকুমার আর বেশীক্ষণ লজ্জা বজায় রাখতে পারে না, পুলক গোপনের উচ্ছ্বসিত আভা মুখে মেখে বলে ওঠে, "পাচকের দরকার হবে না। তুড়ু-খোকার মা, ইয়ে আপনার মেয়েই তো যাচ্ছে।"

"আমার মেয়ে! সত্য! সত্য কলকাতার বাসায় যাচ্ছে!"

নবকুমার থতমত খেয়ে চুপ করে যায়। বুঝতে পারে না রামকালীর এই স্বরটা ঠিক কোন্ ভাবব্যঞ্জক। একটু যেন বিচলিত মনে হল না ?

হ্যাঁ, কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়েছেন রামকালী।

অনেকদিন আগের একদিনের কথা মনে পড়ে গেছে।

বালিকামূর্তি নিয়ে সত্য ভেসে উঠেছে চোখের সামনে। আর তার সামনে ভেসে উঠেছে আর একখানা ভয়ব্যাকুল মুখ। সেই মুখের সামনে আঙুল তুলে বলছে সত্য, "তোমার যে এত ভয় কিসের মা! এই তুমি দেখে নিও, কলকাতায় আমি যাব, যাব যাব!"

সত্য তার প্রতিজ্ঞা রাখছে, কিন্তু তা দেখে গর্বে আনন্দে বিস্ময়ে পুলকে কে মুগ্ধ হবে ?

নিশ্বাস গোপন করে বললেন, "সাহস করতে পারছ সুখের বিষয়। তা তোমার মাতাপিতার ব্যবস্থা ?"

"দিদি আছে। পড়শীরা আছে।"

"হুঁ! তা ওঁরা আপত্তি করলেন না ?"

এবার আর নিজেকে সংবরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে নবকুমারের। প্রায় একগাল হেসে ফেলে বলে, "আপত্তি কি আর তাঁরা না করেছেন ? কিন্তু আপত্তি টিকলে তো ? 'এ' ধুয়ো ধরল ছেলেদের ভাল ইস্কুলে পড়ানো চাই। বুদ্ধির রাজা তো!"

ওর ওই উদ্ভাসিত মুখের দিকে তাকিয়ে সহসা ওর ওপর ভারী একটা স্নেহ অনুভব করলেন রামকালী। অন্দরে পাঠিয়ে দিলেন নবকুমারকে।

অন্দরের অবস্থা তখন হাস্যমুখর। সত্যর ছেলেদের নিয়ে ঠাট্টা-আমোদ চলছে দিদিমা সম্পর্কীয়দের। সত্যকে ঘিরে বসেছে বাড়ির বাকী সবাই।

রাসুর নতুন বৌ, শিবজায়ার আইবুড়ো নাতনীরা, রাসুর দুই ভাদ্রবৌ আর ভাগ্নী দুটো, এবং পড়শীবাড়ির নবীনা-প্রবীণার দল। মোক্ষদার বেশী কথা বলার ক্ষমতা আর নেই, তবু আসরের একপাশে বসে আছেন দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। শুধু সারদা এ আসরে অনুপস্থিত। সারদার মরবার সময় নেই।

তার ঔদাসীন্যের কাছে সত্যর নতুনত্ব, অপূর্বত্ব, বৈচিত্র্যের বহুমুখিত্ব, সব কিছুই পরাস্ত মেনেছে।

কিন্তু আর সবাই তো সারদা নয়, তাই প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে, নিজে আর কাউকে কোনও প্রশ্ন করবার সময় পাচ্ছে না সত্য। অথচ সে তো নিজেকে দেখাতে আসে নি, সবাইকে দেখতে এসেছে।

কিন্তু কৌতূহল যে সকলেরই অদম্য। দু-দুটো ছেলে হয়ে গেল, তারা ডাগররটি হল, যোগাযোগ তো নেই। ওরা অবিশ্যি ছেলেদের অন্নপ্রাশনে বলে পাঠিয়েছিল, কিন্তু রামকালী তো তখন তীর্থে ঘুরছেন। তবে ফিরে এসে তো কই—?

কিন্তু এত দিন কেন আসে নি সত্য, আর এখন এমন হট করে এল কেন, এ প্রশ্ন চাপা পড়ে গেল। এখন প্রশ্ন কলকাতার বাসা! সেইখানেই সহস্র কৌতূহলের প্রশ্ন। কে সাহস দিল সত্যকে? কে দেখবে সেখানে সত্যকে? শ্বশুর-শাশুড়ী বেঁচে থাকতে বরের সঙ্গে বাসায় যাবার পরিকল্পনাটা তার মাথায় এলোই বা কি করে, আর তাঁদের অনুমতিই বা পেল কোন্ অলৌকিক সাধনার জোরে?

তা ছাড়া—

গেলে জাত যাবে কিনা, ম্লেচ্ছর জল খেতে হবে কিনা, জুতো মোজা পরতে হবে কিনা, বরের সঙ্গে "ল্যাণ্ডো ফেটিং" চড়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যেতে বাধ্য হতে হবে কিনা, ইত্যাদি বহুবিধ খাপছাড়া প্রশ্ন তো আছেই।

অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়ে ক্লান্ত সত্য একসময় বলে ওঠে, "বাব্‌বাঃ। নিজের পাঁচালীই গাইলাম এই অবধি, তোমাদের খবরাখবর কিছু শুনতে দাও?"

মোক্ষদা ক্লান্ত আর্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন, "আমাদের আবার খবর! যারা মরে নি তারা এখনো বিধাতার অন্নজল ধ্বংসাচ্ছে এই খবর।"

"বাঃ, ও কি কথা?"

"ঠিক কথাই বলেছি সত্য। চিরটাকাল তোকে 'মুখ' করেছি, ভেবেছি হাড়ির হাল হবে তোর। এখন দেখছি তুইই টেক্কা মারলি। তুইই দেখালি! বেশ করেছিস, এ মতলব করেছিস। এখন সবাই বলছে ইংরিজি বিদ্যের জয়জয়কার। ছেলে দুটোকে যদি কলকেতায় ইংরিজি ইস্কুলে দিতে পারিস—"

শিবজায়া সম্প্রতি বিধবা হয়েছেন এবং কিছুক্ষণ আগে গগনভেদী চিৎকার করে সত্যকে বুঝিয়েছেন, সত্যর মা পরম পুণ্যবতী ছিল, মরে পুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছে এবং জগতে যে যেখানে শাঁখা নোয়ার গৌরব নিয়ে এখনো টিঁকে আছে, তারা যেন এইবেলা সেই গৌরব বজায় থাকতে পৃথিবী থেকে সরে পড়ে। এখন শিবজায়া মুখে কাপড় ঢাকা দিয়ে শুয়েছিলেন পোড়ামুখ কাউকে দেখাবেন না বলে।

কিন্তু চির-প্রতিদ্বন্দ্বিনী মোক্ষদার এই বাক্য শুনেই তাঁর নির্বেদ ভঙ্গ হল। মুখের কাপড় সরিয়ে বলে উঠলেন, "বললে ভাল ছোটঠাকুরঝি! জন্ম গেল ছেলে খেয়ে আজ বলছে ডান। বলি একাল, সেকাল সবাইয়ের বাংলা 'সমসক্রিত'য় চলল, বেশী বিদ্বান হল তো ফার্সি, আর এখন ওই মেলেচ্ছ ভাষা না শিখলে আর—"

"ফার্সিটাও মেলেচ্ছ ভাষা সেজবৌ!"

"ও মা শোন কথা! জন্মকাল 'ফার্সি'র কথা শুনে এলাম, কই কখনো তো শুনিনি মেলেচ্ছ ভাষা!"

সত্য এবার কথা বলে, "থাক্ পিসঠাকুমা, ওসব জাত থাকা জাত যাওয়ার গপ্পো। ও তোমার যা যাবার সে যাবেই। তাকে কে রুখতে পারবে? ও কথা ছাড়। তোমার এমন হাল হল কি করে তাই বল? এত তীর্থধর্ম করে হাওয়া বদল করে এসেছ, শরীর তো ভাল হবার কথা!"

"আর ভাল!"

মোক্ষদা জিভে একটা শব্দ করেন। "আমার ভাল একেবারে সেই যমরাজ এলে তবে। বর তো কখনো চোখে দেখি নি, ওই যম বরের চতুর্দোলাতে চড়েই যাব। তবে একালে ভাল আর কজন আছে? এই সেবারও যে গাঁ দেখেছিস সে আর নেই। মানুষের দেবদ্বিজে ভক্তি যাচ্ছে, গুরুলঘু জ্ঞান যাচ্ছে, মানুষ মনিষ্যত্ব সব ঘুচছে। দেখবি, ঘুরে ঘুরে দেখবি তো? দেখিস সুখ পাবি না।"

দিন সাতেক থাকার পর ফিরতি পথে অনবরত সেই কথাই ভাবতে ভাবতে চলে সত্য। ভাবে আর মনে মনে বলে, 'দেখেছি পিসঠাকুমা, দেখে বুঝেছি তোমার কথাই ঠিক। সুখ পেলাম না। সেই আগের গাঁ আর নেই। নেই আগের সুখ আনন্দ তৃপ্তি।'

এবারও ছেলেবেলাকার খেলার জায়গাগুলোয় গিয়ে গিয়ে বসে দেখেছে সত্য, চেষ্টা করেছে আগের দিনের সুর বাঁধতে, কিন্তু পারে নি। শেষ পর্যন্ত সেটা হাস্যকর হয়ে উঠেছে। ছেলেদের দেখাবে বলে ফট করে একদিন গাছে চড়তে গিয়েছিল, ছেলেরাই এমন হাঁ হাঁ করে উঠল যে নেমে আসতে হল। সেই সাঁতারের পীঠস্থান বড় দীঘিতে গিয়ে সাঁতার দিয়েছে, সুখ পায় নি। নোনা আতা আর নোড় কুড়োতে গিয়ে কেমন যেন পাগলামি মনে হয়েছে, তবু কুড়িয়ে এনে ছেঁচে আচার করবে বলে রেখে দিয়ে ফেলে রেখেছে। বুঝেছে সুখ পাবে না ওতে।

সুখ তো সবটা নিয়ে।

সেই সবটা, সম্পূর্ণটা, অখণ্ডটা কোথায়? কোথায় সেই আগের সঙ্গী-সঙ্গিনীরা?

আর কোন্খানে সুখ পাবে সত্য? এর মাঝখানে কোথায় খুঁজে পাবে রামকালী চাটুয্যের সেই মাঠবেড়ানো দস্যি মেয়েটাকে? যাকে খুঁজে পাবার জন্যে এত তোড়তোড় করে আসা?

আর সেই মেয়েটার মা, তার ছায়াও কি থাকতে নেই? সব মুছে ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে গেছে?

বদলে গেছে।

সব বদলে গেছে।

সত্যর সেই চেনা জগৎটি অদৃশ্য হয়ে গেছে। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সত্যর আসনটি। সত্যর জন্মভূমির মাটিতে সত্য এখন আগন্তুক, বহিরাগত। এখন এখানে চোখের সামনে অন্যায় ঘটতে দেখলেও চুপ করে যেতে হয়, মনে হয়, 'থাক! দু দিনের জন্যে এসে আর—' বেপরোয়া দুঃসাহসে বলতে পারা যায় না, 'এ বাপু তোমাদের অন্যাই।'

নইলে এ ক'দিনে দেখলও তো কম নয়। অনেক অন্যায্য ঘটনা ঘটছে এখন সংসারে। তার কারণ বাবাই যেন কেমন একটু উদাসীন হয়ে গেছেন। আগে পাড়ার ছেলেদের এতটুকু বেচাল করবার জো ছিল না, এখন বাড়ির ছেলেরাও, ওর সামনেই যা ভয় করে। আড়ালে সমীহর বালাই নেই।

পাড়াতেই কত দেখল।

জটাদার বৌ এখন গলা তুলে শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করে। আর জটাদা নাকি বৌয়ের কাছে জোড়হস্ত। সত্যর মামাবাড়িতে ভাইয়ে ভাইয়ে হাঁড়ি ভেন্ন হয়ে গেছে। দু বাড়িতে দু দিন নেমন্তন্ন খেতে হয়েছে সত্যকে। তুষ্টু গয়লা পক্ষাঘাত হয়ে বিছানায় পড়ে, তুষ্টুর বৌ কেঁদে কেঁদে লোকের দোর-দোর ঘুরছে, কিন্তু কেউ আর ওর কাছে ঘি-দুধ নেওয়ার গা করছে না, টাল-বাহানা করে অন্যের কাছে নিচ্ছে। বলে কিনা "তুষ্টুর বৌয়ের পাতা দই? মুখে করা যায় না। তুষ্টুর বৌ আবার ঘি তৈরি করতে শিখল কবে?"

জিনিস একটু যদি নীরেসই হয়, তা বলে চিরদিনের লোকটার দুঃখু-কষ্টর সময় দেখবে না? মানুষ আর জন্তু-জানোয়ারে তবে তফাৎ কি?

লুকিয়ে দুটো টাকা দিয়ে এসেছিল সত্য তুষ্টুকে, তুষ্টুর চোখ দিয়ে জল পড়েছিল। বলেছিল, "বাপের মতন মনটি! কবরেজ মশাই আছেন, তাই এখনো বেঁচে আছি।"

কুমোর-জেঠা, কামার-খুড়ো, ধোপাপিসি কারুর সঙ্গে দেখা করতে বাকি রাখে নি সত্য, কিন্তু আগের মত কেউ সহাস্যে বলে নি, "এসেছিস্? আয় বোস।"

আসন পেতে দিয়ে বলেছে, 'আসুন দিদিঠাকরুন, বসুন।'

আশ্চর্য, একসঙ্গে সবাই কি করে বদলে গেল?

বদলায় নি শুধু গ্রামটা। বদলায় নি গাছপালা মাঠ বন, দীঘি পুকুর। এরাই শুধু উচ্ছ্বসিত আনন্দে স্বাগত জানিয়েছে, মাথা নেড়ে নেড়ে, কোলাহল

করে। আবার বিদায়কালে তারাই বিষণ্ণ বিধুর দৃষ্টি মেলে মৌন বেদনার মত তাকিয়ে থেকেছে।

এরাই শুধু বদলায় নি।

কিন্তু ওদের কাছে আর কতটুকু আশ্রয়? আশ্রয় চাই হৃদয়ের কাছে, প্রাণোত্তাপের কাছে। কোথায় সেই উত্তাপ? সকলেই ভাল করে যত্ন করেছে, আর বলেছে, "ওরে বাবা দু দিনের জন্যে এসেছে!" কেউ বলে নি, "তুই যে আমাদের চিরদিনের।"

সত্যর মা বেঁচে থাকলে কি অন্য রকম হত না? মার কাছে কি সত্যর সেই শৈশবটি সোনার কৌটোয় তোলা থাকত না? সত্য এসে দাঁড়ালে মা সেই কৌটোটি খুলে ধরে হাসিমুখে বলত না, "এই দেখ্! কিছু হারায় নি তোর। সব আছে। আমি তুলে রেখেছি।"

তা হলে হয়তো সত্যর সেই পুতুলের বাক্সটাকেও এসে দেখতে পেত সত্য। মা বলত, "এই দেখ্ তোর হাতের কাপড় পরানো এই তোর 'বড়বৌ মেজবৌ নবৌ', সেবারে এসে যেমন রেখে গিয়েছিলি তেমনই আছে।"

হ্যাঁ, ঠাকুমার শ্রাদ্ধে এসে সেবার নিজের ফেলে যাওয়া পুতুলবাক্স সাজিয়েছিল সত্য, তার পর তো তার নিজেরই জীবনের মধ্যে এল পুতুল ভেঙে যাওয়ার ঘটনা।...মাটির পুতুলের কথা আর কে ভেবেছে?

সত্য হয়ত মার ছেলেমানুষিতে হাসত। তবু সুখ পেত। 'মা না থাকলে বাপেরবাড়ি এসে সুখ নেই!' নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল সত্য। অত বড় সংসারের মধ্যে সেই মানুষটাকে, অনেকের মধ্যে একজন মাত্র ছাড়া আর তো কোনদিন কিছু ভাবে নি। হঠাৎ আজ ধরা পড়ছে সেই একজন ছাড়া সমস্ত 'অনেকই' অর্থহীন।

তবু ওরই মধ্যে পিসঠাকুমার কাছে দু দণ্ড বসলে প্রাণটা ঠাণ্ডা হত! কিন্তু সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ মানুষটার এত দুরবস্থা হয়েছে যে দেখলে প্রাণটা ফাটে।

সত্য বলেছিল, "অতিরিক্ত খেটেখেটেই তুমি এমনি করে দেহ ভেঙেছ পিসঠাকুমা! তোমার সেই শরীর স্বাস্থ্য, এই ক বছরে এমনি হয়েছে?"

মোক্ষদা ধিক্কারের হাসি হেসে বলেছেন, "অতিরিক্ত যদি না খাটব তো সেই ভূতের মত আকাঁড়া গতর নিয়ে করতাম কি বল্? ভেতরের ভূতই রাতদিন ছুটিয়ে মারত।"

"আর এখন যে সেই ভূত তোমাকেই জীর্ণ করে ফেলল।"

"মরুক গে! যে কদিন পৃথিবীর অন্নজলের বরাত আছে গড়িয়ে গড়িয়ে বাঁচবই। তার পর যে পারবে সে মুখে এক নুড়ো আগুন দিয়ে চিতেয় তুলে দেবে। যার ছেদ্দায় আসবে সে এক মুঠো পিণ্ডি দেবে। যার জন্যে একটা দিন অশৌচ পালবার কেউ নেই, তার আবার বাঁচা-মরা!"

সত্য ব্যথিত হয়ে বলেছিল, "বাবাই তোমার সব করবেন পিসঠাকুমা!"

মোক্ষদা উদাস কণ্ঠে বলেছিলেন, "তা অবিশ্যি করবেন। রামকালী মহৎ মানুষ, হয়তো মায়ের মতন করেই পিসির ছেরাদ্দ করবেন, তবু মনে মনে তো জানবেন যা করছি বাহুল্য করছি, ভিক্ষে দিচ্ছি।"

আশ্চর্য!

মোক্ষদাকে দেখে আগে কি কেউ কখনো ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পেরেছে এ সংসার মোক্ষদার নিজের নয়! এখানে মোক্ষদার জন্যে তেরাত্তির অশৌচ পালবার মতও কেউ নেই! মোক্ষদা মরলে যে তার মুখে আগুন দেবে, পিণ্ডি দেবে, সে দয়া করেই দেবে! মোক্ষদার প্রাপ্য পাওনা বলে দেবে না!

অত দাপট তবে কোন্ 'ভিতে'র ওপর খাড়া ছিল? নাকি কোথাও কোনও ভিত ছিল না বলেই, ফোঁপরা দাপটটা অত বড় করে তুলে ধরতেন মোক্ষদা? জানতেন হাতটা একটু শিথিল হলেই, মুহূর্তে ভূমিসাৎ হয়ে যাবে ফাঁকা ইমারত।

ভাবতে ভাবতে—

ছেলে দুটোকে একটু কাছে টেনে নিয়ে বসল সত্য। এরাই জোর, এরাই ইমারতের ভিত!

সারদাকে বুঝতে পারে নি সত্য।

নাগালই পায় নি সারদার।

অবিশ্যি সারদাই সর্বদা খাইয়েছে, মাখিয়েছে, যত্ন করেছে। সত্য ছেলেবেলায় যা যা খেতে ভালবাসত সেগুলি মনে করে রেঁধে দিয়েছে, হেসে হেসে বলেছে, "বুঝলি তুড়ু, তোর দাদামশাইয়ের সংসারে এ হেন জিনিস মজুত থাকতে তোর মার রুচি পছন্দ ছিল পুঁইমেটুলি ভাজা, শশাপাতার বড়া, তেতো পুঁটির টক।"

কিন্তু সত্য যখন বলতে গিয়েছিল, "যাই বল বৌ, খুব মহত্ত্বটা দেখিয়েছ তুমি! নতুন বৌ বলছিল, তুমি এক প্রকার দেবী—" তখন কেমন কঠিন হয়ে উঠেছিল সারদা। ভয়ানক তীক্ষ্ণ একটা হাসি হেসে বলেছিল, "তোমার তো বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে ঠাকুরঝি, পরের মুখে ঝাল খাচ্ছ কেন?"

বুদ্ধি-সুদ্ধি যথেষ্ট পরিমাণ থাকা সত্ত্বেও কথাটার নিহিতার্থ ঠিক ধরতে পারে নি সত্য। আর সর্বদাই লক্ষ্য করেছে, পুরনো অন্তরঙ্গতার দরজা কিছুতেই খুলতে রাজী নয় সারদা।

আর বড়দা?

তার সঙ্গে তো কথাই কইতে ইচ্ছে হয় নি সত্যর। বড়দা যে ওই গিন্নী-বান্নি সারদার স্বামী, অত বড় দুটো ছেলের বাপ, তা যেন খেয়ালেই নেই বড়দার। যেন নতুন বৌয়ের নতুন বর। তার কথা নিয়েই সত্যর সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা ফষ্টিনষ্টি। ছিঃ!

কারো সঙ্গেই যেন কথা কয়ে সুখ হয় নি।

অবিশ্যি বিদায়কালে সকলেই ব্যাকুলতা দেখিয়েছে, চোখের জল ফেলেছে, আবার কবে দেখা হবে বলে হা-হুতাশ করেছে। কেউ কেউ ডাক ছেড়েও কেঁদেছেন, কিন্তু সত্যর নিজেরই যেন ভেতরের শিকড় ছিঁড়ে গেছে। তাই নিজেও সে চোখের জল ফেললেও, যে প্রাণ নিয়ে এসেছিল, সে প্রাণটা নিয়ে ফিরছে না।

রামকালী তো চিরদিন সকলেরই দূরের মানুষ, শুধু দুঃসাহসী সত্যই পারত সেই দূরত্বের বর্ম ভাঙতে! কিন্তু সে দুঃসাহসিক আবদার সত্য নিজেই আর করতে পারে নি। সময়ও পায় নি। সর্বদা নবকুমারকেই কাছে কাছে রেখেছেন রামকালী। আর সত্যকে টেনেছে মেয়েমহলে। তবে নবকুমারকে যে রামকালী ভালবেসেছেন ওইটাই পরম তৃপ্তি।

আসার সময় বাপকে প্রণাম করে স্বামীর উপস্থিতি ভুলে রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠেছিল, "তুমি তোমার এই দুঃসাহসী আসপদ্দাওলা মেয়েকে ক্ষমা করেছ বাবা, সেই সাহসেই বলছি, আমি তোমার এক সন্তান, যেন সময়কালে সেবা-যত্নের অধিকার পাই।"

রামকালীর গলাটা কি একটু কেঁপে উঠেছিল?

চারিদিকের হা-হুতোশের শব্দে সেটা ধরতে পারে নি সত্য। শুধু

কথাটাই শুনতে পেয়েছিল। মেয়ের মাথাটা ধরে একটু নাড়া দিয়ে বলে উঠেছিলেন রামকালী, "চিরকালের পাকা বুড়ী! বাবার জন্যে তো খুব সুব্যবস্থা দিচ্ছিস! সেবার পাত্র হবই বা কেন রে?"

এ কথার আর উত্তর দিতে পারে নি সত্য, সেই গভীর একটু স্নেহস্পর্শে ভেতর থেকে উথলে কান্না এসেছিল তার। কাঁদতে কাঁদতে আর কান্না চাপতে চাপতে পাল্কিতে উঠেছিল।

পাল্কিতে উঠেও তাই কথা কইতে পারে নি অনেকক্ষণ।

হঠাৎ একসময় নবকুমার বলে উঠল, "তোমার বাবা আমাদের এই তুচ্ছ জগতের মানুষ নয়!"

চকিত হয়ে স্বামীর দিকে তাকাল সত্য।

বাতাস লেগে লেগে ততক্ষণে গালের জলের ধারাটা শুকিয়ে উঠেছে, চোখটা জল শুকিয়ে ভারী থমথমে হয়ে রয়েছে।

নবকুমার আবার বলল, "সেকালের রাজা-রাজড়াদের সব যেমন ভাব ছিল, তেমনি ভাব। ভয়ও যত করে ভক্তিও তত আসে। এমন বাপ পাওয়া পরম পুণ্যি!"

সত্যর মুখের কাছে একবার আসে, "তবু তো তুমি দেখছ ভাঙা রাসের ঠাকুর! আগের মানুষকে যদি দেখতে! এখন মন ভেঙেছে, শরীর ভেঙেছে।" কিন্তু এই বেদনা-বিধুর চিত্তে অত কথা বলতে ইচ্ছে হয় না। শুধু আস্তে বলে, "মা থাকতে তো দেখলে না! মাকেও দেখলে না! এই আক্ষেপটা রয়ে গেল।"

মনে মনে বলে, দেখ, কেন আমি বাপের গরবে গরবিনী!

কিন্তু তবু মেয়েসন্তান।

বাপের সে গরব শুধু মনের মধ্যে তুলে রাখবার। সে গৌরবে অধিকার নেই, ভোগের দাবি নেই। ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে, ছেড়ে থাকতে হবে। সেই গৌরবের ছায়ায় বসে জীবনকে ধন্য করবার উপায় নেই, জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করবার পথ নেই। ভগবান! কেন এই পোড়া সমাজ গড়েছিলে?

সমাজের ব্যাপারে ভগবানকেই দোষ দেয় সত্য। তার পর বাইরের মৌন প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনে মনে বলে, "বিদেয় নিচ্ছি তোমাদের কাছে। হয়তো বা জন্মের শোধ। পা বাড়াচ্ছি অকূলের দিকে।

এখন দেখি জিতি কি হারি। রামকালী চাটুয্যের মেয়ে, যদি হারেও, তবু হার মানবে না।"

বারুইপুর ফিরে এসেই কলকাতায় যাওয়ার তোড়জোড়। যাত্রাকালে মা বাপ কেউই কথা বললেন না, ঠিক যাত্রাকালে তো বাড়ি থেকে বেরিয়েই গেলেন, যা কিছু করলো সদু।

কিন্তু আশ্চর্য, নবকুমার যেন এই বিরাট লোকসানটাকে আর লোকসান বলে মনে করছে না। রামকালীকে দেখে এসে পর্যন্ত 'বাপ' সম্পর্কে যে একটা উঁচু ধারণা তার জন্মেছে, তার সঙ্গে নীলাম্বরের এই মেয়েলি সংকীর্ণতা যেন বড় বেশী দৃষ্টিকটু লাগলো তার। ইচ্ছে হচ্ছিল মা বাপের এই দুর্ব্যবহারের প্রসঙ্গ নিয়ে সত্যর সঙ্গে কিছু আলোচনা, অর্থাৎ নিন্দাবাদ করে, কিন্তু সত্যর ভয়েই সাহস করল না। এগিয়ে চলল নতুন জীবনের দিকে।

বত্রিশ

এ এক আশ্চর্য সকাল!

যেন এই সকালের আকাশের কোন লুকনো পৃষ্ঠপটে নিথর হয়ে আছে অনেক রহস্য, অনেক আনন্দ, অনেক ভয়। সেই রহস্য আস্তে আস্তে উন্মোচিত হবে, সেই আনন্দ ধীরে ধীরে প্রসন্ন হাসি হাসবে, অথচ সেই ভয় মুঠোয় চেপে রাখবে সমস্ত সত্তাকে। তাই উচ্ছ্বসিত হতে বাধবে, উল্লসিত হতে বাধবে, যতটা জুটছে তার সবটা গ্রহণ করতে বাধবে।

এই আশ্চর্য নতুন সকাল সেই অজানিতের ইশারা নিয়ে তাকিয়ে রইল সত্যবতীর মুখোমুখি।

সত্যবতী অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে। ভাবল, "আকাশটা কি রকম অন্যরকম!"

অথচ সত্য যে এইমাত্র এই স্বপ্ন-শহরের মাটিতে পা ফেলল, আর তার

আকাশে চোখ মেলল, তাও নয়। গত কাল বিকেলে এসে উঠেছে সে পাথুরেঘাটার এই একতলা বাসাবাড়িটায়।

তবু ভোর সকালে ঘুম ভেঙে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বেশ খানিকক্ষণ দাওয়ায় দাঁড়িয়ে রইল সত্য বিমূঢ়ের মত।

মনে পড়ল না ঠিক এই মুহূর্তে ওর কোন কাজ আছে।

যে জীবনটা অভ্যস্ত ছিল, তার কাজগুলো যেন নিজেরাই সজীব হয়ে পরপর সামনে এসে দাঁড়াত, কিন্তু চিরপরিচিত গণ্ডির সেই নিত্য কাজগুলো ঝাপসা হয়ে গেছে। এলোকেশীর হাতের কাটা খাল দিয়ে আর ডোঙা ভাসবে না সত্যর। এবার সত্যকে নিজে হাতে খাল কাটতে হবে।

কোথায় যেন ভোরের পাখীরা ডাকছিল, সত্যর মনে হল ওরা কি নিত্যানন্দপুর থেকে উড়ে উড়ে সত্যর সন্ধান করতে এসেছে, না বারুইপুরের কোন এক অজানা গাছের ডালে বসে সত্যকে ডাক দিচ্ছে? বলছে, "সত্য, তুমি ভুল করতে বসেছ। দ্যাখ, বিবেচনা কর, এখনও হয়তো সময় আছে ফেরবার।"

সত্য কি সত্যিই ভুল করল?

নইলে বুকের ভেতরটায় এমন ভয়-ভয় করছে কেন? কেন নিজেকে কেমন যেন অসহায় লাগছে?

দাঁড়িয়ে থাকতে বল পাচ্ছে না সত্য, তাই বসে পড়ল দাওয়ার ধারে। ভাবল হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে এসে বোধ হয় মাথাটা হালকা লাগছে। একটুক্ষণ বসে নিয়ে স্নান করতে গেলেই হবে। আজকের দিনটা পর্যন্ত ইচ্ছেমত, কাল থেকে নবকুমার কাজে লাগবে।

পাড়াগাঁয়ের 'কাছারী-বাড়ি'র চাকরি নয়, এ একেবারে কলকাতা শহরের অফিসের চাকরি। ভাত দিতে এক পলক এদিক ওদিক করলে চলবে না। সত্যকে শুনিয়ে শুনিয়ে এলোকেশীর এক বান্ধবী অবহিত করিয়ে দিয়েছিলেন, "বুঝবেন ঠ্যালা! স্বাধীন সংসার করার মজা বুঝবেন! 'আপিসের ভাত' যে কী বস্তু জানেন না তো! দেখে এসেছিলাম সেবার কালীঘাটে আমার পিসতুতো ভেয়েদের বাড়ি গিয়ে। একটা মানুষের ভাত যোগাতে তিন-তিনটে বৌ হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। তোমার বৌ অবিশ্যি করিৎকর্মা,

তবে শাউড়ী-ননদের তলায় তলায় কাজ, আর এক হাতে 'হরিদ্বার গঙ্গাসাগর' —অনেক তফাৎ!"

এলোকেশী বলেছিলেন, "পারবে। বুকের পাটার জোরেই পারবে। তবে খোয়ার হতে আমার ছেলেটারই হবে। বাছা আমার জগতের কিছু জানে না, তাকে গলায় গামছা বেঁধে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে জুততে গেল। যাক—ভগবান দেখছেন!"

বান্ধবী বলেছিলেন, "তা তো সত্যি! যে অন্যাই পথে সুখ করতে যাবে, তার বিচার ভগবান অবিশ্যিই করবেন। সংসার করা মানে তো আর মাছের ল্যাজা ভাত খাওয়া নয়, তার অনেক হ্যাপা। কথাতেই আছে—একলা ঘরে চতুর্ভুজে খেতে বড় সুখ, মারতে এলে, ধরতে নেই, ওইটাই যা দুখ।"

এর পর আলোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল, "ঠ্যালা বুঝলেই নবুর বৌ পালিয়ে আসতে পথ পাবেন না।"

সত্য সেদিন মনে মনে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসেছিল। কিন্তু আজ সত্য একটু যেন ভয় পাচ্ছে। ভাবছে এই শহরকে আমি বুঝতে পারব তো? আপনার করতে পারব তো? এ শহর আমাকে "আয়" বলে কাছে টানবে তো? এখানে আমাকে নিস্পরের মত, বেচারীর মত, থাকতে হবে না তো?

না, "আপিসের ভাত"কে ভয় করে না সত্য, ভয় করে না "একা হাত"কে। সত্যর ভয় অপরিচয়ের ভয়।...

"মা!"

বড় খোকা তুড়ু এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে। নীলাম্বর নাম দিয়েছিলেন "তুড়ুক সোয়ার", সেই থেকে তুড়ু। ভাল নাম সাধন। প্রথম সন্তানটি নষ্ট হয়ে গেছে, তাই এটি সাধনার ধন। অতএব সেই ঘেঁষা নাম।

তুড়ুর ফোলা ফোলা চোখে অগাধ বিস্ময়।

সত্য তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে বলে, "উঠে পড়েছিস? ভাই ওঠে নি?"

"না।"

"আর তোদের বাবা?"

"না।"

"তা উঠবেন কেন? আয়েসটি যে নবাবী! কাল থেকে বুঝবেন মজা!"

আলিঙ্গি ভেঙ্গে উঠে দাঁড়ায় সত্য।

কী বোকার মত বসেছিল এতক্ষণ! কী ভাবছিল আবোলতাবোল। নতুন জায়গায় সব ব্যবস্থা করে নিতে কম তো দেরি হবে না।

গতকাল সন্ধ্যায় রান্না হয় নি।

ভবতোষ মাস্টার ঘর-দোর দেখিয়ে শুনিয়ে ওদের বসিয়ে রেখে বলেছিলেন, "তুমি তা হলে এদের সামলে-সুমলে নিয়ে বসো নবকুমার, বৌমাকে বলো বেলা থাকতে, প্রদীপ জ্বালাবার ব্যবস্থা করে ফেলতে, নতুন জায়গা! আমি তোমাদের জন্যে কিছু খাবার নিয়ে আসছি। এখন আর রান্নাবান্নায় কাজ নেই—"

সত্য ঘরের ভিতর থেকে দরজার শিকল নেড়েছিল।

নবকুমার সেদিক থেকে ঘুরে এসে হাত কচলে বলেছিল, "আপনি আবার বৃথা কষ্ট করবেন কেন? ইয়ে মানে—যাহোক করে দুটো ভাত ফুটিয়ে নেবে অখন।"

ভবতোষ মাস্টার একবার সেই দরজার দিকে দৃষ্টিপাত করে সরাসর অন্তরাল-বর্তিনীকেই উদ্দেশ করে বলে উঠেছিলেন, "যাহোক করে করতেও অনেক ল্যাঠা বৌমা, কাল সকাল থেকেই একেবারে নতুন করে পত্তন করো। কাল আমি একটা বাসনমাজার ঠিকে ঝি যোগাড় করে নিয়ে আসব। আজ বাজার থেকে পুরী-তরকারি মিষ্টি এনে···"

নবকুমার হঠাৎ বলে উঠেছিল, "বাজারের পুরী-তরকারি? কলকাতায় পা দিতে দিতেই জাতটা খোওয়াব?"

হেসে উঠেছিলেন ভবতোষ মাস্টার।

বলেছিলেন, "নাঃ! তুমি একেবারে মান্ধাতার আমলেই আছ নবকুমার! জাতটা খোওয়াচ্ছ কিসে? আমি কি ম্লেচ্ছ হোটেলের খানা এনে খাওয়াতে চাইছি তোমায়? দেশে তোমরা ময়রার ঘরের জিলিপি মেঠাই ফুলুরি বেগুনি খাও না? এও সেই ময়রার দোকানের।"

নবকুমার মাথা চুলকেছিল।

"ইয়ে মানে, ওই তরকারি-টরকারি বলছিলেন তাই বলছি। একটা দিনের জন্যে কেন আর···"

ভবতোষ মাস্টার জোর দিয়ে বলেছিলেন, "শুধু একটা দিন কেন, এমন

অনেক দিনই হতে পারে নবকুমার! বৌমা একা মানুষ। শরীর-অশরীর আছে। কোনদিন যদি ভাতের হাঁড়ি নামাতে না পারলে! তা ছাড়া জলখাবার বলে কথা আছে। কলকাতায় এত হরেক খাবার, খাবে না ছেলেপুলে? তোমায় তো আমি দোকানের ভাত খেতে বলছি না। তবে যদি বৌমার তেমন আপত্তি থাকে…”

আর একবার শেকল নড়ে উঠেছিল।

নবকুমার ঘুরে এসে বলেছিল, “না, ইয়ে মানে ওদিকে আপত্তি কিছু নেই। বলছে আপনি যা বলবেন, তাই শিরোধার্য! আপনি হিতৈষী বন্ধু গুরু! আপনার…”

“হয়েছে হয়েছে! অত ভাল ভাল কথা বেশী খরচ করবার দরকার নেই নবকুমার! তোমরা খেয়েদেয়ে একটু সুস্থ হও, আমি দেখে বাসায় যাই।”

নিজের পয়সায় একরাশ খাবার এনেছিলেন ভবতোষ মাস্টার। পুরী তরকারি চমচম রাবড়ি। সাজা পানও এনেছিলেন। বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল ছোট ছেলে দুটো। কী সোনার দেশে এলো তারা।

নিতাইয়ের সঙ্গে একসঙ্গে থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু এদের সঙ্গে একসঙ্গে এসে উঠতে পারে নি নিতাই। কদিন পরে আসবে। রাত্রে তাই একবার প্রস্তাব করেছিলেন ভবতোষ, “একা ভয় পাবে না তো নবকুমার? নতুন জায়গা। বল তো যে কদিন না নিতাই আসে, রাতে আমি তোমাদের পাহারা দিই?”

নবকুমার হাতে চাঁদ পাচ্ছিল।

কিন্তু সে চাঁদ মুঠোয় পেতে দিল না সত্য। শেকল নেড়ে জানাল, মাস্টার মশাইয়ের কষ্ট পাবার দরকার নেই, দরজায় হুড়কো লাগিয়ে বেশ থাকবে তারা।

ভবতোষ চলে গিয়েছিলেন।

আর চলে যাবার পর সত্যকে এক হাত নিয়েছিল নবকুমার। চিরকাল যেটা বলে সেটা বলেই বলেছিল।

“সব তাতেই দুঃসাহস প্রকাশ। ভগবান যে কেন তোমাকে বেটাছেলে না করে মেয়েছেলে গড়েছিল তাই ভাবি।”

সত্যর মুখ কঠিন হয়ে ওঠে নি। সত্য হেসে ফেলেছিল। গলা খুলে। নিজের এই খোলা হাসির শব্দ নিজের কানেই অপরিচিত ঠেকেছিল সত্যর।

তবু খোলা গলাতেই বলেছিল, "ভাববার কি আছে? তোমাকে তো ভগবান বেটাছেলে করে গড়েছে! অপরের পিত্যেশ করলে চলবে কেন? বারো মাস তো অপরে করবে না? তবে? গোড়া থেকেই মনের জোর করে পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করা উচিত।"

সন্ধ্যার অন্ধকারে মিটমিটে প্রদীপের ছায়ায় এ বল খুঁজে পেয়েছিল সত্য, আর সকালের হীরে-ঝকঝকে আলোয় দুর্বল হয়ে পড়বে?

না। পড়বে না। সত্য আঁচল কোমরে জড়িয়ে নেমে পড়েছে কাজে। নেমে পড়বে নতুন জীবন সংগ্রামে।

এ সংসার সত্যর নিজের। নিজের ছাঁচে, নিজের ভাবে, নিজের স্বপ্নে একে গড়ে তুলবে সত্য।

ভবতোষ বাসার ঘর দোর সব ধুইয়ে মুছিয়ে রান্নাঘরে উনুন পাতিয়ে রেখেছিলেন। আনিয়ে রেখেছিলেন ঘুঁটে কয়লা। কাল নবকুমারের মাধ্যমে কয়লার উনুন জ্বালার পদ্ধতিটাও শিখিয়ে দিয়ে গেছেন সত্যকে। সেই পদ্ধতিতে উনুনে আগুন দিতে দিতে হঠাৎ ভারী অবাক লাগল সত্যর। যে ভাবে ইচ্ছে কাজ করতে পারে সত্য। কেউ কোথাও চোখ দেবার নেই, ছল ধরবার কি খুঁত ধরবার নেই। এ কী অদ্ভুত অনুভূতি!

এ কী অপূর্ব সুখ।

এই সুখটার ধারণা নিয়ে তো মুক্তির লড়াই করে নি সত্য। ও শুধু চেয়েছিল তেমন দেশে চলে আসতে, যেখানে রোগে ডাক্তার আছে, ছেলেদের জন্যে ভাল ইস্কুল আছে, পুরুষদের জন্যে কাজ আছে।

নিজের জন্যে ভাল কি আছে, সে কথা ভেবে দেখে নি সত্য। শুধু জেনেছিল নিন্দে আছে, ধিক্কার আছে? এখন দেখছে আরো অনেক আছে। স্বাধীনতার সুখ মানে তা হলে এই? মাথার ওপর সর্বদা উদ্যত খাঁড়ার বদলে অনেক উঁচুতে আলো ঝকঝক আকাশ থাকা!

শহরের মেয়েরা যে কেন বিদ্যেয় বুদ্ধিতে অনেক উঁচু, তার মানে বুঝতে পারে সত্য। যারা এত পাচ্ছে, তারা তার প্রতিদান দেবে বৈকি!

হঠাৎ একটু স্তব্ধ হয়ে গেল সত্য।

সেও তো অনেক পাবে, তার বদলে দিতে পারবে তো কিছু!

রান্নাঘর থেকে বেরোতে গিয়ে থতমত খেয়ে ফের ঘরে ঢুকে পড়তে হল

সত্যকে। ভবতোষ উঠোনে দাঁড়িয়ে। 'উঠোন' বলতে সত্যর পরিচিত জিনিস নয়। শান-বাঁধানো চারচৌকো খানিকটা জায়গা মাত্র। পাড়াগাঁয়ে একে চাতাল বলে।

সে যাই হোক, ভবতোষ সেখানে দাঁড়িয়ে গলাখাঁকারি দিলেন, তার পর বললেন, "নবকুমার আছ নাকি ?"

"বাবা ঘুমুচ্ছে।"

সাড়া দিল বড় খোকা।

ভবতোষ গলা চড়ালেন, "এখনো ঘুমুচ্ছে ? কাল থেকে যে দশটায় অফিস যেতে হবে। আমি এই একজন লোক ঠিক করে আনলাম, মেয়েলোক। খোকা, তোমার মাকেই তা হলে বল, কথাবার্তা কয়ে নিতে। আমি অবশ্য মোটামুটি বলে নিয়ে এসেছি। বাসনমাজা, ঘর মোছা, ছাড়া কাপড় কাচা, কয়লা ভাঙা, উনুন ধরানো, মশলা পেষা, এই সব করতে হবে। মাইনে মাসে বারো আনা, জলপানি চার আনা। তবে মাথায় মাখতে তেল একটু দিতে হবে। চান না করলে তো আর মশলা পেষা চলবে না।"

নবকুমারের সাড়া পাওয়া যায় না। ঘরের মধ্যে বিহ্বল সত্য এই সকালেও ঘামতে থাকে।

সব কাজই যদি ঝি করবে, সত্য তা হলে কী করবে ?

শুধু বাসনমাজার জন্যে হলেই তো হত !

ভবতোষ সঙ্গের স্ত্রীলোকটিকে উদ্দেশ করে বলেন, "কই গো বাছা, এগিয়ে এস। ওই ওদিকে মা রয়েছেন, তাঁর সঙ্গেই বলা-কওয়া করে নাও। এখন থেকেই লেগে যাও তা হলে। এই তো রাতের শকড়ি ঘটিবাটি পড়ে রয়েছে।"

আর বেশীক্ষণ লজ্জাবতীর ভূমিকার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখা সম্ভব হল না সত্যর। মাথার কাপড়টা টেনে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে নম্র গলায় বলে ফেলল, "এত সবের জন্যে বলবার দরকার ছিল না। ঘরের কাজ নিজেই চালিয়ে নিতে পারব—"

ভবতোষ প্রথমটা একটু থতমত খেলেন, কারণ সত্য এসে কথা বলবে, আশা করেন নি। তার পর সামলে উঠে বললেন, "কেন ? লোক যে ক্ষেত্রে রাখাই হচ্ছে, সবই করবে। এমনিতে শুধু বাসনমাজাতেও তো আট আনার কম রাজী হচ্ছে না। আর গণ্ডা চারেক পয়সা দিলেই—"

"পয়সার জন্যে না—", সত্য এবার প্রায় স্পষ্ট গলায় বলে ওঠে, "নিজের অব্যেস খারাপের জন্যে বলছি। সব কাজ লোক দিয়ে করালে আয়েস এসে যাবে। সময়ই বা কাটবে কিসে ?"

ভবতোষ মিনিট খানেক হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন। কথাটা হৃদয়ঙ্গম করতে এ সময়টুকু লেগে যায় তাঁর।

শ্বশুরবাড়িতে খেটে খেটে হাড়কালি করা কোন মেয়ে যে বাসায় এসে "আয়েস" করতে চায় না, এ তাঁর অভিনব মনে হল। ছাত্র নবকুমারের স্ত্রীটি সম্পর্কে অবশ্য তিনি বরাবরই একটু সমীহভাবাপন্ন, তবু আজ যেন তার সম্পর্কে আরও বেশী অবহিত হলেন।

হয়তো বা কিঞ্চিৎ অভিভূতও।

তার পর ধীরস্বরে বললেন, 'মেয়েছেলেদের জন্যে আরো অনেক ভাল ভাল কাজ আছে বৌমা, তাতেও সময় কাটবে। তা ছাড়া অবকাশকালে ঘরে বসে বসে লেখাপড়ার চর্চা করলেও—"

কথা শেষ হল না, নবকুমার বেরিয়ে এল ঘর থেকে চোখ রগড়াতে রগড়াতে। তটস্থ হয়ে বলল, "মাস্টার মশাই আবার সকালবেলাই কষ্ট করে—"

"না কষ্ট আর কি! এই কাজের লোক ঠিক করে আনলাম। দেখিয়ে শুনিয়ে দাও একে। এবার একটা গোয়ালা ঠিক করে দিতে পারলেই সব ব্যবস্থা হয়ে যায়।"

"আপনি আর কত কষ্ট করবেন ?"

সত্য বলে ওঠে।

আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠে নবকুমার।

দরজার শেকল নাড়া পর্যায়টা কখন পার হল! এভাবে স্পষ্টাস্পষ্টি কথা! অবাক কাণ্ড!

ভবতোষ বলেন, "আমাকে যদি তোমরা পর ভাব নবকুমার, তবেই কুণ্ঠা বোধ করবে। আমি কিন্তু তোমাদের পর ভাবছি না।"

"না না, সে কি ? পর মানে ?"

নবকুমার কথার খেই হারায়। এবং বোধ করি "আপন" ভাবার প্রমাণ দেখাতেই তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "আমি তো এই ভাবছিলাম আপনার সঙ্গে হাটটা ঘুরে আসি। কোন্ কোন্ বারে হাট বসে এখানে ?"

ভবতোষ হাসেন।

বলেন, "কলকাতায় রোজই হাট।"

"ওঃ। প্রত্যেক দিন বাজার বসে?"

"তা বসে। একটা নয়, অনেক বাজার। তা আজ আর তোমাকে যেতে হবে না, আমিই ব্যবস্থা করছি। তুমি বরং বাড়ির কাজে, মানে কি সুবিধে অসুবিধে—"

"বাড়ির কাজে কিছু আটকাবে না—", সত্যর ধীর গম্ভীর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়। তার পর ঘরের মধ্যে থেকে একটা ধামা বার করে এনে নবকুমারের সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে যায় সত্য।

এমনি করেই আরম্ভ হয় সত্যর শহরের সংসার।

নিজের সংসার।

কদিন পরে নিতাই আসে।

নবকুমার বলে, "ওকে আর তোমার লজ্জা করলে চলবে না। একসঙ্গে থাকা, ভাইয়ের মত, বাড়িতে আর দ্বিতীয় মেয়েছেলে নেই, ভাত বেড়ে দেবে তুমি—"

সত্য মৃদু হেসে বলে, "অত বলবার কি আছে? আমাকে কি তোমার খুব লজ্জাবতী মনে হয়?"

"আহাহা ইয়ে তা নয়! মানে লজ্জা আর কোথা? মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গেই তো তুমি দিব্যি কথাটথা চালাচ্ছ।…বুঝলি নিতাই, প্রথম দিন আমি তো তাজ্জব! যাই ভাগ্যিস মা নেই সামনে? খুব সাহসী বুঝলি? মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে আমরাই তো—"

নিতাই এক নজর সত্যর দিকে দৃষ্টিপাত করে বলে, "বৌঠানকে এতদিন দেখেও চিনতে পারলে না নব? তোমার আমার মাটি দিয়ে গড়া উনি নন। তোমার অনেক ভাগ্য তাই—"

হঠাৎ ওদের চমকে দিয়ে হেসে ওঠে সত্য, "নাও, নাওয়া-খাওয়া শিকেয় তুলে এখন দুই বন্ধুতে ভাগ্যবিচার শুরু হয়ে গেল। আচ্ছা ঠাকুরপো, তুমিই বল, মাস্টার মানে হল গিয়ে গুরু, কেমন কিনা? তা গুরুকে লজ্জা করলে চলবে কেন? ভক্তি করব, ছেদ্দা করব, মান্য করব, ভয় লজ্জা করব কেন? আমি তো ওনার কাছে ইংরিজি পড়ব ঠিক করেছি।"

"কী বললে?"

নবকুমার জ্যা-মুক্ত ধনুকের মত ছিটকে ওঠে, "কি শিখবে?"

"বললাম তো!"

"পাগলামি করো না। বেশী বাড়াবাড়ি ঠিক নয়। যা রয় সয় তাই ভাল। কলকেতায় এসেছ, বাসার সংসার করছ, এ পর্যন্ত একরকম, তা বলে—"

"তা ইংরিজি শিখব বলেছি বৈ তো গাউন পরে হোটেলে খানা খেতে যাব বলি নি?" কৌতুকের হাসিতে জোড়া ভুরু নেচে ওঠে সত্যর, উৎফুল্ল মুখ লাল হয়ে ওঠে, নিতাইয়ের দিকে সরাসর তাকিয়েই বলে, "তোমার বন্ধুর সবতাতেই ভয়। ঘরে বসে বই পড়ে যদি একটু জ্ঞান বিদ্যে অর্জন করা যায়, তাতে দোষটা কি বল তো? নাকি মেলেচ্ছ অক্ষর ছুঁলেও জাত যাবে?"

নবকুমার গম্ভীর ভাবে বলে, "তা একরকম তাই বৈকি। যতই হোক হিন্দুর মেয়ে।"

"আর নিজে হিন্দুর ছেলে নও?"

"বেটাছেলের কথা আলাদা।"

"আলাদার কিছু নেই। ধর্মের কাছে সব সমান। আর যদি জাত যাওয়ার কথাই বল—", আর একবার কৌতুকের আলো ফুটে ওঠে সত্যর মুখে, "সে তা হলে অনেক দিনই গেছে।"

"অ্যাঁ!"

"অ্যাঁ!"

যুগপৎ দুই বন্ধুরই মুখবিবর হাঁ হয়েই থেকে যায় বুজতে ভুলে।

সত্য মৃদু মৃদু হাসতেই থাকে।

একটু চৈতন্য লাভ করে নবকুমার বলে, "ইংরেজি পড়েছ তুমি?"

"সামান্য সামান্য। নিজের চেষ্টায় যা হয়। তোমার বই দুটো তো ছিল ঘরে।"

"তাজ্জব!"

নিতাইয়ের কণ্ঠ থেকে শুধু এইটুকুই স্বর নির্গত হয়।

"কিগো ঠাকুরপো, আমার হাতে চলবে তো? নাকি জাত যাওয়ার হাতে খাবে না?"

কথা নেই বার্তা নেই সহসা নিতাই এক হাস্যকর কাজ করে বসে।

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সত্যর পায়ের কাছে সাষ্টাঙ্গে এক প্রণাম করে।

সত্য অবশ্য এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। দু পা পিছিয়ে যায়। তার পর ধীর স্বরে বলে, "যাক ঠাকুরপো, গুরুজন বলে মানলে তা হলে? বেশ। নাও এবার বাধ্যতা কর। তোমার তো এখনো দুদিন ছুটি, চান করে খেয়ে ভাইপোদের নিয়ে ইস্কুলে ভর্তি করতে যাও দিকিন। কদিন এসেছে, কেবল খেয়ে খেলিয়ে বেড়াচ্ছে! যার জন্যে এত কাণ্ড করে কলকেতায় আসা।"

তেত্রিশ

কালের খাতার কয়েকখানা পাতা ডান দিক থেকে বাঁ দিকে চলে আসে, গড়িয়ে যায় অনেকগুলো দিন।...

অনভ্যস্ত জীবন প্রায়-ধাতস্থ হয়ে এসেছে নবকুমারের। গতিতে বেশ খানিকটা ক্ষিপ্রতার সঞ্চার হয়েছে, বাড়িতে অফিসের গল্প করতে শিখেছে, অফিস যাওয়ার সময় কৌটো ভর্তি পান, আর পানের সঙ্গে দোক্তা নিতে শিখেছে।

ইতিমধ্যে ছেলেরা স্কুলে কয়েকবার ক্লাস বদলেছে, আর সত্যবতীরা একবার বাসা বদলেছে।

বাসা বদলাবার অবশ্য অতি সূক্ষ্ম গোপন একটি ইতিহাস আছে, সে ইতিহাস শুধু সত্যবতীর আর ভবতোষ মাস্টারের মধ্যেই নিবদ্ধ।

বেশ চলছিল সংসার।

তাড়াহুড়ো করে স্বামীর আর স্বামীর বন্ধুর অফিসের ভাত রাঁধছিল সত্য। পান সাজছিল দু কৌটো করে। তারা বেরোতে না বেরোতে ছেলেদের নাওয়া খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত হচ্ছিল, "দুর্গা দুর্গা" উচ্চারণ করে ছেলেদের স্কুলে পাঠাচ্ছিল, তারপর সারাদিনের অবসরে সংসারের বাকী কাজগুলো সেরে তুলে মন দিয়ে শিখছিল লেখাপড়া। বাংলা ইংরিজী দুই-ই।

বইয়ের যোগানদার ভবতোষ, পাঠশিক্ষকও ভবতোষ। নিয়মিত নয়, মাঝে মাঝে দুরূহ জায়গাগুলো বুঝে নিত সত্য। ঘরের মধ্যে উঁচু চৌকিতে বসতেন মাস্টার, চৌকির সামনে মাটিতে সত্যর দুই ছেলে বসত মাদুরে নিজেদের বই খাতা নিয়ে, আর সত্য মাদুর থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে মেজেয় বসত মাথায় কাপড় টেনে।

কিন্তু কথা চিরদিনই স্পষ্ট সত্যর।

তাই দূরত্ব সত্ত্বেও তার প্রশ্ন বুঝতে অসুবিধে হত না ভবতোষের।

এই. পড়াশোনার মাঝখানে হঠাৎ একদিন সত্য বলে বসল, "আমাদের জন্যে অনেক তো করলেন আপনি, আর একটু কষ্ট করতে হবে।"

ভবতোষ বিচলিত হয়ে বললেন, "কষ্ট কিসের, কষ্ট মানে ?"

"কষ্ট তো বটেই। এযাবৎ অনেক কষ্ট করলেন। সে যা হোক, আপনি পিতৃতুল্য, আমি আপনার মেয়ের মত, তাই 'কিন্তু' আমি হচ্ছি না—"

সত্যর বড় ছেলে লক্ষ্য করল, হঠাৎ যেন মাস্টার মশাইয়ের মুখটা কেমন বদলে গেল। কি রকম যেন ভয় পাওয়া ভয় পাওয়া মুখ হয়ে গেল।

সত্যর অবশ্য মাথায় ঘোমটা, মুখ নীচু।

ভবতোষ অস্ফুটে কি যেন বললেন। সত্য পরিষ্কার গলায় উত্তর দিল, "হ্যাঁ সেই কথাই বলছি—'কিন্তু' আমি হচ্ছি না। আপনি কায়েত ঠাকুরপোর জন্যে অন্য একটা ব্যবস্থা করে দিন। এখেনে তো শুনেছি মেস-ঘর না কি যেন আছে, মাথাপিছু খাই-খরচা দিয়ে বেটাছেলেরা এক জোট হয়ে থেকে আপিস-কাছারি করে।"

কায়েত ঠাকুরপো অর্থে নিতাই।

সামনে শুধু "ঠাকুরপো" বললেও আড়ালে তার সম্পর্কে অপরকে বোঝাতে "কায়েত ঠাকুরপো" বলেই উল্লেখ করে সত্যবতী। কিন্তু সেটা কেবলমাত্র বোঝাতেই।

নবকুমারের সঙ্গে তো ঠিক ভাইয়ের মতই ছিল সে এ বাড়িতে, আর নেহাত "ভাতে"র ছোঁয়াটা বাদে অত বামুন কায়েতের ভেদাভেদও ছিল না সত্যর কাছে। খুব সৌহার্দ্যই তো ছিল।

হঠাৎ কি হল ?

ভবতোষ তাই অন্যমনস্কভাবে বললেন, "সে তো আছে।"

"হ্যাঁ সেই কথাই বলছি। ওনার থাকার জন্যে ব্যবস্থা একটা আপনাকে নিঘ্যসই করতে হবে।"

ভবতোষ মাথা চুলকে বলেন, "তা না হয় দিলাম, কিন্তু হঠাৎ ? মানে সে কি কিছু বলেছে ? ইয়ে এখানে থাকবে না বলে—"

"না তিনি কিছু বলেন নি—", সত্য দৃঢ় গলায় বলে, "আমিই বলছি। আর এটা আপনাকে করতেই হবে।"

ভবতোষ মুহূর্ত কয়েক চুপ করে থেকে আস্তে বলেন, "তুমি যখন বলছ বৌমা, অবশ্যই ন্যায্য কোন কারণ আছে। তবু মানে বুঝতে পারছি না বলে, কেমন যেন চিন্তায় পড়ছি।"

এবার আর উত্তর এল না সত্যর দিক থেকে।

ভবতোষ উঠে দাঁড়ালেন।

তার পর বললেন, "নবকুমারেরও এই মত তো ?"

সত্য বলল, "ঘর-সংসারের সুবিধে-অসুবিধেয় বেটাছেলের মতামত চলে না। ব্যবস্থা হয়ে গেলে বললেই হবে।"

ভবতোষ বুঝলেন। বুঝলেন কোন একটা গোলমেলে ব্যাপার ঘটেছে। কিন্তু নিতাই ছেলেটা তো—হল কী !

আচ্ছা—হঠাৎ বলা কওয়া নেই, নিতাইকে তিনি বলবেন কি করে, "ওহে তোমার জন্যে মেসের ঘর যোগাড় করেছি, কাল থেকে থাক গে যাও সেখানে।"

সে কথা বলেও ফেললেন।

"নিতাইকে আগে একটু না জানালে—"

"হ্যাঁ, সে একটা চিন্তা বটে। কিন্তু কি আর হবে ? বলতেই যখন হবে। সে ব্যবস্থা আমিই করব।"

ভবতোষ অগত্যাই বিদায় নিলেন।

বড় ছেলে বলল, "কাকাবাবু কেন এখানে থাকবেন না মা ?"

সত্য গম্ভীর ভাবে বলল, "ছেলেমানুষ সব কথায় থাকতে নেই খোকা ! যখন যা হবে দেখতেই পাবে। কেন কি বিত্তান্ত অত ভাবতে বসো না।"

তা তারা শুধু দেখতেই পেল।

দেখল বাবা কোথায় যেন পালিয়ে থাকল, মা চুপচাপ দরজা ধরে দাঁড়িয়ে

রইল, আর নিতাইকাকা নিজের তোরঙ্গ আর বিছানা নিয়ে আস্তে আস্তে একটা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়িতে গিয়ে উঠল।

পরিস্থিতিটা এমন থমথমে যে, একটিও প্রশ্ন করতে সাহস হল না তাদের।

তা সাহস প্রথমটায় নবকুমারেরও হয় নি। তাই সে সকাল থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে প্রায় চোরের মত চুপি চুপি তাকিয়ে দেখল নিতাইয়ের ঘরটার দিকে। দেখল দরজায় শেকল তোলা

বুকটা ধক্ করে উঠল।

মনে হল তার "অন্তর" নামক জায়গাটাতেও যেন অমনি একটা শেকল তোলা দরজা দাঁড়িয়ে রয়েছে মুখ গম্ভীর করে। সে দরজা আর বুঝি কোনদিন খুলবে না। সেই বন্ধ ঘরের মধ্যে রয়ে গেল নবকুমারের অনেকখানিটা সুখ, অনেকখানিটা আনন্দ।

ঈশ্বর জানেন সত্যর হঠাৎ কেন এই খেয়াল!

নিতাইয়ের কোনও ব্যবহারে যে সে রাগ করেছে তাও তো মনে হচ্ছে না। নিজের চক্ষে কাল দেখেছে নবকুমার, রান্নাঘরে নিতাইয়ের ভাত বাড়তে বসে টপটপ করে চোখের জল পড়ছে সত্যর। আর এও লক্ষ্য করেছে নিতাই যা যা খেতে ভালবাসে; সেই সবই আজ কদিন ধরে রাঁধছে সে।

তবে?

হিসেবটা মিলছে কোন্‌খানে?

তবে কি খরচপত্রের কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে সত্য?

কিন্তু তাতেই বা প্রশ্নের উত্তর কোথা? নিতাই তো সংসার খরচের ভাগ না দিয়ে ছাড়ে না।

গোলকধাঁধাঁর মধ্যে কাটাতে হয়েছে নবকুমারকে।

সত্যকে প্রশ্ন করে সদুত্তর জোটে নি। সে বলেছে, "এ তো ভাল ব্যবস্থাই হচ্ছে। দু বেলা বাড়া ভাতটা পেলে, ঠাকুরপোর আর বৌ এনে বাসা করার চেষ্টা থাকবে না।"

নবকুমার ঝেঁজে উঠে বলেছিল, "ওর পরিবারের কথা ও বুঝবে। সে চেষ্টা যে করতেই হবে, তার কোনও মানে আছে? গাঁ সুদ্ধু বৌ কি তোমার মতন বাসায় আসার জন্যে পা তুলে বসে আছে?"

সত্য অবশ্য এ কথায় মর্মাহত হয়ে নিথর হয়ে যায় নি। প্রথম প্রথম যেমন হত। কারণ যে কোন বিষয়ে সামান্যতম অসুবিধে বা অপছন্দ হলেই

সত্যর "বাসায় আসার" বাসনা নিয়ে খোঁটা দেওয়ার অভ্যাস নবকুমারের গোড়া থেকেই। বহুবিধ স্বাচ্ছন্দ্য সুখের আস্বাদ পেলেও, এবং বহুবার মনে মনে সত্যকে তারিফ করলেও, ওটা যেন ওর একটা মুদ্রাদোষের মতই।

প্রথম প্রথম সত্য অভিমানে পাথর হয়ে যেত। আর সেই পাথর-মূর্তি অসহ্য হওয়ায় শেষ অবধি নবকুমারকেই মিটমাট করতে হত। বলতে হত, "ঘাট হয়েছে বাবা, শতেকবার ঘাট হয়েছে। এই নাক মলছি, কান মলছি, আর যদি ও কথা মুখে আনি। ঠাট্টার কথা বুঝতে পার না, এই এক আশ্চয্যি!"

তা "ঠাট্টা" বলেই বুঝিয়ে বুঝিয়ে ক্রমশঃ জিনিসটাকে গা সহা করে এনেছিল নবকুমার। এখন এমন হয়েছে যে ওই খোঁটাটাকে আর গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না সত্য। সেদিনও তাই আনে নি।

শুধু ভ্রূকুটি করে বলেছিল, "পা তুলে আছে কি নেই, সেটা তো যতক্ষণ না অন্তর্যামী হচ্ছ, টের পাবে না। তবে মানুষের সংসারেও নেয্য হিসেব একটা আছে। বিয়েটা করে লোকে ঘরকন্না করবার জন্যেই।"

আরো খানিক বাক্যব্যয় করেছিল নবকুমার অনেকটা একতরফা। তবু তার মনে আশা ছিল শেষ পর্যন্ত নিতাইয়ের যাওয়ার কথাটা হাওয়ায় ভাসবে। কিন্তু দেখল ক্রমশঃই সেটা পাকতে থাকল।

কেউই কিছু বলে না তবু যেন কোথায় কি হতে থাকে। খেতে বসে দু বন্ধুতে কথাও হয় না তা নয়। কিন্তু সে যেন কেমন শুকনো শুকনো, আঠাছাড়া। অথচ নিতাইকে স্পষ্টাস্পষ্টি জিজ্ঞেস করতেও সাহসে কুলোয় না।

সত্যকেও না।

কিন্তু আজ এই দুঃখের আবেগে ওর সাহস জেগে উঠল। ওখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে এসে তীব্র স্বরে বলে ফেলল, "বিনি দোষে নিরপরাধ মানুষটাকে বাড়ি থেকে বিদেয় করে দিতে মনটা একবার কাঁদলও না? ধন্যি মেয়েমানুষ বটে!"

সত্য তখন প্রদীপের সামনে হেঁটমুণ্ডে বসে একখানা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল, স্বামীর এই মন্তব্যে একবার মাত্র মাথাটা তুলল, তার পর নীরবেই আবার মাথা নীচু করল।

নবকুমারের তখন ভিতরে আলোড়ন চলছে, তাই সবই খারাপ লাগছে।

অতএব ওই বইয়ের পাতা ওল্টানোতেও গা জলে গেল তার। বলল, "মা যা বলে ঠিকই বলে। মেয়েছেলের অধিক বিদ্যে সর্বনাশের মূল।"

সত্য চট করে বইটা মুড়ে ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "মাতৃবাক্য অবিশ্যিই বেদবাক্য। অতএব আমিই বসে বসে তোমার সর্বনাশ সাধন করছি। তা তার তো আর চারা নেই। বিদ্যেটা তো আর ঘটিবাটি নয় যে, অসুবিধে ঘটাচ্ছে বলে সরিয়ে রাখব। কিন্তু 'বিনাদোষ' কিনা, আর মনটা কাঁদছে কি না, সে সংবাদ তুমি সঠিক পেয়েছ?"

"মন! হুঁ! পাষাণেও বরং প্রাণ আছে, তোমার মধ্যে নেই।"

বন্ধুকে যে নবকুমার কতখানিটা ভালবাসে সে কথা সত্যর অজানা নয়, তাই এত বড় দোষারোপেও বিচলিত হয় না সে। বোঝে, রাগে দুঃখে বলে ফেলেছে। আর সেটাই তো স্বভাব নবকুমারের। রাগের মাথায় কড়া কথা বলে বসে, আর রাগ ভাঙলে খোশামোদ করতে বসে।

তাই সত্য অবিচলিত ভাবে বলে, "তা পাষাণীই যখন, তখন মন কাঁদার কথা উঠছে কেন? তবে 'বিনাদোষ', এ কথা ভাববার হেতু? যে মানুষ গুরুর নামে কলঙ্ক দিতে পারে, তাকে আমি অন্ততঃ নিরপরাধী বলতে পারব না।"

গুরুর নামে!

নবকুমার স্তম্ভিত ভাবে বলে, "তার মানে?"

"মানে তোমায় বোঝাতে পারব না। মেয়েমানুষের বাড়া পেট-আলগা মানুষ তুমি, এখুনি জগৎ সংসার সকল বাত্রা জেনে ফেলবে। তবে এই বিশ্বাসটুকু রেখো আমার ওপর, অন্যাই কাজ আমাকে দিয়ে হবে না। অবিবেচনার কাজও না।"

না, এর বেশী নবকুমার জানতে পারে নি।

পারবার কথাও নয়।

বুদ্ধি দিয়ে বুঝে ফেলবে এত ক্ষমতা তার নেই। আর সত্য তো হাত জোড় করে বলেছে, "আমায় আর কিছু জিজ্ঞেস করো না। আমি সে কথা মুখে আনতে পারব না।"

না, সত্যিই পারবে না।

মুখে আনবার কথা নয়।

তবু নিতাই একদিন মুখে এনেছিল। ভবতোষ মাস্টার সত্যকে পড়া দিয়ে চলে যাওয়া মাত্র বলে উঠেছিল, "সম্পর্কটা মাস্টার বানিয়েছে ভাল। গুরু শিষ্য! কিন্তু যতক্ষণ পড়া বুঝোয় ততক্ষণ তো গুরু বসে বসে শিষ্যকে চোখ দিয়ে গিলতে থাকে!"

"সত্য তীব্র স্বরে বলে উঠেছিল, "ঠাকুরপো!"

"তা রাগ করলে আর কি হবে? যা হক কথা তাই বলছি। মাস্টার মশাইয়ের রীত-চরিত্তির আমার আর আজকাল ভাল মনে হয় না। ছুতোয়-নাতায় হরঘড়ি এ বাসায় আসার বহর দেখে বুঝতে পারেন না? নিছক হিত করতে আসা নয়, কারণটা অন্য। আমি এই ভবিষ্যৎবাণী করছি, সময়ে সাবধান না হলে ওই মাস্টার হতে একদিন বিপদ আসবে।"

সত্য কঠিন গলায় প্রশ্ন করেছিল, "কথাই যদি তুললে ঠাকুরপো, তো বলি —সে বিপদ যে তোমার দ্বারাই আসবে না তার নিশ্চয়তা কি?"

"আমার দ্বারা! আমার দ্বারা মানে?"

নিতাই সিঁদুরে আমের মত লালচে হয়ে ওঠে।

কিন্তু সত্য কঠোরা।

"মানে ঘরে গিয়ে বোঝ গে। জিজ্ঞেস কর গে আপনার মনকে। কে কাকে চোখ দিয়ে গিলছে, সে খবর তোমার চোখে পড়ে কেমন করে তাই তোমায় শুধোই আমি?"

"পড়বে না?"

নিতাই উত্তেজিত হয়, "নবর মতন কানা মানুষ ছাড়া সবাইয়ের চোখেই পড়ে।"

"নিজে চোখ না ফেললে পড়ে না; এই আমারও সাদা বাংলা। কিন্তু এমন মন্দ কথা যখন তোমার মনে উঠতে পারে ঠাকুরপো, তখন আমার মনে হয় আর একত্র থাকা ঠিক নয়।"

"ঠিক নয়!" নিতাই অবাক হয়ে বলে, "একত্র থাকা ঠিক নয়?"

"না।"

নিতাই ফুঁসে উঠে বলেছিল, "আমাকে সরালেই তোমাদের বিপদ সরবে?"

"বিপদ!"

সত্য সহসা হেসে উঠেছিল, "আমার আবার বিপদ কিসের? আগুনে

যদি কেউ হাত দিতে আসে ঠাকুরপো, বিপদটা আগুনের হয়, না হাতের হয়? রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীও কি কখনো শোন নি? সতীনারীর উপাখ্যান? তোমায় যে সরে যেতে বলছি, সে তোমারই ভালর জন্যে।"

নিতাই আর কোনও কথা খুঁজে না পেয়ে বলেছিল, "চমৎকার! বিচারটা ভাল।"

সত্য বলেছিল, "এখন তুমি নানা কারণেই অন্ধ ঠাকুরপো, তাই জ্ঞানগম্যি নেই। পরে বুঝবে। তবে এ সম্পর্কে অধিক কথায় আর কাজ নেই। কুকথা হচ্ছে ছারপোকার বংশ, একটা থেকে একশোটা ছানা জন্মায়। ওকে মূলেই ধ্বংস করে দেওয়া বুদ্ধির কাজ।"

তার পর সেই ভবতোষ মাস্টারের কাছে মেস খুঁজে দেওয়ার প্রস্তাব।

কিন্তু নিতাইয়ের অনুযোগ কি বাস্তবিকই অমূলক?

নিছক অমূলক বললে ভুল বলা হবে।

ভবতোষ মাস্টারের চোখের শ্রদ্ধা সমীহ আর স্নেহভরা মুগ্ধ বিহ্বল দৃষ্টি যে আত্মহারা হয়ে সত্যবতীর আনত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, এ কি সত্যবতীর অনুভবের মধ্যে ধরা পড়ে না?

পড়ে। পাথরের দেবতাও ভক্তের নিবেদন বোঝে।

তবু সত্যবতী গ্রাহ্য করে না। সত্যবতী বোঝে এ দৃষ্টির মধ্যে অনিষ্টের আশঙ্কা নেই। সত্যবতী জানে এ দৃষ্টি সত্যবতীর কেশাগ্রেরও ক্ষতি করতে পারবে না। যেমন পারবে না নিতাইয়ের ঈর্ষাকাতর জ্বালাভরা দৃষ্টি। দুটোকেই সমান অগ্রাহ্য করছিল সত্যবতী। কিন্তু নিতাইয়ের এই স্পষ্টাস্পষ্টি জ্বালা-প্রকাশে বিবেচনার পথ নিল সে। কে জানে কোনদিন যদি নির্বোধ নবকুমারের কানে তুলে বসে নিতাই এই নীচ সন্দেহের কথাটা!

যদি মাস্টার মশাইয়ের কানে ওঠে?

ছি ছি!

উনি স্নেহ করেন।

উনি গুরু।

উনি নিজেও জানেন না এর মধ্যে কোনও দোষ আছে। তাই ওঁর নিজেরও কিছু ক্ষতি হচ্ছে না।

কিন্তু নিতাইয়ের কথা স্বতন্ত্র। নিতাইয়ের মধ্যে যা আছে, সেটা নির্ভেজাল শ্রদ্ধা নয়।

সে আপনি আপনার ক্ষতি করতে পারে।

তার জন্যে ব্যবস্থার দরকার।

তাই নবকুমারের কাছে দৃঢ় স্বরে বলতে পারে সত্যবতী, "আমার দ্বারা কোন অবিবেচনার কাজ হবে না, কোন ছোট কাজ হবে·না এ বিশ্বাস রেখো।"

নিতাই চলে যেতেই নবকুমার বলতে শুরু করল, "বাড়িটা যেন গিলে খেতে আসছে।" বলতে লাগল, "চার-চারখানা ঘরে দরকার কি?"

ওই শেকল-বন্ধ ঘরটা যে ওর বুকে শেলের মত বিঁধছে সেটা বুঝতে পারে সত্য। তাই একদিন নরম গলায় বলে, "আর একটা বাসা দেখলে হয় না?"

"কেন আর একটা বাসার দরকার?"

নবকুমার খাপ্‌পা হয়ে ওঠে।

"দরকার আর কি, একটু হাওয়া বদল। তা ছাড়া এ বাসার ভাড়াটাও তো কম নয়। এদিকে বাজার দিন দিন অগ্নিমূল্য হচ্ছে। ওদিকে ছেলেদের বইখাতা ইস্কুলের মাইনে বাড়ছে।"

"তা সে তো তোমার পক্ষে ভালই। একটা মানুষ দু বেলা দু মুঠো ভাতের বদলে একমুঠো করে টাকা ধরে দিচ্ছিল—"

সত্য বিনাবাক্যে উঠে গিয়েছিল। আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, ঠিক আছে, আর নবকুমারকেও বলা নয়, ভবতোষ মাস্টারকেও অনুরোধ জানানো হয়, নিজেই হাল ধরবে সে। ঝিকে দিয়ে বাসা যোগাড় করবে। ঝি পাঁচবাড়ি ঘোরে, অনেক সন্ধান রাখে।

তা সত্যর হিসেব ভুল হয় নি।

মুক্তারামবাবুর স্ট্রীটের এ বাসা ঝি পঞ্চুর মা-ই যোগাড় করে দিয়েছে। বাড়িওলারা মস্ত বড়লোক, বনেদী ঘর। আগে যখন আরো বোলবোলাও ছিল, তখন আমলা-গোমস্তাদের জন্যেই ছোট ছোট অনেক বাসা বানিয়ে দিয়েছিল। এখন কর্মচারীর সংখ্যা কম, তাই দু-পাঁচখানা বাসায় ভাড়া বসিয়েছে।

তারই একখানার সন্ধান এনে দিল পঞ্চুর মা। নবকুমার বাসা দেখে এসে সন্তোষ প্রকাশ না করে পারল না। কারণ ছোট হলেও বাসাটা ভাল।

রাস্তার ধারে। ভবতোষ মাস্টার ক্ষুণ্ণস্বরে বললেন, "বাসা বদলের দরকার ছিল, আমায় জানাও নি তো নবকুমার ?"

নবকুমার 'বাড়ির মধ্যে'র শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বলল, "আজ্ঞে আপনার ওপর আর কত বোঝা চাপাব ? আমাদের জন্যে তো আপনার কাজের অন্ত নেই। এটা যখন ঝির দ্বারা হয়ে গেল—"

"আমার বাসা থেকে একটু দূর হয়ে গেল, এই আর কি !"

ভবতোষ নিশ্বাস ফেললেন।

তবু বাসা বদল হল।

আর সত্য আর একটু স্বাবলম্বী হয়ে উঠল। ফি-হাত মাস্টার মশাইয়ের মুখাপেক্ষিতার অভ্যাসটা কাটাতে শুরু করল।

তবে এ বাড়ির একটা অসুবিধে, বাড়িওলারা ধনী হলেও জাতে ছোট। কাজেই বামুন-ভক্তিটা প্রবল। যখন তখন পালপার্বণ হলেই বামুনবাড়ি সিধে পাঠায় তারা, বামুনের মেয়ের জন্যে পান সুপুরি মিষ্টি, লালপাড় শাড়ীর উপঢৌকন পাঠায়।

ফেরত দেওয়াও চলে না, কেবল নেওয়াও লজ্জার।

নবকুমার অবশ্য লজ্জার বলে না। বলে "এতে তোমার এত কিন্তু কিসের ? কথায় আছে লাখ টাকায় বামুন ভিখিরি। তা ছাড়া ওরা হল গে সোনার বেনে। বামুনকে দান করে পুণ্যিসঞ্চয় করছে।"

"তা হোক।" সত্য ঝঙ্কার দেয়। "আমরা তো আর পরিবর্তে কিছু দিতে পারছি না ? নিতে আমার মাথা কাটা যায়।"

"তোমার সবই উল্টো। বলি পরিবর্তে তো তুমি আশীর্বাদ দিচ্ছ !"

"আশীর্ব্বাদ !"

হি হি করে হেসে ওঠে সত্য। "আমার আশীর্ব্বাদের অপেক্ষাতেই যে ছিল এত দিন। আর ওদের ওই রাজ্যিপাট আমার আশীর্ব্বাদেই হয়েছে ! যাই বল, এ একটা বিপদ হয়েছে।"

"লোকের যা প্রার্থনার, তোমার তাতেই বিপদ, আর লোকের যাতে ভয়, তোমার তাতেই আহ্লাদ, এই তো দেখলাম চিরটাকাল। কোন্ বিধাতা যে গড়েছিল তোমায় তাই ভাবি।"

এই ধরনের কথা প্রায়ই হয়।

আবার মাঝে মাঝে পক্ষুর মা বলে, "বড় বাড়ির গিন্নী পেরায় আমাকে

বলে, 'হ্যাঁ লা, সবাই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে, কই সাত নম্বর বাসার গিন্নী তো কই আসে না একদিনও ?' আমি বলি, 'ও রাণীমা, গিন্নী কোথায় ? সে নেহাত ছেলেমানুষ বৌটি।' তা যাই বল বাপু, তোমার এক-আধদিন যাওয়া কোত্তব্য। সকল প্রেজারাই যখন যায়—"

সকল প্রেজারাই যখন যায়—!

সত্য দপ্ করে জ্বলে উঠে বলে, "তা আমি তো আর ওনাদের প্রজা নই পঞ্চুর মা ? ভাড়া দিই, থাকি।"

"তা সে একই কথা।" পঞ্চুর মা বিগলিত স্বরে বলে, "খাজনা দিলে প্রজা, ভাড়া দিলে ভাড়াটে। গিন্নীর যেন একটু গোসা গোসা ভাব দেখলাম, তাই বলছি। মানে বড়মানুষ তো ? রাতদিন তোয়াজ পাচ্ছে, তাতেই অহ্বার ভাব। মনে করে সাত নম্বর কেন তোয়াজ করে গেল না ? একদিন গেলেই ও গোসাটা কাটে।"

"আমার সময় কোথা ?"

সত্য গম্ভীর ভাবে বলে।

"ওমা, শোন কথা !" পঞ্চুর মা বিস্ময় রাখবার জায়গা পায় না। "এই গলির এপার ওপার এটুকু একবার যেতে তোমার সময় হবে না ? তা হলে বলি বৌদিদি, অহ্বার তোমারও কম নয়।"

"তা হলে বুঝেছিস ?" হেসে ফেলে সত্য।

"বুঝেছি। বুঝেই আছি। তবে কিনা তোমার হিতের জন্যেই বলছি। জলে যখন বাস, কুমীরের সঙ্গে ভাব রাখাই ভাল।"

"দেখ্ পঞ্চুর মা, ওসব তোয়াজ করাটরা আমাকে দিয়ে হবে না। তা সে কুমীরের কামড় খেতে হয় তাও ভাল।"

"আহা-হা, তা কেন ! কামড়ের কথা হচ্ছে না। তোমরা হলে গে জগতের সেরা, উঁচু বামুন। তোমাদের মান্যির কাছে কি আর পয়সার মান্যি ? তবে কিনা কালটা কলি, এই আর কি। কলিকালে পয়সাই মোক্ষ। নইলে ওই এগারো নম্বর বাসার চকোত্তিগিন্নী অমন করে দত্তগিন্নীর পায়ে তেল দেয় ?"

"যাক পঞ্চুর মা, ওসব কথা তুলিস নে। আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। বড়মানুষের বাড়ি যাওয়া আমার পোষাবে না, এই হচ্ছে সাদা বাংলা। তা তাতে এখানের বাস ওঠাতে হয় তাও ভাল।"

পঞ্চুর মা মানুষটা ভাল। লাগানে-ভাঙানে নয়। আর বোধ করি সত্যর এই তেজস্বিতাকে সে সমীহই করে। তাই গিয়ে বড় বাড়ির গিন্নীর কানে তোলে না কথাটা। নইলে ও বাড়িতে তো তার নিত্য গতায়াত।

কারণ ঝি-খেটে খেলেও পঞ্চুর মা মালির মেয়ে। তার বোনঝি ওই বড় বাড়িতে ফুলের যোগানদার, বোনঝির সেখানে অশেষ প্রতিপত্তি। পঞ্চুর মা সেই সুবাদে দৈনিক জলপানিটা বরাদ্দ করে নিয়েছে ও বাড়িতে।

আর রাজ্যের ঝি আর মালিনী তাঁতিনী নিয়েই তো আসর গিন্নীর।

তাই সে ভাবে, একটা দিন গেলে যদি বড় বাড়ির গিন্নীর মনটা প্রসন্ন হয়, গেলেই বা। কিন্তু সত্য উড়িয়ে দেয়।

বলে, "বড়মানুষের বাড়ির চৌকাঠ ডিঙোতে আছে? বাপ!"

তবু সত্যকে একদিন বড় বাড়ির চৌকাঠ ডিঙোতে হল।

ওদের রাঁধুনী বামনী আর গিন্নীর খাস ঝি এসে কর্তার নাতির 'মুখে-ভাতে'র নেমন্তন্ন করে গেল। নতুন কাঁসার রেকাবিতে চার জোড়া সন্দেশ, আর নতুন পেতলের ঘটিতে সেরটাক তেল দাওয়ায় নামিয়ে দিয়ে বলল, "নাতির মুখে পেসাদ, নেমন্তন্ন করে গেলাম। বাড়িসুদ্ধ সব যাওয়া চাই। বাড়িতে যেন উনুন না জ্বলে।"

সত্য মৃদু গম্ভীর ভাবে বলে, "কবে অন্নপ্রাশন?"

"এই তোমার গে পর্শু।"

সত্য আরও গম্ভীর ভাবে বলে, "তবে? ছুটির দিন তো না? বাবুকে দশটায় আপিস যেতে হয়। উনুন না জ্বাললে চলবে কেন? অত সকাল সকাল তো আর যজ্ঞিবাড়িতে ভাত মিলবে না?"

"তা জানি না।" রাঁধুনী খরখরে গলায় বলে ওঠে, "পাড়ার কারুর ঘরে উনুনের ধোঁয়া উঠতে দেখলে গিন্নী আর রক্ষে রাখবে না, এই হচ্ছে সংবাদ।"

"তা হলে বাবুকে সেদিন পান্তা খেতে হবে!"

সত্য নিশ্চল দাঁড়িয়ে বলে।

আর রাঁধুনী বামনী গালে হাত দিয়ে 'থ' হয়ে যায়। তারপর খরখরিয়ে বলে ওঠে, "ওমা এ যে সব্বনেশে মেয়ে গো! রাণীমা তো ঠিকই বলেছে, 'আর সকল বাড়ি শুধু ঝি গেলেই বোধ হয় হত, সাত নম্বরে বামুনদি তুমি সঙ্গে যেও। ওনার বড় দেমাক, কি জানি যদি শুদ্দুরের মুখের নেমন্তন্ন না নেন'।"

"তা ভাল! চোখে না দেখেও মানুষ চিনতে পারেন। তোমাদের রাণীমা তো খুব গুণী!"

রাঁধুনী বোধ করি কথাটার নিহিতার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরেই বলে, "গুণী, সে কথা আর বলতে! একবার কেন একশোবার। গেলেই জানতে পারবে। কী দয়া-দাক্ষিণ্যি! আর রূপও তেমনি! যেন জগদ্ধাত্রী প্রিতিমা!"

গিন্নীর খাসদাসী সঙ্গে।

কাজেই জানা কথা যে এই স্তুতিগান একেবারে ব্যর্থ হবে না।

সত্য বলে, "তা দাঁড়াও। ঘটিটা রেকাবটা নিয়ে যাও।"

শুনে ঝি বামনী দুজনেই হেসে ওঠে। "ওমা! বলে কি গো! নিয়ে যাব কি গো! ও তো সামাজিক বিলোনোর জন্যে। একেবারে ব্যাপারী-দের কাছে বায়না দিয়ে এক মাপের এক গড়নের অমন হাজার খানেক আনানো হয়েছে। এসব বুঝি দেখনি কখনো?"

সত্য আর দ্বিরুক্তি না করে জিনিস দুটো ঘরে উঠিয়ে রাখে। ওই হাসির শব্দ যেন ছুরির মত বিঁধতে থাকে।

দেখবে না কেন?

রামকালী চাটুয্যের মেয়ে সত্য অনেক কিছুই দেখেছে। বাসন বিলোনোও দেখেছে বৈকি। কিন্তু সেটা কখন কিভাবে বিলোনো হয় তা তার জানা ছিল না।

ভাবল কি জ্বালা!

যদি বা পাঁচ টাকায় এমন মনের মত বাসাটি পাওয়া গেল, তার সঙ্গে জুটল এই পিঁপড়ের কামড়।

এতদিনে ওদের বাড়িতে না গিয়ে চলেছে, আর চলল না দেখা যাচ্ছে। সামাজিক নেমন্তন্ন বলে কথা।

গাড়ি-পালকির পথ নয়, তবু এসব কাজে পালকিতে চেপে যাওয়াই রেওয়াজ! পঞ্চুর মা বলে, "আমি এই বাসন কখানা মেজে ফেলে, বাসা থেকে কাচা কাপড় পরে আসছি বৌদিদি, তুমি সাজগোজ করে নাও ততক্ষণ, আর খোকাদেরও পোশাক-আশাক পরিয়ে—"

"খোকারা তো এখন ইস্কুলে চলল।"

বলল সত্যবতী।

"ওমা, সিকি কথা! নেমন্তন্ন খাবে না ওরা ?"

"ইস্কুল কামাই করে ?"

পঞ্চুর মা অবাক হয়ে বলে, "একদিন তোমার ইস্কুল কামাইটা এমন মারাত্মক হল বৌদিদি ? পাড়াসুদ্ধু ছেলে কেউ আজ ইস্কুলে যাবে নাকি ? বলে বিশ দিন থেকে দিন গুনছে সবাই। বড়মানুষের বাড়ির নেমন্তন্ন, কত ভালমন্দ সামগ্রীর আয়োজন, বারো মেসে সংসারে তোমার গে সেসব চোখেও দেখতে পায় না কেউ—"

সত্য ঈষৎ কঠিন স্বরে বলে, "তা বারো মাস যখন দেখতে পায় না, একদিন পেয়েই বা কি রাজ্যলাভ হবে ? তুই বাসা থেকে ঘুরে আয়, আমি একাই যাব।"

"জানি নে বাবা! তোমার মতিগতি কেমন! বলি ছেলেরা না গেলে মাথা পিছু ছাঁদাটাও তো বেবাক লোকসান।"

"লাভ-লোকসানের হিসেব তোর সঙ্গে করতে বসতে পারছি না পঞ্চুর মা, কাজ সেরে বাসা থেকে ঘুরে আয়।"

পঞ্চুর মা তথাপি হাল ছাড়ে না।

বলে, "তা বৌদিদি, খোকারা ইস্কুল থেকে ফিরেও যেতে পারে। খ্যাট তো তোমার গে এই দুপুর থেকে সাঁঝ সন্ধে অবধি চলবে!"

"তুই থামবি ?"

বলে ধমক দিয়ে সরে যায় সত্য।

নবকুমার কোটের পকেটে পানের কৌটোটা ভরে নিতে নিতে বলে, "ছেলেদের নিয়ে গেলেই পারতে!"

"কেন ?"

"কেন আবার কি! নেমন্তন্ন—"

"নাঃ। বড়লোকের বাড়ি না যাওয়াই ভাল। ছেলেবুদ্ধি ছেলেমন, অত জাঁকজমক দেখে এসে শেষে নিজেদের তুচ্ছু মনে করতে শিখবে।"

"তোমার যত সব উদ্ভট কথা! মাথাতে আসেই যে কি করে! যাক। যাবে একটা টাকা নিয়ে যেও। সামাজিক আশীর্বাদটা দিতে হবে তো ?"

সত্যর জোড়া ভুরু নেচে ওঠে।

কৌতুকের হাসিতে মুখ উজ্জ্বল দেখায়।

"একটা টাকা! ধুৎ! এতদিন ধরে এত সিধে শাস্তি কাপড়চোপড় পেয়ে আসছি, যদি তার শোধ দেবার সুযোগ পাচ্ছি, টাকা দিয়ে সারব কেন?"

"তবে কী দেবে? গিনির মালা?"

নবকুমারও রহস্য করে।

"গিনির মালা? না। বেআন্দাজী কিছু করতে যাব না। এইটে দেব।"

সত্য তোরঙ্গ খুলে একটা জিনিস বার করে। মুঠোয় চেপে রহস্যভরে বলে, "হাত গুনে বল, কি এটা?"

"হাত গুনতে জানি না। আপিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে। দেখাবে তো দেখাও।"

সত্য মুঠো খুলে ধরে।

আর ঝকমক করে ওঠে সোনার জলুস।

কড়িহার একগাছা!

ভরি পাঁচেকের কম নয়।

নবকুমার হেসে ফেলে বলে, "ইস, তা আর নয়! প্রাণ ধরে পারবে?"

"নিশ্চয়। আমার প্রাণ অত হালকা নয়।"

"পাগলামি করো না।"

"পাগলামি নয়, সত্যিই দেব।"

"ওই অতবড সোনার হারছড়া দিয়ে দেবে? বড়মানুষের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার সাধ?"

"পাল্লা নয়।" সত্য গম্ভীর ভাবে বলে, "মান-সম্মান রক্ষে। বলে কিনা প্রজা!"

"ওদের কাছে তোমার মান? ওরা হল গে লাখপতি।"

"তাতে আমার কি?"

এবার নবকুমার বোঝে, রহস্য নয় সত্যি। ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে।

বলে, সর্বনাশা বুদ্ধি না হলে এমন কাণ্ড কেউ করতে যায় না। বলে, একটা টাকায় যেখানে মেটে, সেখানে এতবড় একগাছা সোনার হার! এ

শুধু বদ্ধ পাগলেই করে। তা ছাড়া উড়নচণ্ডে হয়ে সোনাদানা নষ্ট করবার অধিকারই বা দিয়েছে কে সত্যকে? এলোকেশী যদি টের পান, রক্ষে রাখবেন?

সত্য গম্ভীর ভাবে বলে, "এ তো তোমার মায়ের জিনিস নয়!"

"নয় মানে? তোমার বাবা যেকালে সালঙ্কারা কন্যে দান করেছে—"

"এ আমার বিয়ের সময়ের জিনিস নয়। সেসব তোমার মা সঙ্গে দেনও নি। এবারে নিত্যেনন্দপুরে যেতে ছোট খোকার নাম করে পিসঠাকুমা দিয়েছেন।"

"দিয়েছেন বলেই বিলোতে হবে? না না, ওসব বদখেয়াল ছাড়।"

"তা হলে আমার যাওয়া হয় না।"

"যাওয়া হয় না! চমৎকার! বলি এত যদি টেক্কা দেওয়ার শখ, নিজের জন্যেও তাহলে হীরে মুক্তো জরি বানারসী যোগাড় করো?"

"তা কেন?"

সত্য দৃঢ়ভাবে বলে, "বামুনের মেয়ের শাঁখা আর লালপাড় শাড়ীই মস্ত আভরণ।"

তা শেষ পর্যন্ত সেই মস্ত আভরণেই সজ্জিত হয়ে ও বাড়িতে গিয়ে হাজির হল সত্য পঞ্চুর মার সঙ্গে। একখানা নতুন কাঁসার রেকাবিতে সেই কড়ি-হারছড়া আর একটু ধানদুর্বো নিয়ে।

নৌকতা'র বহর দেখে পঞ্চুর মাও তাজ্জব হয়ে গেছল। গালে হাত দিয়ে বলেছিল, "হ্যাঁ গা বৌদিদি, বড় বড় কুটুমবাড়ি থেকেও তো দুটো একটা টাকাই দেয়। আর তোমার মতন এই পাড়াপড়শী প্রেজারা চারগণ্ডা কি জোর আটগণ্ডা পয়সা। একটা টাকা হল তো খুব বেশী হল! আর তুমি—"

"হোক হোক, চল্ তুই।"

"ছেলে কোন্ ঘরে?"

সত্য শুধোল একজনকে।

সম্ভবত সে দাসী। কারণ পঞ্চুর মা তাড়াতাড়ি আগবাড়িয়ে এসে একগাল হেসে বলে, "এই যে সুখদার পিসি! নিয়ে এলাম আমাদের বৌদিদিকে। সাত নম্বরের বাড়ির—"

"ওঃ!"

সুখদার মা ভুরুর ইশারায় দিকনির্দেশ করে বলে, "ওই উদিককার দালানে বসাও গে!"

"বসবে বসবে! তা অগ্রে খোকাবাবুকে আশীর্ব্বাদ করে—"

সুখদার পিসির এতক্ষণে বোধ করি হাতের জিনিসটার প্রতি নজর পড়ে। ঈষৎ বিস্ময় এবং সমীহমিশ্রিত স্বরে বলে, "তা তবে ওপরতলায় নে যাও। মোক্ষদার কাছে আছে ছেলে।"

মোক্ষদা এ বাড়ির খোদ ঝি।

গিন্নীর পরের পদটাই তার।

বাড়ির বৌ-ঝিরা পর্যন্ত তার ভয়ে তটস্থ। আর অন্য ঝিদের তো সে দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা। মোক্ষদার জিম্মাতেই আছে ছেলে। কারণ ছেলের সর্বাঙ্গে আজ গয়না।

ন্যাড়া মাথা, সর্বাঙ্গে অষ্ট অলঙ্কার, আর সলমা-চুমকির কাজ করা ভেল-ভেটের পোশাকের জ্বালা, হাঁ হাঁ করে কাঁদছিল ছেলেটা—

"মুখ দেখানি"র থালা সামনে নিয়ে ক্রন্দনরত ছেলেটাকে কোলে চেপে ধরে বসেছিল মোক্ষদা কালো মোষের মত চেহারাখানি নিয়ে।

পঞ্চুর মার সঙ্গে সত্যকে দেখেই বাজখাঁই গলায় বলে ওঠে, "এই বুঝি তোর মনিব পঞ্চার মা? যাক, পার ধুলো পড়ল তা হলে?"

সত্যর ভুরু কুঁচকে ওঠে।

তবু সে ধীরভাবে এগিয়ে গিয়ে ধানদুর্বো নিয়ে ছেলের মাথায় দিয়ে হার সমেত রেকাবিটা নামিয়ে দেয় মুখ-দেখানির থালার কাছে। যে থালায় টাকার চাইতে আধুলি, ও আধুলির চাইতে সিকির সংখ্যাই বেশী।

সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কুঁচকে ওঠে মোক্ষদারও।

"এটা কি পঞ্চার মা?"

পঞ্চার মা তটস্থ ভাবে বলে, "এই খোকাবাবুর আশীর্ব্বাদী মোক্ষদাদি! বৌদি বলে একটা টাকা নিয়ে গিয়ে আর কি হবে পঞ্চুর মা? বড়মানুষের বাড়ি, সুমুদ্দুরে পাদ্য-অর্ঘি—তাই—"

"বাজে বাজে বকছিস কেন মিথ্যে?"

তীব্র স্বরে ধমকে ওঠে সত্যবতী।

তীব্র, তবে মৃদু।

মোক্ষদা একবার সত্যর আপাদমস্তক দেখে নেয়, একবার হারছড়া হাতে তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনুভব করে। তারপর বিরস স্বরে বলে, "এ হার তুমি উঠিয়ে নিয়ে যাও গো সাত নম্বরের গিন্নী। এদের ঘরের ছেলেপেলে গিল্টির গয়না পরে না।"

গিল্টির গয়না!

পঞ্চুর মার বুকটা বসে যায়।

নির্বোধ ছুঁড়ির নির্বুদ্ধি দেখে এ পর্যন্ত সে মনে মনে হাসছিল। ভাবছিল শহুরে বড়মানুষ তো দেখে নি কখনো, তাই ভয়ে তরাসে বেআন্দাজী একটা নৌকতা করে বসেছে। তা বসুক। পঞ্চুর মার মুখটা বড় হবে বোনঝির মনিববাড়িতে।

কিন্তু এ কী!

এ যে মুখে চুনকালি!

ছি ছি, ই কি মুখ্যুমি! তুই এই দত্তবাড়িতে নিয়ে এলি গিল্টির গয়না!

প্রায় হতভম্ব হয়েই তাকিয়ে থাকে সে। কিন্তু ততক্ষণে উত্তর দিয়েছে সত্য। তীক্ষ্ণ তীব্র মৃদু।

"তুমি বুঝি এখানে নতুন কাজে ঢুকেছ?"

"নতুন? আমি নতুন কাজে ঢুকেছি?" মোক্ষদা আগুনের মতন গনগনিয়ে ওঠে, "ওমা আমার কে গো! তুমি আজ নতুন পদার্পন করেছ বলে মোক্ষদাও নতুন হয়ে গেল! এই বাড়িতে কাজ করতে করতে চুল পাকালাম। বলি এ প্রশ্ন যে?"

"প্রশ্ন তুমিই করালে বাছা! এতদিন এদের ঘরে কাজ করছ, সোনা চেনো না?"

মোক্ষদা কালো মুখ আরও কালি করে বলে, "তোমার কথাবাত্রা তো বড় চ্যাটাং চ্যাটাং! যা পঞ্চার মা, বড় রাণীমার কাছে নে যা। সেখেনে মুখটায় একটু লাগাম রেখে কথা কোয়ো গো ভালমানুষের মেয়ে। সে আর দাসীবাঁদীর এজলাশ নয়।"

পঞ্চুর মা খানিক এগিয়ে ফিসফিস করে বলে, "মোক্ষদার বড় দাপট মা! ওকে একটু তোয়াজ করে কথা কইতে হয়। যাই দেখি আমার বুনঝিটা কোথায়! তাকে সঙ্গে পেলে বুকে একটু ভরসা পাই। খাস মালিনী তো সে! এই বিরোদ বাড়ির যত মেয়েছেলে সব্বার খোঁপার জন্তে রোজ বরাদ্দর

ফুলের সাজ, রকমারি মালা, জরির ফুল, রাংতার চাঁদতারা, সব ওই আমার বুনঝি।...অ শৈল, কই কোথা লো—"

পঞ্চুর মা ঝপ করে এগিয়ে যায়।

আর সত্যবতী দালানের একটা থামের কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে তাকিয়ে তাকিয়ে বাড়ির বাহার, কারুকার্য, সাজসজ্জা।

দালানের ছাতটা কী উঁচু!

যেন কোথায় থামতে হবে ভুলে গিয়ে যথেচ্ছ উঠে গেছে উপর দিকে। সেই ছাদের নীচে ঝুলছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝাড়লণ্ঠন, সত্য গুনে ফেলল, চকমিলোনো দালানের চার কোণায় চারটে, আর মাঝামাঝি একটা করে, সবসুদ্ধ আটটা ঝাড়।

আগাগোড়া দালান শ্বেতপাথরে মোড়া, শুধু কিনারায় কিনারায় কালো পাড়। থামের মাঝখানে প্রতিটি খিলেনের মাথা থেকে ঝুলছে নানা মাপের পাখীর খাঁচা, পাখীর দাঁড়। হরেক রকমের পাখী। আশ্চর্য! এত পাখী কেন? এত পাখী পুষে কি হয়?

দালানের কোণে কোণে একটা করে পাথরের নগ্ন নারীমূর্তি। সত্য তাদের দিকে তাকিয়ে চোখটা তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে নিল। ভাবল মাগো মেয়েগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে যেন জলজ্যান্ত! তার পর মনে মনে ফিক করে একটু হেসে ভাবল, বেচারীরা বোধ হয় রক্তমাংসেরই ছিল, হাজার লোকের চোখের সামনে অমন করে দাঁড়িয়ে থাকতে হওয়ায় লজ্জায় পাথর হয়ে গেছে।

বাইরে থেকে বাড়ির ভিতরের এতটা শোভা-সৌন্দর্য ঠিক বোঝা যায় না। ভিতরে ঢুকলে দেখে তাজ্জব বনতে হয়। ছেলেবেলায় বাবার কাছে নবাব-বাড়ির অনেক গল্প শুনেছে সত্য, তার অসীম কৌতূহলী চিত্তের অসংখ্য প্রশ্ন-শরাঘাতে রামকালীকে বলতেই হত অনেক কিছু বিশদ করে। দত্তদের অন্তঃপুরে এসে সত্যর সেই ছেলেবেলায় শোনা নবাববাড়ির কথা মনে পড়ল। শোনা গল্পের সঙ্গে মনের রং আর কল্পনা মিশিয়ে নিয়ে এই ধরনের ছবিই এঁকে রেখেছিল সত্য তার ধারণার জগতে।

তাই ভাবল, বাবা, এ যে দেখছি একেবারে নবাবী কাণ্ড!

"এস গো বৌদিদি", উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল পঞ্চুর মা, "এই সময় চল। এখন একটু ভিড় কম আছে।"

সত্য আস্তে বলে, "কাজের বাড়ি তো, কিন্তু এত বড় দালানে মানুষজনের চিহ্ন নেই কেন রে পঞ্চুর মা! বাড়ির গিন্নীটিন্নীই বা কোথায়?"

"ওমা শোন কথা!" পঞ্চুর মা বিস্ময়ের চরম অভিব্যক্তি স্বরূপ গালে হাত দেয়।···

"কি হল? মুচ্ছো গেলি যে!"

"তা মুচ্ছো যাওয়ার মতন কথাই যে বললে বৌদিদি! এ কী তোমার আমার মতন গরীবগুরবোর ঘর যে, নাতির অন্নপাশনে ঠাকমা কোমর বেঁধে কাজ করে বেড়াবে? এ বাড়ির গিন্নীরা নীচের তলায় নাবে নাকি?"

"নীচের তলায় নামে না?" সত্য হেসে ফেলে বলে, "কেন পায়ে বাত বুঝি?"

"বকো না বৌদিদি! হাসিও না! নীচের তলায় নামবার ওনাদের দরকার? বাহান্ন গণ্ডা দাসীবাঁদী মোতায়েন নেই? তা ছাড়া তোমার গে সংসারে কত অবীরে বেধবা প্রিতিপালিত হচ্ছে, তারাই সংসারের কন্না করছে। আর সরকার মশাই তো আছেনই। অবিশ্যি একেবারে নাবে না তা নয়, নাবে। পাল-পাব্বনে ঠাকুরদালানে আসে। তা তার জন্যে আলাদা সিঁড়ি আছে ভেতর-ঘর দিয়ে। ইদিকটা হল গে, না সদর না অন্দর, দুইয়ের মাঝখান। মানুষজনের কথা বলছ? সে তোমার গিয়ে ইদিকে বড় নেই। ভিড় দেখতে চাও তো দেখ গে যাও ভেতরবাড়ির উঠোনে দালানে।···এ তো আর চালা বেঁধে ভিয়েন বসানো নয়, পেরকাণ্ড পেরকাণ্ড টানা লম্বা পাকা ভিয়েন ঘর। তার ছেঁচতলায় মেছুনীরা বসেছে মাছ কুটতে। ভগবান জানেন কত মণ মাছ, তবে সে যা বঁটি, দেখে ভিরমি লেগে যায়। মন্দ জেলেরা পেরথমে ন্যাজা মুড়ো খণ্ড করে বাগিয়ে দিয়েছে, তার পর মেছুনীরা বসেছে 'খামি' করতে। দেখাব, সবই দেখাব তোমায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। আমি শৈলর মাসী বলে, আমায় কেউ কিছু বলে না। আর বলবেই বা কেন? আমি বলব, আমার মনিব গো! গাঁ-ঘরের মানুষ, এত সব সাহেবী কেতা, শহরে কাণ্ড তো কখনো দেখে নি, তাই—"

কথা হচ্ছিল এ-হদ্দ ও-হদ্দ দালানটা পার হতে হতে। তিন মুড়ো পার হয়ে তবে একেবারে শেষ মুড়োয় সিঁড়ি, সিঁড়ির কাছ বরাবর এসে পৌঁছেও ছিল, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে তীব্র তীক্ষ্ণ অথচ চাপা গলায় বলে ওঠে সত্য, "পঞ্চুর মা!"

"কী হল গো?"

পঞ্চুর মা থতমত।

"দেখ্, কথা যখন কইতে জানিস না, হ্রস্ব-দীর্ঘি জ্ঞান যখন নেই, তখন মেলা কতকগুলো কথা কইতে আসিস নে!"

"ওমা! কথার ভুল আবার কখন হল?"

"সে জ্ঞান থাকলে তো বুঝবি। তা তোকে এই পষ্ট কথায় সাবধান করে দিচ্ছি, আমাকে নিয়ে মিছে কতকগুলো বকবক করবি না। যা করতে এসেছিস তাই কর্।"

"বাব্বাঃ! ধন্যি মেজাজ! মেজাজে তুমিও তো দেখছি রাজরাজড়ার থেকে কিছু কম যাও না! এদের এসব ঘরবাড়ি, বোটকখানা আর বাবুদের ঐশ্বয্যির দব্‌দবা এই কলকেতা শহরে একদিন এমন রাষ্ট ছিল যে শুনতে পাই নাকি খাস বিলিতী সাহেবরা সুদ্ধু দেখতে আসত। আর তুমি কিনা—"

"হ্যাঁ, আমি ওই রকমই! ও বাবা, এ কে?"

"ও বাবা, এ কে?" বলেই হঠাৎ থেমে দাঁড়ায় সত্য, তার পরই ঈষৎ এগিয়ে গিয়ে নিরীক্ষণ করে দেখে অনুচ্চস্বরে হেসে উঠে বলে, "দেখ কাণ্ড! কে বলবে সত্যি সেপাই নয়?"

পঞ্চুর মা এবার একটু গৌরব অনুভব করে, অহ্মারি মানুষটা হয়েছে তা হলে জব্দ! স্বীকার পেয়েছে যে অবাক হয়েছে!

সিঁড়িতে উঠতে যেতেই ঠিক পাশে বন্দুক কাঁধে যে সেপাইটা খাড়া দাঁড়িয়ে আছে বীরের ভঙ্গীতে, প্রথম দিন সেটাকে দেখে পঞ্চুর মাও ঘাবড়ে গিয়ে দশ পা পিছিয়ে এসে দুগ্‌গা নাম জপ করতে শুরু করেছিল। দেখে শৈলর কী হাসি! সে রকম হাসি পঞ্চুর মার হাসতে ইচ্ছে করছে, তবে নেহাত নাকি মানুষটা বেখাপ্পা মেজাজী, তাই সাহস হয় না। শুধু একটু মুচকি হেসেই ক্ষান্ত হয়ে বলে, "ওই দেখ, যত দেখবে তত আশ্চয্যি হবে! এনাদের এক কুটুমবাড়ি তত্ত্ব নে গেছিলুম, তা সে বললে বিশ্বেস করবে না, তাদের বাগানে ফোয়ারার ধারে এমন একটা মেয়েছেলের মূর্তি বসানো আছে যে দেখে লজ্জায় জিভ কেটে ছুটে পালাতে হয়। আমি বলে উঠেছিলুম পয্যন্ত, 'মরণ মাগীর! এই বাড়বাড়িতে এমন বে-বস্তর হয়ে নাইতে এসেছে কেন?' শ্বেত পাথরে গড়া তো, আমি ইনতাম করেছিলুম বোধ হয় তোমার গে মেম-বাইজীটাইজি হবে। তা আমার কথা শুনে এ

বাড়ির এক দাসী হাসতে হাসতে হাতের বারকোশখানাই ফেলে দিল। পথের ওপর মেঠাই গড়াগড়ি।"

সত্য কিন্তু এই হাস্যির নাটকে অংশগ্রহণ করে না, ঈষৎ কঠিন গলায় বলে, "তা সে রকম মূর্তির অভাব তো এখেনেও নেই। দেখে লজ্জায় জিভ কাটতে হয়েছে তো আমাকেও। তা এই বুঝি শহুরে বড়মানুষদের বাড়ির বাহার? রুচি পছন্দকে বলিহারি যাই! পয়সা থাকে দেব-দেবীর মূর্তি গড়িয়ে প্রিতিষ্ঠা কর না! তা নয় যত অসভ্যতা! বাপ-বেটায় মায়ে-পোয়ে একসঙ্গে আনাগোনা করতে হয় না এখেন দিয়ে? দেখে লজ্জা লাগে না?"

পঞ্চুর মা সত্যবতীর এই অবোধ নীতিজ্ঞানের মন্তব্যে একটি অবহেলা মিশ্রিত পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বলে, "তা এসব তো আর হেঁজিপেঁজির ঘরের কাণ্ড নয়! এ তোমার গিয়ে বিলেত থেকে সায়েব কারিগর এসে গড়েছে। এর মানমর্য্যেদাই আলাদা।"

"তাই বুঝি? তা বেশ। মানমর্য্যেদার নিদর্শনটা দেখলাম ভাল। এখন চ দিকি, দায় সেরে ফিরতে পারলে বাঁচি।"

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে পঞ্চুর মা ফিস ফিস করে বলে, "বললে তুমি শুনবে না বোধ হয়, তবু আমার কত্তব্য আমি করি, বলে রাখি তোমায়, যতই তুমি বামুনের মেয়ে হও, গিন্নীকে একটু মান-সম্মান দিও। জোড়হস্ত দেখাই অব্যেস তো ওনাদের, বেত্তিক্কেরম দেখলে চোটে যাবে।"

সত্য আর একবার থমকে দাঁড়ায়, তেমনি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, "তবে দেখিয়ে দে জোড়হস্তটা কেমন ভাবে করতে হবে! শুধু জোড়হস্ত? না গলবস্তর চাই? ধন্যি বটে পয়সার মহিমা! বলি এত যে ওদের স্তোত্তরপাঠ করিস, নিজের অবস্থা কিছু ফিরেছে তাতে? বাসন মেজে তো খাস। জোড়হস্ত করবি ভগবানের কাছে, করবি মানুষের মতন মানুষের কাছে, পয়সার কাছে করতে যাস কেন মরতে?"

সত্য বুদ্ধিমতী তবু সত্য নেহাতই নির্বোধ। যে মরার কথা সে বলেছে সে মরা কি একা পঞ্চুর মার? কে না যায় সেই মরণে মরতে? কে না চায় সেই মৃত্যুসাগরে ডুবতে?

নইলে চক্রবর্তী-গিন্নী কেন দত্ত-গিন্নীকে অবিরত তেল দেয়? দত্তরা যে সোনার বেনে, আর সোনার-বেনেরা যে 'জল অচল' এ কথা কি জানে না চক্রবর্তী-গিন্নী?

সত্য যখন সিঁড়ি ভেঙে উঠে গিয়ে বড়গিন্নীর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল, তখন চক্রবর্তী-গিন্নী বিগলিত বিনয়ে, মুখের চেহারায় জোড়হাতের ভঙ্গী ফুটিয়ে বলছিলেন, "তাই তো বলছি মা, তোমার মতন এমন উঁচু নজর কটা লোকের আছে ?·· ঘরে তাই বলাবলি করি, হ্যাঁ, দরাজ প্রাণটা এনেছিল বটে দত্তদের গিন্নী !"

সত্য এসে দাঁড়াতেই কথায় ছেদ পড়ল। ঘরের মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁদের সকলের চোখ পড়ল তার উপর। মোসাহেবের স্ত্রীলিঙ্গ কি আমার জানা নেই, যদি কিছু থাকে, তো এঁরা দত্ত-গিন্নীর তাই। সেই সকাল বেলা থেকে অর্থাৎ যখন থেকে দত্ত-গিন্নী 'সভা' করে জাঁকিয়ে বসেছেন, তখন থেকে এঁরা তাঁকে ঘিরে বসে আছেন এবং চাটুবাক্যের প্রতিযোগিতা চালাচ্ছেন।

কাজে-কর্মের দিনে এইভাবেই গুছিয়ে বসেন দত্ত-গিন্নী, অথবা বসেন আরও সব বড়লোকের গিন্নীরা, এই ধরনের চাটুকারিণী পরিবৃতা হয়ে। নিমন্ত্রিত যাঁরা আসেন, তাঁরা পাতে বসবার আগে একে একে দুইয়ে দুইয়ে এসে দেখা করে যান। ওঁরা মানুষ বুঝে ওজন করে কথা বলেন।

এখানেও আজ চলছিল সেই পর্ব।

সত্য এসে দাঁড়াল সেই পর্বের পার্বণী যোগাতে।

সমস্ত দৃশ্যটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল সত্য।

দেখল প্রকাণ্ড চারচৌকো ঘর, তার মেজেটা শতরঞ্জ খেলার ছকের মত চৌকো চৌকো সাদাকালো পাথরে মোড়া। সমস্ত দেয়ালটায় একটা কালচে সবুজ রং, আর নীচে থেকে হাততিনেক উঁচুতে টানা লম্বা একটা পাঁচরঙা রঙের নক্শার পাড় আঁকা। ঘরের মধ্যেও ছাতের নীচে ঝাড়লণ্ঠন। জানলা-দরজাগুলো যৎপরোনাস্তি চওড়া আর উঁচু, তাতে পাখী-খড়খড়ির পাল্লা, আর তার পিঠ-পিঠ ফিকে নীল-রঙা কাঁচের শার্সি পাল্লা।

দেয়ালের ধারে ধারে সাজানো মেহগনী কাঠের আলমারি টেবিল, স্ট্যাণ্ড দেওয়া প্রকাণ্ড দাঁড়া আরশি, দাঁড়ানো ঘড়ি। আলমারির সামনে টেবিলের ওপর দেয়ালের ব্র্যাকেটে নানাবিধ পুতুল খেলনা টাইমপিস ফুলদানি, উঁচুতে দেয়ালের গায়ে অয়েল পেন্টিং।

এত বড় ঘরটা আগাগোড়া জিনিসে জিনিসে বোঝাই। ঘরের ঠিক মাঝখানটায় একটা মস্ত চৌকো পালঙ্ক, পালঙ্কের গদিটা প্রায় হাতখানেক পুরু, একখানা ধপধপে সাদা চাদর তাতে টান টান করে পেতে গদির তলায়

তলায় গোঁজা। সেই পালঙ্কের উপর চারিদিকে গির্দে তাকিয়া সাজিয়ে শ্বেত হস্তীর মত বিপুল বপুখানি নিয়ে বসে আছেন দত্তবাড়ির বড়গিন্নী।

বড়গিন্নী যে বিধবা সে কথা জানা ছিল না সত্যবতীর, কিন্তু এ কেমন বিধবা? সত্যর মনের মধ্যে প্রশ্নের প্রাবল্য। এ কি রকম সাজসজ্জা? বড়গিন্নীর পরনে দর্শকের দৃষ্টি-পীড়াকারী অতি মিহি চন্দ্রকোণার থানধুতি, তার আঁচলে বড় থোলোয় চাবি, সামনের চুল "আলবোট" ফ্যাশান, পিছনে একটি বড়ির মত খোঁপা।

বড়গিন্নীর নিচের হাত শূন্য ফাঁকা, কিন্তু উপর হাতে বোধ করি নীরেট সোনার মোটা মোটা প্লেন তাগা। গলায় গোছা করা গোট হার। কোলের কাছে রুপোর ডাবরে ডাবরভর্তি সাজাপান।

পালঙ্কের ধারে দাঁড়িয়ে বাজুর ওপর থেকে হাত বাড়িয়ে দাসী বা কোনও আশ্রিতা একখানি ঝালরদার পাখা দুলিয়ে দুলিয়ে বাতাস করছে। পালঙ্কের নীচে পায়ের কাছে একখানা জলচৌকির উপর সোনার মত ঝকঝকে একটা বড় পেতলের পিকদানি, আশেপাশে চাটুকারিণীর দল। অবস্থা সম্পর্কে এবং মর্যাদা হিসেবে কেউ পালঙ্কের উপরেই বড়গিন্নীর গা ঘেঁষে বসেছেন, কেউ আলগোছে একটুখানি বসেছেন পালঙ্কের কিনারায়, কেউ কেউ বা পালঙ্ক ঘিরে আশেপাশে দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যে সধবা আছে, বিধবা আছে, বয়স্কা আছে, তরুণী আছে।

শূন্য প্রকোষ্ঠের উপর ভাগে বাহুতে মোটা সোনার তাগা ভারী বিসদৃশ লাগল সত্যর, আরও বিসদৃশ লাগল বিধবা মানুষের এরকম পানের ডাবর কোলে করে খাটগদিতে বসে থাকা। ইতিপূর্বে কোনও বিধবাকে কখনো খাটগদিতে বসে থাকতে দেখে নি সত্য।

মনটা হঠাৎ কেমন বিমুখ হয়ে গেল। ভাবতে চেষ্টা করল বটে, মরুক গে, এই যদি কলকেতা শহরের চালচলন হয়, আমার কি? কিন্তু চেষ্টাটা ফলবতী হল না। মন সেই মোটা তাগাপরা ছোট ছেলেদের পাশবালিশের মত মোটা মোটা ন্যাড়া হাত দুখানার দিকে তাকিয়ে সিটিয়ে রইল।

বড়গিন্নী চোখের কেমন একটা ইশারা করলেন, সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতভঙ্গীতে একজন জলচৌকিতে বসানো সেই পিকদানিটা উঠিয়ে নিয়ে তাঁর মুখের কাছে ধরল। বড়গিন্নী পিচ করে একটু পিক ফেলে বললেন, "কে এসে দাঁড়াল র‍্যা? চিনতে পাচ্ছি না তো?"

এগিয়ে এল পঞ্চুর মা, বলে উঠল, "ওই যে আপনার সাত নম্বর বাড়ির—"

"অ। তাই বলি চিনতে পারছি না কেন? আসে নি তো কখনো? তা এসো বাছা, একটু এগিয়ে এসো।···পায়ের ধুলো দাও খানিকটা।"

"পায়ের ধুলো" নামক জিনিসটা যে নিজে থেকে দেওয়া যায় এ হেন অভিনব কথা সত্য জীবনে এই প্রথম শুনল। তার জানার জগতে জানা আছে ওটা যার নেবার ইচ্ছে হয়, সে এসে মুণ্ডু হেঁট করে আহরণ করে নেয়।

কিংকর্তব্য বুঝতে না পেরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

"কই গো দাও?"

জনৈকা 'ধামাধারিণী' তীব্রকণ্ঠে বলে ওঠেন, "পা'র তলা থেকে এক ফোঁটা ধুলো নিয়ে এনার মাথায় দিয়ে দাও।"

সত্য গম্ভীর ভাবে বলল, "পায়ে ধুলো নেই।"

পায়ে ধুলো নেই!

এইটা একটা কথা হল?

তা ছাড়া দত্তগিন্নীর প্রার্থিত বস্তু, তাও সোনা নয় দানা নয়, নেহাতই তুচ্ছ বস্তু! সেই বস্তুর প্রার্থনা যে এভাবে অগ্রাহ্য করা যায়, এ তো অভাবনীয় কথা!

দত্তগিন্নী গালে হাত দিয়ে কোনরকমে বিস্ময় এবং অবহেলার ভাব কমিয়ে ফেলে ব্যঙ্গহাসি হেসে বলেন, "সেই যে বলে না, অভাগা যগুপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়, আমার ভাগ্যে যে দেখছি তাই হল! এক ফোঁটা পদরজও দুর্লভ হল!"

সত্য অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে সেই আকার-অবয়ব-বর্জিত মেদপিণ্ডের মুখের দিকে। এই মাংসের তালের মধ্য থেকে বয়স উদ্ধার করা কঠিন, কিন্তু যিনি পৌত্রের অন্নপ্রাশন দিতে বসেছেন, নেহাত কিছু ছেলেমানুষ তিনি নন, কোন্ না সত্যর দিদিমার বয়সী! সত্যর সঙ্গে এ আবার কোন্ ধরনের রসিকতা তাঁর!

'ঝড়ের আগে এঁটো পাত' সদৃশ একটি মহিলা বলে ওঠেন, "মানুষ বুঝে কথা কইতে হয় বাছা! কইবার আগে তলিয়ে দেখতে হয় কাকে কি বলছি!"

বলা বাহুল্য সত্য নীরব।

শুধু তার প্রকৃতি অনুযায়ী চোয়ালের পেশীগুলো দৃঢ় আর কঠিন হয়ে ওঠে।

"সোনার হার দিয়ে নৌকতা করেছ, তুমিই না?"

এবার সত্য মুখ খোলে।

নরম গলায় বলে, "নৌকতা বলছেন কেন? খোকাকে যৎসামান্য কিছু আশীর্বাদী বৈ তো নয়!"

"তা সে যাই হোক," দত্তগিন্নী অসন্তুষ্ট স্বরে বলেন, "ও হার তোমাকে ফিরে নিয়ে যেতে হবে।"

নিয়ে যেতে হবে!

সত্য অবাক হয়ে বলে, "ছেলেকে দেওয়া জিনিস কী করব নিয়ে গিয়ে?"

"কী করবে সে তোমার বিবেচনা। তবে পেরজার দানের সোনা আমরা নিই না।"

আবার সেই "প্রজা"!

সত্যর সমস্ত শরীরের মধ্যে যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে যায়, তবু সে কষ্টে আত্মসংবরণ করে বলে, "তা হলে দেখছি আপনাদের এই সব প্রজা-পাঠকদের নেমন্তন্ন করাটাই ভুল, নৌকতা না দিয়ে কে আর কোন্ কাজে খায় বলুন? তা ছাড়া ব্রাহ্মণে কি আশীর্বাদী ফিরিয়ে নিতে পারে?"

ব্রাহ্মণ!

দত্তগিন্নী একটু মলিন হন।

"ওমা! এ যে দেখছি কাঠ-কাঠ কথা!" দত্তগিন্নী বলেন, "পোড়ারমুখী মোক্ষদা তো তা হলে ঠিকই বলেছে! যাক, তুমিই তা হলে জিতলে। অতিথি নারায়ণ, যা বলবে শুনতেই হবে। তবে কাজটা ভাল হয় নি তোমার। বামুনের মেয়ে তুমি, তোমাদের পায়ের ধুলো আমাদের শিরোভূষণ, বলব না তোমায় আমি কিছু, শুধু এইটুকু বলব, পুঁটিমাছও মাছ রুইমাছও মাছ, তবু কে আর তাদের এক সমান বলবে বল? যাক্ বলেছি তো অতিথি নারায়ণ! ওরে সুবাস, এঁকে সঙ্গে করে বামুনের পাতার ঘরে বসিয়ে দিগে যা!"

অর্থাৎ এখানেই বাক্যে ইতি।

সত্য ধীরে ধীরে সরে আসে, আর হঠাৎ মনে হয় তার—কোথায় যেন তার একটা হার হল।

সত্য কি খাবে না?

চলে যাবে ?

বলবে শরীর খারাপ ?

কিন্তু কিছু বলার আগেই দত্তগিন্নী ফের কথা বলেন, "তোমার ছেলেকে আন নি ?"

"না।"

"কেন ? সগুষ্টি নেমন্তন্ন হয়েছিল না ?"

সত্যর জোড়া ভুরু চির অভ্যাসমত কুঁচকে ওঠে, আর গলায় ফিরে আসে মৃদু কঠিন স্বর। সেই স্বরে উত্তর দেয়, "না নেমন্তন্নয় আপনার ত্রুটি কিছু হয় নি। তবে সগুষ্টির এসে মাথা মুড়োবার সময় না হলে আর উপায় কি! যাক আমি তো এসেছি, তাতেই হবে। কথাতেই আছে শিরে জল ঢাললে সর্ব্বাঙ্গে পড়ে।"

ঘরে যারা উপস্থিত ছিল তারা সাত নম্বর বাড়ির ভাড়াটের এ হেন স্পর্ধাযুক্ত কথায় বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়, এবং ভাবলেশশূন্য মেদপিণ্ডেও কঠিন একটা ভাবের খেলা ফোটে। তা তিনিও দত্তবাড়ির বড়গিন্নী। তাই নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন, "বামুনদির কথার তো খুব বাঁধুনী ? নেকাপড়া জানা বুঝি ? ভাল ভাল। দেখি নি তো এর আগে, দেখে বড় আমোদ পেলুম। তা যাক্, খেও ভাল করে। আর ছেলেদের জন্যে ছাঁদাটা নিয়ে যেও।"

সত্য চলে যাচ্ছিল সেই সুবাস না কে তার সঙ্গে, হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে তীক্ষ্ণ একটু হাসির সঙ্গে বলে, "আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, শহুরে রীতির কিছু জানি নে। নেমন্তন্ন করে ডেকে এনে অপমান করাই বুঝি কলকেতার চাল ?"

"ওমা শোনো কথা!"

দত্তগিন্নীর দুধের মত সাদা মুখখানায়ও হঠাৎ কালি মেড়ে যায়, আমতা আমতা করে বলেন, "তোমরা হলে গে কুলের কুলীন, সব বামুনের সেরা বামুন, যাকে বলে জাত সাপ। তোমাদের অপমান্যি করবে, এত সাধ্যি কার আছে বল ভাই বামুনদি ? যদি দোষত্রুটি কিছু হয়ে থাকে—নিজগুণে মার্জনা করে আমার খোকাকে একটু আশীর্বাদ করে যাও।"

সত্য স্থির স্বরে বলে, "আশীর্বাদ তো অবিরতই করব। কিন্তু আমাকে একটু শীগ্‌গির ছেড়ে দিতে হবে, তাড়া আছে।"

শূদ্দুর-বাড়ি বামুনের খাওয়া!

দিনদুপুরে মোটা মোটা খানকতক লুচি, আলুনি খানিকটা কুমড়োর ঘ্যাঁট, আর আলুনি বেগুনভাজা। অবশ্য হরেকরকম মিষ্টি আছে, আছে দই ক্ষীর।

তা কোনটাই সত্যর কাছে আকর্ষণীয় নয়। তবু খেয়ে দায় সেরে নিয়ে তাড়াতাড়ি পঞ্চুর মার সন্ধান করে। কিন্তু কোথায় পঞ্চুর মা? সে তখন "ঢপের" আসরে গিয়ে বসেছে। তিনতলার ওপর প্রকাণ্ড হলে সে আসর বসেছে। নাতির ভাতে "ঢপ্ কীর্ত্তন" দিয়েছেন দত্তগিন্নী।

মানদা ঢপি এসেছে।

আর নাকীসুরে টেনে টেনে কী একটা গানের গোড়াবাঁধুনি শুরু করছে।

পঞ্চুর মার তল্লাস করতে এসে দাঁড়ায় তার বোনঝি শৈল।

ময়লা রং, কালো ফিতেপাড় শাড়ী পরনে, সাদা ধবধবে সরু সিঁথির দু পাশে পাতাকাটা চুল, সর্বাঙ্গ নিরাভরণ তবু মনে হয় মেয়েটা খুব সেজেছে তো! এটা মনে হয় হয়তো তার মাজাঘষা গড়নের জন্যে, হয়তো বা পানেরাঙা ঠোঁটের জন্যে।

শৈল বার্তা শুনে অবাক হয়ে বলে, "ওমা চলে যাবে কী গো? ঢপ্ শুনবে না?"

"না।"

"কী আশ্চয্যি! শোনবার লেগে লোকে মরে যায়, আর তোমার এত অগেরাহ্যি? মনে ভাবছ বুঝি শুনলেই প্যালা দিতে হবে? তা তুমি দিলেও পার না দিলেও পার, ওটা হচ্ছে ইচ্ছেসাপেক্ষ।"

"তুমি পঞ্চুর মাকে ডেকে দেবে?"

"ও বাবা! দিচ্ছি দিচ্ছি। মাসী তাই বলছিল বটে—"

"শোন, তোমার মাসীকে বল একেবারে যেন একখানা পাল্‌কি ডেকে তবে আসে।"

"পালকি! ও বাবা!"

শৈল পানেরাঙা ঠোঁঠের একটা অপরূপ ভঙ্গী করে ওদিকে এগিয়ে যায়।

তীব্র তীক্ষ্ণ সরু গলার গানের আওয়াজ এ বাড়ি থেকেও শোনা যাচ্ছে। শুধু এ বাড়ি কেন, দূরে অদূরে বোধ করি পাড়ার সব বাড়ি থেকেই শোনা যাচ্ছে। সুরের জন্যে যত না হোক, গলার জন্যই 'মানদা ঢপি' বিখ্যাত। তীক্ষ্ণ শানানো গলা, গলার সেই সুর—গান থামবার পরেও বাতাসের গায়ে ঝনঝনিয়ে আছড়ায়।

সত্য কখনও ঢপ্ কেত্তন শোনে নি।

ছেলেবেলায় সেজঠাকুর্দার সঙ্গে কখনো কখনো হরিসভায় কেত্তনগান শুনতে যেত, সে অন্যরকম। তার গানের থেকে অনেক জোরালো ছিল খোল করতালের জগঝম্প। আরও ছোটয় বাবার সঙ্গে একবার যেন হালিশহরে না কোথায় নৌকো করে গিয়েছিল কালীকীর্তন শুনতে, আবছা মনে পড়ে। আর কবে কোথায়?

বারুইপুরে পানের চাষ অনেক আছে বটে, গানের চাষ নেই।

আজ যদি মেজাজটা অমন না বিগড়ে যেত, দু দণ্ড বসে গান শুনে আসত সত্য, কিন্তু হল না শোনা! যাচ্ছেতাই হয়ে গেল মন মাথা।

নিজের বাড়ির দাওয়ায় দাঁড়িয়ে একটু শোনবার চেষ্টা করল, তা সে ওই সুরের একটা রেশ ছাড়া আর কিছুই কানে এল না। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে নিশ্বাস ফেলে সরে এল সত্য। এ নিশ্বাস গান শুনতে না পাওয়ার জন্য অবশ্য নয়, কারণ অন্য।

জগতে পয়সার প্রাধান্য দেখে আর পয়সার গরম দেখে মনটা উদাস হয়ে যাচ্ছে তার। কী আশ্চর্য এই কলকাতা শহর! গুণের নয়, বিদ্যেবুদ্ধির নয়, মানুষ মনিষ্যত্বর নয়, শুধু মাত্র পয়সার জয়জয়কার! এই শহরকে সেই শৈশব কাল থেকে কত ভক্তি কত সমীহর চোখে দেখে এসেছে যে সত্য!

খানিকটা উদাস উদাস হয়ে বসে থেকে সত্য আবার ভাবল, তা একটা মাত্র সংসার দেখে, একটা মানুষের আচার আচরণ দেখেই বা আমি এমন আশা ছাড়া হচ্ছি কেন? এত বড় বিরাট পুরীতে কত মানুষ, কত হালচাল। এই শহরেই রাজা রামমোহন ছিলেন, বিদ্যেসাগর আছেন, বঙ্কিমচন্দ্র আছেন, পিরীলি ঠাকুরবাড়ির মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আছেন, আরও কত সব আছেন। ভবতোষ মাস্টার তাঁদের সব জীবনকথা, মহিমার কথা কত শুনিয়েছেন সত্যকে, সে সব ভুলে গিয়ে সত্য কিনা ওই দত্তগিন্নীকে দিয়ে কলকাতার বিচার করছে?

মনটা ঝেড়ে ফেলে উঠল। আজ আর পঞ্চুর মা আসবে না, তার কাজগুলো সব করে নিতে হবে।

তা একটু না গুছিয়ে নিতেই তুড়ু আর খোকা ইস্কুল থেকে ফিরল হুমদাম করে।

"মা! ভীষণ নেমন্তন্ন খেলে তো?"

সমস্বরে বলে উঠল দুজনে।

সত্য হেসে ফেলে বলে, "হ্যাঁ! শুধু ভীষণ? একেবারে বিভীষণ! নে নে, ইস্কুলের জামাকাপড়ে সর্বজয় করিস নে। মুখ-হাত ধো।"

"খাবার আছে? খাবার? মণ্ডা-মেঠাই, খাজাগজা, ছানাবড়া প্রভৃতি? ভাবতে ভাবতে আসছি আমরা—"

ওদের কণ্ঠে অসহিষ্ণুতা দেদীপ্যমান।

সত্যর মনটা একটু মায়া মায়া হয়ে আসে, এই দেখ ছোট ছেলেদের কাণ্ড! সারাদিন পড়া লেখা ফেল্ করে মণ্ডা-মেঠাইয়ের চিন্তা করছে। কিন্তু মায়াকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না এখন। তাই সবিস্ময় ভাব দেখিয়ে বলে, "ওমা, স্বপ্ন দেখছিস নাকি? ওসব আবার আমি কোথায় পাব?"

ওরা কিন্তু এ বিস্ময়কে আমল দিল না, মার হাত ধরে ঝুলে পড়ে হৈ-হৈ করে উঠল। "ইস্ তাই বৈকি। চালাকি হচ্ছে। ও বাড়ি থেকে ছাঁদা আন নি বুঝি?"

ছাঁদা!

সত্যর মায়া মায়া মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে, তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করে, "ছাঁদার কথা কে বলেছে?"

"বাঃ, বাবা তো আপিস যাবার সময় বলল, তোদের মা কত ছাঁদা আনবে দেখিস।"

"ভুলে বলেছেন। নয়তো ঠাট্টা করেছেন।"

সত্য বলে।

কিন্তু তুড়ুর মন এখন আক্ষেপ-উদ্বেল। সে বলে, "তুমি শুধু শুধু আমাদের ইস্কুলে পাঠালে, কেউ বুঝি আজ ইস্কুলে গেছে? পাড়ার ওরা দিব্যি পেট ঠেসে খেলো, আবার জনাজনতি ছাঁদা আনল। আর আমরা হুঁউউ—বোল রকম নাকি মিষ্টি করেছে ওরা—"

সত্য গম্ভীর ভাবে বলে, "সেটা আবার কি করে জানলি, আপিস যাবার সময় তাও বুঝি বলা হয়েছে?"

"না, সে কথা বাবা কি করে জানবে? বলেছে পঞ্চুর মা।"

"ও তা আজ দেখছি তোদের মাথার মধ্যে শুধু ওই ছাঁদার গল্পই ঘুরছে। হ্যাংলার মতন আবার ছাঁদা আনব কি, যাঃ। চল্, বাড়িতে যা আছে তাই দিই গে।"

তুড়ু বয়সে বড় হলে কি হয়, খোকার থেকে সে হাঁদা। তাই সে সহসা বলে ওঠে, "চাই না আমি ও মুড়ি-মুড়কি আর নাড়ু খেতে! পঞ্চুর মা ঠিকই বলেছে—"

হঠাৎ নিজের কথায় নিজেই শিউরে উঠে চুপ করে যায় সে।

কিন্তু চুপ করিয়ে রাখবার মেয়ে সত্য নয়। সে তীব্র জেরায় কী বলেছে পঞ্চুর মা তা আদায় করতে চেষ্টা করে। আর তুড়ু কাঠ হয়ে গেলেও খোকা বলে বসে, "পঞ্চুর মা বলেছে, একদিন ইস্কুল কামাই হলে কী এত রাজ্যি লোপাট হয়? অমন ভোজটা থেকে ছেলে দুটোকে বঞ্চিত করল। মা না রাক্ষুসী—"

"কী! কী বললি? বল, বল আর একবার।"

সত্য যেন দিশেহারা হয়ে গেছে। সত্য নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। এই হল শেষটা! এই রকম হচ্ছে তার ছেলেরা? এর জন্যে এত কাণ্ড করে দেশ থেকে চলে এসেছে সত্য?

তার যে একান্ত বাসনা ছিল তার ছেলেরা সভ্য হবে, মার্জিত হবে!

সত্যই কি তবে অসভ্য হবে, অমার্জিত হবে? মারবে ছেলেদের?

না, সত্য ছেলেদের মারে নি।

শুধু একবার সেই তীব্র প্রশ্ন করে চুপ করে গেছে। চুপ করে বসে আছে। ছেলেরা যে মুড়ি-মুড়কিও খায় নি, তা আর তার মনেও নেই। ও শুধু ভাবছে ঘরে পরে বিপদ, কার আওতা থেকে তবে রক্ষে করবে ছেলেদের?

খানিক পরে নবকুমার এল।

আড়চোখে একবার দেখে নিল সত্যর জলদগম্ভীর মুখটা, তার পর ইশারায় খোকাকে ডেকে বাইরে নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করল, কী হয়েছে সত্যর।

হ্যাঁ, বেগতিক দেখলে এই রকমই ওদের প্রশ্ন করে জেনে নেয় নবকুমার।

নেয় খোকার কাছে বেশী, জানে তুড়ুটা বোকা, গুছিয়ে বিশদ বলতে সে পারেও না।

কারণ শুনে নবকুমার বুঝতে পারে না, এই তুচ্ছ ব্যাপারে এত বিচলিত হবার কি হল সত্যর।

ছেলেরা তো আর মাকে রাক্ষুসী বলে নি? বলেছে পঞ্চুর মা?

তাই ঘরে ঢুকে কাষ্ঠহাসি হেসে বলে, "কি, আবার কি হল?"

সত্য সেই ভাবেই বসে থাকে, কথা বলে না।

নবকুমার বলে, "বাবা রে, চিরটা দিন এক রকমে গেল! তোমার 'কাষ্ঠ-কঠিন' স্বভাবের গুণেই পঞ্চুর মা ও কথা বলেছে। তা সেইটুকু বলেছে বলে, এত শাস্তিও করতে হয় ছেলে দুটোকে? ইস্কুল থেকে নাচতে নাচতে আসছে বড় মানুষের বাড়ির ভালমন্দ দুটো খাবে বলে, তার বদলে কিনা উপোসের সাজা! ধন্যি বটে!"

উপোসের সাজা! মানে? ওঃ তাই তো! ছেলেদের খেতে দেওয়া হয় নি!

মুহূর্তে মনটা ভিতরে ভিতরে দ্রব হয়ে গিয়ে "হায় হায়" করে ওঠে। ছেলেদের খেতে না দিয়ে বসে আছে সে? রাগের চোটে খেয়ালই হয় নি? ইস্! পঞ্চুর মা দেখছি নেহাত ভুল বলেও নি। কচি ছেলে ওরা, ওদের আর ভালমন্দ বোধ কতটুকু? ওদের বাপ বুড়ো মিনসেই যদি বড়মানুষের বাড়ির খাবারের মোহময় ছবি এঁকে ওদের সামনে ধরে? রাগটা কমে গিয়ে "হায়, হায়" এলেও, মুখে হারে না সত্য। গম্ভীর মুখে বলে, "তা সামান্য দুটো মুড়ি-নাড়ু নাই বা দিলাম, মণ্ডা-মেঠাই খাজাগজার গল্প করগে না ছেলেদের কাছে, খুব পেট ভরবে।"

কথা কয়েছে। বাঁচা গেল।

নবকুমারের ভয়টা অনেক ভাঙে।

সত্য যখন মুখ খুলেছে, বুঝতে হবে অবস্থা একেবারে মারাত্মক নয়।

কথা না কয়ে চোয়ালের হাড় শক্ত করে নিঃশব্দে বসে থাকাটাতেই বড় ভয় নবকুমারের। অফিসে নবকুমারের কর্মদক্ষতা আর বুদ্ধিমত্তার এত সুনাম, নিম্নবর্তীরা এত ভয়-ভক্তি করে তাকে, সেখানে নিজেকে তো "বেশ একজন" মনে হয়, কিন্তু বাড়িতে এলেই যে কী হয়! সেই চির অসহায়তা।

তবু আজ এখন সত্য মুখ খুলেছে।

তাই নবকুমারও সাহসে ভর করে বলে, "আহা খিদেয় কাহিল হয়ে গেছে একেবারে। আপিস ইস্কুল থেকে ফিরে খিদে যা জোর লাগে জানি তো!"

অর্থাৎ এই সুযোগে নিজের কথাটাও ঢুকিয়ে দিল নবকুমার।

আর রাগ নিয়ে বসে থাকা চলে না। সত্য উঠে পড়ে।

নবকুমারও আর বেশী সময় নেই বুঝে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "রাগ তো দেখালে এত, বলি ছাঁদায় এত ঘেন্না কিসের? ছাঁদা আবার কে না আনে? কেন, তোমার বাপের বাড়ির দেশে ছাঁদার চল নেই বুঝি? আমরা তো বাবা ছেলেবেলায় ওই ছাঁদাটার আশাতেই নেমন্তন্ন যেতাম। ছোট পেটে কতই আর খেতে পারতাম বল? বাড়িতে এসে পরদিন সকালে সেই ছাঁদার সরা খুলে—"

"থাক হয়েছে, গল্প রাখ -মুখ হাত ধোওগে" বলে সত্য উঠে যায়। মনটা হঠাৎ যেন নরম হয়ে গেল। সত্যি এতে রাগের কি ছিল? তাদের ছেলেবেলায় তারাও তো—! কেন 'চল্' থাকবে না তার বাপের বাড়ির দেশে? তাদের বাড়ির কাজকর্মেই তো কত সরা সাজানো, মালসা সাজানো, হাঁড়ি সাজানো দেখেছে, লোকে খাওয়াদাওয়ার পর নিয়ে গেছে। রামকালী নিজে দাঁড়িয়ে তদারক করেছেন, মাথা পিছু ঠিকমত যাচ্ছে কিনা। সঙ্গের ঝিটা মুনিষটা রাখালটা পর্যন্ত বাদ যেত না। আবার সত্যরাও পিস্ঠাকুমার সঙ্গে যখন এ-বাড়ি ও-বাড়ি নেমন্তন্ন গেছে, তারা দিয়েছে, নেওয়া হত না তা তো নয়।

আর একটা উৎসব ছিল বিশেষ আকর্ষণীয়। সেটা হচ্ছে আটকৌড়ে। গ্রামে কারো বাড়িতে ছেলে জন্মালেই আটদিনের মাথায় ডাক পড়ত অপর বাড়ির কুচো ছেলেদের কুলো পিটোতে। সে সম্মানটা অবশ্য শুধুই ছেলেদের!

তবে খই-মুড়কি আটভাজার সম্ভার থেকে মেয়েরা বঞ্চিত হত না। আঁট-সাট করে বেড়াবিনুনি বাঁধা, কোমরে ডুরেশাড়ীর আঁচল জড়ানো, পাড়া সচকিত করে মল বাজিয়ে যাওয়া নিজের সেই চেহারাটা যেন চোখের ওপর দেখতে পেল সত্য।

ফিরত সেই ডুরেশাড়ীর আঁচলটা কৌশলে 'কোঁচড়ে' পরিণত করে, তাতে খাজা গজা আটভাজার বোঝাই দিয়ে। তার মধ্যে কেউ-কেউবা

আবার আটটা করে পয়সা মিশিয়ে রাখত, বাড়ি এসে কী মহোল্লাসে সেই পয়সা খোঁজার ধুম !

কই নিজেকে বা অপরকে তো তখন হ্যাংলা মনে হত না? কেন হত না? আজই বা কেন—

স্বামীপুত্রের খাবার গোছাতে গোছাতে কারণটা ভাবল সত্য, নির্ণয়ও করল একটা। ওদের খেতে দিয়ে উপস্থাপিত করল সেই কথাটা।

"বলছিলে আমাদের নিত্যেনন্দপুরে ছাঁদার চল্ ছিল কিনা? থাকবে না কেন, খুবই ছিল। তবে কথাটা হচ্ছে—সেই দেওয়ার মধ্যে নেমন্তন্ন-কত্তার অহঙ্কারটা ফুটে উঠত না। বরং যেন দিতে পেরেই কেতাত্থ। তাই যারা নিত, তাদের মধ্যে 'মান-অপমান' ঘুলোত না। এই তোমার দত্তবাড়ির বাপু সবতাতেই যেন অহঙ্কার। এতখানি একখানা তিজেলে বাহান্ন প্রস্থ মিষ্টি সাজিয়ে রেখেছিল তো আসনের পাশে, তা সেটা মানুষ পাল্‌কিতে তুলিয়ে দেবে তো? তা নয় বাড়ির লোকেরা কে কোথায় ঠিক নেই, কাকস্য পরিবেদনা, একটা দাসীমতন মেয়েমানুষ ভাঙা কাঁসি গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'ওগো বামুন মেয়ে, তোমার ছাঁদা পড়ে রইল যে!' দেখ তো অভব্যতা? নেব আমি হাতে তুলে?"

সত্যর স্বামী-পুত্রের মনে সেই বাহান্ন রকম কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল কে জানে, তবে নবকুমারকে স্ত্রীর কথায় "তা সত্যি" বলে সায় দিতেই হল। তার পর কথাটা সে নিজেই পাড়ল, "তা পর—সত্যিই সেই সোনার হারছড়াটা দিয়ে এলে নাকি?"

"তা সত্যি দেব না তো কি মিথ্যে দেব? দেব বলে নিয়ে গেলাম—"

নবকুমার আক্ষেপ-নিশ্বাস গোপন করে উদাসভাবে বলে, "তোমার জিনিস তুমি ফেলে দিতে পার, বিলাতে পার, সে কথা না, তবে পাড়ার দু-একজনকে শুধিয়েছি সকালে, কেউ আধুলিটা কেউ সিকিটা দিয়েছে, টাকার উর্ধ্বে কেউ ওঠে নি।"

সত্য এ প্রসঙ্গে যবনিকাপাত করে দিতে বলে, "থাকগে বাপু, কচি ছেলেকে দেওয়া জিনিসের কথা নিয়ে কচকচানিতে কাজ নেই, ছাড়ান দাও ও কথায়। এবারে পুরুষ বেটাছেলের মতন একটা কাজ কর দিকি? একখানা বাসা খোঁজ।"

"বাসা? আবার বাসা খুঁজব? বদলাবে এ বাসা?"

"তাই তো স্থির করেছি।"

মনে করেছি নয়, ইচ্ছে করছি নয়, সংকল্প করেছিও নয়, একেবারে স্থির করেছি!

নবকুমার মনে মনে নিজের হার নিশ্চিত জেনেও লড়াইয়ে নামে, "তা স্থির করবে বৈকি, মাথাটাই অস্থির যে। তাই নিত্যি নতুন স্থির করা। বলি এই ভাড়ায় এমন বাসা আর পাবে? দত্তদের নাকি নেহাত পয়সায় দৃক্‌পাত নেই, তাই বাসাগুলো এত সস্তায় ছেড়েছে! অপর কেউ হলে, এর দেড়া দাম হাঁকত। ওসব কু-মতলব ছাড়।"

সত্যর সেই জোড়া ভুরুর নীচের গভীর কালো চোখ জোড়া সহসা একটি কৌতুক-রসাশ্রিত বিদ্যুৎকটাক্ষে ঝিলিক মেরে ওঠে, "সত্য বামনী কবে তার মতলব ছেড়েছে?"

নবকুমার সেই মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। সত্যর হাসিটা দুর্লভ বলেই কি এত অপূর্ব?

না, এ অপবাদ নবকুমার দিতে পারে না—সত্য বামনী কখন তার মতলব ছেড়েছে! শুধু নবকুমারই বুঝতে পারে না, অকারণ সুস্থ শরীর ব্যস্ত করে কী সুখ পায় সত্য!

সঙ্গে সঙ্গে হাঁ করে তাকিয়ে থাকা চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বেজার মুখে বলে নবকুমার, "কেন, এ বাসা আবার কি অপরাধ করল?"

সে তোমাকে বললে তুমি বুঝবে না।"

"না, আমি তো কিছুই বুঝব না। যত বোঝার কত্তা তুমি। বাসা-ফাসা বদলানো হবে না। বারে বারে এক কেত্তন্! পাখী-পক্ষী নাকি, যে রাতদিন বাসা বদলাবো? হবে না বলে দিচ্ছি—ব্যস।"

"তা বেশ, হবে না! সত্যি, কর্তার কথাই বজায় থাক।"

বলে সত্য উঠে যায়।

এ বাসা বদলানোর ইচ্ছে যে সত্যরই খুব আছে তা নয়। বাড়িটা সব দিক দিয়ে সুবিধের। কিন্তু ওই মাথার ওপর প্রভু নিয়ে "প্রজা" হয়ে থাকাটাই তার বরদাস্ত হচ্ছে না। আর মজাটাও দেখ, নিজের বাড়িতে নিজের মতন থাকব তা নয়, ঝিটা এবাড়ি ওবাড়ি করে যন্ত্রণা ঘটাতে থাকবে। ওকে ছাড়িয়ে দিলেও কতকটা সুরাহা হয় বটে, কিন্তু সেটাও ঠিক মনের সঙ্গে খাপ,

খায় না। মানুষটা দুষ্টুপাজী নয়। উপকারীও আছে। দোষের মধ্যে হচ্ছে অবোধ। আর অবোধ বলেই অতিরিক্ত কথা কয়। সেই কথার জ্বালাতেই ছেলে দুটোর কুশিক্ষা জন্মাছে।

তা সেই কথাই বলে ছাড়িয়ে দিতে হবে পঞ্চুর মাকে। বলতে হবে, "আমার ছেলেদের যদি তুমি শেখাও 'মা নয়, রাক্ষসী', তা হলে তোমায় কি করে রাখি বল তো বাছা? সামনের মাস থেকে অন্য কাজ দেখ।"

সেই কথাই ঠিক করে মনে মনে।

এবাড়ি ওবাড়ি আনাগোনার কথা তুলে আর খেলো হবে না। আসুক কাল সকালে।

কিন্তু কাল সকাল অবধি অপেক্ষা করতে হল না সত্যকে, সেই সন্ধ্যেতেই এসে হাজির হল পঞ্চুর মা, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এক বার্তা নিয়ে।

এ কী!

এ কোন্ বিপদ অপেক্ষা করছিল সত্যর জন্যে?

সন্ধ্যের আগে দুপুরের কথাটা তা হলে বলে নিতে হয়।

দত্তগিন্নী পিচ্ করে পিক্ ফেলে বলেন, "হ্যাঁলা পঞ্চার মা, তোর মনিব-গিন্নী বয়সে তো কাঁচা, ওর এত অহ্ঙ্কার কিসের বল দিকিনি?"

দত্তগিন্নীর চির মোসাহেব "ভাগ্নে-বৌ" হি হি করে হেসে উঠে বলে, "ওই কাঁচা বয়সেরই অহঙ্কার গো মামী! নইলে অহঙ্কার করবার আর কিছু তো দেখছি না!"

দত্তগিন্নী ভারীমুখে বললেন, "উঁহু, এ বাপু বয়সের দেমাক নয়, এ হচ্ছে স্বভাবের দেমাক। সংসারে ওর আর কে আছে রে পঞ্চার মা?"

পঞ্চুর মা এ বাড়িতে কোনদিনই "পঞ্চার মা" বৈ পঞ্চুর মা শোনে না, তাই ওই অগ্রাহ্যের ভঙ্গী তার গা-সহা। অতএব বিনয়ে বিগলিত হয়েই সে উত্তর দেয়, "আর কে? ওই উনি, ওনার সোয়ামী আর দুটো সাত-আট বছরের খোকা।"

"অঃ! তাই! কথাতেই আছে, মেঘা খেয়ে রোদ হয় তার বড় চড়চড়ানি, আর বৌ হয়ে গিন্নী হয় তার বড় ফড়ফড়ানি। তা, শাশুড়ীমাগী বুঝি মরেছে?"

পঞ্চার মা কৌতুকের ভঙ্গীতে বলে, "বালাই ষাট! মরবে কেন? শাশুড়ী

আছে শ্বশুর আছে, আছে সবই। দেশ-গেরামে আছে। উনি বাসায় এসেছেন স্বামীপুত্তুর নিয়ে। সোয়ামী সাহেবের আপিসে চাকরি করে।"

"বটে! তাই তো বলি! তাতেই তেজে মটমট! দেশ কোথা?"

"কোথা কি বিত্তান্ত কে শুধোবে মা?" পঞ্চুর মা মনে মনে সত্যর প্রতি স্নেহশীল এবং সমীহপরায়ণ হলেও, নিতান্তই দত্তগিন্নীর সুয়ো হতে মনিবের প্রতি অগ্রাহ্য দেখিয়ে বলে, "গপপো করবার সময় আছে তেনার? ঘরের কাজ মিটল তো বই কেতাব মুখে দিয়ে বসল—"

বই কেতাব!

ঘরের মধ্যে একটা ব্যঙ্গহাসির ঢেউ খেলে যায়। "তাই নাকি? ওরে পঞ্চার মা, তুই যে দেখছি খুব ভাল বাড়িতে চাকরি ধরেছিস! দেখিস বাপু গিন্নীর হাওয়া লেগে তুই স্বদ্ধু পণ্ডিতনী হয়ে যাস নি!"

পঞ্চুর মা হেসে বলে, "তা পারলে গিন্নী আমাকেও বই ধরায়। বাব্‌বা, ছেলে দুটোকে 'পড়া পড়া' করে যা দিক্‌ করে। তবু ওই ছেলে দুটোই যা গপপোগাছা করে আমার সঙ্গে। ওদের মুখেই শুনেছি, বারুইপুর না কোথায় যেন দেশ, ঠাকুমা আছে ঠাকুদ্দা আছে পিসি আছে। আর মামারবাড়ি সেই 'তিরবেণী'র কাছে নিত্যেনন্দপুর না কি যেন। দাদামশায় কবরেজ খুব বড়মানুষ —"

সহসা ঘরের মধ্যের একটা মানুষের মুখটা কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মত হয়ে যায়, দেয়ালের কোলে একখানা পেতলের চৌকিতে পাতিয়ে পাতিয়ে পান সাজছিল সে, কাজ করা হাতটা তার থেমে যায়। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে পঞ্চুর মার মুখের দিকে, কানে যায় না দত্তগিন্নীর মন্তব্য।

"বড়মানুষের ঝি" বলেই এত দেমাক সাত নম্বর বাড়ির গিন্নীর—সেই মন্তব্যই করেন দত্তগিন্নী।

পঞ্চুর মাও মন্তব্য দিয়ে পরিসমাপ্তি করে, "সেই তো।"

"শুনলাম নাকি ছাঁদার হাঁড়ি ছোঁয় নি—", ভাগ্নে-বৌ নিভন্ত আগুনে কাঠ ফেলে, "ঢপ শোনে নি!"

"সেই কথাই তো বলে মরছি বৌদিদি—", পঞ্চুর মা আক্ষেপ করে, "এত এত লোকের সময় হল, আর তোর সময় হল না? পাড়ার সকল ছেলে ঘরে বসে রইল, তোর ছেলেদেরই ইস্কুলের মান্যি এত হল! ছেলে দুটোর জন্তে মরছি করকরিয়ে—"

"তা যাগ। হাঁড়িখানা নয় তুইই নিয়ে যাস। দিস গিয়ে ছোঁড়াদের।" বল্লেন অপর এক মহিলা।

কিন্তু পানসাজুনি বিধবাটির কানে বুঝি এসবের বিন্দুবিসর্গও যায় না। সে তেমনি হাঁ করে তাকিয়ে থাকে পঞ্চুর মার মুখপানে, আর কি বলে সে সেই আশায়।

পঞ্চুর মা কিন্তু আর কথা বাড়ায় না। সত্যর বিরুদ্ধে কথা বলতে তার বিবেক তেমন সায় দিচ্ছে না, তবে নেহাৎ নাকি এ ঘরে এখন পালের হাওয়া উল্টোদিকে তাই। বড়মানুষের কথার ধামা তো ধরতেই হবে। তা ছাড়া— সত্যর ওপর তার আজ সত্যিই বড় রাগ হয়েছে।

সে কোথায় ভেবে রেখেছিল সত্যকে নিয়ে এসে বড়লোকের বাড়ির জাঁকজমক দেখাবে, আর তার বোনঝি শৈলর যে এ বাড়িতে কতখানি মানমর্যাদা তা বুঝিয়ে ছাড়বে। একটা মাণ্যিমানের মাসী-পিসী হওয়াও তো কম গৌরবের নয়!

মাণ্যিমান বৈকি!

দত্তগিন্নীর মেজছেলের সঙ্গে শৈলর দহরম-মহরম তো আর রাখা-ঢাকা নেই? মেজবাবুর উপর শৈলর আধিপত্য একেবারে প্রকাশ্য ব্যাপার। মেজবৌটাকে ঢিট্ রাখতে দত্তগিন্নী এ আগুনে রীতিমতই ইন্ধন দিয়ে চলেন। শৈলর জন্যে গন্ধতেল গন্ধসাবান সরবরাহ হয় দত্তগিন্নীর নিজের ভাঁড়ার থেকে। শৈলর জন্যে পানে খাবার সব চেয়ে দামী 'কিমা' আসে গিন্নীর খরচে। শৈলর ফিতেপেড়ে শান্তিপুরী হাফশাড়ীর যোগানদার অবশ্য মেজবাবু স্বয়ং, তবে একটু ময়লা কি ছেঁড়া চোখে পড়লেই দত্তগিন্নী "গ্যাদারী বেজারমুখী" মেজবৌটাকে শুনিয়ে শুনিয়ে শৈলকে বলেন, "হ্যাঁলা, কাপড় এত ময়লা কেন? নেই বুঝি? বলতে পারিস নে তোর মেজদাদাবাবুকে

এতজন থাকতে মেজদাদাবাবুকেই কেন, সে প্রশ্নটা অবশ্য উহ্য থাকে।

তা এসব রঙ্গরসের গপপো অবশ্য পঞ্চুর মার মনিবনীর সঙ্গে করার জো নেই, কিন্তু শৈলর দখলস্বিটা তো দেখানো যেত? তা হল না কিছুই।

মরুক গে!

যার যেমন বুদ্ধি।

বুদ্ধির দোষেই ঠকে মানুষ। বৌদিদি যে এত বুদ্ধিমতী, তা কই জিততে

পারল কই, হেরেই তো মলো। নিজে ভাল করে খেলি না, স্বামীপুত্তুরকে খেতে দিলি না, গান শুনলি না, সবদিকেই ঠকলি। ধুত্তোর!

মনঃক্ষুণ্ণ পঞ্চুর মা পানসাজুনির দিকে এগিয়ে এসে বলে, "দাও বামুনদি, দুটো বেশ মচমচে করে পান দাও দিকি খাই—"

দুটো পান তাড়াতাড়ি সেজে কম্পিত হাতে সে-দুটো পঞ্চুর মার হাতে তুলে দিয়ে পানসাজুনি বামুনদি চাপা নীচু গলায় বলে, "কই, তোর মনিবনীকে তো আমায় দেখালি না?"

"ওমা শোন কথা! ক দণ্ড থাকল তিনি? এল আর চলে গেল বৈ তো না।"

"তোদের কথাবার্তা শুনে একটু কৌতূহল হচ্ছে। বলি এত তেজদম্ভ শুনছি—দেখাবি না একবার?"

"আর দেখানো! বৌদি কি আর এমুখো হবে? আর এ বাড়িতে আসবে? তবে যদি তুমি—"

বামুনদি আরও মৃদুগলায় বলে, "তবে তাই চল্ না, দেখে আসি।"

"ওমা! হঠাৎ আমার মনিবের ওপর এমন নেকনজর কেন গো বামুনদি?"

"আস্তে! এক্ষুনি গিন্নীর কানে উঠবে আর 'না' করে বসবে।"

"বেশ, সন্ধ্যের পর নিয়ে যাব।"

যাবার মুখটায় কিন্তু বামুনদিদি কেমন যেন বিচলিত হয়, আগ্রহটা যেন ঝিমিয়ে আসে তার। বলে, "থাক গে পঞ্চুর মা—কাজ নেই।"

"ওমা কেন? ত্যাখন অত 'মন' করলে!"

"হ্যাঁ, ঝোঁকের মাথায় তখন বলেছিলাম বটে, তা বলি কি গেলে আবার এ গিন্নীর যদি গোঁসা হয়?"

"শোন কথা! কে টের পাচ্ছে? তোমার আমার মতন চুনোপুঁটির খবর রাখতে ওনাদের দায় পড়েছে! কাজের বাড়িতে নানান্ গোলমাল, দশটা নতুন রাঁধুনী চাকরানী খাটছে, ফাঁকি দেবার এই তো সুযোগ।"

"না ভাবছি—গিয়েই বা কি হবে! শুনছি নাকি দেমাকী, রাঁধুনী পান-সাজুনির সঙ্গে যদি কথা না কয়!"

"ওমা না না, তা তুমি ভেবো না বামুনদি—"পঞ্চুর মা অভয় দেয়, তাকে

যদি কেউ ঘাঁটাতে না যায় সেও কিছু বলবে না। বাড়িতে অতিথি এলে বরং আদর-আভ্যানই করবে, রাঁধুনী চাকরানী বিচার করবে না। এই তো সেদিন তাঁতিনী মাগী গেছল, তাকে কত যত্ন করে বসাল, তেষ্টার জল দিল, পান দিল। কাপড় অবিশ্যি নিল না, বলল দরকার নেই, তবে দুর-ছাই তো করল না।"

অনেক অগ্রপশ্চাতের পর শেষ অবধি অগ্রেরই জয় হয়।

পেঁজা তুরতুরে সিল্কের চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে সন্ধ্যের দিকে খিড়কির দরজা খুলে শঙ্কুর মার সঙ্গে রাস্তায় নামল পান সাজুনি বামুন মেয়ে।

বামুনের মেয়ে একদা কাজের দরবার নিয়ে এসেছিল দত্তবাড়িতে। নেহাৎ ঝি-চাকরানীর কাজ তো দেওয়া যায় না তাকে, তাই এই কাজের ভার। অবশ্য 'পান সাজা' কথাটা শুনতে যত হালকা, এ বাড়িতে সে ব্যাপারটা তত হালকা নয়। দৈনিক অন্ততঃ হাজার তিনেক পান তাকে সাজতে হয়। তদুপযুক্ত সুপুরিও কেটে নিতে হয়। তা ছাড়া সব পান ঠিক এক ধরনের সাজলেও চলে না, তার আবার শ্রেণীবিভাগ আছে। কারুর কারুর মিঠেপানের খিলি বরাদ্দ, কারুর কারুর জায়ফল দারচিনি জৈত্রি কাবাবচিনি এলাচ কর্পূর সম্বলিত রাজকীয় পান, কারো বা দোক্তা খাওয়া মুখের রুচি অনুযায়ী শুধু খয়ের সুপুরি। আবার সুপুরিরও মিহি মোটা নানান্ প্রস্থ। এই সব পানের নৈবেদ্য সাজিয়ে যার যার ঘরের বাটায় রেখে আসতে হয় গোলাপজলে ভিজানো ন্যাকড়া চাপা দিয়ে।

এছাড়া সরকার গোমস্তা লোকজন, অতিথি ফকির, 'আসুস্তি যাউস্তি', আশ্রিত অভাগাদের জন্যে মোটা বাংলা পানের ব্যবস্থা আছে। সমস্ত ওই বামুন মেয়ের ঘাড়ে। শুধু পান নিয়েই সারাটা দিন তার প্রাণ যায় যায়। তার ওপর আবার বাড়িতে যজ্ঞি হলে তো কথাই নেই। সেও তো আছে যখন তখন। বিয়ে, সাধ, মুখেভাত, এসব বাদেও বাড়ির হরেক মেয়েমানুষের হরেক রকম 'বত্ত সারা'ও তো সারা বছর। লোকজন খাওয়া লেগেই আছে। দত্তগিন্নীর ছোটজা অনন্ত-চতুর্দশীর বত্ত সারল, তিন-চারশ লোক খেল। পতিপুত্রহারা বিধবা, তবু কমতি কিছু হল না। বড়গিন্নী উদারমনা, বললেন, "তা হোক! ওর কেউ না থাক্, আমি যখন আছি আমিই ওর সব করাব। ইহকালটা তো বৃথাই গেল, পরকালটা বজায় থাক।"

ছোটগিন্নী অবশ্য বেইমান।

আড়ালে আবডালে বলে বেড়ায়, "আমার বুঝি ভাগ নেই দত্তদের বিষয়-সম্পত্তিতে? বানের জলে ভেসে এসেছি বুঝি আমি? কাঠা হাতে করে ঢুকি নি আমি এদের উঠোনে? গাঁটছড়া বেঁধে সঙ্গে করে নিয়ে আসে নি এদেরই একজন?" তাকে উস্কুনিও দেয় কেউ কেউ।

কিন্তু সে নেহাতই আড়ালে। বড়গিন্নীর সামনে সবাই ঠাণ্ডা।

কি সে যাক।

পথ চলতে চলতে বামুন মেয়ের সঙ্গে নিম্নোক্ত কথাবার্তা হয় পঞ্চুর মার, "যতই হোক তুমি হলে স্বজাতি, তোমায় সমেহা দেখাবে।"

স্বজাতি অবশ্য সত্যবতীর। কারণ সেও বামুন।

বামুন মেয়ে কিন্তু এ আশ্বাসে উল্লসিত হয় না। উদাসভাবে বলে, "সোনার বেনের অন্ন খাওয়া বামুন আবার বামুন! তুইও যেমন পঞ্চার মা! তোরা 'বামুনদি বামুনদি' করিস তাই, নিজেকে বামুনের মেয়ে বলে পরিচয় দিতে আমার ইচ্ছে করে না। নেহাত নাকি কাজ করতে এসে শুদ্দুর বললে, পাছে পা টিপতে, ছাড়া কাপড় কাচতে, এঁটো বাসন মাজতে বলে, তাই ওই পরিচয় দেওয়া।"

"তা কেন বামুনদি, তোমার আচার-আচরণ তো সদ্‌বাম্মনের মতনই। নইলে রাঁধুনী কুটনোকুটনী ভাঁড়ারদিউনি আরও যে সব বামনী ধনী আছেন, তাঁদের আচার কেতা তো আর পঞ্চুর মার অবিদিত নেই? ঘেঁচার মা তো সেদিন লুকিয়ে গরম মাছভাজা খেতে গিয়ে জিভে কাঁটা ফুটিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল, তাই কি মাগীর হায়া আছে? আসল কথা কি জান বামুনদি, স্বভাব-চরিত্তিরটি যতক্ষণ ভাল আছে, ত্যাতোক্ষণ কক্ষনো সে আচারবিচের ছাড়বে না। আচার অনাচার ত্যাগ করলেই বুঝবে মতিগতি বিগড়েছে। ধম্ম-কম্ম আচার-আচরণ হচ্ছে নদীর বাঁধ, বাঁধ যদি একবার ভাঙে—"

বাসনমাজা ঝি পঞ্চুর মার এই জীবনদর্শনের ব্যাখ্যার শেষাংশটা আপাততঃ মুলতুবী থাকে। সত্যবতীর দরজায় এসে পড়েছে দুজনেই। পঞ্চুর মা শানানো গলায় ডাক পাড়ে, "কই গো বৌদিদি, কোথায়? একবার বেরিয়ে এস গো। নতুন মানুষ এয়েছে তোমায় দশ্শন করতে।"

চৌত্রিশ

অনেকদিন নিতাইয়ের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই, ছাতাটা হাতে নিয়ে রোদ্দের মধ্যে বেরিয়ে পড়ে নবকুমার। আজ ছুটির দিনে বাসায় আছে নিশ্চয়। নিতাই চলে যাবার পর প্রথম প্রথম নিতাইয়ের সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে লজ্জা করত, নিজেকে ভারী অপরাধী মনে হত, কিন্তু সময়ে সবই সয়। সে লজ্জা একটু একটু করে কমেছে। সত্যবতীই বার বার ঠেলে ঠেলে পাঠিয়েছে নেমন্তন্ন করতে। আর অবাক কাণ্ড, দিব্যি সহজভাবে নিতাইয়ের সঙ্গে কথা কয়েছে সত্য, নিতাই যা যা ভালবাসে, মনে মনে করে রেঁধেছে, অনুরোধ উপরোধ করে খাইয়েছে।

এই সব অসমসাহসিক কাণ্ডগুলো কী করেই যে করে সত্য! যাক, আজ নবকুমার নিজেই যাচ্ছে। আজ বাড়িতে তেমন মন বসল না। সেই যে পরশু সন্ধ্যেবেলা পঞ্চুর মা কোথা থেকে একটা বিধবা মেয়েছেলে নিয়ে এসে বকবক করল, তার পর থেকেই সত্য যেন কেমন হয়ে গেছে। কথা নেই বার্তা নেই, ছেলেদের সঙ্গে হাসিখুশি নেই, যেন কোন্ জগতে বাস করছে।

কথাটা সত্যি—পরশু থেকে সত্য এক ধাঁধাঁর জগতে বাস করছে।

কাকে নিয়ে এল পঞ্চুর মা? শুধু দত্তবাড়ির পানসাজুনি? তাহলে কি জন্যেই বা এল সে?

সত্যকে দর্শন করার বাসনা এমন প্রবল হবার হেতু কি তার? তা—তাই যদি হয়, মন খুলে কথাই বা কইল কই? কেমন চেপে চেপে রেখে রেখে কথা, থেমে থেমে নিশ্বাস, ভেতরে যেন কত কি!

ওকে কি সত্য আগে কোথাও দেখেছে? সত্যর খুব একটা চেনা মানুষের মতন কি দেখতে ও? কিন্তু সে মানুষটার তো এমন পোড়ামূর্তি ছিল না! ওর নিয়তি কি শেষ অবধি আগুন হয়ে ওকে ঝলসা-পোড়া করে ছেড়েছে?

দুজনের মধ্যেই যেন উত্তাল ঢেউ, কিন্তু কেউই নিজে থেকে এগিয়ে এসে খপ্ করে হাত ধরে বলে উঠল না, "তুমি সেই না?"

পঞ্চুর মা খন খন করে বলে উঠেছিল, "কই গো বামুনদি, এত আগ্রহ করে এলে, অথচ বাক্যি-ওক্যি নেই কেন?"

সেই বামুনদি আস্তে বলেছিল, "কথা কইতে তো আসি নি, দেখতে এসেছি।"

গলার শব্দটা কি সত্যর শোনা নয় ?

যেন অনেক সাগরের ওপারে অনেক যুগের আগে সত্য এই স্বর শুনেছে। তবু বলতে পারা যায় নি, "আমার চোখকে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না গো, আমি বড় ধুরন্ধর মেয়ে।"

বাধা অনেক।

"হয় কি নয়, নয় কি হয়"-এর আলো-আঁধারির বাধা, সমাজ-সামাজিকের বাধা, অবস্থার তারতম্যের বাধা, সর্বোপরি পঞ্চুর মার উপস্থিতির বাধা। সেটাই হয়েছিল বোধ করি সব থেকে বড় বাধা। হঠাৎ একলা দুজনে মুখোমুখি দাঁড়ালে হয়তো অন্য বাধাগুলো মুহূর্তে খসে পড়ত, হয়তো দ্বিধামাত্র না করে ঝপ করে বলে ফেলা যেত, "শেষ অবধি তা হলে এই হাল হয়েছে ? বেশ ভাল ! সুখটা করলে ভাল !" আগে হলেও বলতো, অনেক যুগ আগে ছেলেমানুষ ছিল সত্য, এখন তো নেই।

তাই সে সব হল না। খানিক পরে পঞ্চুর মা হাই তুলে বলল, "চল তা হলে বামুনদি, তোমাকে দুয়োর অবধি এগিয়ে দিয়ে আমি ঘরে যাই। সারাটা দিন রপটানি গেছে, চোখে ভেঙে ঘুম আসছে।"

"চল।" বলে উঠে পড়েছিল সে। বলে নি, "আর একটু থাকি না !"

সত্য বলে নি, "আর একটু বসো না !"

সেই অবধি বিমনা হয়ে রয়েছে সত্য।

নবকুমার বলেছিল, "পঞ্চুর মার সঙ্গে ওই মাগীটা কে এসেছিল ? কোন—"

কথা শেষ করতে পারে নি, তীব্র স্বর থামিয়ে দিয়েছিল তাকে। "ছেলেপেলের সামনে অভব্যির মতন কথা কও কেন ?" বলেছিল সত্য। আর তদবধিই যেন সত্য চিন্তামগ্ন।

ছুটির সকালটা দু-দণ্ড রান্নাঘরের দোরে বসে গল্প করতে কত ভাল লাগে। মনমেজাজ ভাল থাকলে সত্য অপূর্ব ! সত্যি বলতে—মনমেজাজ ভাল না থাকলেও, কী যে এক আকর্ষণ ! নবকুমারকে যেন দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে। নেহাত অফিসের সময়টুকু ছাড়া বাড়ি থেকে বেরোতেই ইচ্ছে করে না। তুড়ু খোকার পড়াটড়াগুলোও একটু দেখতে হয়, কারণ মাস্টার মশাই আজকাল আর নিয়মিত আসেন না। কিন্তু ওই ছাই কর্তব্য কর্ম-টর্ম তেমন ভাল লাগে না, এক যা বাজার করাটা একটু ভাল লাগে। বাদে ইচ্ছে

হয় দুজনে মুখোমুখি বসে থাকি। তা হবার জো নেই। সত্যি, সংসার করাটা এত ভারী করে তোলার দরকারটাই বা কি? হাসলাম গল্প করলাম, খেলাম ঘুমোলাম, চুকে গেল, তা নয়—রাত দিন "দশের একজন" হবার সাধনা কর, ছেলেদের "মানুষের মতন মানুষ" করে তোলবার চেষ্টা কর, মান-মর্যেদা রইল কি গেল তাই ভেবে মাথা খারাপ কর, কেন রে বাবা? গাঁ-ভুঁই ছেড়ে বাসায় এসে তা হলে লাভটা কি হল? আমোদ-আহ্লাদে থাকা যাবে বলেই না আসা?

এই যে সেদিন শুনল আপিসের বন্ধু রামরতনবাবু তার পরিবারকে নিয়ে নাকি থিয়েটার দেখতে গেছল। "নিমাই সন্ন্যাস" পালা। রামরতনের পরিবার নাকি দেখতে দেখতে কেঁদে বুক ভাসিয়েছে, বাড়ি এসে তিনদিন ধরে কেঁদে মরেছে। নবকুমার সত্যকে ধরে পড়েছিল দেখতে যাবার জন্যে, গেল না!

বলল কিনা, "এখন মাসের শেষ—হাতের টানাটানি। থিয়েটার যেতে তে পয়সা লাগবে! তা ছাড়া তুড়ু-খোকাকে নিয়ে সমিস্তে। ওদের দেখবে কে রাত অবধি?"

ওদেরও নিয়ে যাবার কথা তো উড়িয়েই দিল। ছেলেদের ঘোড়দৌড়ের খেলা দেখাতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল নবকুমার, তাও বারণ!

কেন যে সত্য এ রকম!

এক যুগ ধরে মনকে এই প্রশ্নই করে চলেছে নবকুমার।

আজ কপালটাই অভাগ্যির।

নিতাইয়ের সঙ্গে দেখা হল না। কোথায় গেছে! তার মেসের এক ভদ্রলোক বললেন, "জানি না মশাই, মানুষের সঙ্গে তো মিশতেই চান না নিতাইবাবু! ভাবগতিকও তেমন ভাল ঠেকে না আমাদের। চোখে না দেখলে কারুর নামে অপবাদ দিতে নেই, ওঁর পাশের সীটের হারাণবাবু যা বলেছেন তাই বলছি—স্বভাবচরিত্র ভাল নেই নিতাইবাবুর।"

"অ্যাঁ! কী বললেন!"

প্রায় মাটিতেই বসে পড়ে নবকুমার।

এ কী সর্বনেশে সংবাদ!

ভদ্রলোক বললেন, "আপনার বিশেষ বন্ধু বুঝি? তবে তো আপনাকে কথাটা বলা আমার ভুল হয়েছে। তবে একরকম ভালও। দেখুন আপনি

যদি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সুপথে আনতে পারেন। অবিশ্যি ও-পথ থেকে ফেরানো বড় শক্ত কথা।"

মনের মধ্যে একটা দারুণ যন্ত্রণা নিয়ে ভবতোষ মাস্টারের কাছে যায় নবকুমার। বোধ করি এই প্রথম সে সত্যর নির্দেশ ব্যতীতই একটা কাজ করে ফেলে।

মাস্টার এইখানা বই সামনে রেখে উপুড় হয়ে পড়ে তা থেকে খাতায় কি সব লিখে নিচ্ছিলেন, নবকুমার কাছের গোড়ায় বসে পড়ে বিনা ভূমিকায় বলে ফেলে, "ভয়ানক একটা বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি মাস্টার মশাই।"

মাস্টার চমকে ওঠেন।

কী হল?

কারুর অসুখবিসুখ নয় তো?

সত্যবতী কেন গালতে পুড়ে যায় নি তো? উঠোনে আছাড় খেয়ে পড়ে যায় নি তো? চকিত হয়ে বলেন, "বসো বসো, আগে একটু স্থির হও। ব্যাপারটা কি?"

"ব্যাপারটা গুরুতর। নিতাইয়ের চরিত্রদোষ ঘটেছে।"

"কী ঘটেছে নিতাইয়ের?"

ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলে ফেলেই লজ্জা পায় নবকুমার। এবার মাথাটা চুলকে নীচু গলায় বলে, "আজ্ঞে, আজ গিয়েছিলাম নিতাইয়ের মেসে, তা দেখা হল না। একজন বলল, নিতাই কোথায় যায় কোথায় না যায় ঠিক নেই, আর—আর তার স্বভাবদোষ ঘটেছে।"

ভবতোষ মিনিটখানেক চুপ করে থেকে বলেন, "লোকটা নিতাইয়ের শত্রুটত্রু নয় তো?"

"আজ্ঞে না না। সেরকম কিছু না।"

"তবে তো সত্যিই বিপদ!" ভবতোষ নিজের মনে বিড়বিড় করে বলেন, "এই রকম একটা ভয়ই আমার ছিল।"

নবকুমার বলে, "আজ্ঞে কী বলছেন?"

"নাঃ। তোমায় কিছু বলি নি।"

"আপনি একবার তার সঙ্গে দেখা করে বোঝান মাস্টার মশাই।"

"বোঝাব ?"

ভবতোষ হাসে।

"এসব ক্ষেত্রে মাস্টারের বুঝ্ কোনো কাজে লাগে না নবকুমার !"

"কিন্তু একটা তো কিছু করতে হবে মাস্টার মশাই।"

চিরনিস্তেজ নবকুমারের এই ব্যাকুলতা মনকে স্পর্শ করে ভবতোষের। তিনি স্নেহার্দ্র গলায় বলেন, "আচ্ছা আমি চেষ্টা করব। তবে কি জান—"

"আজ্ঞে, কি বলছেন ?"

"বলছি—মানে বলছিলাম কি আমার বলার চাইতে অনেক বেশী কাজ হবে যদি বৌমা একবার—"

বৌমা !

নবকুমার বিমূঢ় নির্বোধ গলায় বলে, "কার কথা বলছেন ? ইয়ে তুড়ুর মা ?"

"হ্যাঁ তাই বলছি। উনি যদি একবার নিতাইকে দিব্যি-দিলেশা দিয়ে বলতে পারেন, হয়তো কাজ হতে পারে।"

নবকুমার তেমনি গলাতেই বলে, 'আপনি বললে কাজ হবে না, হবে ওর কথায় ?"

ভবতোষের মুখে রহস্যের জালে আবৃত সূক্ষ্ম একটু হাসির রেখা ফুটে ওঠে। ধীরে বলেন, "হলে ওঁর কথাতেই হবে। নচেৎ—"

"তবে তাই বলতে বলব।" বলে বিমূঢ় নবকুমার উঠে দাঁড়ায়। তবে মাস্টারের প্রস্তাবটা তার হৃদয়ঙ্গম হয় না। আর সত্যি বলতে কি ভালও খুব লাগে না। ভাল লাগে না নিতাইয়ের সামনে সত্যকে উপস্থাপিত করার কথাটা। যতই বন্ধু হোক নিতাই, তার যখন স্বভাব খারাপ হয়েছে, তখন বিশ্বাস কি ? কে জানে মদ-টদও ধরেছে কিনা। মাতাল চরিত্রহীন, এদের কাছ থেকে 'মেয়েছেলেদের' শতহস্ত দূরে থাকা উচিত।

নবকুমারের বাপ নীলাম্বর বাঁড়ুয্যে নামক ব্যক্তিটিও যে ওইসব অপরাধে অপরাধী, এবং চিরদিন তিনি সমাজের মাথার ওপর বাস ক' আসছেন, সেটা অবশ্য মনে পড়ে না নবকুমারের।

নিতাইয়ের এই অধঃপতনের খবরটা এবং ভবতোষ মাস্টারের ওই অনাসৃষ্টি প্রস্তাবটা কিভাবে সত্যর কাছে ফেলবে, আর সত্য সেটা কিভাবে নেবে ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফেরে।

বেলাও হয়ে গেছে ঢের। সত্য হাঁড়ি নিয়ে বসে আছে। দ্রুত এসে দরজাটায় ধাক্কা দিতে যায় নবকুমার, কিন্তু ধাক্কার আগেই, হাত ঠেকাতেই খুলে যায় কপাট দুটো। তার মানে আগল দেওয়া ছিল না।

কী কাণ্ড! ভরদুপুরে দোরটা খুলে রেখেছে! বলবে বলে ব্যস্ত হয়ে ঢুকেই দু পা পিছিয়ে আসে।

দাওয়ার খুঁটির কাছে সত্য একজনের হাত ধরে দাঁড়িয়ে।

পঁয়ত্রিশ

না, হাত ধরার অপরাধে জাত যাবে না, পুরুষ নয় মেয়েমানুষ। বিহ্বল-দৃষ্টি এক বিধবা। শীর্ণ দেহ, পোড়া রং। নবকুমারও বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে শুনতে পায়, সত্য তার নিজস্ব সবল ভঙ্গীতে বলছে, "হাতে যখন পেয়েছি, আর ছাড়ি? মেয়ে নিয়ে চলে এস তুমি আমার কাছে। আমার যদি দু-বেলা দুমুঠো জোটে, তোমারও একবেলা এক মুঠো জুটবে। আমার ছেলে দুটো যদি খেতে পরতে পায়, তোমার মেয়েটাও পাবে।"

শুনে গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায় নবকুমারের। এসব আবার কি কথা? কে এ? কোথায় এর মেয়ে? সত্যর সঙ্গে কী সম্পর্ক এর? আবার হঠাৎ সেই হিম হয়ে যাওয়া রক্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠল। পুরুষের রক্ত!

নবকুমারের সঙ্গে একবার পরামর্শ পর্যন্ত না করে দু-দুটো মানুষকে খেতে পরতে দেবার ভরসা দিয়ে বাড়িতে জায়গা দিতে চাইছে সত্য! এতই বা সাহস কেন মেয়েমানুষের? নবকুমার কিছু বলে না বলে বড্ড বাড় বেড়ে গেছে!

নবকুমারের চিরদিনের প্রাণের বন্ধু নিতাই, বিনি অপরাধে তাকে বাড়ি থেকে সরিয়ে দেওয়া হল! যার জন্যে মনের দুঃখে, ঘেন্নায়, অভিমানে স্বভাবটাই খারাপ করে ফেলল ছেলেটা। নবকুমারের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকলে, কখনই এসব ঘটত না। মেসে কত রকম কুসঙ্গ!

নবকুমারের চোখে জল এসে গেল। তার পর ভাবল, এখন কি না কে কোথাকার একটা মাগী, নবকুমার যাকে সাতজন্মেও চোখে দেখে নি, তাকে বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করবার ষড়যন্ত্র আঁটা হচ্ছে।

চালাকি!

চলবে না, এসব চলবে না। নবকুমার সাফ জবাব দিয়ে দেবে—নবকুমারের বাড়িতে এসব চালাকি চলবে না।

নির্ঘাত সত্যর বাপের বাড়ির দেশের লোক। তাই এত ভালবাসা! সত্যি বলতে একটা ঈর্ষাও অনুভব করে নবকুমার। নবকুমারের সম্পূর্ণ অপরিচিত জগতের কাউকে যে সত্য মনে জায়গা দেবে, এ অসহ্য!. হোক না সে মেয়েমানুষ, তবুও।

মনের কথা যে মন ছাড়া আর কেউ জানতে পারে না, এই বাঁচোয়াতেই পৃথিবী টিঁকে আছে। নইলে পৃথিবী তার সমাজ সভ্যতা শিক্ষা সংস্কৃতি সব কিছুর বড়াই নিয়ে কোন্‌কালে রসাতলের অতল তলায় তলিয়ে যেত।

মনের কথা অন্যে টের পায় না।

নিতান্ত মনের মানুষটিও না।

এই আনন্দেই যথেচ্ছ নেচে বেড়াচ্ছে মানুষ, যত পারে বড় বড় কথা বলছে। আর স্নেহ প্রেম ভালবাসার মহিমা দেখাচ্ছে। তা এ রহস্যটা মানুষ নিজেও খেয়াল করে না, এই যা মজা!

নবকুমারও খেয়াল করে না, বিধাতার কাছে এ কত বড় পাওনা পেয়ে বসে আছে সে। মনে মনে তাই শুধু সত্যকেই বাক্যবাণে বিদ্ধ করে না, বিধাতাপুরুষকেও করে। করে, বিধাতা নবকুমারকে পুরুষ আর সত্যকে মেয়ে করেছেন বলে। সহ্য হচ্ছে না। এই হাত ধরা দৃশ্য আর সহ্য হচ্ছে না।

গলা ঝাড়ার শব্দ করল নবকুমার।

এতক্ষণ সত্য নিজের ঝোঁকে ছিল, খেয়াল করে নি, আর আর একজন তো দরজার দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে। গলার শব্দে উভয়েই সচকিত হল। বিধবাটি একটু সরে গেল।

আর সত্য ধরা হাতটা ছেড়ে দিয়ে, হাত তুলে মাথার কাপড়টা টানল।

বুদ্ধিমতী সত্য অবশ্য তক্ষুনি হৈ-হৈ করে আবির্ভূতা মহিলার পরিচয় দিতে এল না স্বামীর কাছে। তা ছাড়া লজ্জা-শরম বলেও কথা আছে। গুরুজনের সামনে বরের সঙ্গে কথা বলা চলে না। তাই মাথার কাপড়টা টেনে গলা নামিয়ে আস্তে বলল, "চল বৌ, ও-ঘরে গিয়ে বসবে চল।"

নবকুমার ভেবেছিল যা বলবে গলা চড়িয়ে বলবে, যাতে ওই মেয়েমানুষটার কানে পৌঁছয়। যাতে সে বুঝতে পারে বাড়ির প্রকৃত কর্তা কে! আর এও বুঝতে পারে বৃথা আশায় প্রলুব্ধ হয়ে কোনও লাভ নেই তার। সত্য ছেলেমানুষ, না বুঝেসুঝে কি না বলেছে, সেটা ধোপে টিকল না। এই সবই আশা করেছিল নবকুমার।

কিন্তু গলা চড়ল না।

শুধু চড়ল না নয়, প্রায় বাক্‌স্ফূর্তিই হল না। একটা গম্‌গমে রাগ-রাগ ভাব নিয়ে চান করে এসে খেতে বসল।

ভাতের থালা ধরে দিয়ে সত্য প্রশ্ন করে, "এত বেলা অবধি গিয়েছিলে কোথায়?"

নবকুমার পাতের ওপর হুস্ করে সমস্ত ডালটা একসঙ্গে ঢেলে ফেলে ভাত মাখতে মাখতে গম্ভীর গলায় বলল, "যেখানেই যাই না, তোমার কাছে তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি?"

"শোন কথা! কী কথার কী উত্তুর! কৈফিয়ৎ দিতে হবে, এ কথা কে বলেছে? নাইতে খেতে বেলা গড়িয়ে গেল, তাই শুধোচ্ছি।"

"না, শুধোতে হবে না।" তেমনি গলাতে চালিয়ে যায় নবকুমার, "শুধোবার কোনও এক্তিয়ার নেই তোমার। কি জন্যে শুধোবে? তুমি আমায় মেনে চল? তাই আমি তোমায় মেনে চলব?"

সত্য অবাক হয়ে বলে, "রোদের তাতে হঠাৎ মাথাটা গরম হয়ে গেল না কি? কী বকছ আবোল-তাবোল?"

"আবোল-তাবোল! আবোল-তাবোল বকছি আমি? আর নিজে যখন বলা নেই কওয়া নেই—"

গলা চড়াবার ব্যর্থ চেষ্টায় "বিষম" খায় নবকুমার।

অগত্যাই তখন সত্যর চিকিৎসাধীন হতে হয়, সত্যর বীরপুরুষ স্বামীকে। জল-বাতাস মাথায় ফু! ধাতস্থ হতে সময় লাগে।

আর ধাতস্থ হওয়া মাত্রই সত্য নিম্নস্বরে বলে, "সংসারে আর দুজন মানুষ বাড়ল, একটু জানিয়ে রাখছি তোমায়। নইলে যেমন মতিবুদ্ধি তোমার, হঠাৎ হৈ-চৈ লাগাবে—কে এরা? কোথা থেকে এল? কেন এল?"

নবকুমার বলতে পারত, "তা সে কথা তো জিজ্ঞেস করবই আমি।

সত্যিই তো—কে এরা? কোথা থেকে এল? কেন এল? আর আমিই বা খামোকা ছুটো মানুষকে সংসারে জায়গা দিতে যাব কিসের জন্যে?"

বলতে পারল না।

সেই বিষম খাওয়া ধরা গলায় যা বলল, সেটা হচ্ছে এই, "তা আমাকে জানাবার কি আছে? তুমি যা ভাল বুঝবে—"

কার গলা?

নবকুমারের?

নবকুমার এ কথা বলল কেন?

এতক্ষণ ধরে এই কথাটা বলবার জন্যেই কি "মহলা" দিচ্ছিল নবকুমার মনে মনে?

সেই সেদিন পঞ্চুর মার সঙ্গে একবারের জন্যে দেখা করে গিয়ে পর্যন্ত দত্তবাড়ির "পানসাজুনির" প্রাণটা যে কেন দেয়ালে মাথা কুটতে চাইছিল, তা ভগবানই জানেন। আর তার সাক্ষীও শুধু তিনিই।

তাই আবার যখন এদিন সে দিনদুপুরে পঞ্চুর মাকে ধরে বসল, "চুপি চুপি আর একবার আমায় নিয়ে যাবি?" তখন পঞ্চুর মা হাঁ হয়ে গেল।

বলল, "হ্যাঁ গা, সেদিন তো কথাই কইলে না। আবার আজ যাবে বলছ মানে?"

"কি জানি পঞ্চুর মা, মনটা কেমন টানছে। আমার একটা ছোট বোন ছিল, অনেকটা তেমনি দেখতে—"

পঞ্চুর মা বোধ করি একটা ওবু মানে পেয়ে আশ্বস্ত হয়। তবে এ প্রশ্ন তোলে—দিনদুপুরে চুপি-চুপিটা সম্ভব কি করে?

সে বুদ্ধি পানসাজুনিই দিয়েছে। কালীতলায় যাবার নাম করে বেরিয়ে পড়া। ঠনঠনের মা কালী জাগ্রত কালী, তাঁর কাছে সময় অসময় যায়ও সবাই!…দূরও বেশী নয়, এই তো একটু গেলেই।

দেবীদর্শনেই এসেছিল পানসাজুনি বামুনদিদি। আর সে দর্শন তার মিলেছিল।

তারপর তো সেই নবকুমারের প্রবেশ!

শঙ্করী বলে, "ঠাকুরঝি বলে ডাকবার মুখ নেই ভাই, তবু বলতে বড়

সাধ যাচ্ছে তাই বলছি, মিথ্যে ছেলেমানুষি করো না ভাই সত্য-ঠাকুরঝি, তুমি যা বলছ তা হবার নয়।"

"হবার নয়?"

সত্য জোরালো গলায় বলে, "কিন্তু কেন হবার নয়, সেই কথাটাই আমায় বোঝাও কাটোয়ার বৌ! ভুল-ভ্রান্তি মানুষেই করে, তা বলে কস্মিন্‌কালে আর সে ভুল শোধরাতে পাবে না সে?"

"শোধরাব বললেই হল? সমাজ সে আবদার শুনবে?" শঙ্করী নিশ্বাস ফেলে বলে, "মেয়েমানুষ যে মাটির পাত্তর ঠাকুরঝি, ও তো ছুঁৎ গেলেই গেল।"

"মেয়েমানুষ যে মাটির পাত্তর, এ কথা বুঝি বিধাতাপুরুষ তার গায়ে দেগে দিয়ে ধরাভূমিতে পাঠিয়েছিল?" সত্য তীক্ষ্ণ স্বরে বলে, "আর বেটাছেলেকে সোনার বাসন বলে ছাপ মেরে পাঠিয়েছিল? তাই তাদের বেলা যা করুক তাই বাহবা? হ্যাঁ, অন্যাই তুমি করেছিলে সত্যি, খুবই করেছিলে। তুমি বয়সে বড়, গুরুজন সম্পক্ক, বলাটা আমার শোভা পায় না, তবু না বলেও পারছি না, যা করেছিলে তা মহাপাতক। তখন জ্ঞান-বুদ্ধি ছিল না, পুরো বুঝতে পারি নি কিসের জন্যে কি। কিন্তু পরে তো বুঝেছি! বুঝে মিথ্যে বলব না, মনে মনে তোমায় নোড়া দিয়ে ছেঁচেছি আমি। শুধু মহাপাতক বলেই নয়, বাবার মতন মান্যিমান মানুষের উঁচু মাথাটা যে তুমি হেঁট করে দিয়েছিলে, সেই ঘেন্নার জ্বালায় তোমায় শতেক ধিক দিয়েছি। তবে এও তো সত্যি, অতি পাতকেরও প্রাচিত্তির আছে। যেমন মহাপাতক করেছ তুমি, তার মহা প্রাচিত্তিরই করেছ। তুষানলে জ্বলে জ্বলে খাক হয়েছ।"

"সত্য ঠাকুরঝি!"

শঙ্করী আবেগ-কম্পিত স্বরে বলে, "মান্যে ছোটর কথা বলি না, তবে তুমি আমার চেয়ে বয়সে আদ্দেক, তাই পায়ের ধুলো নিলাম না তোমার। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, রাতদিন যে আমি তুষানলে জ্বলছি, এ তুমি কেমন করে টের পেলে?"

"শোন কথা! এর আবার টের পাবার কি আছে? প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি না? দিষ্টিহীন তো নই? তুষানলে যে জ্বলছ, সে সাক্ষী দিচ্ছে তোমার ওই পোড়াকাঠ দেহ। কী সোনার বর্ণ রং ছিল, কী মোমেগড়া দেহ ছিল তোমার, সেটা তো আর ভুলি নি! তা যাক, রূপ গেছে বালাই গেছে,

থাকলে আর কী ধুয়ে জল খেতে? ওই রূপই 'কাল হয়ে দংশন করেছে তোমায়। গেছে যাক, কিন্তু শরীর স্বাস্থ্যটা তো দেখতে হবে? গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে এহকালের বালাইটা ঘোচাও নি যখন?"

শঙ্করী কাতর কণ্ঠে বলে, "সে ইচ্ছে কি আর হয় নি ঠাকুরঝি? রাতদিন সে ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু পারি নি। ওই পেটের জঞ্জালটাই পায়ের বেড়ি হয়েছে। আমিই মহাপাতকী, ওর আর অপরাধ কি! ত্রিজগতে কেউ নেই ওর, মরে ওকে কোথায় ভাসিয়ে দিয়ে যাব?"

সত্য ঝঙ্কার দিয়ে বলে, "যাক সে সুমতিটুকু যে হয়েছিল, তাও মঙ্গল! একে তো এই পাতকের বোঝা, তার ওপর আবার আত্মঘাতী মরণের পাপ! নরকেও ঠাঁই হত না। যাক গে মরুক গে। গতস্য শোচনা নাস্তি। এখন সোজা কথা হচ্ছে—এতাবৎ যা করেছ করেছ, এখন আমার চোখে যখন ধরা পড়েছে, আর তোমার শুদ্দুরের দাস্যবিত্তি করা চলবে না।"

শঙ্করী বিষণ্ণ হাসি হেসে বলে, "বয়েস হয়েছে, ছেলেপুলের মা হয়েছ, তবু স্বভাবটি তোমার দেখছি ঠিক তেমনি ডাকাবুকো আছে সত্য-ঠাকুরঝি! কিন্তু জগৎকে চিনতেও বাকী আছে। আমায় ঘরে ঠাঁই দিলে, তোমাকে কি আর কেউ ঘরে ঠাঁই দেবে?"

হঠাৎ সত্যর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। একটু মুখ টিপে হাসে সে। তার পর বলে, "কে ঘরে ঠাঁই দেবে না? তোমার ননদাই?"

"বালাই ষাট! তা বলছি না। তিনি তোমায় চিরকাল রাজরাণী মাথার মণি করে রাখুন। এই সমাজের কথা বলছি। জানাজানি হয়ে গেলে—"

"জানাজানি হয়ে যাবার আবার কি আছে কাটোয়ার বৌ। আমি কি লুকোছাপি করব? আমি তো ঠিক করছি আজই বাবাকে পত্তর দেব, বাবা এই কাজ করেছি আমি, এখন আমায় মারতে হয় মার, কাটতে হয় কাট, আর রাখতে হয় রাখ।"

"বাবা" শব্দটা শুনেই শঙ্করী সহসা দু হাত জোড় করে কপালে ঠেকায়।

সেই "বাবা" নামক মানুষটার উদ্দেশে কি? না ভগবানের উদ্দেশে?

বোধ করি ভগবানের উদ্দেশে।

সাহস করে সেই বাড়ি, সেই মানুষগুলো, সর্বোপরি সেই দৃপ্তমূর্তি দেবোপম ব্যক্তিটি সম্পর্কে কোনও প্রশ্নই করতে সাহস হচ্ছিল না শঙ্করীর। ভয়, লজ্জা,

অপরাধের সঙ্কোচ, এসব তো আছেই, তার ওপর এক আশঙ্কার আতঙ্ক। যদি প্রশ্ন করতে গিয়ে শোনে মানুষটা নেই? সে বড় ভয়ঙ্কর।

কিন্তু সত্য বলছে "বাবাকে পত্তর লিখব"। তাই কপালে হাত ঠেকিয়েছে শঙ্করী।

আতঙ্কটা যাবার সঙ্গে সঙ্গে ভয় লজ্জা সঙ্কোচ সবাই যেন একটু সরে দাঁড়ায়। যেন শঙ্করীর অবস্থা দেখে দয়া হয়েছে ওদের।

তাই শঙ্করী ঈষৎ ইতস্ততঃ করে বলেই ফেলে, "মামাঠাকুরের শরীরগতিক মঙ্গল?"

শরীরগতিক!

সত্য নিশ্বাস ফেলে বলে, "খুব ভাল নয়, তবে মানুষটাকে তো জান? ভাঙব তবু মচকাব না। নইলে মা মারা যাওয়ার পর থেকে ভেতরে ভেতরে দেহ ভেঙে গেছে। কলকেতায় আসার আগে দেখা করে এলাম তো।"

মা মারা যাওয়া!

শঙ্করী ভাবে, এ 'মা' রামকালীরই মা, দীনতারিণী! ভাবে, তা তিনি মরবেন এটা তো আশ্চয্যিও নয়, দুঃখেরও নয়, তবে নাকি রামকালী হৃদয়বান পুরুষ, মাতৃশোককে মর্যাদা দিয়েছেন। তবু বলে—"তিনি জ্ঞানবান মানুষ, তিনি এত কাতর হয়েছেন? তা বড়দিদিমা মারা গেছেন কতদিন হল?"

"বড়দিদিমা!"

সত্য ভুরু কুঁচকে বলে, "ঠাকুমার কথা শুধোচ্ছ? ঠাকুমা মারা গেছেন এই ক'বছর যেন হল! আমি আমার মার কথা বলছি। মা তো চলে গেছেন—"

সত্য চুপ করে যায়।

গলার কম্পন কেউ ধরে ফেলবে, এতে সত্যর বড় লজ্জা।

শঙ্করী স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, "মেজমামীমা মারা গেছেন?"

সত্য নীরব।

সত্য নতদৃষ্টি।

অনেকক্ষণ পরে শঙ্করী একটা পরিতাপের নিশ্বাস ফেলে বলে, "কতদিন হল?"

"এই আমার বড় খোকা তখন আঁতুড়ে।"

আস্তে আস্তে উদ্বেলিত নিশ্বাস শান্ত হয়ে যায়। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে কখন

যে নিশ্বাস ফেলার ধাপ থেকে গল্প করার অবস্থায় এসে পৌঁছে গেছে ওরা, তা ওদের নিজেদেরই খেয়াল থাকে না।

অতীত স্মৃতির রোমন্থনে সময়ের জ্ঞান হারায় বুঝি।

শঙ্করী প্রশ্নকর্ত্রী।

সত্য উত্তরদাত্রী।

শঙ্করী যেন গভীর সমুদ্র হাতড়ে হাতড়ে কী এক হারানো মানিক খুঁজতে চাইছে, আর সত্য যেন শঙ্করীর সেই প্রশ্নের হাতড়ানির মধ্য দিয়ে ফিরে পাচ্ছে তার হারানো শৈশবকে।

নিত্যানন্দপুরের শ্যামকালী কবরেজের অন্তঃপুরটা না একদা সশস্ত্র-প্রহরী-বেষ্টিত অন্ধকার কারাগারের মত লাগত শঙ্করীর?

তবে আজ সেই অন্তঃপুরটা আলোকোজ্জ্বল স্বর্গের মত মনে হচ্ছে কেন তার?

সেই স্বর্গকে স্বেচ্ছায় হারিয়েছে শঙ্করী! ভাঙা মাটির বাসনের মত হেলায় পথের ধুলোয় আছড়ে ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছে শয়তানের ছলনার স্বর্গে?

অনেক কথা অনেক নিশ্বাস।

ভারী হয়ে উঠেছে বাতাস।

তবু আবার একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে বলে সত্য, "আজ তুমি ওই দত্ত-বাড়ির পানসাজুনিগিরি করছ কাটোয়ার বৌ! কিন্তু এর থেকে হাজার গুণ মর্যাদা ছিল, যদি তুমি কবরেজবাড়ির উঠোনটা ঝেঁটিয়েও খেতে।"

"মতিচ্ছন্ন! পূর্বজন্মের মহাপাতক! আর কিছু বলার নেই আমার।"

"যাই হোক, তুমি আর দ্বিধা করো না বৌ, মেয়ে নিয়ে একবস্ত্রে চলে এস! পেটের ভেতরের অন্ন তো আর এক কথায় ধুয়ে মুছে সাফ হবে না, তবে পরনের ওই সব পতিত বস্ত্র পরিত্যাগ দিতে হবে। ও ত্যাগ না দিলে গলদ আর দূর হতে চাইবে না! সে যাক, মেয়ে কত বড়টা হল?"

"কত বড়? মানে বয়সের কথা বলছ?"

শঙ্করীর চোখের ছায়ায় যেন একটা ধূসর শূন্যতা। সে শূন্যতার স্পর্শ তার কণ্ঠে এসে লাগে।

"বয়েস? তোমার কাছে আর লুকোছাপা করব না ঠাকুরঝি, পষ্টই বলছি—বয়েস চোদ্দ উতরে গেছে এই মাঘে।"

"মাঘে! তা হলে তো পনেরই। পনের চলছে।" সত্য বিমূঢ়ভাবে বলে, "বিয়ে?"

"বিয়ে!" শঙ্করী ক্ষুব্ধ ব্যঙ্গমিশ্রিত একটু হাসে। এ ব্যঙ্গ ভাগ্যকে। এ ক্ষোভ সত্যর প্রশ্নতে।

সত্য একটু চুপ করে থেকে বলে, "তা যাদের সংসারে আছ, তারা কিছু বলে না? তাদের কি জবাব দাও?"

শঙ্করী তেমনি একটু হেসে বলে, "সে জবাব আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম। বলেছি পাঁচ বছরে বিয়ে, সাত বছরে বিধবা, শ্বশুরবাড়ি চক্ষে দেখে নি—"

সত্য ইতিমধ্যে শিউরে উঠেছে।

"বল কি বৌ, কী সব্বনেশে মা তুমি! আইবুড়ো মেয়েটাকে 'বিধবা' বলে পরিচয় দিয়েছ? সমগ্র পৃথিবীতে এমন কথা কেউ কখনো শুনেছে? বলি, এই কাণ্ডটি যে করে রেখেছ, আজন্ম তো তাকে আলোচাল কাঁচকলা গিলতে হচ্ছে?"

"তা হচ্ছে বৈ কি। আমারও যা তারও তাই! তার বেশী জুটছেই বা কোথা থেকে ঠাকুরঝি?"

সত্য পরিতপ্ত স্বরে বলে, "তা যেন হল। কিন্তু এর পর ওর বিয়ে দেবে কি করে?"

শঙ্করী নিশ্বাস ফেলে বলে, "সে পরিচয় না দিলেই কি বিয়ে দিতে পারতাম ঠাকুরঝি? বাপ-ঠাকুদ্দার পরিচয়হীন মেয়েকে কে বৌ বলে ঘরে তুলবে?"

সত্য ভুরু কুঁচকে বসে থাকে কিছুক্ষণ, তার পর বলে, "তা সেই নগেন না কে, তার সঙ্গে তো বিয়ে তোমার হয়েছিল বললে—"

"ফাঁকি ফাঁকি, সব ফাঁকি বুঝলে ঠাকুরঝি, সেই নরকের কীট পাপিষ্ঠ শয়তান ফাঁকি দিয়ে আমাকে—", রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করে বলে শঙ্করী, "কী বলব ঠাকুরঝি, ওই ভোগায় না পড়লে কি এ দুর্মতি হত আমার? বলল, কলকাতায় এখন বিধবা বিয়ের চল হয়েছে। কত অল্পবইসী বিধবা দিব্যি আবার সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর করছে। সেই ভোগায় ভুলে পাতালের সিঁড়িতে পা ফেললাম।"

সত্য বিরসমুখে বলে, "তা হলে বিয়ে করে নি?"

"না, সে মিথ্যে বলব না, করেছিল। বিধবা বিয়ে দিতে রাজী হয় এমন পুরুত ডেকে অগ্নি নারায়ণ সাক্ষী করে ঠাট একটা দেখিয়েছিল। কিন্তু সেই বিয়েকে যদি সে মনে প্রাণে সত্যি বলে মানত, তা হলে কি পেটে সন্তান এসেছে শুনেই আমাকে ছেঁড়া কাপড়ের মতন ফেলে চলে যেত?"

"তা যাক।" সত্য একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে. "তার চরিত্তিরের উপযুক্ত কাজই সে করেছে। কিন্তু তুমি তো একপ্রকার ধর্মে খাঁটি আছ! আর তোমার মেয়েকেও অধর্মের সন্তান বলা চলে না। বিধবার বিয়ে আমার চোখে অবিশ্যি ভাল ঠেকে না, তবে মন্দের ভাল। বড় বড় পণ্ডিতরা যখন শাস্তর পড়ে বুঝেসুঝে বিধান দিয়ে রেখেছেন, তখন একেবারে তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না! তাঁদের চেয়ে আমি পণ্ডিত নই। তবু বলব কাটোয়ার বৌ, মেয়ের এই মিথ্যে বিধবা পরিচয়টা তোমার দেওয়া উচিত হয় নি। তার কাছেও তো একটা জবাব আছে? সে যখন বড় হবে, পাঁচজনের বিয়েথাওয়া গয়নাকাগড় ঘরবর দেখবে, তখন তার প্রাণের ভেতরটি কেমন করবে? তখন তোমায় একদিন শুধোবে না, 'মা, মা হয়ে তুমি আমার এই করলে'—"

শঙ্করী কথার মাঝখানেই উদাস গভীর স্বরে বলে, "সে জিজ্ঞেসের গোড়াও মেরে রেখেছি ঠাকুরঝি! তাকেও ওই কথাই বুঝিয়ে রেখেছি। বলেছি পাঁচ বছর বয়েসের ঘটনা, তোর স্মরণে নেই।"

"বৌ!"

আবেগ-কম্পিত স্বরে শুধু এই একাক্ষর শব্দটুকু উচ্চারণ করে সত্য।

শঙ্করী সত্যর সেই ক্ষুব্ধ বিস্মিত আহত মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, "তা তুমি আমায় শতেক ঝাঁটা মারতে পার ঠাকুরঝি, কিন্তু এ ছাড়া আর কোনও উপায় আমি দেখতে পাই নি। বলতে পার আমি মা নই রাক্ষুসী, কিন্তু তবু তো সেই দুর্দিনে গর্ভসুদ্ধ গঙ্গায় ডুবে মরতে পারি নি? আর ওর জন্যেই দোর দোর ঘুরেছি, হাজার লাথি-ঝাঁটা খেয়েছি, মান-অপমান জলাঞ্জলি দিয়েছি। আর আজ সোনার বেনের দাসত্ব করে ভাত খাচ্ছি। কিন্তু বাড়ি ভাল নয়। লোকে বলে অন্নদাতার নিন্দে করতে নেই, তবু না বলে উপায় নেই, সোমত্ত মেয়ে নিয়ে ও-বাড়িতে থাকা কাঁটা হয়ে থাকা। শুধু মেয়েটাকে যদি তুমি—" চুপ করে যায় শঙ্করী।

অনেকক্ষণ নীরবতার পর সত্য আস্তে বলে, "নাম কি রেখেছ?"

"নাম!" শঙ্করীর কণ্ঠে যেন অপরাধের সুর বাজে, "দু-মাস বয়েস থেকে হাসিটা লক্ষীছাড়ীর এত মন-কাড়া ছিল যে নাম রেখে বসেছিলাম সুহাসিনী।"

তা অপরাধের সুর আসাই স্বাভাবিক, ওই হতভাগ্য মেয়েটার নাম 'মলিনা' কি 'অশ্রুমতী', নিদেন পক্ষে 'ছায়া' কি 'দাসী' এমনি একটা কিছু হলেই যেন শোভা পেত।

কিন্তু সত্য সে খোঁটা দিল না। সত্য বলল, "তা মন্দ নয়। সে যাক, বাড়ি যখন অমন বলছ, আর তো থাকা ঠিক নয়। মেয়ে নিয়ে অবিলম্বে চলে এস।"

"হ্যাঁ, বাড়ি ওদের অমনি!" নবকুমারের কাছে বসে সত্য চাপা তীব্র স্বরে বলে, "ভদ্দরঘরের মেয়ের এসব কথা মুখে আনলেও পাপ, তবে অবস্থাটা তোমায় পষ্ট করে খুলে না বললেও তো বুঝবে না তুমি। ওই রূপের ডালি মেয়ে নিয়ে কী কাঁটা হয়ে থাকে বৌ, বুঝে দেখ। বলে, নীচের তলায় রান্নাবাড়ির কাছে একখানা ছোট্ট ঘর আছে, তাতে নাকি কাঠ-ঘুঁটে থাকত, সেই ঘর পরিষ্কার করে মায়ে-ঝিয়ে আছে। কেন? না পাছে কারুর চোখে পড়ে যায়। দিনান্তে একবার নাইতে খেতে ঘর থেকে বেরোতে দেয় মেয়েকে, তাও নিজের কড়া পাহারায়। আইবুড়ো মেয়েটাকে 'বিধবা' পরিচয় দিয়ে রেখে দিয়েছে। ভাব কষ্ট!"

নবকুমার কিন্তু খুব বেশী বিচলিত হয় না, বরং নিতান্ত ব্যাজার মুখে বলে, "তা সে যার কথা সে বুঝবে। তোমার এত আগ-বাড়াবার দরকার কি? শুধু গরীব দুঃখী অবীরে বিধবা ভাজ হত, তার মানে ছিল। এসব কি? না না, এসব কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি আমার বাড়িতে ঢোকানো চলবে না। বাসাতেই নয় এসেছি, তা বলে তো বেওয়ারিশ নই আমি! মা শুনলে আর আমার মুখ দেখবে, না তোমার হাতে জল খাবে?"

সত্য স্থির কণ্ঠে বলে, "বলার আমার অনেক কথা ছিল। কিন্তু বলব না সে সব। শুধু বলছি—আমি যদি তাঁদের মত করাতে পারি?"

"হ্যাঁ! মত করাতে পার!" নবকুমার বলে ওঠে, "এ তোমার কাছা-আলগা নবকুমার বাঁড়ুয্যে কিনা, যে তোমার কথায় উঠবে বসবে! সে বড় শক্ত ঘাঁটি।"

সত্য ভ্রূভঙ্গী করে বলে, "নিজের মুখে নিজের ব্যাখ্যানটা আর নাই করলে। বেশ, ওনাদের মতটা পেলেই তো হল ?"

"তা তোমাকে বিশ্বাস নেই। তুমি যা ডাকাত, হয়তো শ্বশুর-শাশুড়ীর গলায় গামছা মোড়া দিয়ে মত আদায় করবে। কিন্তু এত ঝামেলার দরকার কি শুনি ? আমি বলে দিচ্ছি—আমার সংসারে ওসব চলবে না—"

সত্য সহসা ভ্রূভঙ্গী ত্যাগ করে উদাস মুখে বলে, "বেশ তাই ভাল। সেই কথাই বলে দেব ভাজকে। বলব, না বৌ, এ সংসারে তোমার ঠাঁই হবে না, ভুল করে ভেবেছিলাম, সংসারটা বুঝি আমার, তা মস্ত একটা হাতুড়ির ঘায়ে ভুলটা ভেঙেছে। চোখ ফুটে গেছে। ভালই হল, শিক্ষা হয়ে গেল।"

নবকুমার বসে পড়ে।

নবকুমার চোখে সর্ষেফুল দেখে।

নবকুমার সমস্ত বীরত্ব ত্যাগ করে ওর সেই চিরমুখস্থ কথাটা বলে বসে, "হল তো! অমনি রাগ হয়ে গেল ? রাগের কথা কিছু বলি নি আমি। শুধু বলছি সুখে থাকতে ভূতের কীল খাওয়া কেন ?"

সত্যর মুখের কাঠিন্য কিছুটা হ্রাস হয়।

সত্য স্থির স্বরে বলে, "আর একদিন তোমার এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলাম, আজ আবার দিচ্ছি, কীল খাওয়া কেন জান ? মানুষ জাতটা 'মানুষ' বলে। গরু-গাধা পাখী-পক্ষী নয় বলে।"

"আর ওই যে আবার একটা মেয়ে রয়েছে—"

"রয়েছে সে কথা তো হয়েই গেছে।"

"সেও মায়ের মত হবে কি না—"

"যাতে না হয়, সেই চেষ্টাই করতে হবে।"

সত্য উঠে যায় দৃঢ় সংকল্পের মুখ নিয়ে।

সুহাসিনী!

ডাকনাম সুহাস।

হ্যাঁ, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রূপের ডালিই হচ্ছে। শঙ্করীর বাস্তুহারা কৈশোর মূর্তি যেন ওর মধ্যে এসে পুনর্বাসন করেছে। এত দুঃখ-ধান্ধা, এত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, মায়ের এত কড়া শাসন, তবু কলায় কলায় ভরে উঠছে দেহ। পনের কলা ভর ভর, আর একটা কলা হলেই সম্পূর্ণ।

মেয়ের মুখ দেখে শঙ্করীর বুক ভরে ওঠে। মেয়ের রূপ দেখে শঙ্করীর বুক কেঁপে ওঠে। তাই কখনো মেয়েকে কোলে নিয়ে কাঁদে, কখনো মেয়েকে দাঁতে পেষে।

মেয়েকে দাঁতে পেষা তো নয়, নিজেকেই জাঁতায় পেষা। কিন্তু করবে কি শঙ্করী, তার যে বেড়া আগুন!

যেদিন সত্য হাত ধরে বসল—সে রাত্রে মেয়েকে যাচ্ছেতাই করল শঙ্করী। বলল, "তবে আন খানিক বিষ আন, তুইও খা, আমিও খাই। সকল জ্বালা জুড়োক। সকল সমস্যা মিটুক।"

কথাটা এই, মার মারফত সত্যর প্রস্তাব শুনে, সুহাস একেবারে বেঁকে বসেছে। ওসব অনাসৃষ্টির মধ্যে যেতে রাজী নয় সে। অনেক হাঁড়ির হালের শেষে, অনেক ঘাটের জল পার করে এতদিনে যদি পায়ের তলায় একটু মাটি মিলেছে, যার তুল্য নেই রাজবাড়িতে আশ্রয় জুটে গেছে, এখন আবার অনিশ্চিতের সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে যাবার কী দরকার?

আপনার লোক!

তিনকুলে কেউ ছিল না, একমুঠো পোড়ামুড়ি নিয়ে কেউ এগিয়ে আসে নি, এখন হঠাৎ ভুঁই ফুঁড়ে আপনার লোক গজাল। হতে পারে কোন একসময় দেশের লোক ছিল, কিন্তু তাতে কি চারখানা হাত-পা বেরোচ্ছে? হঠাৎ তাঁর এত দরদ উথলে ওঠবার কারণটাই বা কি? আর কিছুই নয়, বিনি মাইনের দাসীরাঁধুনী পেয়ে যাবার আশ্বাস। ভেবেছে দুটো দরদের কথা কয়ে একবার বাড়িতে পুরে ফেলতে পারলে হয়।......শঙ্করী যেমন বোকা তাই বুঝতে পারে না, এর পর একুল-ওকুল দুকুল যাবে।

হ্যাঁ, প্রথমটায় এত কথাই বলেছিল সুহাস। এত কথাই বলতে পারে সে। অবিশ্যি আর কারুকে নয় শুধু মাকেই। মায়ের ওপর দাপটের অবধি নেই। জন্মাবধি যত দুঃখ-কষ্ট অভাব-অসুবিধে পেয়েছে চিরদিন তার ঝাল ঝেড়েছে মায়ের ওপর।

তবু তো সম্পূর্ণ ইতিহাস জানে না। সত্য ইতিহাস জানে না। জানে—গর্ভে নিয়ে বিধবা বলে, সে সন্তানকে 'অপয়া' বলে দূর দূর করেছিল বাড়ির লোক, তাই শঙ্করী দুঃখে অভিমানে মেয়ে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছিল।

সেইটাই অভিযোগ সুহাসের।

মার অবিমৃষ্যকারিতাতেই যে তাদের এই হাঁড়ির হাল সে বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি।

যাক, সে যাহোক হয়ে গেছে।

এখন আবার এ কী!

মায়ে ঝিয়ে তর্ক বাধে।

শঙ্করী যাচ্ছেতাই করে মেয়েকে।

এবং সুহাস সতেজে বলে, "ঠিক আছে। আমি যখন এতই পাথর তোমার গলার, সে পাথর সরিয়ে দিয়ে যাব।"

ছত্রিশ

কথায় আছে মাটি বোবা।

কিন্তু কলকাতার মাটি বোধ করি কথা কয়। বোধ করি তার মূল বনেদে অনন্তকালের সহস্রস্তরের ঐতিহ্য নেই বলেই প্রকৃতিতে তার উঠতি বয়সের মেয়ের চপলতা আর মুখরতা। সেই মুখরতার ঝাপটায় সে মূককে বাচাল করে তুলতে পারে। তাই কলকাতার বাসিন্দারা কিছু না শিখেও পণ্ডিত, কিছু না বুঝেও বোদ্ধা।

সত্য বলে, এ নাকি শুধু কলকেতার হাওয়ারই নয়, কলের জলেরও গুণ।

তা হতেও পারে।

আদি অন্তকাল তো লোকে পৃথিবীর গহ্বর থেকেই আঁজলা ভরে নিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করেছে, জীবনযাত্রার প্রয়োজন মিটিয়েছে। যেখানে সে গহ্বর আছে ভালই, যেখানে নেই, সেখানে কোদাল চালিয়ে গহ্বর খুঁড়েছে। তার পর তার কাছে এসেছে ঘট নিয়ে কলসী নিয়ে, ভরে নিয়ে গেছে অসময়ের জন্যে। কে কবে মাটির নীচে নল চালিয়ে জলকে হাতের মুঠোয় মুঠোয় পৌঁছে দিয়ে তাকে হুকুমের চাকর বানিয়ে ফেলবার কল গড়তে শিখেছিল? শেখে নি।...কলকাতা শিখে ফেলেছে। জল হেন দুর্লভ বস্তু কল মোচড় দিলেই তাকে আদায় করছে। এ কী কম তাজ্জব

এ জলের বিশেষ গুণ শরীরে বর্তাবে বৈকি। আর কিছু না হোক, কলের জলটা সাহসের যোগানদার।

নইলে আর নবকুমারের সাহস হয় ভবতোষ মাস্টারকে মুখের ওপর বলতে, "আমরা আপনাকে ত্যাগ করলাম মাস্টার মশাই! ভবিষ্যতে আপনি আর আমাদের বাড়িতে মাথা গলাতে আসবেন না।"

বলেছে, সে খবরটা নবকুমার নিজেই গিয়ে পৌঁছে দিল নিতাইকে। বলল, "রেখে ঢেকে বললাম না বুঝলি? আচ্ছা করে শুনিয়ে দিলাম। যখন মান্যের ছিলেন, তখন মান্য করেছি, এখন উনি যদি মান্যের মর্যেদা নিজে ঘুচিয়ে গালে মুখে চুনকালি লেপেন, মান্য রাখবার দায় আমার নয়। এই বুড়ো বয়সে উনি যদি ধর্ম খোয়াতে পারেন, মানুষের ছেদ্দা-ভক্তি ভালবাসা সবই খোয়াতে হবে। ছি ছি, কী করে যে এ দুর্মতি হল মাস্টারের, ভেবে কুল-কিনারা পাচ্ছি না। বিদেশবিভূঁই জায়গায় একটা অভিভাবকের মত ছিলেন, সেটা ঘুচল।"

নিতাই একটু পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বলে, "সম্পর্ক আর রাখবি না তা হলে?"

"ক্ষেপেছিস! উনি তো 'পতিত'! পতিতের সঙ্গে আবার সম্পর্ক কি?"

না, নিতাইকে "পতিত" বলে ত্যাগ করে নি নবকুমার। প্রতিদিন ওর মেসে ধর্না দিয়ে যায়, আর হাতে পায়ে ধরে বলে, এবং শেষ অবধি ভবতোষ মাস্টারের পরামর্শমত সত্যকে দিয়ে বলিয়ে সুরাহার পথে এনেছে তাকে।

অবিশ্যি সেও হয়ে গেল অনেকদিন। নবকুমারের বড়ছেলে, যার ভাল নাম নাকি সাধনকুমার, সে তখন ফোর্থ ক্লাসে পড়ত, আর এখন সে এনট্রেন্স পাসের পড়া পড়ছে। সত্য বলেছে জলপানি নেওয়া চাই। বলেছে জলপানি নিয়ে পাস করতে না পারলে সত্যর জীবনের সাধনাই মিথ্যে।

গাঁয়ের ছেলেরা পাঁচ মাইল রাস্তা ভেঙে জেলা ইস্কুলে পড়ে পড়ে যেটুকু করছে, সত্যর সাধনকুমারও যদি এতখানি সুযোগ সুবিধে পেয়েও সেইটুকুই করে, কি হল সত্যর এই যুদ্ধ আর বলক্ষয়ে?

অবিশ্যি শুধু জলপানি পাওয়াটাই শেষ কথা নয়। মানুষের মত মানুষ হতে হবে সত্যর ছেলেদের। কিন্তু লেখাপড়ায় মুখোজ্জ্বলটা তো তার প্রথম সোপান।

তা ছেলেটা মুখ রাখবে বলে মনে হয়। অন্ততঃ পর মাস্টার তো

তাই বলে, নগদ মাস মাস দশ-দশটা টাকা দিয়ে যে মাস্টারকে পুষছে নবকুমার।

কিন্তু নবকুমারের মাস্টার যে এভাবে নবকুমারের মুখ পোড়াবেন, এ কথা কে কবে ভেবেছিল?

স্বস্তি জিনিসটা কি এতই দুর্লভ?

সেই কতদিন তো গেল নিতাইয়ের দুর্মতির গ্লানিতে। কত হাঁটাহাঁটি করতে হয়েছে তরে মেসে, কত কাকুতিমিনতি করতে হয়েছে তার কাছে, হেসে উড়িয়েছে নিতাই। জ্বালাভরা তিক্ত হাসি। বলেছে, "আমাদের মতন একটা অখণ্ডে অবণ্ডের জন্যে আবার ভাবনা! রইলাম কি উচ্ছন্ন গেলাম, ত্রিভুবনের কার কি এসে গেল তাতে? বেশ আছি। খাচ্ছিদাচ্ছি রঙিন্ নেশা নিয়ে পড়ে আছি। তোমরা বাবা গুড্ বয়, দামী মাল, জগতে তোমাদের দরকার আছে, তোমরা ভাল হও গে।"

কিন্তু এই এক জায়গায় নবকুমার হালছাড়া হয় নি, দৃঢ় থেকেছে। নিতাইকে সুপথে আনতেই হবে।

শেষ পর্যন্ত ভবতোষ মাস্টারের নির্দেশমত সত্যর কাছেই নিতাইকে টেনে এনে হাজির করেছিল নবকুমার। বলেছিল, "নাও এবার মোকাবিলা কর দ্যাওরের সঙ্গে। বোঝাও সংসারে ওর দাম আছে কি নেই?"

সত্যর তখন শঙ্করীর ব্যাপারে মন প্রাণ ভাল নয়, তাই থমথমে মুখে বলেছিল, "দাম আছে কি নেই সে কথা আমি বোঝাব?"

নবকুমার মাথা চুলকে বলে, "ও তো তাই বলছে। মানে, বলছে ও উচ্ছন্ন গেলে কারুর কিছু এসে যাবে না।"

হঠাৎ স্পষ্ট করে চোখ তুলে তাকিয়েছিল সত্য নিতাইয়ের দিকে, বলেছিল, "কারুর কিছু এসে যাবে না, সেটা জেনে ফেলেছ? সবজান্তা তুমি?"

নিতাই সে দৃষ্টির সামনে মাথা নীচু করেছিল।

সত্য তীব্রস্বরে বলে উঠেছিল, "আমি বলছি, আমার এসে যাবে। মানবে সে কথা?"

নবকুমার এই তীব্রতার মানে খুঁজে পায় নি, ঘাবড়ে গিয়েছিল। ওর ধারণা ছিল সত্য কাকুতিমিনতি করবে, দিব্যিদিলেশা দেবে। কিন্তু কই! তেমন কিছু তো দেখা গেল না!"

ধমকই কি দিল?

মনে হচ্ছে না তা। অথচ কথাটা যে জোরালো, তাতে সন্দেহ নেই। আবার তেমনি জোরালো স্বরেই বলল সত্য, "আমি বলছি তোমায় ভালো হতে হবে, সভ্য-ভব্য ভদ্দরলোক হতে হবে। মানুষ যে বনের জন্তু-জানোয়ার নয়, সেটা মনে রাখতে হবে। আপিসে ছুটি নাও দশদিন, দেশে যাও, বৌ নিয়ে এস। আমি এখেনে বাসার ব্যবস্থা করে রাখছি।"

বৌ!

বাসা!

নিতাই আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে।

"সে অসম্ভব।"

"অসম্ভব! কেন, অসম্ভবটা কিসে?"

"বাড়িতে রাজী হবে না।"

"কে রাজী হবে না? তোমার বৌ?"

সত্যর স্বর তীব্র।

"না, মানে একরকম তাই।" নিতাই মলিন স্বরে বলে, "মামা-মামী রাজী হবে না, কাজে কাজেই সেও—"

"কাজে কাজেই সেও? এ তো দেখি আচ্ছা স্বার্থপর মেয়ে!"

স্বার্থপর!

নিতাই আকাশ থেকে পড়ে।

যেখানে পরার্থপরতার চরম পরাকাষ্ঠা, সেখানে কিনা স্বার্থপরতার অপবাদ!

"আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না বৌঠান!"

সঙ্গে সঙ্গে নবকুমারও বলে, "তাই তো। এ কথাটা তোমার আবোল-তাবোল হল বড় বৌ!"

"বুদ্ধি খরচ করলে, বুঝতে আবোল-তাবোল নয়। বলি—ওপরওলাদের গোড়ে গোড় যে দেবে বৌ, সে কি ছেদ্দায়, না ভালবাসায়? বোঝাও তুমি আমায়। স্বামীর থেকে বেশী ভালবাসে তাদের? স্বামীর কাছে থেকে স্বামীকে রেঁধেবেড়ে খাইয়ে যত্ন করে যে পরিতৃপ্তি পাবে, তার থেকে বেশী পরিতৃপ্তি পাচ্ছে তেনাদের যত্ন করে? হক্ কথা বল?"

প্রশ্নটা নিতাইকেই, তবে উত্তর দেয় নবকুমার।

বলে, "আহা এটা আবার একটা কথা নাকি? বাসায় আসতে চাইলে লোকনিন্দে নেই? পাঁচজনে মন্দ বলবে না? তোমার মতন—"

"হ্যাঁ আমার মতন ডাকাত আর কে আছে? সে যাক, অনেক দিনের পুরনো কথা ওটা। বলি পাঁচজনে আমায় একটু মন্দ বলবে এই ভয়ে স্বামী হেন বস্তুকে ভাসিয়ে দেব, হোটেলের ভাতে ছেড়ে দিয়ে শরীর স্বাস্থ্য ঘোচাব তার, উচ্ছন্নতার পথে যেতে দেব তাকে, এটা স্বার্থপরতা নয়? পাঁচজনে মন্দ বললে কি আমার গায়ে ফোসকা পড়বে? কাজটা যে মন্দ নয়, সেটা আমার অন্তরাত্মা বুঝবে না? সে তো আবার বাঁজা মানুষ। কি নিয়ে আছে শুনি? উদয়াস্ত জগতের যাবতীয় ওঁচা কাজ নিয়ে পড়ে আছে, তার বিনিময়ে লোকে সুখ্যাতি করছে, এই কি একটা মনিষ্যির জীবন? আমি তোমায় বলছি ঠাকুরপো, যদি নিজের হিত চাও, বৌকে নিজের কাছে এনে রাখ। বাসা আমি দেখছি।"

হঠাৎ আরও একদিনের মত নিতাই একটা কাজ করে বসে। হেঁট হয়ে সত্যর দুই পায়ে হাত দিয়ে সে হাত মাথায় ঠেকিয়ে বলে, "নিজের হিত অহিত আমি বুঝি না বৌঠান, বুঝি শুধু আপনাকে। আপনি যদি হুকুম করেন, তা হলেই—"

"হ্যাঁ হুকুমই করছি আমি।" সত্য দৃঢ় স্বরে বলে, "হুকুম করছি মানুষের মত ঘর-সংসার কর, অলীক স্বপ্ন নিয়ে মাথা ঘামিও না।"

নিতাই চলে যায়।

সত্য চলে যায় নিজের কাজে। নবকুমার বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকে ফ্যালফেলিয়ে। প্রকৃত ঘটনা যে কি ঘটল, তা যেন অনুধাবন করতে পারছে না। অথচ ওর চোখের ওপরই এমন একটা কিছু ঘটল, যেটা ঠিক সচরাচরের নয়, এ বোধ আসছে। সত্য আর নিতাই যেন উর্দু ফার্সি অন্য আর এক ভাষায় কথা বলল।

অথচ সত্যকে এখন জিজ্ঞেস করে ব্যস্ত করাও চলে না। শঙ্করীর কীর্তিতে সত্য নিতান্তই মনমরা এখন।

সত্যি, শঙ্করী যে সত্যর সঙ্গে এত বড় শত্রুতা সাধবে, এ কি সত্য স্বপ্নেও ভেবেছিল? এ যেন পূর্বজন্মের শত্রুতার ঋণ শোধ করে গেল শঙ্করী!

নইলে চিরদিনের হারিয়ে যাওয়া মানুষটা, একদিনের তরে মনের কোণেও যাকে আনে নি, সে হঠাৎ এমন আচমকা দেখাই বা দেবে কেন, চেনাই বা করবে কেন ?

কত সুখে কাটাচ্ছিল সত্য, হঠাৎ যেন শঙ্করী তার সেই সুখের প্রাণে একটা ছুরির আঁচড় টেনে ক্ষত করে দিয়ে গেল।

সেই যে গল্পে আছে কবর থেকে প্রেতাত্মা উঠে এসে মানুষকে যন্ত্রণা দেয়, সেই প্রেতাত্মার মতই করল শঙ্করী।

কী করেছিল সত্য তার কাছে, যে এইভাবে দাগা দিয়ে গেল সত্যকে ?

বাবাকে চিঠি লিখেছিল সত্য, শঙ্করীকে পাওয়ার খবর জানিয়ে, বাবা কি বলেন না বলেন জানতে। সে চিঠির জবাব আসার আগেই নতুন খবর ঘটাল শঙ্করী।

দু দিনও তর সইল না তার ?

এ যেন সত্যিই সত্যকে ধরল আর ধারালো অস্তরখানা শানিয়ে তুলে বসিয়ে দিল সত্যর বুকের মাঝখানে !

এই দীর্ঘকাল ধরে শত লাঞ্ছনা আর শত ধিক্কারের ভাত খেয়ে খেয়ে যে প্রাণটাকে পুষে রেখেছিল শঙ্করী, একটা দিন সত্যর কাছে ভালবাসার ভাত খেয়ে হেলায় বিসর্জন দিলে সেই প্রাণটাকে ?

এর চাইতে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা আর কি আছে ?

খবরটা শুনেই সত্য মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে সেই কথাই বলেছিল, "জানি, জানতাম ! চিরকেলে পাষাণ ও ! মেয়েমানুষ এত বড় নিষ্ঠুর, উঃ !"

তার পর ডাক ছেড়ে বলে উঠেছিল, "ওগো বৌ, কুক্ষণে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তোমার, কুক্ষণে আমি বলেছিলাম তোমার মেয়েটার ভার নেব। কেন মরতে বললাম গো ! না বললে তো তুমি এমন ভাবে দায়মুক্ত হতে পারতে না !"

তা কথাটা তো ভুল নয়, সুহাসের দায়েই তো এযাবৎকাল অত বড় গ্লানির জীবন বয়ে বেড়াচ্ছিল শঙ্করী !

সে দায় থেকে মুক্ত হল বলেই তো—

নাকি শুধু সাময়িক উত্তেজনার ফল ? মেয়ে যখন মায়ের সঙ্গে কোঁদল

করে বলে বসেছিল, "আমি যখন এতই গলার পাথর তোমার, সে পাথর সরিয়ে দিয়ে যাব—", তখন কি শঙ্করীর মুখে একটা ক্রুদ্ধ আক্রোশের তীব্র হাসি ফুটে উঠেছিল? ভেবেছিল কি, "বটে! চিরকাল আমিই শুধু জব্দ হব তোমার কাছে? পাপের প্রাচিত্তির আর হচ্ছে না আমার? জন্মাবধি জব্দ করে রেখেছ তুমি আমাকে, আবার মরে জব্দ করতে চাও? আচ্ছা দেখ এবার কে কাকে জব্দ করে!"

কে জানে কোন্ কথাটা সত্যি।

ঠাণ্ডা মাথায় ভেবেচিন্তে দীর্ঘকালের পরিকল্পনাকে রূপ দিয়েছিল শঙ্করী, নাকি ক্ষণিক মুহূর্তের অসতর্কতায় কূলে এসে ওঠা নৌকোখানাকে ডুবিয়ে বসেছিল?

না, প্রকৃত কথা কেউ জানে না।

আত্মহত্যা করবার আগে যে একটু লিখে রেখে যেতে হয় "আমার মরার জন্যে কেউ দায়ী নয়—" সেটুকুও জানত না শঙ্করী। অথবা সে রেওয়াজ তখনও চালু হয় নি।

লিখতে ওরা শেখে নি বলেই হয়তো চালু হয় নি।

চালু হয় নি, তাই রাত পোয়াতেই দত্তদের বাড়ির অন্দরে হৈ-হৈ উঠল। রাতে রান্নাঘরের পাশের ঘরে আড়ায় দড়ি বেঁধে ঝুলে মরেছে পানসাজুনি বামুনদিদি!

ওমা কেন গো!

কী দুঃখে!

এই যে কাল আহ্লাদের সাগরে ভাসছিল, দেশের লোকের সন্ধান খবর পেয়ে, তাঁদের কাছে আদরের ভাত খেয়ে! চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবই তো বলেছিল, বলেছিল, "দেশের লোক, চিরকালের চেনা-জানা, ছাড়ছে না, মেয়েটার সুদ্ধু ভার নেবে বলেছে, এ সুযোগ ছাড়তে পারব না মা! অনেক দিন তো দাস্যবিত্তি করলাম।"

কালীতলায় নাকি পরিচয় হয়েছিল।

কিন্তু মানুষটা আর কেউ না, দত্তদের সাত নম্বর বাড়ির সেই অহঙ্কারী ভাড়াটে।

তার কাছেই আশ্রয়ের আশ্বাস পেয়েছিল সে।

চলেই যেত।

তবে দিনক্ষণের ছুতো দেখিয়ে বলেছিল, "চৈৎ পোষ ভাদ্দর এ তিনটে মাসে পোষা বেড়ালটাকেও বিদেয় দিতে নেই মা, দিলে গেরস্থর অকল্যাণ। এতদিন নেমক খেলাম, অকল্যাণ করব না তোমার। এ মাসটা আর যাব না।"

হঠাৎ সেই সৎবুদ্ধি কি করে বিনষ্ট হল শঙ্করীর? কি করে বিস্মৃত হল সে নিমকের ঋণ?

তাই অদিনে অক্ষণে গেরস্থর অকল্যাণ ঘটিয়ে চিরদিনের মত বিদেয় হয়ে গেল?

হৈ-হৈ হল।

তবে নাকি বড়মানুষের অন্দর, আর দীনদুঃখী চাকরানী বিধবার প্রাণ! তাই সে হৈ-হৈ ফুটল আর মরল। থানা পুলিস তো দূরের কথা, বৈঠকখানার কর্তারাও সবাই টের পেলেন কি না পেলেন। অন্ততঃ টের পেয়েছেন এ লক্ষণ প্রকাশ পেল না তাঁদের আচরণে।

গড়গড়ার একটানা শব্দটার একবার হয়তো একটু ছন্দপতন হল, গলা থেকে একবার হয়তো একটু হুঙ্কার উঠল, তার বেশী নয়।

দত্তদের খিড়কির দরজা দিয়ে বার হয়ে গেল শঙ্করীর মৃতদেহ। নিজের দরজায় কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল সত্য। যখন চলে গেল, চোখছাড়া হয়ে গেল, হাত দুটো একবার তুলে নমস্কার করে মনে মনে বলল, "এত পতনেও ভেতরে ভেতরে তুমি খাড়া তেজী ছিলে বৌ, বুঝতে পারছি। তাই ছোট ননদের করুণার আশ্রয়ে থাকতে আর রইলে না। সবাই শুধোচ্ছে—'কারণ কারণ!' হাড়ে হাড়ে বুঝছি আমিই কারণ। কি করব আমার নিয়তি। ভগবান যাকে যার নিমিত্ত করেন!"

ঠিক এই সময়ে ও-বাড়ি থেকে একজন দাসী ডাকতে এল সত্যকে, "বড় গিন্নীমা ডাকতেছে।"

সত্য দ্বিরুক্তি করল না।

হয়তো এই ডাকটির প্রতীক্ষাই করছিল।

অবশ্য ডেকে ওকে সন্দেশ খাওয়াবেন দত্তগিন্নী, এমন আশা করবারও হেতু ছিল না। তবে এতটাও ভাবে নি সত্য। ভাবে নি ন ভূতো ন ভবিষ্যতি করে গাল পাড়বেন তিনি তাঁর সাত নম্বরের প্রজার বৌকে। একবার যেন

পুলিসেরও ভয় দেখালেন, কারণ দশেধর্মে সাক্ষী দেবে, সত্যর পরামর্শতেই হঠাৎ সাদাসিধে ভালমানুষটা কেমন বিগড়ে গেছল।

"তুমিই ওর মৃত্যুর কারণ! নইলে বেশ তো ছিল এযাবৎ!"

বললেন দত্তগিন্নী।

সত্য মাথা নীচু করে সব অভিযোগ মেনে নিয়ে শুধু বলল, "যা হবার তা তো হয়েই গেল, মেয়েটাকে আমায় দিন।"

"তোমায় দেব?" মেয়েটাকে?"

অমন একটা রূপবতী উঠতি বয়সের মেয়েকে অমনি এক কথায় বিলিয়ে দেবেন, এত বোকা নয় দত্তগিন্নী। ও জিনিস হল হাতের একটা হাতিয়ার। ওকে দিয়ে সময়ে অসময়ে কত কাজ হাসিল হতে পারে, কত কাজে লাগতে পারে। তাই ভুরু কুঁচকে বলেন তিনি, "তোমায় দেব মানে? তুমি কি ওর অছি? আমার সংসারেই থাকবে ও। যেমন ওর মা ছিল।"

সত্য মুখ তুলে প্রশ্ন করে, "পানসাজুনি চাকরানী হয়ে?"

দত্তগিন্নী কালীমুখে কঠিন গলায় বলেন, "তা চাকরানীর মেয়ে চাকরানী হবে না তো কি রাজরাণী হবে? তবে কিনা আমাদের ঘরের পুরুষ বেটা-ছেলেদের দয়ার শরীল, নজরে পড়তে পারলে তাও হওয়া আশ্চয্যি নয়।"

এই বিষাক্ত হুলটা যে দত্তগিন্নী জেনে বুঝে ইচ্ছে করে ফোটালেন, তাতে আর সন্দেহ কি! আসল কথা শঙ্করীর মরণটার জন্যে আগাগোড়া সত্যকেই দায়ী করে বসে আছেন তিনি, কি না জানি মন্তর কানে দিল, আর জলজ্যান্ত ভাল ঝিটা তাঁর কর্পূরের মত উপে গেল! এর ওপর আবার তার মেয়েটাকে দাবি করতে আসছে!

ওরে আমার কে রে!

তোমার অহঙ্কার ভাঙবার দিন এবার এসেছে আমার। বুঝেছি তোমার ভেতরের শাঁস। ওই সুহাসের মা তোমার 'দেশের লোক!' কোন্ না আত্মীয়ই। তুমিও তবে সেই পদেরই লোক! মুখে অহঙ্কার দেখিয়ে আমার সঙ্গে টেক্কা?

সত্যবতী দত্তগিন্নীর মনের কথাটা বোধ করি মুখের ভাষা থেকেই আবিষ্কার করে ফেলে। তাই বিচলিত হব না প্রতিজ্ঞা করেই বলে, "তা হলে তো সুবিধেই। আপনাদের ঘরের পুরুষদের যখন এত দয়ার শরীর,

তখন আর ওর কী গতি হবে ভেবে কাতর হই কেন? সদগতিই হবে মনে হচ্ছে।"

দত্তগিন্নী ভুরু কুঁচকে বলেন, "কী বললে?"

"ওই তো বললাম!"

"সদগতির কথা কি বললে?"

"ওই তো বললাম, যদি বুঝতে না পেরে থাকেন, তবে বোঝাতে পারব না, পরে বুঝবেন। আচ্ছা তা হলে যেতে অনুমতি দিন।"

দত্তগিন্নী আবার নিজমূর্তি ধরলেন। বললেন, "তোমায় আমি পুলিসে দিতে পারি জান? বলতে পারি, আমার লোক তোমার প্ররোচনায় মরেছে?"

সত্য মৃদু হেসে বলে, "তবে সেই চেষ্টাই করুন। কিন্তু আপাততঃ আপনাদের কোনও দাসী কি ছোট ছেলেকে আমার সঙ্গে দিন, দেখিয়ে দেবে কোথায় আপনাদের বৈঠকখানা।"

"বৈঠকখানা দেখিয়ে দেবে? বৈঠকখানায় যাবে তুমি? তোমার মতলবখানা কি তাই বল তো?"

"দয়ার মানুষদের কাছে একটু ভিক্ষে চাইব। বামুনের মেয়ের তাতে দোষ নেই।"

"এ তো আচ্ছা জাঁহাবাজ মাগী!" দত্তগিন্নী তেড়ে খাট থেকে উঠে দুম দুম করে মাটিতে নেমে আসেন, বলেন, "তোমার রীতি-নীতি তো ভাল দেখছি না। বৈঠকখানা-বাড়িতে গিয়ে পুরুষদের কাছে কী ছলা-কলা করতে যাবে শুনি? বলি একটু লাজ লাগবে না?"

সত্যর মাথার কাপড়টা খসে পড়েছিল, সত্যর মুখটা লাল হয়ে উঠেছিল, দুটোকেই সংবরণ করে সত্য শান্ত স্বরে বলে, "লজ্জার কি আছে? শুদ্দুর মাত্রেই ব্রাহ্মণকন্যার সন্তানতুল্য। সন্তানের কাছে মায়ের 'লজ্জা'র কথাটা উঠবে কেন?"

তার পর কিসে কি হল দত্তগিন্নীর অজ্ঞাত।

তবে সুহাসিনীকে সত্যর সংসারেই ভর্তি করে দিতে হল তাঁকে।

মেজকর্তা, অর্থাৎ মেজ ছাওর চটি ফট ফটাতে ফটাতে অন্দরে ঢুকে এসে আদেশ দিলেন, "ওই বামনী-মাগীর মেয়েটাকে সাত নম্বর বাড়িতে চালান করে দাও গে বড়বৌ, মেয়েটা নাকি ওদের দেশের লোক!"

বৌ-মরা শ্বাওর, বলতে গেলে বড়গিন্নীর হাতের মুঠোর সম্পত্তি, তাই ভ্রূভঙ্গী করে প্রশ্ন করেন তিনি, "কে কার দেশের লোক, সে খবর তোমার কানে আসে কোথা থেকে?"

"আসে কোথা থেকে! শোন কথা! কানে গিয়ে ঢেলে দিয়ে এলে আসবে না? ওই বাঁড়ুয্যের পরিবার তো নিজে গিয়ে বলল—"

"বলল! তোমার সঙ্গে কথা কয়ে বলল!"

"আহা পষ্টাপষ্টি কথা কয়ে কি আর বলল? একটা চাকরানীকে দিয়ে বলাল—"

"আর তুমি অমনি সোন্দর মুখ দেখে গলে গেলে! ধন্য বটে! এসব অন্দর মহলের কথায় তোমার থাকবার দরকার নেই মেজবাবু! পুরুষ-মজানি মেয়েমানুষকে কি করে শায়েস্তা করতে হয় আমার জানা আছে।"

মেজবাবু বিচলিত হলেন।

"আঃ, কী যা তা বলছ? ভদ্রঘরের মেয়েছেলে, বলতে গেলে আমার মেয়ের বয়সী, এসব কি কথা! ছি ছি!"

বড়গিন্নী চাপা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, "ইল্‌লি মারি গুরু গোসাঁই! কত ছলাই জানো! মেয়ের বইসী মেয়েমানুষ আর কখনো দেখি নি আমি! যাও যাও, যেখানের মানুষ সেখানে যাও। সুহাসকে আমি কোথাও পাঠাব না, ব্যস!"

মেজকর্তা নিরুপায় ভঙ্গীতে বলেন, "কিন্তু আমি যে কথা দিয়েছি! আমার কথাটার একটা দাম আছে তো?"

"ওঃ! আর আমার কথার দাম নেই, কেমন?"

"কী মুশকিল! সে কথা কে বলছে—", মেজকর্তা কূট-কৌশল ধরেন, "আমি বলছি ও তোমার যখন বিনি চেষ্টায় আপদ বিদেয় হচ্ছে হতে দাও। জানই তো গলায় দড়ি মড়ার সদগতি হয় না? আর পৃথিবীতে যার প্রতি বেশী টান ছিল তার ধারে কাছে ঘুরে ঘুরে আসে! ওই মেয়েটা তো ওর একটাই সন্তান, অবিশ্যিই টান ছিল খুব!"

বড়গিন্নী শিউরে রাম নাম করে উঠলেন।

খুব!

খুব বললে আর কতটুকু বলা হয়? সন্তানে এত আকর্ষণ দত্তগিন্নী অন্তত দেখেন নি কখনো!

যাক আর কাঠ-খড় পোড়াতে হল না, ওই এক মশালেই কার্যসিদ্ধি হয়ে গেল মেজবাবুর।

সুহাসিনী শত অনিচ্ছে নিয়ে সত্যর সংসারে এসে উঠল।

অনিচ্ছে সকলেরই।

নবকুমারের তো ষোলআনাই অনিচ্ছে, সত্যরও আগের সেই বেশ একটি মধুর কর্তব্যের আনন্দ রইল না আর। নেহাতই নীরস কর্তব্যর দায়ে ঘরে আনল তাকে। বাক্যদত্ত হয়েছিল শঙ্করীর কাছে তাই!

তা এসব তো সেই বছর চারেক আগের কথা!

এখন তো বেথুন স্কুলে তিন ক্লাস পড়া হয়ে গেল সুহাসিনীর!

স্কুলের সুবিধের জন্যেই হোক আর দত্তবাড়ির আওতা-মুক্ত হতেই হোক, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীটের সেই বাড়ি ছেড়ে বাগবাজারে উঠে এসেছিস সত্য। এ বাড়িতে ভাড়া বেশী, অসুবিধে ঢের, তবে একটা পরমলাভ গঙ্গা খুব নিকটে। নিত্য গঙ্গাস্নানের পুণ্যঅর্জন হয়।

আর?

আরও একটা আকর্ষণ আছে, যে খবর নবকুমারের অজ্ঞাত। নবকুমারের অজানিতেই দুপুরবেলা একটা জায়গায় আনাগোনা শুরু করেছে সত্য।

যাক সে তো নবকুমারের অজানিতেই, তার জন্যে নবকুমারের সুখ-দুঃখ নেই, মোটামুটি সুখেই তো থাকবার কথা তার। কারণ বাড়ির ভাড়া যেমন বেড়েছে, তেমনি অফিসের মাইনেও তার বেড়েছে অনেক। ছেলে দুটি প্রত্যেক বছর ফার্স্ট সেকেণ্ড হয়ে ক্লাসে উঠেছে, একজন পাস দিয়েছে। সত্যর অটুট স্বাস্থ্য আর অপরিসীম কর্মক্ষমতা সংসারটিকে একখানি নিটোল মুক্তোর মত করে রেখেছে।

দেশের বাড়িতে মা-বাপও আছেন ভাল।

নিতাইটারও মতিগতি ফিরেছে বলা চলে। আর কি চাইবার আছে?

ছিল না।

চাইবার আর কিছু ছিল না, কিন্তু হঠাৎ ভয়ানক একটা লোকসান ঘটে গেল।

হ্যাঁ, হঠাৎই। আর যা হয়েছে তার চারা নেই।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ঘটেছে নবকুমারের, ষোলো সুখে বিবাদ!

ভবতোষ মাস্টার ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছেন।

'পতিত' হয়েছেন।

সাঁইত্রিশ

দেশের বাড়িতে আর এক চেহারা ছিল ভাবিনীর। সারাদিন গাধার মত খাটুনি, সারারাত মোষের মত ঘুম। সাত চড়ে মুখে 'রা' নেই। মামাশ্বশুর-বাড়ির তামস্ত প্রাণীকে যমের মত ভয়।

কলকাতার বাসায় আসার আগে, এতখানি বয়েস পর্যন্ত নিতাইয়ের সঙ্গে কটা কথা বলেছে তার বৌ, বোধ করি হাতে গুনে বলতে পারে নিতাই। শুধু সেই অনেকদিন আগে যখন একবার বাসায় আসার কথা উঠেছিল তখনই যা বৌয়ের একটু স্পষ্ট গলা শুনতে পেয়েছিল নিতাই।

বৌ বলেছিল, "গলায় দড়ি আমার! লোকলজ্জা ভাসিয়ে গালে মুখে চুনকালি মেখে বাসায় যাব তোমার সঙ্গে?"

আশেপাশে কোনোখান থেকে যে "আড়িপাতা'র লীলা চলছে, এ জ্ঞান টনটনে থাকার দরুনই বোধ হয় বৌয়ের এই উচ্চ কণ্ঠ।

শুনে নিতাইয়ের চুন মুখো আরো চুন হয়ে গিয়েছিল।

পরদিন মামী বলেছিল, "কি রে নিতাই, পরিবারকে বাসায় নিয়ে যাবি নাকি, তোর ওই পেরাণের বন্ধুটার মতন?"

নিতাই উড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, "কী যে বল! ক্ষেপেছ?"

মামী বলেছিল, "ছাখো বাপু ভবিষ্যতে আমায় দুষো না! বৌমাকে আমি বলেছিলাম, মনের বাসনা মনে চেপে এখেনে পড়ে থাকার দরকার নেই, যাবে তো যাও। তা আবাগীর বেটি বলে কি, 'তোমাদের পা আঁকড়ে পড়ে থাকব, দেখি আমায় কে নিয়ে যেতে পারে তোমাদের আচ্ছুয় খেয়ে'।"

মামীর কণ্ঠে পরিতৃপ্তির স্বর ঝরে পড়েছিল।

আর নিতাই তার ধর্মপত্নীর ধর্মজ্ঞানের পরিচয়ে পরিতৃপ্ত হয়েই কলকাতায় এসে নবকুমারের সংসারে ভর্তি হয়েছিল।

কিন্তু সে তো সেই গোড়ার দিকের কথা।

তারপর তো কত জল গড়াল, কত জল ঘোলাল। নিতাইয়ের দশ দশা ঘটল। এবং অবশেষে বন্ধুপত্নীর নির্দেশে অথবা আদেশে আবার সেই পুরনো প্রস্তাব নিয়ে দেশে গেল।

ভেবেছিল বেশ একটু লড়তে হবে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এবারে বিনা যুদ্ধেই রাজ্য দখল হয়ে গেল। ঈশ্বর জানেন কে কোথায় কি কলকাঠি নেড়েছিল, তবে নিতাইয়ের বলার আগেই মামী বললেন, "কতকাল আর 'মেছে'র ভাত খাবি, বৌমাকে এবার নিয়ে যা।"

মামাও তাই বললেন।

এবং দেখা গেল বৌ বিনাবাক্যে সুড়সুড় করে নিতাইয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করল। তার গালে যে চুনকালি পড়ছে, এমন মনে হল না ভাবগতিক দেখে।

আসলে ব্যাপারটা এই—

নিতাইয়ের চরিত্র-চ্যুতির খবর দেশ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। কারণ নিন্দে আর মন্দ খবরের পাখা থাকে। আর সে পাখা অনেক 'অশ্বশক্তি' সম্বলিত।

শুনে অবধি বৌ ধরাশয্যা নিয়েছিল, আর অভিভাবকরা চিন্তান্বিত হয়ে স্থির করছিলেন ঘাঁটি আগলাতে সেনাপতি পাঠানো প্রয়োজন। আর ইতিমধ্যে তো গ্রামের বেশ কয়েকটা বৌ-ই গ্রাম ছেড়েছে। মামীর নিজের বাপের বাড়ির গ্রাম থেকেই চার-চারটে বৌ জামালপুরে চলে গেছে। এখানের একটা গেছে কাঁচড়াপাড়ায়, একটা সাহেবগঞ্জে। "রেলের চাকরি" হয়েই ছোঁড়াগুলো সাপের পাঁচ পা দেখছে, লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে বৌ নিয়ে বাসায় যাচ্ছে।

অতএব নিতাইয়ের বৌ যদি কলকাতায় যায়ই, জাতিপাত হবে না। তা ছাড়া নেহাৎ অগঙ্গার দেশও নয় যখন। বরং কালীঘাটের কালীমাতা বিদ্যমান।

জমি আপনিই প্রস্তুত হয়েছিল।

তবে নিতাই এত জানত না। নিতাই এক কথায় মত পেয়ে অবাক হয়েছিল।

কিন্তু সে আর কতটুকু?

এখন নিতাইকে মুহূর্তে মুহূর্তে অবাক করছে ভাবিনী!

সে যেন আর এক মূর্তি পরিগ্রহ করেছে।

নিতাই কি স্বপ্নেও ভেবেছিল ভাবিনীর এত 'মুখ' আছে ?

কিন্তু ভাবিনীকেও দোষ দেওয়া যায় না।

প্রথম কথা, সে এসেছে ঘাঁটি রক্ষা করতে, বরকে শায়েস্তা করার ব্রত নিয়ে। দ্বিতীয় কথা, এই এতদিনের বিবাহিত জীবনে 'মুখ'কে অবিরত চুপ করিয়েই রেখে এসেছে ভাবিনী, তা সে ভয়েই হোক আর সুখ্যাতি কিনতেই হোক। সেই রাখার একটা প্রতিক্রিয়া তো দেখা দেবেই।

তৃতীয় কথা হচ্ছে, এখন আর সে মুখকে চুপ করিয়ে রাখার কোনও প্রয়োজন নেই। অতএব এই দীর্ঘকালের রুদ্ধ জল বাঁধ ভেঙে প্রবল কল্লোলে নিজেকে বিস্তার করতে শুরু করেছে।

উঠতে বসতে নিতাই বাক্যবাণে জরজর !

অথচ উল্টে চড়ে ওঠবার মুখ তার নেই, কোথায় যেন হার হয়েছে তার। বোঝা যায় না হারটা কোথায়, অথচ কী এক লজ্জা মাথা তুলতে দেয় না।

আবার সব থেকে মর্মান্তিক এই, যেখানে নিতাইয়ের পূজার বেদী হৃদয়ের নৈবেদ্য, ঠিক সেইখানেই যেন ভাবিনীর যত আক্রোশ। সত্যবতীর নামে জ্বলে ওঠে সে। অথচ কেন এই অগ্নিদাহ, হৃদয়ঙ্গম হয় না নিতাইয়ের। মানুষ জাতটা কি এতও অকৃতজ্ঞ ?

নিতাই ভাবে, কার দয়ায় 'বাসা'য় আসতে পেলি তুই ? কে তোর জন্যে সংসার গুছিয়ে রেখেছিল ? কে তোর স্বামীকে বিপথ থেকে সুপথে আনল ? এত স্বাধীনতা এত বাবুয়ানা থাকত কোথায় তোর, যদি সত্যবতী না সুপারিশ করত ? ধান সেদ্ধ করতে করতে, ক্ষার কাচতে কাচতে, আর ঢেঁকিতে 'পাড়' দিতে দিতেই তো জীবন কাটছিল, আর তাই কাটত !

তা তার জন্যে কৃতজ্ঞতার বালাই মাত্তর নেই ! জানে না নাকি ! নিতাই তো কলকাতার বাসায় পা দিয়েই বলেছিল, "এই যে গিন্নেপনার স্বাধীনতাটি পেলে, এর কারণ স্বরূপ হচ্ছে সেই মানুষটি। বৌঠান না হুকুম করলে কোন্ শালা এত ঝামেলা পোহাতে যেত।"

ভাবিনীর যে 'মুখ' বলে একটা বস্তু আছে, সেই দিনই যেন হঠাৎ একটু আভাস পেয়েছিল নিতাই। ঝপ করে বলে উঠেছিল ভাবিনী, "সভ্য শহরে বাস করলে বুঝি কথা-বাত্রা এমন চোয়াড়ে হয় !"

তা ইদানীং কথাবার্তা একটু অসভ্য হয়ে গিয়েছিল নিতাইয়ের। যে

সঙ্গের যে ফল! যে 'বন্ধু' তাকে উচ্ছন্নের পথের পথ চেনাচ্ছিল, সে নিজে যে দরের, তার গতিবিধিও তেমনি দরের ঘরে। কাজেই কথাবার্তা চালচলনে একটু প্রভাব পড়বেই, না পড়ে যাবে কোথায়?

নিতাই 'শালা' শব্দটা উচ্চারণ করেই ঈষৎ লজ্জিত হয়েছিল, ভাবিনীর মন্তব্যে আরো দমে গিয়ে বলল, "এ্যাই দেখো। বাসায় পা দিতে না দিতেই যে গিন্নীত্ব শুরু করলে!"

সেদিন ওইটুকুর ওপর দিয়েই গিয়েছিল।

কিন্তু "দিনে দিনে কলা কলা চাঁদ বেড়ে যায়।" এখন ষোল কলায় বিকশিত হয়ে উঠেছে ভাবিনী!

আজ সকালেই হয়ে গেল এক চোট!

রাত থেকে মাথাটা টিপটিপ করে সর্দিজ্বর মত হয়েছিল নিতাইয়ের, বলেছিল ভাতও খাব না, অফিসও যাব না। শুনে একটু প্রসন্নই হয়েছিল ভাবিনী। বাঁজা মানুষ, সারাটা দিন তো একাই কাটে, এ তবু বাড়িতে থাকবে লোকটা। চোরের রাত্রিবাস, একটা দিন একটা দিনই! ছুটির দিনগুলো তো নিতাইয়ের কাটছে আজকাল এক নতুন নেশায়! ঠিক নতুনও নয়, পুরনো নেশা ঝালানো। দেশে-গ্রামে তো ওই ছিল একমাত্র আনন্দ। মাছধরা ধরেছে আজকাল নিতাই আর নবকুমার ফি রবিবার।

অফিসের সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেরই একটু এদিক সেদিক বাড়ি বাগান পুকুর আছে, তারা নেমন্তন্ন করে মাছ ধরতে। অতএব শনিবার দুপুর থেকেই ছিপ হুইল বঁড়শি 'চার' নিয়ে ব্যস্ততা পড়ে যায় দু বাড়িতে।

সে যাক।

আজ রবিবার নয়, তাই খুশি হল ভাবিনী। আর শহরের বাসায় কম কাজ করে করে আয়েসী হয়ে যাওয়া মনে ভাবল, যাক, তাহলে আজ রাঁধবই না। ও যেমন ভাতের বদলে মুড়ি চিঁড়ে খেয়ে থাকবে, আমিও তাই থাকব। তবে আজ তিথিটা ভাল নয়, দশমী। এয়োৎ রক্ষে করতে একটু মাছ মুখে দেওয়া দরকার। তা রাতে সে লক্ষণটুকু পাললেই হবে। কলসীতে কৈ মাছ জিয়োনো আছে।

সেই মন নিয়েই খানিক বেলায় আধসেলাই কাঁথাখানা আর ছুঁচসুতো পেড়ে নিয়ে বসেছিল ভাবিনী। নিতাই ঘরে শুয়ে পা নাচাচ্ছিল। হঠাৎ উঠে এসে বলল, "এ কী, রান্না না চড়িয়ে কাঁথা পেড়ে বসেছ যে?"

ভাবিনী মুখ কুঁচকে বলে, "তুমিই যখন খাচ্ছ না, তখন আর নিজের জন্যে কে আবার হাঁড়ি নাড়ে!"

নিতাই অবাক হয়ে বলে, "তার মানে? আমি খাব না বলে তুমিও হরি মটর? ছি ছি, এ আবার একটা কথা নাকি? খাবে কি?"

ভাবিনী একটা উচ্চাঙ্গের দার্শনিক ভঙ্গী করে বলে, "মেয়েমানুষের আবার খাওয়া! ও তোমার সঙ্গে দুটো খই-মুড়ি খেলেই হবে।"

"এ্যাই ছাখো! চুলোই জ্বালবে না?"

"দরকার তো দেখছি না কিছু—"

নিতাই ইতস্ততঃ করে বলে, "তবে আর কথা কি। নইলে ভাবছিলাম—"

"কি ভাবছিলে?"

"নাঃ, থাক!"

ভাবিনী কাঁথা সরিয়ে রেখে বলে, "থাকবেই বা কেন? বলই না?"

নিতাই বলে, "না মানে বলছিলাম কি—তেমন কিছু জ্বর তো হয় নি, আলুমরিচের দম দিয়ে দুখানা গরম গরম রুটি খেলে মন্দ হত না।"

রুটি!

রুটি শুনেই ভাবিনীর মাথায় বজ্রাঘাত হয়। রুটি কথাটাই শুনেছে এযাবৎ, হাতে করে গড়ে নি কখনো। তাদের গাঁয়ে-ঘরে ও বস্তুর চলনই নেই। ভাত খাও ভাত, না খাও মুড়ি আছে চিঁড়ে আছে, খই বাতাসা, ফুলুরি কলাইসেদ্ধ আছে, যেমন যার শরীরের অবস্থা বুঝে 'সেবা' কর। রুটির কথা ওঠে না!

কলকাতায় এসে নিতাই এই শহুরে চালটি শিখেছে। আর একদিন অমনি সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে বলে বসেছিল, "দেহটা কেমন ম্যাজম্যাজ করছে, দুখানা রুটি গড়ো না। আটা নিয়েই এসেছি একেবারে।"

সেদিন একটু অনৃতভাষণ করতে হয়েছিল ভাবিনীকে। স্বামীর কাছে মিথ্যা বলার পাপের জন্যে অলক্ষ্যে একবার নাকটা কানটা মলে নিয়ে বলেছিল, "ও হরি! তা কি জানি ছাই! ভাত তো চড়িয়ে ফেলেছি।"

নিতাই অবশ্য রান্নাঘর খানাতল্লাস করতে যায় নি, "তবে থাক তবে থাক" বলে আটার ঠোঙাটা নামিয়ে রেখেছিল। সেই ঠোঙাসুদ্ধ আটা মজুত আছে নিতাইয়ের জানা, কাজেই বাসনাটা প্রকাশ করে ফেলে, অন্য চিন্তায় পড়ে না।

কিন্তু ভাবিনীর মাথায় যে দুশ্চিন্তার পাহাড় চাপল।

"রুটি গড়তে পারব না" বলাটাও যেমন কঠিন, "রুটি গড়তে জানি না" বলাটাও তেমনি কঠিন।

তবু শেষ চেষ্টা করে সে।

বলে, "দিনদুপুরে শুকনো রুটি আর কেন খাবে তবে? বরং একটু খিচুড়ি চড়িয়ে দিই, তাই গরম গরম—"

"না না, খিচুড়ি না", নিতাই ভাবিনীর আশার মূলে কুঠারাঘাত করে, "অন্ন দ্রব্যটা থাক, ওতে শরীর রসস্থ হয়। রুটিটা নেহাৎ শুকনো না কর, গাওয়া ঘি একটু মাখিও। মেলা করো না, ওই খান বারো-চোদ্দো। অল্পাহারই ওষুধ!"

অগত্যাই আটার ঠোঙা নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকতে হয় ভাবিনীকে ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে দিতে। কোথায় আজ কাঁথাখানা মিটিয়ে ফেলবে আশা করছিল, আশা করছিল উনুনের দায়ে ধরা পড়বে না, সে জায়গায় কিনা একেবারে মাথায় আকাশ!

বলা বাহুল্য, রুটির ব্যাপারে ভাবিনীর প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হল না।

কারণ প্রথমেই প্রয়োজনাতিরিক্ত জল ঢেলে আটাটাকে প্রায় "শির্ণীতে" পরিণত করে ফেলেছিল সে। তার পর যদিও ছিঁড়েখুঁড়ে বহুকোণবিশিষ্ট খানকয়েক আটার চাকলা বানাল হিমসিম খেয়ে, তাদের উনুনে ফেলে তুলতে তুলতে পুড়ে উঠল প্রায় সবগুলোই। অথচ আবার গঠন-সৌকুমার্যে জায়গায় জায়গায় কাঁচাও বর্তমান।

ওদিকে দুপুর গড়িয়ে যায়।

নিতাই অনুমান করে নিজের জন্যেও রুটিই করছে ভাবিনী! আর সে রুটির সংখ্যা অনুমান করে মনে মনে একটু হেসে ধৈর্য ধরে বসে থাকে!

কিন্তু ধৈর্যেরও তো একটা সীমা আছে। পেটের মধ্যে যে সাড়া উঠেছে।

বার বার সাড়া দিয়ে উসখুস করে অবশেষে রান্নাঘরের দরজাতেই এসে দাঁড়ায় নিতাই, "কী এত নশো-পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রাঁধছ? বললাম যে শুধু দুখানা রুটি আর আলু-মরিচের দম হলেই হবে—"

ভাবিনী আজও মনে মনে নাক-কান মলে বলে, "ওমা তাই কি আবার খেতে পারে মানুষ? একটু সোনামুগের ডাল চড়াচ্ছি—"

"এ্যাই ছ্যাখো! আবার ওই সব! তাই এত দেরি হচ্ছে! দরকার নেই দরকার নেই, ওই যা হয়েছে তাই দিয়ে দাও।"

দিয়ে তো দেবে, কিন্তু আলু-মরিচের দম কই ?

আলু তো এখনও ঝুড়িতে।

অগত্যাই হাটে হাঁড়ি ভাঙতে হয় ভাবিনীকে। সবটা নয়, হাঁড়ির কানাটা। বলতে হয়, "একটু অপেক্ষা কর, দেরি আছে।"

নিতাই ছটফট করে আর বলতে থাকে, "ও না হয় পরেই হবে। শুধু গুড়-রুটিও মন্দ না।"

এতএব শুধু গুড়-রুটিই ধরে দিতে হয় ভাবিনীকে স্বামীর পাতের গোড়ায়।

আর জোর ক্ষিদের মুখে সেই গুড়ের ডেলা এবং আটার পিণ্ডি দর্শনে নিতাইয়ের সমস্ত রক্তকণিকা মুহূর্তের মধ্যে অগ্নিকণিকায় পরিণত হয়ে "মার মার" করে ওঠে।

থালাটা ধরে দিয়েই ছুতো করে রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছিল ভাবিনী। হঠাৎ থালা-আছড়ানোর ঝন্ ঝন্ শব্দে চমকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। এতটা আশঙ্কা ছিল না তার। কিন্তু দেখল থালাটা অদূরে নিক্ষিপ্ত।

সব কখানা রুটি একসঙ্গে তাল করে হাতে চটকে নিতাই চেঁচাচ্ছে, "কী হয়েছ কী এ ? আমার ছেরাদ্দর পিণ্ডি ? বলি দুখানা রুটি গড়বারও যদি ক্ষমতা না থাকে, বল নি কেন আগে ? কোন্ শালা বেকুব খেতে চাইত তা হলে ? আমারও যেমন মুখ্যুমি! বাজার থেকে দু আনার পুরী-তরকারি কিনে এনে খেলেই চুকে যেত। তা নয় সাধ করে রুটি খেতে চাইলাম আমার কর্মিষ্ঠি পরিবারের কাছে! হুঁ। বোঝা উচিত ছিল এসব সভ্য কাজ সবাইয়ের জন্যে নয়। সেই যে বলে—'বাপের জন্মে নেইকো চাষ, ধানকে বলে দূর্বোঘাস!' এ হচ্ছে তাই। তা শহরে যখন এসেছ, সভ্য কাজ একটু শিখতে হবে বৈকি। তোমার ধান সেদ্ধ ঢেঁকি কোটার মহিমা তো চলবে না এইখানে।" তাই পরামর্শ দিই—একবার আধবার বৌঠানের কাছে গিয়ে মানুষের মতন কাজ-কর্ম শিখে এসো দু-একখানা—"

বড্ড বেশী খিদের মাথায় বড্ড বেশী আশাভঙ্গ হয়েই বোধ করি মেজাজের ওপর রাশ রাখতে পারে নি নিতাই। কিন্তু সকলেরই ধৈর্যের সীমা আছে।

বিশেষ অপ্রতিভ হয়ে গিয়েছিল বলেই এতগুলো কথা নীরবে শুনেছিল ভাবিনী, মানুষটার খিদের মাথায় উত্তুর প্রত্যুত্তুর করবে নাই ভাবছিল, এবং মনে মনে আঁচ করছিল রাগটা একটু নরম হলে বরং তুতিয়েপাতিয়ে চারটি খই দুধ—

কিন্তু শেষরক্ষা হল না।

শেষ টান্‌টা আর সইতে পারল না যন্ত্রের তার।

ছিঁড়ে পড়ল ঝন্‌ঝনিয়ে।

পড়বেই।

তোমার গায়ে আমার পায়ের আগাটা একটু ঠেকে গেছে বলে তুমি আমায় কষে লাথালে আমি সইব? তোমার গোয়ালে আমার তামাকের কাঠকয়লাখানা ছিটকে পড়েছে বলে আমার ঘরে তুমি আগুন দেবে আর আমি চুপ করে থাকব?…তোমার বাগানে আমার ছাগলটা একবার মুখ লাগিয়েছে বলে গরুর পাল ঢুকিয়ে আমার তামস্ত বাগান তুমি মুড়োবে, আমি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকব?

ইয়ার্কি নাকি?

মানুষ মানে পাথর নয়।

তাই শেষরক্ষে হল না। নিতাইয়ের কথাটা শেষ হবার আগেই ভাবিনীও "রে-রে" করে তেড়ে এল।

"কী! কী বললে? আর একবার বল তো শুনি? তোমার পেয়ারের বৌঠানের কাছে আমি যাব রান্না শিখতে? বলি আর কত অপমান তুলে রেখেছ আমার জন্যে? যা রেখেছ একসঙ্গে বার কর। একেবারে বুকে ভরে নিয়ে মা-গঙ্গার কোলে আশ্রয় নিই গে।…রেখে এস, আজ আমায় রেখে এস বারুইপুরে। এত অপমান সয়ে থাকতে পারব না, এই বলে দিলাম সাদা বাংলা।…ও গো মা গো, এই সুখ করাতে তুমি আমায় শহরে এনেছিলে? ঝাড়ু মারি আমি অমন সুখের মাথায়! ভাবছিলাম দোষ হয়ে গেছে, ঘাট মানব, চুকে যাবে ল্যাটা, তার আর ডালপালা গজাবে না। ওমা এ যে দেখি থামেই না! শক্তের ভক্ত আর নরমের যম তুমি, কেমন? উঠতে বসতে নড়তে চড়তে খালি 'বৌঠান আর বৌঠান!' বলি এতই যদি মন্তরপূত করে রেখেছিলো বৌঠান, তো আমাকে আবার আনতে গেছলে কেন? লোকের কাছে মুখ রাখতে? শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে? তোমার—"

আবার শেষ ঘাটে ধাক্কা!

আবার কথার ওপর হাতুড়ি!

নিতাই আসন থেকে দাঁড়িয়ে উঠে গলা ফাটিয়ে বলে, "কী বললি?"

"অ্যাঁ! 'তুই!' 'তুই' বললে তুমি আমাকে হাড়ি-কাওরার মতন? এও বোধ হয় শহুরে সভ্যতা?" ভাবিনী ধেই ধেই করে ওঠে, "তোমায় আমি কড়ে আঙুলের ছেন্দা করি না বুঝলে? কানা কড়ার না। দুশ্চরিত্র স্বামী আবার স্বামী? হুঁঃ। আমি যাব সেই মায়াবিনী ডাকিনীর কাছে শিক্ষে করতে! গলায় দেবার দড়ি জুটবে না আমার? যাও, তুমি যাও দু-বেলা তাঁর পাদোদক খাও গে—"

নিতাই সহসা গম্ভীর হয়ে যায়। হাত দুখানা আড়াআড়ি করে বুকের ওপর রেখে বার দুই পায়চারি করে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, "পাদোদক যদি জোটে তো শুধু 'খাবো' কেন, মাথায় মেখে বর্তাব। তবে এই তোমার মতন মেয়েমানুষেরও সেটা করা উচিত। বিশ বছর তাঁর পায়ের কাছে বসে শিক্ষে করলে, আর দুবেলা পা-ধোয়া জল খেলে যদি তাঁর কড়ে আঙুলের নখের যুগ্যিও হও!"

নিতাই চরম অভিব্যক্তিতে তার হৃদয়ের শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু স্ত্রীর পক্ষে যে পরস্ত্রীর প্রতি এ শ্রদ্ধাপ্রকাশ কাটা ঘায়ে নুনের তুল্য তাতে তো আর সন্দেহ নেই। অতএব এর পর ভাবিনী যদি কোমরে কাপড় জড়ায়, তাকে দোষ দেওয়া যায় না। ভাবিনী জীবনাবধি যা দেখেছে তাই শিখেছে। 'দেখা'র ঊর্ধ্বে শেখবার মত অনুভূতি কটা মেয়েমানুষের থাকে?

তা ছাড়া যে মেয়েমানুষ যতই নীরেট হোক নির্বোধ হোক, স্বামীর মন পেলাম কিনা বুঝতে বাধে না তার। আর সে মনের অধীশ্বরী যদি আর কেউ থাকে, তাকে চিনতেও দেরি হয় না। কলকাতার মাটিতে পা দিয়েই তাকে চিনেছে ভাবিনী। সেই জ্বালাকর সত্যটা বুঝে ফেলেছে।

এই ভয়ঙ্কর জ্বালা ভাবিনী মহান উদারতায় সহ্য করে যাবে, এ তো আর হয় না।

অতএব কোমরে কাপড় জড়িয়ে কী যেন একটা ছড়া আউড়ে ছিটকে কাছে সরে আসে ভাবিনী।

"বটে! বটে! কড়ে আঙুলের যুগ্যি! চরিত্রহীন পুরুষের উপযুক্ত কথাই বলেছ! পরের ইস্তিরীর সবই মিষ্টি যাদের! বলি তোমার প্রাণের

নিধি বৌঠানের সব 'খেলা' জান? ও কথা তুলি না, তুলতে পিরবিত্তি হয় না তাই তুলি না। তুললেই তো পুরুষের মুখ বুক সব খুলে যাবে। যা দেখবে তাই স্বচক্ষে দেখবে। নইলে জেনেছি অনেকদিন। এইবার তোমায় জানাই—স্বামীকে লুকিয়ে রোজ ভরদুপুরে বিবিটি সেজে কোথায় যান গিন্নী, জান সে কথা?"…

"স্বামীকে লুকিয়ে মানে?"

নিতাই যেন দুর্বল পক্ষ হয়ে পড়ে। অতএব সবল পক্ষ ভাবিনী কুটিল হেসে বলে, "লুকিয়ে মানে লুকিয়ে! ঝি মাগীই বলেছে আমার ঝিকে, ছেলেদেরকে শেখানো আছে 'বলিস নে'।"

নিতাই বিশ্বাস করতে পারে না সত্যবতীর পক্ষে লুকোচুরি সম্ভব। তাই সগর্জনে বলে, "বিশ্বাস করি না।"

"ওঃ তাই নাকি? এইটুকুই বিশ্বাস কর না? আরও শুনলে না জানি কি বলবে!…বলি তোমাদের ওই জাতধর্ম খোয়ানো মাস্টারটার সঙ্গে তলে তলে কত দহরম মহরম তা জান? তেনার সঙ্গে তো বেম্ভধর্মের আপিসে পর্যন্ত যাওয়া হয়েছিল। বলি নি এতদিন, ওর কথা তোমার কাছে কইতে ঘেন্না হয়, তাই বলি নি। আমি বলছি ও মেয়েমানুষ একদিন—"

"খবরদার!"

নিতাই তীব্র চীৎকারে এগিয়ে আসে, "মিথ্যাবাদী! মিছিমিছি করে আর কিছু বলতে যাস তো জিভ খসে পড়বে। চুপ, একেবারে চুপ!"

দিশেহারা দেখায় নিতাইকে।

একে তো দুটো অপবাদই ভয়ানক মারাত্মক, অথচ এমনই সর্বনেশে সত্যগন্ধী মত যে একেবারে উড়িয়ে দিতেও বুকে বল আসে না। তদুপরি আবার সেই ভবতোষ মাস্টার। মাস্টার জাতধর্ম খুইয়ে বেম্ভ হয়েছিল, নিতাইয়ের হাড়ে বাতাস লেগেছিল। ভেবেছিল অন্ততঃ নবকুমারের বাড়িতে আসা যাওয়ার পথে তার কাঁটা পড়ল।

কিন্তু এ কী কথা শোনা যায় মন্থরার মুখে? দিশেহারাই হয়ে যায় নিতাই।

এই সুযোগে ভাবিনী কোমরের আঁচলটা আর একটু শক্ত করে।

"বলি গায়ের জোরে চুপ করিয়ে রাখলেই তো আর সত্যিটা মিথ্যে হয়ে যাবে না? আমি এই তোমায় বলে রাখছি, ওই তোমার পেয়ারের বৌঠান

বেস্ত হবে হবে হবে। ওই যে একটা বুড়ো ধিঙ্গী মেয়ে পুষেছে, মিছে করে বলে ভাইঝি, ভগবান জানেন বেধবা না আইবুড়ি, বয়সের তো গাছপাথর নেই, সেটাকে তো আর হিঁদুর সংসারে গছাতে পারবে না? তাই বেস্ত হয়ে তার—"

"তুমি চুপ করবে?"

ভাবিনী মুখে একটা আঙুল ঠেকিয়ে ভেঙিয়ে উঠে বলে, "তবে এই করলাম। কিন্তু আমি চুপ করলেই তো আর জগৎ চুপ করে থাকবে না? জানতে সবই পারবে।"

চুপ সত্যিই তখন করেছিল ভাবিনী।

বোধ করি অস্নাত অভুক্ত স্বামীকে পরাজিত শত্রুপক্ষের মতই দেখতে লেগেছিল বলে অস্ত্র সংবরণ করেছিল।

কিন্তু নিতাই ছটফটিয়ে বেড়িয়েছিল পাগলের মত।

বৌঠানের দ্বারা এসব সম্ভব?

লুকোচুরি, অভিসার, ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত, ভবতোষের সঙ্গে চুপি চুপি মেলামেশা! ভাবিনীর অভিযোগ যদি সত্যিই হয়, তা হলে তো ধর্ম মিথ্যে, ভগবান মিথ্যে, জগতে যা কিছু বস্তু আছে সবই মিথ্যে।

অসুস্থ শরীর, না-স্নান, না-আহার আরও উদভ্রান্তি আনছিল। ভাবিনী একসময় এসে পায়ে ধরে মাপ চেয়ে দুটো নারকেল নাড়ু আর এক ঘটি জল নিয়ে সেধেছিল, গলা দিয়ে নামাতে পারে নি নিতাই, "পরে হবে—" বলে সরিয়ে রেখে বালিশে মাথা ঘষতে ঘষতে অবশেষে একসময় ঘুমিয়েও পড়েছিল।

ওবেলা ঘটেছিল এসব।

ঘুম ভাঙল পড়ন্ত বেলায়, নবকুমারের ডাকে।

নবকুমার ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঠেলা মেরে প্রশ্ন করছে, "নিতাই নিতাই, তোদের বৌঠান এসেছে এ বাড়িতে?"

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে নিতাই।

উপবাসক্লিষ্ট শরীরে মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে, প্রশ্নের কথাটা চট্ করে হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাই উত্তরের বদলে নিজেই সে প্রশ্ন করে, "কি? কে এসেছে?"

"আরে বাবা তোর বৌঠান ছাড়া আর কে? আর কাকে খুঁজে বেড়াব

আমি ? ভেতরে গিয়ে একবার খবর নিয়ে আয় দিকি, বৌমার কাছে বেড়াতে এসেছে কিনা ?"

নিতাই হতচকিত দৃষ্টি মেলে আস্তে মাথা নাড়ে।

"কী মুশকিল! বসে বসে হাত গুনছিস কেন ? তুই তো ঘুমোচ্ছিলি মদ্দারাম! ইত্যবসরে এসেছে কিনা—"

এতক্ষণে বড়সড় একটা কথা বলে নিতাই ভেবেচিন্তে, "কেন বাড়িতে নেই ?"

"এই দেখ! থাকবেই যদি তো আমি ছুটে এসে হামলা করছি কেন ? ওঠ তুই একবার—"

অগত্যাই উঠতে হয় নিতাইকে।

এবং বাড়িতে তৃতীয় ব্যক্তি না থাকার অসুবিধেটা হঠাৎ এখন স্পষ্ট করে উপলব্ধি করে নিতাই।

ভিতরে গিয়ে ওই প্রশ্নটা এখন করতে হবে ভাবিনীকেই। নিতাইয়ের মুখ থেকেই বার করতে হবে, "বৌঠান এসেছেন ?"

উত্তরটা যা আসবে সে তো নিতাইয়ের জানাই। নেহাৎ নবকুমারের নির্বেদেই ওঠা। নইলে সত্যবতী এসেছে, আর নিতাই টের পায় নি ? ঘুমিয়েছিল বৈ তো মরে ছিল না ?

খানকয়েক বাড়ির ব্যবধানেই দুটো বাড়ি। আসা-যাওয়া তো আছেই। ভাবিনী আসার পর তার সুবিধে অসুবিধে দেখতে প্রথম প্রথম খুবই এসেছে সত্য, কিন্তু ভাবিনীর অনাগ্রহেই যাওয়াটা আসাটা কমিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু সে সব আসা বেশীর ভাগই নিতাইয়ের অনুপস্থিতিতে। উপস্থিতিতে দৈবাৎ। আজই কি আর হঠাৎ সেই সৌভাগ্য—

নবকুমারের অধীরতায় উঠে গেল নিতাই। ভিতরে গিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে চলে এসে মাথা নাড়ল।

মান খুইয়ে জিজ্ঞেস আর করতে হল না।

দেখল ভাবিনী একা বসে সন্ধ্যের অন্ধকার তুচ্ছ করে সেই কাঁথাখানাই সেলাই করছে। ভরসন্ধ্যেয় যে ছুঁচসুতো হাতে করতে নেই, এ শিক্ষাও যেন বিস্মৃত হয়ে গেছে ভাবিনী।

"কী হবে নিতাই ?" নবকুমার প্রায় 'ভ্যাঁক' করে কেঁদে ফেলে।

নিতাই শুকমুখে বলে, "আর কোথাও গেছেন হয়তো !"

"আর কোথায় যাবে? একা আর কোথায় যাবে?" নবকুমার কাতর ভাবে বলে, "কপালক্রমে ঠিক এই সময় তুড়ু খোকা দুদিনের জন্যে ওদের ঠাকুমা-ঠাকুদ্দাকে দেখতে বারুইপুর গেছে—"

"একা গেছে?" চমকে ওঠে নিতাই—

"না. না। আমাদের অবনী যাচ্ছিল দেশে—ভাবলাম ওদের তো ছুটি রয়েছে, যাক দুদিন। দেশভিটে কিছুই তো চিনল না! কী করে জানব এই ফাঁকে এই বিপদ হবে!"

নিতাই আরও শুষ্ককণ্ঠে বলে, "তোমার সঙ্গে কোনও বচসা-টচসা হয় নি তো? মানে গঙ্গার দিকেটিকে—"

"না না। সে সব কিছু নয় নিতাই! তবে আমাকে না জানিয়ে তো তুড়ুর মা কোথাও—"

আবেগের মুখে এসেছিল নিতাইয়ের, "তা তিনি যান। শুনেছি সে খবর—"

কিন্তু আবেগকে প্রশমিত করে। আস্তে অন্য কথা বলে, "সেই যে মেয়েটা—মানে সুহাস আর কি— সে নেই?

"সে তো ইস্কুল থেকে এসে পর্যন্ত না দেখে ভাবনা করছে। ঝিটাও কিছু জানে না। কী হবে নিতাই?"

কী হবে, কী হচ্ছে, কী হতে চলেছে, তার কি কিছুই জানে নিতাই? তার শূন্য মস্তিষ্কে যেন সহস্র বোলতা শনশনিয়ে ওঠে। মাথার ভার ঘাড় বহন করতে রাজী হয় না। বালিশে ধপ করে মাথাটা ফেলে ভাঙা গলায় বলে ওঠে নিতাই, "আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

কিন্তু আর একজন তো সবই বুঝতে পেরে ফেলেছে।

নিতাইয়ের ওই একবার নিঃশব্দে অন্তঃপুরে পাক খেয়ে আসার পর মুহূর্তেই কাঁথা ফেলে উঠে এসেছে ভাবিনী।

দরজার ফাঁকে চোখ কান রেখে আড়ি পেতে এ পিঠের কথাবার্তা শুনেছে, এবং শুনেই সমস্ত রহস্য হৃদয়ঙ্গম করে ফেলেছে।

একটা বদ বিচ্ছিরি মেয়েমানুষের জন্যে দু-দুটো দস্যিপুরুষ যে এরকম মচ্ছিভঙ্গ হয়ে পড়বে, এও তো অসহ্য! চোখে দেখাই শক্ত!

ওই অসহ্য ব্যাপারটা আর বেশীক্ষণ বরদাস্ত করতে পারে না ভাবিনী, ঠনঠনিয়ে দরজার শেকলটা নেড়ে দেয়।

সেই ঠনঠনানির মধ্যে যেন কোনও রহস্যবার্তার ইশারা।

ছেলের বৌ যেমনই হোক, নাতি বড় জিনিস। বংশধর, সর্বেশ্বর, নাড়িতে নাড়িতে বাঁধন। ছেলে দুটো আসা অবধি এলোকেশী যেন উথলে বেড়াচ্ছেন। অবিশ্যি সঙ্গে সঙ্গে বৌয়ের নিন্দেরও বিরাম নেই। 'যে ছোটলোকের বেটী' তাঁকে এই পরম বস্তু থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে, তার যে কখনো ভাল হবে না, এ বিষয়ে শেষ রায় দিয়ে এলোকেশী নাতিদের যত্নে তৎপর হয়ে বেড়াচ্ছেন। কারণ এবার ওরা একা এসেছে। কোন-কোনবার পুজোয় আসে, বাপের সঙ্গে তিন-চারটে দিন মাত্র থাকে, বিশেষ হাতে পান না! না, সত্য আর আসে নি। এলোকেশী আর তার মুখ দেখতে চান না, সেটা বড় গলায় জানিয়ে দিয়েছেন। ছেলেদের পৈতে দিয়ে গেছে ভিটেয় এসে, তাও নবকুমার একা। দুই ছেলের একসঙ্গে মাথা মুড়িয়ে দিয়েছে। কৃপণস্বভাব নীলাম্বরের বাড়িতে সমারোহময় কাজের ধরণও নেই। নবকুমার শেখে নি।

আর সত্য? তার যদি বা কোনো সাধ থেকেও থাকে, এলোকেশীর কথা ভেবে সে সাধ তুলে রেখেছে। সমারোহ করতে গেলেই তো তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। এ বরং কদিন ঝিকে রাত্তিরে থাকতে বললেই বেশ থাকতে পারবে সত্য। তাই থেকেছে।

ভারী তো মনিষ্যি সাধন সরল, তুচ্ছু খোকা ছাড়া পোশাকী নামে যাদের আজ পর্যন্ত কেউ ডাকে নি, বড্ড একেবারে খাইয়ে, তবু তাদের জন্যে পুকুরে জাল ফেলা হচ্ছে, টাটকা চিঁড়ে কোটানো হচ্ছে, পিঠে পায়েস, নাড়ু, পাটিসাপটা, গোকুল পিঠে, ক্ষীরতক্তি ইত্যাদি করে যতরকম জানা আছে এলোকেশীর, একটু ভুল বলা হল—যত রকম বানাতে জানা আছে সদুর, সব চলছে একধার থেকে।

নাকে নল ছেঁচে যাচ্ছে সদুর।

নীলাম্বর অবশ্য এক-আধবার বলছেন, "ওরে তোদের পেট-টেট ভাল আছে তো? দেখিস, দিনকাল ভাল নয়। শেষে আবার কলকাতায় ফিরলে তোদের মা না বলে ঠাকুমার কাছে আদর খেয়ে পেটের রোগ ধরিয়ে এনেছে!"

কিন্তু এলোকেশী সে কথায় কর্ণপাত মাত্র করছেন না।

নাতিদের অসুখ এবং বৌয়ের 'কথা' শোনানো সম্পর্কে তাঁর মনে লেশমাত্রও ভয় আছে বলে মনে হচ্ছে না। বরং ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠেছেন, "তুমি থাম তো! অসুখই বা হতে যাবে কেন? বালাই ষাট! আমি কি পচা পান্তো খাওয়াচ্ছি নাতিদের? অসুখ যদি হয় তো বলতে হবে যে ওদের গর্ভধারিণীর গুণেই হয়েছে। শহরে গিয়ে শহুরে চাল ধরেছেন, ছেলে দুটোকে আধপেটা খাইয়ে খাইয়ে পেট মেরে রেখেছেন। সারা দিনমানে একবার বৈ দুবার ভাত নয়!···আর নবুকে আমার আমি তিনবার করে ভাত দিতাম। সকালবেলা কী খাচ্ছে ছেলেরা, না গজা জিলিপি তিলকুট! দোকান থেকে কিনে আনিয়ে রাখে। কেনা খাবারে ছেলেপিলের পেট ভরে? কেন সকালে একবার দুটো ফেনাভাত দিতে হাতে পোকা পড়ে?···ইস্কুল থেকে এসে খাবার কি? না পরোটা। খিদের সময় ময়দা? দেখলে চোখ ফেটে জল আসে না ছেলেদের?···নবু আমার একদিন যদি ইস্কুল থেকে এসে মাছ-ভাতের বদলে অন্য কিছু দেখেছে তো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কেঁদেছে!"

সদু এক-আধবার বলতে চেষ্টা করেছিল, "তা নবুর ছেলেদেরও যে কান্না আসে, তা বলেছে ওরা তোমাকে?"

এলোকেশী সে কথাও উড়িয়েছেন।

বলেছেন, "বলবে আর কোন্ সাহসে? যে খাণ্ডারনী মা, ভয়ে তার বিপক্ষ কথা একটা বলতে পারে? বড়টাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যদিবা দু-একটা পেটের কথা টেনে বার করছি, ছোটটা একেবারে তুখোড় পাকা। জানে কথা প্রেকাশ পেয়ে গেলে মা আর আমার কাছে পাঠাবে না, তাই—"

"আহা প্রকাশেরই বা আছে কি? বৌ তো আর বাসায় গিয়ে চুরি ডাকাতি করছে না?"

"চুরি ডাকাতি না করুক, অনেক কাণ্ডই তো করছে। কোথাকার একটা অখদ্যে অবদ্যে ছুঁড়িকে তো পুষছে, তাকে পয়সা খরচ করে ইস্কুলে দিয়েছে, বই খাতা কিনে দিচ্ছে, সে তো গেল। নিজে নাকি রোজ দুকুরে কোথায় গিয়ে গিয়ে মেয়ে পড়াচ্ছে। বিদ্যেবতী লীলাবতী! বলি চুরি-ডাকাতির চেয়ে কমটাই বা কি হল তা হলে? বাবার জন্মে শুনেছিস কেউ এ কথা? ভদ্দরঘরের বৌ যায় গুরুমশাইগিরি করতে?"

নীলাম্বরও অবশ্য এ সংবাদে ছিটকে উঠেছিলেন, গাল দিয়ে নবকুমারের পিতৃশ্রাদ্ধ ঘটিয়ে সংকল্প ঘোষণা করেছিলেন, নিজে গিয়ে খড়ম পেটা করে

ছেলে বৌকে গাঁয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন, পরে সে সংকল্প ত্যাগ করেছেন। বলেছেন, "নাঃ, গাঁয়ে এনে আর দরকার নেই! জাত যা যাবার তা তো গেছেই, ও বৌয়ের হাতের ভাত তো আর খাচ্ছি না আমরা, মিথ্যে আর ধরা বাঁধার দরকার কি? এ বরং বাইরে বাইরে আছে, এখানে আনলেই তো পাড়া জানাজানি। ঘোমটা দিয়ে কোণে বসে থাকবার বৌ যখন নয়, তখন চোখের আড়ালে থাকাই মঙ্গল। বরং ছেলে দুটোকে যদি হাত করতে পার সেই চেষ্টা দেখ। আখেরে বুড়ো-বুড়ীকে দেখবার একটা লোক তো চাই!"

এলোকেশী গলা খাটো করে মুচকি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, "সে চেষ্টার কসুর করছি মনে করছ? মায়ের ওপর মন বিষ করে তোলবার জন্যে, মায়ের যত গুণাগুণ সবই ব্যক্ত করছি। তবে মায়াবিনীর যে মহামন্তর জানা! ছেলেরা মাতৃভক্তিতে ডগমগ। মন্তর নইলে আমার নিজের পেটের ছেলেটা এমন পর হয়ে যায়?"

সাধন সরল অবশ্য ভেতরের এত কথা জানে না, তারা প্রাণভরে ছুটির আনন্দ উপভোগ করছে। কলকাতার ধরা-বাঁধা জীবনের বাইরে এসে, শৈশবের লীলাভূমি ফিরে পেয়ে, মাঝে মাঝে সত্যিই মায়ের ওপর রাগ হচ্ছে তাদের। মার জেদের জন্যেই যে কলকাতায় বাস, সেটা সবিস্তারে এবং স-নিন্দেয় শুনছে তো উঠতে বসতে।

তবে সত্থ ন্যায্য কথা কয়।

অবশ্য মামীর সামনে তত নয়, কারণ এলোকেশীর রণরঙ্গিণী মূর্তিকে সে বড় ডরায়। রাতের খাওয়ার সময় একলা পায় ভাইপোদের, এলোকেশী সন্ধ্যার মধ্যে বিছানা নেন। সত্থ ভাত বেড়ে দিয়ে কাছে বসে গল্প করে। বলে, "ঠাকুরমার কথায় তো মাকে দুষছিস, বলি মা যাই টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেছল তাই মা এই বয়সে এতটা পড়া করেছিস, ভাল ভাল করে পাস করছিস। এখানে থাকলে হত এসব? দেখছিস তো এখানে তোদের বইসী ছেলেদের! কেউ এরই মধ্যে পড়া ছেড়ে দিয়ে মাছ ধরছে আর তামাক খাচ্ছে, কেউবা একটা কেলাশে তিন চার বছর ঘষটাচ্ছে। না সভ্যতা না ভব্যতা। বামুনের ঘরের ছেলেটা আর চাষার ঘরের ছেলেটায় তফাত বোঝবার উপায় নেই।"

সাধন ঠাকুমার মুখের বচন ঝেড়ে বলে, "তা এত এত দিন, এত এত যুগ

ধরে লোকে তো দেশগাঁয়েই থেকেছে ? তারা কি আর মানুষ নয় ? মায়ের বাবাও তো পাড়াগাঁয়ের ছেলে ?"

"তোদের দাদামশাইয়ের কথা বলছিস ? তাঁর কথা বাদ দে। তিনি হলেন হাজারে একটা। তবে তিনি কি আর তোর এই ঠাকুদ্দার মতন বদ্ধজলা ? তিনি হলেন নদীর মতন। শুধু পাড়াগাঁয়ে কেন ? শহর-বাজারেই তাঁর অনেক দিন পর্যন্ত কেটেছে। তা হ্যাঁ রে—মামার বাড়ি যাস-টাস না ?"

"না তো !"

"যাস না ? আমি বলি, এখন তোর মা স্বাধীন হয়েছে, হয়তো—"

হঠাৎ সরল ফট করে বলে বসে, "মা আবার একলা একলা কি স্বাধীন হল ? আমাদের দেশের কেউই তো স্বাধীন নয়, ভারতবর্ষটাই তো পরাধীন।"

সদু কথাটা চট্ করে অনুধাবন করতে পারে না, বলে, "ভারতবর্ষটা কি বললি ?"

"পরাধীন, পরাধীন ! গোরা সাহেবরা রাজা নয় ?"

সদু সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, "ওমা ! শোন কথা, ওদের রাজ্য ওরা রাজা হবে না ?"

"বাঃ ওদের রাজ্য কি করে হবে ? ওরা কি আমাদের এ দেশের লোক ?"

"তা ওরা তো রাজার জাত ? তা ছাড়া ওরা সমুদ্রের ওপার থেকে এসে তোদের কত ভাল করছে !"

"ভাল করছে না হাতী ! অনেক লোকসানই করেছে বরং। আর মা বলেন যে যার নিজের দেশের মালিক হবে এই নিয়ম। যারা পরের দেশে এসে লোভ করে সেখানে শেকড় গেড়ে বসেছে, তাদের—"

সদু অবাক হয়ে বলে, "এই সব কথা বলে তোদের মা ? তা হলে তো দেখছি মামী মা বলে মিথ্যে নয় ! মাথারই দোষ। কিন্তু ওসব কথা বলতে নেই রে খোকা, সাহেবরাই তোদের বাপের অন্নদাতা।"

অন্নদাতা কথাটার সম্যক অর্থ বুঝতে না পেরেই বোধ করি সরল উত্তর দেয় অন্য পথে, "মা তো সাহেবদের নিন্দে করেন না, শুধু বলেন, সব ছেলেরই মনে এই চিন্তা নিয়ে মানুষ হওয়া দরকার, পৃথিবীর মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে। তা দেশটাই যাদের পরাধীন, তারা আর মাথা উঁচু করবে কি করে ?"

সত্য হতাশ নিশ্বাস ফেলে বলে, "কি জানি বাবা, ওসব কথার মর্ম বুঝি না। তোর মায়ের চিরদিনই চোটপাট কথা, উদ্ভুট্টে বিদঘুট্টে চিন্তা। এত দেশ থাকতে কিনা সাহেব বাঙালী নিয়ে মাথা ঘামানো, কে রাজা কে প্রজা তার ভাবনা! আজন্ম পরাধীনতায় কাটল, স্বাধীনতা কাকে বলে তাই জানলাম না। তার মর্ম বুঝবো কি ছাই! মানুষ পরাধীন হয় তাই জানি, দেশের আবার স্বাধীন পরাধীন? যাক গে মরুক গে ওসব কথা, তোর মা নাকি গুরুমশাইগিরি করতে যায় রে?"

সাধন সরল দুই ভাই একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, তার পর সরলই সহসা সবেগে বলে ওঠে, "তা বল্ না দাদা, ভয়টা কি? মা তো বলেছেন, লুকোচুরি মিথ্যে কথা, এর বাড়া পাপ নেই। তবে বাবাকে বলতে মানা, বাবা পাছে মাকে যেতে নিষেধ করেন। নিষেধ করলে তো মুশকিল। অথচ মাস্টার মশাই বলেছেন—"

সত্য চোখ কুঁচকে বলে, "মাস্টার মশাই কে?"

"বাঃ মাস্টার মশাই কে জান না? ভবতোষবাবু। বাবাকে যিনি—"

"বুঝেছি! বুঝেছি! তা সে না ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে গেছে?"

সাধন ভয়ে ভয়ে মাথা কাত করে।

"তার সঙ্গে বৌ কথা কয়?"

সাধন ততোধিক নম্রতায় আর একবার মাথা কাত করে।

"ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে যাবার পরও তোদের বাড়িতে আসে সে?"

"না, বাড়িতে আসেন না—", সরল গম্ভীর ভাবে বলে, "বাবা তো তাঁর মান রাখেন নি, বাড়িতে ঢুকতে বারণ করেছেন। তাই মা বলেন, 'বেশ আমিই তাঁর বাড়ি যাব। মাস্টার মশাই কত উপকারী—' "

সত্য গালে হাত দিয়ে বলে, "তোদের কথা শুনে আমি তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি তুড়ু, ইচ্ছে হচ্ছে গিয়ে দেখে আসি তোদের মার আর দুখানা হাত-পা বেরিয়েছে কিনা। যা ত্রিভুবনে কেউ শোনে নি, সেই সব ঘটনা ঘটাচ্ছে সে? কিন্তু এও বলি, এককালে মাস্টার উপকার করেছে বলে, এখন জাতধর্ম নষ্ট করার পরও কি দরকার তার কাছে যাবার?"

যে কথা মনে আনাও পাপ, হঠাৎ তেমনি একটা সন্দেহ দংশন করে ওঠে সত্যকে। তাই এই প্রশ্ন।

কিন্তু সাধন ততক্ষণে সদুত্তর দিয়েছে।

"পাঠশালা তো মাস্টার মশাই-ই বানিয়েছে। বুড়ো বুড়ো গিন্নীরা অ আ ক খ শিখতে আসে। মাস্টার মশাই বলে, দিনভোর গালগল্প করে, তাস খেলে আর কোঁদল করে—নয়তো বা ঘুমিয়ে নষ্ট করার চাইতে কত ভাল কাজ লেখাপড়া শেখা, তাই 'সর্বমঙ্গলা তলা'য় দুপুরবেলায় ওই পাঠশালা খুলে দিয়েছে। তোমাদের মতন বড়রাও পড়তে আসে।"

সত্য একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, "এজন্মে যদি কখনো মরি, তবে আবার তোদের ওই কলকাতায় জন্মাব, আর তোর মার ইস্কুলে পড়ব।"

"তা এখনই তো পড়তে পার ?"

"পারব ! সেই একেবারে যখন চিতায় শোব ! নে ভাত কটা যে পাতে পড়েই আছে !"

"খাচ্ছি ! বাবা, রাতদিন যা খাচ্ছি—আর পেটে ধরছে না।"

"তবে থাক, জোর করে খাস নে !"

সাধন সত্যর সেই হঠাৎ স্থির হয়ে যাওয়া মুখটার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আস্তে বলে, "পিসি, তুমি চল না, আমাদের সঙ্গে—"

"আমি ?" সত্য হঠাৎ চড়ে উঠে বলে, "আমি কলকাতায় যাই আর এই বুড়োবুড়ী দুটো না খেয়ে মরুক !"

"আহা চিরকাল কি ? দু-একদিনের জন্যে বেড়াতে—"

"থাক বাবা। তুই যেতে বললি এই ঢের, বেড়াতে আর এজন্মে কোথাও যাচ্ছি না, যাব তো চিরকালের মতন সেই যমরাজার বাড়িতে। তবে বড় হয়েছিস তুই, চুপি চুপি একটা যদি কাজ করতে পারিস। কাউকে কিন্তু বলতে পাবি না। যে বলবে সে আমার মরা মুখ দেখবে—"

"আহা কি কাজ তাই বল না ?"

"বলছি—তোদের ওই বাগবাজারেই, তাই বলছি। ওখানের একটা বাসার ঠিকানায় একখানা চিঠি দেব, পৌঁছে দিতে পারবি ?"

সাধন মহোৎসাহে বলে, "কেন পারব না, কত নম্বর বল ?"

"লেখা আছে দেব। কিন্তু—শোন্ কেউ যেন না জানতে পারে।"

"জানতে না পারে ? কেন বল তো পিসি ?"

"পরে বলব।"

আটত্রিশ

হারিয়ে যাওয়া সত্য যখন বাড়ি ফিরল, তখন সন্ধ্যে হয় হয়। একটা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামল সত্য, সঙ্গে একটি গিন্নীবান্নি বিধবা।

"তুমি একটু দাঁড়াও বাছা, গাড়োয়ানটাকে আগে বিদেয় করি—", বলে সত্য ভিতরে ঢুকে আসে। সুহাস তখন এ-জানলা ও-জানলা করে ছটফটিয়ে বেড়াচ্ছে, নবকুমার নিতাইয়ের বাড়ি থেকে ফেরে নি।

সত্যকে দেখেই সুহাস প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, "পিসিমা!" সে স্বরে অভিযোগ।

সত্য ব্যস্তকণ্ঠে বলে, "হবে, জবাবদিহি হবে, এখন গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে আমার ওই হাতবাক্স থেকে চার আনা পয়সা বার করে দে দিকি, গাড়ির কাপড়ে আর বাক্সটা ছোঁব না।"

আঁচলের গিঁট খুলে চাবিটা ফেলে দেয় সত্য সুহাসের সামনে।

সুহাস স্বল্পভাষিণী, নেহাৎ অস্থির হয়েই চেঁচিয়ে উঠেছিল। আর কথা বলে না, নিঃশব্দে আদেশ পালন করে। শুধু অলক্ষ্যে বার বার দেখে নেয় সত্যকে। রহস্যময়ী সত্যকে।

গাড়ির ভাড়া দিয়ে গাড়োয়ানকে বিদেয় করে সত্য সেই মেয়েমানুষটিকে বলে, "নাও বসো, হাতেমুখে একটু জল দাও, একটু মিষ্টিমুখ কর, তবে যেও।"

মেয়েমানুষটি হৃষ্টচিত্তে বলে, "আবার মিষ্টি কেন মা? তোমার ঘরদোর দেখলাম চিনে গেলাম, এই ঢের। তোমার মিষ্টি কথাই 'মিষ্টি' মা, শুনলে শরীর শীতল হয়।"

"তা হোক, তুমি আমার জন্যে এতটি করলে, একটু মিষ্টিজল না খাইয়ে ছাড়ব না।" বলে সত্য ফট করে গায়ের সিল্কের চাদরটা রেখে কলের ঘরে ঢুকে কাপড়টা সেমিজটা কেচে ফেলে ভিজে কাপড়েই ভাঁড়ার থেকে দুটো নারকেল নাড়ু বার করে এক ঘটি জল দিয়ে খেতে দেয়।

মেয়েমানুষটি বিদায় নিলে সত্য শুকনো কাপড় পরে ঘরে এসে বসে সুহাসকে উদ্দেশ করে বলে, "তার পর? আমার নামে হুলিয়া বেরিয়ে গেছে বোধ হয়?"

সুহাস অন্যদিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলে, "হুলিয়া আবার কি? পিসেমশাই অস্থির হয়ে বেরিয়ে গেলেন, এই পর্যন্ত।"

"এই একদিনেই তোর পিসের কাছে আমার সব কীর্তি ফাঁস হয়ে গেল দেখছি"—সত্য বলে, "পাঠশালার খবরটা এযাবৎ চেপেচুপে ছিলাম—"

সুহাস বোধ করি আজকের সুযোগে তার মনের সন্দেহটা প্রকাশ করে বসে। মুখ তুলে ঝপ্ করে বলে ফেলে, "তা চাপাচাপিই কি ভাল? এদিকে তো তোমরা নিজেরাই বল স্বামী মেয়েমানুষের দেবতা!"

সত্যর মুখে আসছিল বলে, "তোর যে দেখি স্বামী না হতেই স্বামীভক্তি!" কিন্তু সামলে নেয়। কে জানে মেয়েটার কপালে "স্বামী" আছে কিনা। নিরুপায় বুদ্ধিহীন মা তো কুমারী মেয়েকে বিধবা পরিচয় দিয়ে তার ভবিষ্যতের পায়ে কুড়ুল মেরে রেখে গেছে। এই রূপের ডালি মেয়ে, সভ্য নম্র, লেখাপড়ায় কত চাড়, এ মেয়েকে যে স্বামী পেত, সে তো ধন্য হত!

কিন্তু হয়তো দুঃখিনীর ভাগ্য দুঃখেই যাবে। তবু মনে স্থির করে রেখেছে সত্য, শেষ অবধি লড়বে মেয়েটার জন্যে। তাই না ব্রহ্মজ্ঞানীদের সম্পর্কে ঔৎসুক্য সত্যর, তাদের সঙ্গে চেনাজানার বাসনা।

ব্রহ্মজ্ঞানীরা নাকি খুব উদার।

বালবিধবা মেয়ের বিয়েতে নিন্দেও নেই তাদের। সত্য প্রথমে ভেবেছিল সত্য ঘটনা প্রকাশ করে দেবে সুহাসের কাছে।

কুমারী পরিচয়েই স্কুলে ভর্তি করে দেবে তাকে, কিন্তু সাতপাঁচ ভেবে সে ইচ্ছে স্থগিত রাখতে হয়েছে। প্রথম তো এত বড় আইবুড়ো মেয়ের কৈফিয়ত অনেক, জাত যাওয়ার প্রশ্নও আছে। তা সে হয়তো সত্য তার ন্যায়ভাষণের জোরে একরকম করে মানিয়ে নিত, "গরীবের মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিতে পারে না সমাজ, জাতটা নিয়ে নিতে পারে?" এ তর্ক তুলত। কিন্তু বাধা অন্যদিকেও।

এত বড় নিষ্ঠুর সত্য প্রকাশ হয়ে পড়লে মাকে কী ভাববে সুহাস? কোন দিনই কি প্রাণ থেকে ক্ষমা করতে পারবে মাকে? যখন শুনবে কেবলমাত্র নিজের সুবিধার্থে মা তার কপালে দুর্ভাগ্যের ছাপ দেগে রেখে দিয়েছে, আজন্মকাল খাওয়াপরা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে, মা কি নিতান্ত ছোট হয়ে যাবে না তার চোখে? স্বার্থপরতার নির্মমতায়? সে যে মরার ওপর খাঁড়ার ঘা!

আর যদি মাকে সে দেবীর আসনে বেদীতে বসিয়ে রেখে থাকে,

বিশ্বাসের ভালবাসার ভক্তির নড়চড় না হয়, তা হলে হয়তো বা সত্যকেই সন্দেহ করে বসবে। ভাববে সত্যই এখন তার বিয়ের সুবিধে করতে—

এইসব সাতপাঁচ ভেবেছে সত্য সুহাসের সম্পর্কে। ভেবেছে, থাক, আরও একটু জ্ঞানবুদ্ধি বাড়ুক। সতিমিথ্যে বোঝবার চোখ হোক। তখন দেখা যাবে।

তাই এখন ওদিক দিয়ে না গিয়ে সত্য দোষ মেনে নেওয়ার ভঙ্গীতে বলে, "স্বামী দেবতা এ কথা শুধু আমরা কেন, ত্রিজগতের সবাই বলে। কিন্তু দেবতার অসন্তোষ ঘটনোও তো দোষের রে! আমি পাঠশালা খুলে গুরুমশাইগিরি করছি শুনলে, তোর পিসে অসন্তোষের পরাকাষ্ঠা করবে বৈ তো না? অনর্থক রাগিয়ে দিয়ে লাভ? তাকেই মনে যন্তন্না দেওয়া। আর না বুঝেসুঝে হুম্ করে যদি বারণ করে একটা দিব্যিদিলেশা দিয়ে বসে, তাতেও তো বিপদ!"

সুহাস একটু চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলে, "তা পিসেমশাই যাতে রাগ করতে পারেন, সে কাজ তোমার না করাই উচিত।"

সত্য সুহাসের এই সদ্বিবেচনার কথায় খুশি হয়, তবে সত্য মনে মনে একটু হাসে। ভাবে তাই যদি উচিত হত, তুই কোথায় থাকতিস বাপু? এত কথা ভাববার মত বুদ্ধিই বা পেতিস কোথা থেকে? কম লড়ালড়ি করতে হয়েছে ওর সঙ্গে তোর জন্যে? তোকে কাছে রাখা নিয়ে তো বটেই, তা ছাড়া ইস্কুলে ভর্তি করা নিয়ে?

সাহেবী ইস্কুলে পড়ালে মেয়েকে, সে মেয়ের হাতের জল খাওয়া চলবে না, এ বলেও নিবৃত্ত করতে চেয়েছে নবকুমার। তবু সত্য ব্যাপারটা ঘটিয়ে তুলেছে।

মনে পড়ে গেল সত্যর সেই কথাটা এই 'উচিত অনুচিতে'র প্রসঙ্গে। মুখেও আসছিল, সামলে নিল, মৃদু হেসে বলল, "তুই তো দেখছি অনেক শিখে ফেলেছিস! হ্যাঁ, বলেছিস ঠিক, উচিত নয়। কিন্তু দেখ্, সব নিয়ম সব ক্ষেত্রে খাটে না। কত স্বামী হরিনামে অসন্তুষ্ট হয়, হরিনাম শুনলে জ্বলে ওঠে, তা বলে তার স্ত্রী করবে না হরিনাম? তবে আবার তার কানের কাছে খোল্ পিটিয়ে নাম সংকীর্তন করাও ভাল নয়। আসল কথা, যে কাজটা করতে যাচ্ছ, আগে দেখবে সে কাজ ভাল কি মন্দ, সেই বিবেচনাটুকু রাখতে হবে, তার পর যতটা পারা যায় কাউকে না চটিয়ে সে কাজকে সামলে নিয়ে

উদ্ধার করা। যারা পছন্দ করে না তাদেরকে অগ্রাহ্য করাও হল না, কাজটাও হল।"

সুহাসকে কি একেবারে বড়র দলে ফেলেছে সত্য? তাই তার কাছে এত কৈফিয়ত? অথবা সুহাসকে উপলক্ষ করে সত্য নিজের মনকেই কৈফিয়ত দিচ্ছে? স্বামীর সঙ্গে লুকোচুরি করতে, ভিতরে ভিতরে যে সূক্ষ্ম বিবেকের পীড়ন অনুভব করে সে, এ কৈফিয়ত তার জন্যে?

সুহাস অবশ্য নিজেকে বড়ই ভাবে, পুরো একটা মানুষই ভাবে, তাই সত্যর কৈফিয়ত শুনেও আবার মতামত ব্যক্ত করতে সাহসী হয়। আর সত্যর কাছে আর যাই হোক সাহসী হতে বাধা নেই। তাই আস্তে বলে, "আমার তো মনে হয় হরিনামটা ভাল কাজ, সেটা বুঝিয়ে দিয়ে—"

সত্য হেসে ওঠে।

বলে, "কম বয়সে আমিও তোর মত করেই ভাবতাম সুহাস, সব কিছু নিয়ে লড়াই করতাম, তক্ক করে অপরকে বুঝিয়ে ছাড়বার চেষ্টা করতাম, কিন্তু এখন বয়েস বুদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এইটা বুঝেছি অবিরত লড়াইয়ে কেবল শক্তিক্ষয়। কাজের জন্যে যে শক্তি থাকা দরকার, সে শক্তির অনেকটা যদি তর্কেই খরচ করে ফেলি, তবে কাজটায় যে ঝিমিয়ে যাব। তাই যাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে, সেই পথই ধরি। তবে ওই যা বললাম ক্ষেত্রবিশেষে। আর সেই 'বিশেষ'টা চেনবার চোখ চাই বুঝলি? 'মেয়েমানুষ কি মানুষ নয়' বলে অনেক তক্ক করেছি, কিন্তু দেখছি ক্রমশঃ সে তক্ক সমুদ্রে বালির বাঁধ। এই আমাদের পোড়া দেশে মেয়েমানুষ হওয়ার অনেক জ্বালা বুঝলি? একটা সৎ কাজ করতে যাও, তাও পায়ে পায়ে বাধা। মাস্টার মশাই বলেন, অন্নদানের চেয়েও বড় পুণ্য বিদ্যাদানে। মানুষে আর জন্তু-জানোয়ারে যে তফাৎ সে তো ওই বিদ্যে থেকেই! নইলে প্রাণী মাত্তরেই তো খায়, ঘুমোয়, ছানা পাড়ে। মানুষ থেকে কীটপতঙ্গ পর্যন্ত। তা সেই বিদ্যে বস্তুটা যার মধ্যে এতটুকুও আছে, তার উচিত আর একজনকে সে বিদ্যের ভাগ দেওয়া। এ জিনিস তো দানে কমে না, বরং বাড়ে। কিন্তু এসব কথা কজন বুঝতে চায় বল্! চায় না।···আগে ভাবতাম, যা ঠিক, তা সবাইকে বুঝিয়ে ছাড়ব। বুঝিয়ে সোজা করব, কিন্তু এখন বুঝতে শিখেছি সে চেষ্টা হচ্ছে হাত দিয়ে হাতী মাপা, আকাশের তারা গোনা। তার চেয়ে নিজের বিবেচনায় যা ঠিক বলে বুঝব, করে যাব একমনে। একদিন না একদিন

বুঝবে লোকে ঠিক কি ভুল। যারা বিরক্ত হয়েছে, অপছন্দ করেছে, তারাই মেনে নেবে।"

অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বলে সত্য একটু চুপ করে জিরিয়ে নেয়। সুহাস সেই অবসরে চট্ করে উঠে গিয়ে এক ঘটি মিশ্রীর পানা এনে সত্যর মুখের সামনে ধরে।

সত্যর ভেতরটা বোধ করি এমনি একটা শীতল পানীয় চাইছিল। কোন্‌কালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। বিনাবাক্যে ঢকঢক করে মিশ্রীর জলটা খেয়ে নিয়ে মৃদু হেসে বলে, "মনের কথা টেনে নিয়ে তেষ্টার জল দিতে শিখেছিস, আর তোর শেখবার কিছু বাকী নেই সুহাস। জগৎ-সংসারে শুধু এইটুকু শিক্ষার সম্বল থাকলেই যথেষ্ট।"

সুহাস লজ্জায় মাথা হেঁট করে।

সত্য তাকিয়ে দেখে।

রূপে গুণে যেন আলো করা মেয়েটা! কিন্তু, কিন্তু গুণ কি ছিল এমন ?

সত্যর মনে পড়ে প্রথম দিনকার কথা। কী উদ্ধত অনম্র, ভেতর-চাপা, মুখ-গোঁজা গোছের স্বভাব ছিল সুহাসের। প্রতিনিয়ত তাকে নিয়ে অসুবিধেয় পড়তে হয়েছে সত্যকে। নেহাৎ যে সত্য নিজেকে সামলে থেকেছে, সে শুধু মেয়েটা সত্ব মাতৃহারা বলে। আর তার ওপর মায়ের মৃত্যুটা বড় মর্মান্তিক, বড় আকস্মিক বলে।

ক্রমশঃ সুহাসের প্রকৃতিতে এসেছে নম্রতা, সভ্যতা, কোমলতা। দত্তবাড়ির দরুন বহুবিধ বদভ্যাস, যা সত্যকে পীড়িত করত, বিরক্ত করত, সেগুলো অন্তর্হিত হল আস্তে আস্তে, একটা মেয়ের মত মেয়ে হয়ে উঠল সুহাস।

তবে স্বভাবটা একটু গম্ভীর, চাপা।

হৃদয়-বৃত্তির বহিপ্র্রকাশটা কম। আনন্দ-বেদনা সুখ-দুঃখ খুশী-অখুশী বোঝা যায় না ফট করে, বোঝা যায় না শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা স্নেহ। তাই আজ হৃদয়-বৃত্তির এই প্রকাশটুকুতে বড় বেশী পরিতৃপ্ত হয় সত্য।

সুহাসের ওই লজ্জানত মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, "তা আমার এত দেরি হল কেন, তা তো জিজ্ঞেস করলি না কই ?"

সুহাস মৃদু হেসে বলে, "জিজ্ঞেস করতে যাব কেন ? বলবার হলে, তুমি নিজেই বলবে।"

"বলবার হলে? শোন কথা!" সত্য বলে, "বলবার নয়, এমন কাজ তোর পিসি করে বেড়ায় বুঝি?"

"বাঃ তাই বলেছি নাকি? বলেছি—"

তা সুহাসের আর কথার শেষটা বলা হল না, উঠোনের দরজা ঠেলে দুই মূর্তিমান ঢুকলেন। নবকুমার আর নিতাই।

দুজনের মুখ থেকেই একটা করে সম্বোধন বেরোল।

"বড়বৌ!"

"বৌঠান!"

সত্য মাথার কাপড়টা একটু টেনে উঠে দাঁড়ায়।

নবকুমার বসে পড়ে।

বসে পড়ে বলে, "কী ব্যাপার তোমার বড়বৌ? ভরদুপুরে রোজ তুমি যাও কোথায়? আজই বা এতক্ষণ ছিলে কোথায়? তোমার এসব রীতনীত তো ভাল ঠেকছে না আমার?"

সত্য এক মুহূর্ত নবকুমারের সেই বিপর্যস্ত মূর্তির দিকে তাকিয়ে, একটু মুখ টিপে হেসে বলে, "তাই বুঝি? আমার রীতনীত আর ভাল ঠেকছে না তোমার?"

হাসি!

সত্য হাসছে!

তার মানে, হয় তার মনে কোনও অপরাধ-বোধ নেই, নয় সে পাকা ঘুঘু। নিতাইয়ের জ্ঞান থাকে না যে সে হাঁ করে সেই চাপা হাসিতে উজ্জ্বল অর্ধাবগুণ্ঠিত মুখের দিকে তাকিয়ে আছে এবং রীতিনীতির দিক দিয়ে সেটাও খুব শোভন নয়।

নবকুমার কিন্তু এখন বিহ্বল নয়। এই এতক্ষণকার উদ্বেগ অশান্তি দুশ্চিন্তা সব কিছুর যন্ত্রণা তার রাগের ঝাঁজ হয়ে ফুটে ওঠে। সত্যর হাসিটা তাতে ইন্ধন জোগায়। তাই এবার তেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলে, "না ঠেকছে না। আমার মনে হচ্ছে তোমার মতিবুদ্ধি মন্দপথে যাচ্ছে।"

শুধু নবকুমার থাকলে সত্য দপ্ করে উঠত কিনা কে জানে, কিন্তু এখন সঙ্গে নিতাই। ওর সামনে রেগে উঠলে মান থাকে না। তাই সত্য তেমনি ভাবেই বলে, "তা তোমার যখন মনে হচ্ছে, তখন অবশ্যিই তার একটা ন্যায্য কারণ আছে। বিজ্ঞ বিচক্ষণ পুরুষ তুমি। তা হলে এখন এই দুষ্টু

পরিবারকে নিয়ে কি করবে বল? বনবাস? অগ্নিপরীক্ষা? না কেটে গঙ্গায় বিসর্জন?"

এ কী দুঃসহ স্পর্ধা! নবকুমারের মুখে কথা যোগায় না।

নিতাই এতক্ষণে কথা বলে।

বলে, "কিন্তু বৌঠান, আপনি যে আমাদের ধাঁধাঁয় ফেলে মজা দেখছেন, তারও তো একটা বিহিত চাই? এই আজ বিকেল থেকে ও হতভাগার কী গেরো! আর আমিও আজ এই সমগ্র দিনটা না খাওয়া, না দাওয়া, তার ওপর বৌয়ের কাছে মুখ হেঁট—"

"ওমা! ধাঁধাঁয় যে তুমিই আমাকে ফেলছ ঠাকুরপো! তোমার খাওয়া-দাওয়াতেই বা আমি হস্তারক হলাম কি করে? আর বৌয়ের কাছে মুখ হেঁট হবার দায়ীকই বা হলাম কেন? কিছু তো বুঝতে পারছি না! মুখ তো দেখছি 'কড়ি' হয়ে গেছে!"

বেচারা নিতাই, উপোস সে একেবারে সহ্য করতে পারে না, সেই উপোস আজ সারাদিন, তার উপর এত রকম কথাবার্তা, সর্বোপরি এই স্নেহবাণী, তার চোখের স্নায়ু দুর্বল হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে। আর সেই বিশ্বাস-ঘাতকতার লজ্জাটা ঢাকতে সে তার বৌয়ের কাছে হেঁট হয়ে যাওয়া মাথাটা আর একবার হেঁট করে।

"নাঃ, এই দুটি বুড়ো খোকা হয়েছেন সমান", সত্য এবার ব্যঙ্গের রূপ ছেড়ে সদয় রূপে আসে, "এই অবুঝপনার জন্যেই আমাকেও বুড়ো বয়সে ছলচাতুরী ধরে মরতে হচ্ছে।...কিন্তু তার আগে ঠাকুরপো, কিছু খাও দিকি, মনে হচ্ছে বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে হরিমটর চালিয়েছ আজ।...সুহাস, আগে তোর ছোট পিসেমশাইকে একটু কিছু খেতে দে তো—"

"না না, আমার কিছু লাগবে না—", বলে প্রতিবাদ করে ওঠে নিতাই।

সত্য মৃদু হেসে বলে, "লাগবে কি না লাগবে সে কি তুমি বুঝবে?"

সুহাস বিনাবাক্যে দুখানি ঝকঝকে কাঁসার রেকাবে দুই পিসের জন্যেই খাবার এনে ধরে দেয়। বাড়িতে মজুত খাবার যা হয়, দুটি নারিকেল নাড়ু, খানচারেক জিবেগজা, আর একবাটি মুড়ি।

হঠাৎ নিতাইয়ের ভারী দুঃখ হয়। তার ঘরেও তো এমন কিছু অপ্রতুল নেই, অথচ এমন পরিপাটিত্ব কোন সময় চোখে পড়ে না। এই যে নবকুমার মাঝে মাঝে যায়, কই নিতাইয়ের বৌ তো কোনদিন এক

গেলাস জল এগিয়ে দেয় না! খিদে দুর্দমনীয় হলেও, হাত বাড়িয়ে নিতে ইচ্ছে হচ্ছে না যেন।

নবকুমারও ভারী মুখে বলে, "আমার খাবার দরকার নেই।"

সত্য গম্ভীর ভাবে বলে, "তোমাদের দরকারে তো খেতে বলা হচ্ছে না, আমার দরকারেই বলা হচ্ছে। খাও, আমি বসে বসে আমার অপরাধের জবানবন্দী দিচ্ছি।"

অগত্যাই দুজনকে হাত বাড়াতে হয়।

সত্য বলে, "রোজ কোথায় যাই, সে বিত্তান্ত সুহাস জানে, ছেলেরা জানে, জান না শুধু তুমি। জানাব তোমাকে, তবে তার আগে কথা দিতে হবে, যে কাজ করছি নিষেধ করবে না।"

"বাঃ! এ যে সাদা কাগজে সই—", নবকুমার বলে, "কাজটা ভাল কি মন্দ না জেনে—"

সত্য এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শান্ত স্থির গলায় বলে, "তাকাও আমার দিকে। দু বন্ধু আছ, দুজনেই তাকাও, পষ্ট তাকিয়ে বল, আমি একটা মন্দ কাজ করছি, এ সন্দেহ সত্যি আছে তোমাদের মনে? বল—তবে আমি তোমাদের কথার উত্তুর দেব।"

বলা বাহুল্য দু বন্ধুর কেউই চোখ তুলে তাকায় না, বরং দুজোড়া চোখ একেবারে নতমুখী হয়ে যায়।

সত্য একটু অপেক্ষা করে বলে, "বুঝলাম। শোন, রোজ দুপুরে আমি পাঠশালে পড়াতে যাই।"

নবকুমার এবার চোখ তোলে।

চমকে। শিউরে।

নিতাইও প্রায় তাই। বলে, "পড়াতে!"

"হ্যাঁ পড়াতে। সর্বমঙ্গলাতলায় রোজ দুপুরে মেয়েমহলের একটা আড্ডা হয়। গিন্নী, মাঝবয়সী। বৌ ঝি আছে দু-একজন। সাধ করে কেউ বা মায়ের ফুল বিল্বিপত্তর বেছে রাখেন, কেউ বা মালা গাঁথেন, একজন আছেন মুখে মুখে পুরাণ-কাহিনী রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী বলেন, পাঁচজনে শোনে। আবার গালগল্পও খুব চলে। এটা দেখে মাস্টার মশাইয়ের মাথায় এসে গেল—"

আবার মাস্টার মশাই!

নবকুমারের মুখটা বিকৃত হয়ে ওঠে। সত্য সেটা দেখেও দেখল না, বলতে লাগল, "মাথায় এসে গেল এই মেয়েমানুষদের নিয়ে একটা পাঠশালা খুললে কেমন হয়, বৃথা গালগল্পে সময় নষ্ট না করে—খুলে দিলেন 'সর্বমঙ্গলা বিদ্যাপীঠ'! আমায় ধরলেন পড়াতে। বললেন, 'গুরুকে এবার গুরুদক্ষিণা দাও, পড়াও এদের।' দেখলাম কাজটা পুণ্যের, বললাম, 'বেশ'।"

"বললাম বেশ।" নবকুমার চঞ্চল হয়ে বলে ওঠে, "আমাকে একবার শুধোবারও দরকার নেই?"

"আহা, সে অপরাধ তো একশোবার স্বীকার করছি, কিন্তু তুমি যদি 'হুম' করে দিব্যি দিয়ে বসতে? সে ঠেলে তো আর করা হত না? তাই মা সর্বমঙ্গলার নাম করে লেগে গেলাম।...বই খাতা শেলেট সব মাস্টার মশাইয়ের খরচ।"

"তোমার এত বিদ্যে যে মাস্টারি করতে এগোও—"

নবকুমারের এই ব্যঙ্গোক্তিতে সত্য মৃদু হেসে বলে, "মাস্টারি করা তো সত্য বামনীর জন্মগত পেশা গো, আজন্ম তো মাস্টারি করেই এলাম। স্বভাবের দোষেই এগিয়ে পড়লাম, আর বিদ্যেয়? সে ওই পড়াতে পড়াতেই এগোবে। যতটুকু পারি ততটুকুই করে যাব।"

নিতাই আস্তে আস্তে বলে, "বয়সওলা মেয়েরা পড়ায় মন দিচ্ছে?"

"খুব খুব! দু-একজন বাদে শিখেও ফেলেছে চটপট! দেখলে বুঝতে, নিজেরা রামায়ণ-মহাভারত পুরাণকাহিনী পড়বার জন্যে কী আগ্রহ! দেখে মনে হয় জীবন সার্থক হচ্ছে আমার।"

নবকুমারের মুখ তথাপি হালকা হয় না। বলে, "মাস্টার মশাই যে ধর্মের মাথায় ঝাড়ু মেরে বেম্ম হয়েছে, সে কথা নিশ্চয় জানে না ওরা?"

"জানবে না কেন? তবে তোমার মতন সবাই অত গোঁড়া নয়। মাস্টার মশাইয়ের হাতে ভাত তো খেতে যাচ্ছে না কেউ। আর ধর্মের মাথায় ঝাড়ু মারাই বা বলছ কেন? ব্রাহ্মধর্মও হিন্দুধর্ম। কান দিয়ে শোন না তো কিছু? এই যে আজ অত বড় ব্রাহ্মসমাজের চাঁই কেশব সেনের বাড়ি পরমহংস এসেছিলেন—"

"কী কী! কোথায় কে এসেছিলেন?"

নবকুমার কাছা খুলে দাঁড়িয়ে ওঠে।

"পরমহংসদেব,—বলি তাঁর নামটাও কি শোন নি কখনো?"

"শুনব না কেন।" বেজার মুখে বলে নবকুমার, "দক্ষিণেশ্বরে দেখেও তো এসেছি সেবার আপিসের বন্ধুদের সঙ্গে। তা তিনি—"

"হ্যাঁ, তিনি। কেশব সেনের বাড়িতে এসেছিলেন। সেই দেখতেই তো আজ আমার এত দেরি, আর তোমাদের কাছে সব ফাঁস!"

নবকুমার স্তম্ভিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে, "তোমাকে আর কিছু বলবার নেই আমার বড়বৌ, তুমি আমার নাগালের উর্ধ্বে চলে যাচ্ছ। কিন্তু কেশববাবুর বাড়ি গেলে কি করে?"

"কি করে আবার? একা নাকি? আরও কত মেয়েমানুষ গেল। দল করে শেয়ারের ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে—যেখানে দল, সেখানেই বল। কত চমৎকার গান হল, প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল।"

"বুক কাঁপল না?"

"বুক কাঁপবে? কেন?" সত্য অবাক দৃষ্টিতে বলে, "এই যে মেয়েমানুষরা তীর্থে যায়, যোগে গঙ্গাচ্ছান করতে যায়, দেবস্থানে মেলা দেখতে যায়, সাধু-সন্নিসী দর্শনে যায়, কই বুক কাঁপার কথা ওঠে না!...এসব জায়গায় মাঝে মাঝে যেও গো তা হলে দিষ্টিটা খুলবে।"

"আমরা যাব? হুঁঃ।" নবকুমার বলে, "আমরা ক্ষুদ্দুর প্রাণী, আমাদের অত সাহস কোথা?"

সত্য উঠে পড়ে বলে, "নিজেকে চব্বিশ ঘণ্টা 'ক্ষুদ্দুর প্রাণী ক্ষুদ্দুর প্রাণী' ভাবলেই মনটা ক্ষুদ্দুর হয়ে যায়। ক্ষুদ্দুরই বা ভাবতে যাব কেন? সব মানুষের মধ্যেই ভগবান আছেন, এটা মানো তো? সেই ভগবানের জোরেই জোর। সেই ক্ষেত্রে সবাই বড়।"

নিতাই সন্তর্পণে একটা নিশ্বাস ফেলে।

তার বৌকে সে বৌঠানের কাছে আসতে বলে। সাতজন্ম পার করে এলেও নিতাইয়ের বৌয়ের সাধ্য হবে, এসব চিন্তা ধরতে?...নবকুমার ঠিকই বলেছে, সত্য যেন তাদের নাগালের উর্ধ্বে চলে যাচ্ছে।

নবকুমার তাই টেনে নামাতে চেষ্টা করে, "তা সে যাই হোক, বেম্মবাড়ি থেকে এসে কাপড়-চোপড় ছেড়েছ? মাথায় একটু গঙ্গাজল স্পশ্য করেছ?"

সত্য মৃদু হেসে বলে, "সেটা করেছি বাড়ির জন্যে নয়, গাড়ির জন্যে। গাড়ির কাপড়ে কোনকালেই থাকি না। ভেবেচিন্তে বুঝি এই মাথায়

আনলে এতক্ষণে ?…যাক্, ছেলেরা কবে আসবে ? ওরা নেই, বাড়ি ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে—”

নবকুমার বেজার মুখে বলে, “তোমার আবার ফাঁকা ঠেকা ! তোমার মন প্রাণ তো সব তত্ত্বজ্ঞানে ঠাসা। সেখানে আবার স্বামী-পুত্তুরের জায়গা কোথা ? বেশ বুঝছি তোমার বাপের মতন কাষ্ঠ-কঠিন হয়ে যাবে তুমি—”

সত্য শান্ত গলায় বলে, “বাবার মতন ? বাবার চরণের নখের এক কণা হতে পারলেও ধন্য মনে করব নিজেকে।…কিন্তু আজ আবার এ কথা কেন ? নিজে মুখেই তো বলেছিলে, ‘বাবা মানুষ নয় দেবতা।”

“সে কথা এখনও বলছি। কিন্তু দেবতাকে দূরে থেকে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়াই ভাল, নিয়ে ঘর করায় কোন সুবিধে নেই।”

সত্য হেসে ফেলে বলে, “দেখ ঠাকুরপো, তোমার বন্ধুর কত উন্নতি হয়েছে। কত বাক্যি শিখেছেন !”

আর নিতাই এতক্ষণে কিঞ্চিৎ ধাতস্থ হয়ে বলে, “না শিখলে তো শাস্তরই মিথ্যে বৌঠান ! সঙ্গগুণ বলে কথা—”

কথার মাঝখানে হঠাৎ সুহাস পাশের ঘর থেকে এসে বলে, “কে যেন আসছেন মনে হচ্ছে।”

পাশের ওই ঘরের দুটো জানলাই রাস্তামুখো, সুহাস খুব সম্ভব সেখানেই দাঁড়িয়েছিল।

এরা সন্ত্রস্ত হয়ে বলে, “কে ? কে আসছেন ?”

“চিনি না। বুড়ো মতন, কিন্তু খুব লম্বা,—ফর্সা—সোজা—”

লম্বা ফর্সা ! সোজা—

সত্যর বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে। আর পরক্ষণেই সেই ছাঁৎ করা বুকটা হিম করে দিয়ে উঠোনের ওধার থেকে একটি মৃদু গম্ভীর ভারী গলায় প্রশ্ন ধ্বনিত হয়, “বাড়িতে কে আছেন ?”

“বাবা !”

সত্য বিদ্যুৎগতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। তারও আগে নিতাই বেরিয়ে পড়ে, পিছনে নবকুমার। আর ততক্ষণে সেই মৃদু গম্ভীর ভারী গলায় আর একটি প্রশ্ন উচ্চারিত হয়, “এইটাই কি নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি !”

“বাবা ! বাবা গো ! তুমি !”

সত্য প্রণামের মাথাটা না তুলেই বলতে থাকে, "আমার যে সত্যি বলে বিশ্বাস হচ্ছে না—"

"তবে স্বপ্নই ভাব।" বলে মৃদু হেসে রামকালী দাওয়ায় ওঠেন।

নবকুমার নিতাই দুজনেই প্রণাম করে। আর মনে মনে ভাবে, অনেক দিন বাঁচবেন ইনি। ঠিক যে মুহূর্তে ওঁর কথা হচ্ছিল, সেই মুহূর্তেই এমন আকস্মিক এসে পড়া—

আবেগের উচ্ছ্বাস প্রশমিত হতে এবং কুশল বিনিময় হতে বেশ কিছুক্ষণ যায়। তার পর আসার কারণ ব্যক্ত করেন রামকালী। তিনি কাশীবাসের সংকল্প করেছেন, তাই শেষ একবার সত্যকে দেখতে এসেছেন।

কাশীবাস!

সত্য ভেঙে পড়ে বলে, "বাবা! এই সংকল্প করেছ তুমি? তাই এই হতভাগা মেয়েটাকে দেখা দিতে এসেছ? আমি যে কিছু জানি না বাবা, তাহলে সব ফেলে ছুটে চলে যেতাম তোমার কাছে!"

রামকালীর এই আকস্মিক আবির্ভাবে সত্য যেন তার চির-অভ্যস্ত স্থিরতা হারিয়ে ফেলতে বসেছে।

একে তো অপ্রত্যাশিত আনন্দের আবেগ, তার সঙ্গে অন্তর্নিহিত এক চিন্তা—তাদের এই বাসাবাড়িতে বাবা জলগ্রহণ করবেন কিনা। জলও তো কলের জল। যদি এ জল না খান, না হয় গঙ্গাজলেরই ব্যবস্থা করবে, কিন্তু বাসাবাড়ির দোষ খণ্ডাবার উপায় কি?

গেরস্তবাড়িতে গুরু আসা দেখেছে সত্য, সেভাবে করতে পারে, কিন্তু বাবা কি সেই অতি যত্ন অতি সেবা নেবেন? এই সব চিন্তার সঙ্গে উপ্‌চে উঠছে এক অব্যক্ত বিচ্ছেদ-ব্যাকুলতা!

বাবাকে সে নিত্যি দেখছে না সত্যি, কিন্তু জানে বাবা রয়েছেন, সত্যর সেই চির-পরিচিত পরিবেশের মাঝখানে বাবার চিরঅভ্যস্ত জীবনে।

কিন্তু কাশীবাস!

সে যে চিরবিরহের সমতুল্য। এ তো এক প্রকার মৃত্যু। কাশীবাসের সংকল্প মানেই সংসার থেকে মুখ ফিরোনো। সাতপাঁচ চিন্তায় সত্যর কণ্ঠে এই আবেগ, এই আকুলতা।

রামকালী বোঝেন।

তাই রামকালী এই অস্থিরতাকে ঈষৎ প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে দেখেন। আর মেয়ের কথার উত্তরে মৃদু হেসে বলেন, "তুমি যাও নি, আমিই তোমার কাছে এলাম। একই কাজ হল।"

প্রণামান্তে নিতাই চলে গিয়েছিল, নবকুমার সত্যর কথা বলার সুবিধের জন্যে একটু তফাতে গিয়ে বসেছে। সত্য তাই স-আক্ষেপে বলে, "তুই কি আর এক হল বাবা? সে আমি বাপের মেয়ে বাপের কাছে গিয়ে পড়তাম, আগের ছোটটি হয়ে যেতাম। যা প্রাণ চায় বলতাম! আর এ তুমি কুটুম-বাড়ি এসেছ, আমি পরের ঘরের বৌ, আমার প্রতিপদে বাধা। কী বা বলব, কী বা কইব!"

নবকুমার তফাতে বসলেও, এত তফাতে নয় যে সত্যর বাক্যাবলী তার কর্ণগোচরিত হতে কোনও বাধা হচ্ছে। সে সহসা নৈর্ব্যক্তিক স্বগতোক্তি করে ওঠে, "হায় ভগবান! প্রতিপদে বাধা! পা আরো অবাধ হলে কী যে হত!"

রামকালী সচকিত হয়ে বললেন, "কী বললে বাবাজী?"

নবকুমার গম্ভীর গলায় বলে, "না, এমন কিছু নয়। তবে নাকি আপনার মেয়ে আক্ষেপ করছেন, প্রতিপদে বাধা, তাই বলছিলাম! আপনাদের নিত্যানন্দপুরে এমন কোন্ মেয়েটা আছে, আর আমাদের বারুইপুরে এমন কোন্ বৌটা আছে, যে আপনার মেয়ের সমতুল্য স্বাধীন, তাই বরং জিজ্ঞেস করুন।"

রামকালী অনুভব করেন এটা নালিশের সুর।

তাই মৃদু হাসেন।

বলেন, "তা যদি হয় সেটা তো ভালই। আমার মেয়ে যে 'ঝাঁকের কৈ' হবার জন্যে জন্মায় নি, সে আমি তার শৈশবকালেই বুঝেছি।"

সত্য আর বাপের উপস্থিতি স্বামীর উপস্থিতি ইত্যাদি মানতে পারে না, ঘোমটাটা আর একটু টেনে বলে, "আচ্ছা বাবা, তুমি এই তেতেপুড়ে এসেছ, এ সময় নালিশ ফোরেদ করতে বসাটা খুব ভাল হচ্ছে? থাকবে তো দু'চার দিন, পরে যত খুশি—"

"ওরে বাবা! দু'চার দিন কি রে? একটা দিনের জন্যে চলে এলাম। কাল যাবো।"

"একটা দিন! বাবা মাত্তর একটা দিনের জন্যে এলে তুমি?" সত্য কেঁদে ফেলে, "তোমার সঙ্গে যে আমার অনেক কথা—"

হ্যাঁ, বাবার সঙ্গে সত্যর অনেক কথা।

কতদিন ভেবেছে চিঠি লিখে সব বলে বাবাকে, প্রশ্ন করে—কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা ভুল, কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখেছে অগাধ কথা! এত কথা কি চিঠিতে লেখা যায়? তা ছাড়া উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্যে বক্তব্য বোঝানো যায়, শুধু একতরফা পেশ করা যেন কৈফিয়ত দাখিল করা।

বাবা যদি উত্তরে লেখেন, এত কথা আমায় লেখার উদ্দেশ্য কি?

অথচ—ব্রাহ্মধর্ম কি, কোন একজন চিরহিতৈষী গুরুজন যদি হঠাৎ ব্রাহ্মধর্ম নিয়ে বসেন, তাঁকে ত্যাগ করাই সমীচীন কিনা, "গেরস্তঘরের মেয়ে, অথবা গেরস্তঘরের বৌ," এই অপরাধে জগৎ-সংসারের সকল প্রকার কাজ থেকে তাদের বঞ্চিত হওয়াই বিধি কিনা, স্বামী যদি হিতাহিতে অন্ধ হন, মেয়েমানুষের সেই অন্ধপথেই চলা নিয়ম কিনা, এমন অনেক প্রশ্ন তো আছেই, সর্বোপরি প্রশ্ন শঙ্করীর মেয়ের প্রশ্ন। শঙ্করীর কথা বলে যখন বাবাকে চিঠি লিখেছিল, তখন রামকালী উত্তর দিয়েছিলেন, "যে যত বড় অপরাধেই অপরাধী হোক, সে যদি অনুতপ্ত হয়ে থাকে, তাকে ক্ষমা করাই কর্তব্য। তা ছাড়া তোমার বিবেচনার ওপর আমার আস্থা আছে।"

সুহাস সম্পর্কে কোন্ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, এ একবার বাবাকে জিজ্ঞেস করবার তার বিশেষ ইচ্ছে।

কিন্তু বাবা কিনা একদিন মাত্র থাকবেন?

তার মানেই সত্যর এই বাসাবাড়িতে তিনি খাওয়া-মাখা করবেন না। হয়তো ফলমূল আর গঙ্গাজল খেয়েই একটা বেলা কাটিয়ে দেবেন। সত্যর আর পিতৃসেবার পুণ্য হবে না। এত সব উচ্ছ্বাস মনের মধ্যে আলোড়িত হতেই চোখের জল বাঁধ মানে না।

রামকালী আস্তে তার মাথায় একটু স্পর্শ রেখে বলেন, "একটা দিনই কি কম হল রে? কত কথা বলবি, বল্ না?"

"আর কথা! আমার তো শুধু উপ্‌চে উপ্‌চে কান্নাই আসছে বাবা!"

আঁচল ভিজে জব্‌জবে হয়ে ওঠে সত্যর।

অনেকক্ষণ পরে প্রশমিত হয় সে কান্না। কথাও হয়। যত কিছু বলার ছিল সব বলে ফেলে সত্য, তার চিরদিনের ধ্রুবতারার কাছে।

রামকালী নবকুমারকে মৃদু ভর্ৎসনা করেন। বলেন, "সে কি! মাস্টার মশাই তোমার চিরহিতৈষী, তাঁকে ত্যাগ করবে কি? তাঁর ধর্ম, বিশ্বাস তাঁর কাছে। এই যে আমি, আমি শাক্ত কি বৈষ্ণব, এইটা কি দেখতে যাবে তোমরা? না দেখবে—বাবা? গুরু, শিক্ষক এঁরাও তেমনই পিতৃতুল্য! তা ছাড়া তিনি তো তাঁর ধর্মবিশ্বাস তোমার ওপর চাপাতে আসছেন না? তোমার কোনো অনিষ্ট আসছে না তা থেকে? তবে?"

সত্যর ওই পাঠশালায় পড়ানো শুনে রামকালী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে একটি নিশ্বাস ফেললেন। তার পর বললেন, "সত্য তোর মাকে তোর মনে পড়ে?"

"মাকে মনে পড়ে না? কী বলছ বাবা?" আবার সত্যর চোখ উপচে ওঠে।

"না, তাই বলছি। তোর মা থাকলে, একথা শুনে ভয় পেত, বুঝলি? নির্ঘাৎ ভয় পেত। আবার আড়ালে বলতো, আমি জানি ও আমার ক্ষণজন্মা মেয়ে।"

উত্তর পেয়ে যায় সত্য। তার কাজ ভুল কি ঠিক জেনে যায়।

শুধু সুহাসকে নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা চলে। কিছুটা বাদ-প্রতিবাদও বুঝি। তখনও সত্য সুহাসকে সামনে আনে নি রামকালীর।

রামকালী বলতে চাইছিলেন, বিয়ের চেষ্টার প্রয়োজন কি? বেশ তো লেখাপড়া শিখছে ভাল কথা। নিজের জীবিকা নিজে অর্জন করতে পারে, সেটা মঙ্গল। কলকাতায় তো আজকাল এ রকম হচ্ছে। বিদুষী মেয়েরা গৃহশিক্ষয়িত্রী হয়ে অথবা মেয়েস্কুলে পড়িয়ে উপার্জন করছে।

"কিন্তু বাবা—", সত্য বলে, "মা-টা তো চিরদুঃখিনী হয়ে দুঃখে-দুঃখেই মরল। মেয়েটাও কোনদিন ঘর-সংসারের মুখ দেখবে না?"

"মা-বাপের পাপের প্রায়শ্চিত্ত তো সন্তানকেই করতে হয় সত্য।"

"আর যদি ইচ্ছে করে কেউ ওকে বিয়ে করতে চায়?"

রামকালী মাথা নেড়ে বলেন, "কে চাইবে? একে তো জন্মের গোড়াতেই অত বড় গলদ, তার ওপর মেয়ের যথেষ্ট বয়েস হয়ে গেছে, বিধবা কি কুমারী তারও নিশ্চয়তা নেই—"

সত্য তখন নিজের গোপন ইচ্ছে ব্যক্ত করে। মেয়েটাকে যদি ব্রাহ্মধর্ম

গ্রহণ করিয়ে ব্রাহ্মসমাজের কোনও সমাজ-সংস্কারক পরহিতৈষী যুবকের হাতে তুলে দেওয়া যায়! সুহাসের যোগ্য বয়সের অবিবাহিত ছেলে ও সমাজে পাওয়া যায়।

রামকালী যেন এ প্রস্তাব সমর্থন করেন না। তুচ্ছ একটা মেয়ের বিয়ে বিয়ে করে এত কাণ্ডর দরকার কি, এই যেন তাঁর মত। তাই সহসা গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন, "যদি জিজ্ঞেসই করছ তা হলে বলি, একটা খুঁতওলা বংশের ধারা বাড়িয়ে চলে লাভ কি?"

"লাভ ওই মেয়েটার সংসার। মেয়ে বলেই কি 'তুচ্ছ' বাবা? একটা মানুষের জীবন তো?"

"মানুষের জীবন শুধু ভোগেই সার্থক নয় সত্য, ত্যাগেও সার্থকতা আছে। ও তো জানে ও বিধবা, বালবিধবার যেমন ভাবে জীবন কাটে—"

"কী ভাবে আর তাদের কাটে বাবা?" সত্য হতাশ নিশ্বাস ফেলে বলে, "চিরদুঃখেই কাটে। পিসঠাকুমার মতন আর ক'জন হয়? তাও তিনিও মনের দাহয় শুচিবাই করে বিশ্বসুদ্ধু লোককে অতিষ্ঠ করেছেন—"

রামকালী সহসা স্তব্ধ হয়ে যান। যেন মোক্ষদাকে চোখের ওপর দেখতে পান। পূর্বের সেই সুবর্ণবর্ণা তীব্র দীপ্তময়ীকেও দেখেন, আর তার পিছনে —কায়ার পিছনে ছায়ার মত, সূর্যের পিছনে রাহুর মত, বর্তমানের রোগজীর্ণ মোক্ষদার প্রেতাত্মাকেও দেখতে পান। যে মোক্ষদা এখন ভীমরতী হয়ে যা তা করে বেড়াচ্ছেন। লুকিয়ে চুরিয়ে খাবার জন্যে নাকি সর্বদা ছোঁক ছোঁক করে বেড়ান তিনি, "দেখ্ তোর, না দেখ্ মোর" নীতিতে মুঠো করে মাছভাজা নিয়ে মুখে পুরে বসে থাকেন!

আর সারদা রাতদিন গালমন্দ করে টেনে টেনে নিয়ে গিয়ে পুকুরে চুবিয়ে আনে।

একথা তবু জানে না সত্য।

সত্য সেই শুচিবাইটাই জানে।

রামকালী একটু চুপ করে থেকে বলেন, "দেখ! তেমন পরোপকারী ভাল ছেলে যদি পাও!"

"তোমার আশীর্বাদ না পেলে, এত বড় একটা কাজ করতে ভয় খাচ্ছি বাবা! তুমি মন খুলে সায় দিয়ে যাও—"

রামকালী একটু হেসে বলেন, "মন কি ঘরের জানলা-দরজা সত্য, যে

পায়ের জোরে খোলাবি ? তবে—আশীর্বাদ আমি করছি। তোর কাজে ভগবান সহায় হবেন।"

সত্যর আশঙ্কাই ঠিক।

রামকালী সামান্য কিছু ফলমূল গ্রহণ করেন, এবং জানান পরদিনও তাঁর পূর্ণিমার ব্রত।

"এই বুঝেই তা হলে তুমি এসেছ বাবা ?" সত্য কাঁদ কাঁদ হয়ে বলে, "আমি তোমার এমন অধম মেয়ে যে জীবনে একদিন রেঁধে ভাত দিতে পারলাম না।"

রামকালী সহসা একটি গভীর নিশ্বাস ফেলে বলেন, "জীবনের কথা কি এখুনি বলে শেষ করে ফেলা যায় সত্য ? জীবনের পরিণতি গুহার অন্ধকারে।"

তার পর বলেন, "এত কথা হল, কই সে মেয়েটাকে তো দেখলাম না ?"

"কি জানি বাবা, কি লজ্জা ঢুকেছে তার মনে, চৌকিতে পড়ে কাঁদছে।"

কাঁদছে ! রামকালী একটু চকিত হন।

আর কিছু বলেন না।

কিন্তু পরদিন সকালে যখন স্নান-আহ্নিক সেরে বসেছেন, তখন সুহাস মাথা নীচু করে এসে আস্তে আস্তে প্রণাম করে রামকালীকে।

পূব জানলা দিয়ে সকালের আলো এসে মেয়েটার মুখে পড়ে যেন তাকে একটা স্নিগ্ধ কৌমার্যের দ্যুতিতে স্নান করিয়ে দিয়েছে। আর নম্র অথচ দৃঢ় মুখের রেখায় একটি প্রত্যয়ের আভা। পাতলা ঋজু দীর্ঘ দেহের গড়নেও সেই প্রত্যয়ের দৃঢ়তা।

রামকালী বুঝি এমনটি আশা করেন নি।

রামকালী যেন বিচলিত হন।···হঠাৎ বহুদিন পূর্বের একটা কথা মনে পড়ে যায় তাঁর। মনে পড়ে যায়, পুকুরঘাটের ধারে বসে থাকা একটা বিধবা মূর্তি ! কেমন সেই মূর্তি রামকালী কি দেখেছিলেন ?

মাথায় হাত ঠেকিয়ে আশীর্বাদ করেন রামকালী।

তার পর গম্ভীর শান্ত গলায় বলেন, "সত্য, এ যে তপস্বিনী উমা !"

সত্য হাসি হাসি মুখে সুহাসের মুখের দিকে তাকায়। এ প্রশংসা যে তারই। সুহাস যে তার হাতে গড়া প্রতিমা।

কচি নয়, শিশু নয়, পনেরো বছরের ধাড়ী মেয়েটাকে কাছে এনেছিল সত্য, তার বহুবিধ অশিক্ষা কুশিক্ষা আর চরিত্রগত বহু দোষের সমষ্টি সমেত।

এই ক'বছরে মাত্র ভেঙেচুরে গড়েছে সেই মেয়েকে।

অবশ্য প্রকৃতির নিয়মে তার নিজের ভিতরেও একটা প্রবল ভাঙাগড়ার কাজ চলেছে। মায়ের ওই আকস্মিক বীভৎস মৃত্যু, এবং তার পরবর্তীকালে মায়ের জীবন-ইতিহাস জানার ফলে সেই বিরাট ওলট-পালটটা সংঘটিত হয়েছিল।

তার পর এসেছে সুহাসের নবজন্মের পালা!

কোথায় দত্তদের বাড়ির সেই বিলাসিতায় আবিল অশুচি আবহাওয়া, আর কোথায় সত্যর দৃঢ় চরিত্রের দৃষ্টান্ত! তা ছাড়া স্কুলের জীবন! সে যেন স্বর্গের জগৎ!

সুহাসের প্রকৃতিই শুধু বদলায় নি, আকৃতিও বদলেছে। যেমন বাচাল মেয়েটা মিতভাষিণী হয়ে গেছে, তেমনি হঠাৎ লম্বা হয়ে গিয়ে, গোলগাল পুষ্টদেহ মেয়েটা হয়ে উঠেছে বেতের ডগার মত ছিপছিপে লম্বা পাতলা। একটু বুঝি কৃশই।

যে কৃশতাকে দেখে তপস্বিনী উমার তুলনা মনে পড়েছে রামকালীর।

সত্য হাসি হাসি মুখে বলে, "পর পর দুবছর ফার্স্ট হল—"

"সত্যি নাকি!"

বলেন রামকালী।

সুহাস বোধ করি লজ্জা পেল। মৃদু কুন্ঠিত একটু হাসি হেসে বলল, "দাদুর নাতিদের ফার্স্ট হওয়ার খবর তোলা থাকল, আর—"

তোলা নেই।

সেকথা শুনেছেন রামকালী। নবকুমার বলেছে। নাতিদের সঙ্গে দেখা হল না বলে দুঃখ প্রকাশও করেছে। রামকালী বলেছেন, "তা সত্যি, দেখি নি অনেক দিন। জলপানি পেয়েছে, শুনে খুশি হলাম।"

এসব গত রাত্রের কথা।

সুহাস জানে না। সুহাস নিজের লজ্জা ঢাকতে তাড়াতাড়ি ওদের কথা তোলে।

রামকালী মৃদু হেসে বলেন, "নাতির ফার্স্ট হওয়া আহ্লাদের কথা, কিন্তু নতুন কথা নয় দিদি, নাতনীর ফার্স্ট হওয়াটাই নতুন কথা!...আশীর্বাদ করি সুখী হয়, সৌভাগ্যবতী হও!"

সত্যর দিকে ফিরে বলেন, "মন খুলেই আশীর্বাদ করলাম রে!"

সত্যর চোখ আবার জলে ভরে আসে।

বাবার কথাবার্তার ধরন বদলে গেছে। চিরদিনের সেই দূরত্ব বজায় রাখা মাপা-জোপা কথার জায়গায় এখন যেন নিকটের সুর।

সংসার থেকে মুখ ফিরোবার কালে কি সহসা সংসারের প্রতি মমত্ববোধ করছেন রামকালী?

নাকি তাঁর এই সৃষ্টিছাড়া সংসার-ছাড়া মেয়েটার কার্যকলাপ তাঁকে বিচলিত করেছে?

যাত্রাকাল যত নিকটবর্তী হয়, সত্যর গলার শব্দ তত ভার হয়ে আসে। "থেকে যাও" বলে অনুরোধ করারই বা পথ কোথা? এখানে একমুঠো ভাত খাবার অনুরোধ চলবে না! যেতেই দিতে হবে।

ছোট ছোট কথা, ছোট ছোট নিশ্বাস!

"কবরেজী কি ছেড়ে দেবে বাবা?"

"ছেড়ে দেব? না ছেড়ে দেব কেন সত্য? ওই বিদ্যেটুকু দিয়ে যতটুকু যার উপকার হয়—তবে পেশাটা ছেড়ে দেব।"

অর্থাৎ "দক্ষিণা"টা বাদ।

"খুব কষ্ট করে থাকবে না তো বাবা?"

"বিশ্বনাথের খাসমহলে কষ্ট কিরে পাগলী!"

"শরীর-অশরীরে এই বেয়াড়া অবাধ্য মেয়েটা একটু খবর পাবে তো বাবা?"

"সে বাপু এখন বাক্যদত্ত হতে পারছি না।"

"সে জানি! সে কি আর জানতে বাকী আছে আমার!"

নবকুমার পায়ের ধুলো নিয়ে বলে, "কবে যাত্রা?"

"এই সামনের অষ্টমী তিথিতে নৌকা ছাড়বে।"

"নৌকো!" নবকুমার সাহসে ভর করে বলে, "কেন এখন তো রেল-গাড়ি চলছে—"

"চলছে! নৌকোও তো চলে এসেছে।" রামকালী হাসেন, "সে তো চলৎশক্তি হারায় নি।"

"ওতে একদিনে পৌঁছে যেতে—", সত্য এগিয়ে এসে বলে।

রামকালী মৃদু হাসেন, "অত তাড়াতাড়িই বা কী? মুমূর্ষু রোগী দেখতে তো যাচ্ছি না? তীর্থের পথটাই তীর্থ, পথটাকে চোখ বুজে অতিক্রম করে লাভ কি! এ একেবারে মা গঙ্গার কোলে চড়ে বসবো, কোলে কোলে চলে যাব।"

"বাবা ঠিকানা?"

"ঠিকানা? সে কি আমি এখান থেকে ঠিক করে যাচ্ছি রে?"

"গিয়ে পৌঁছনো খবরে জানাবে তা হলে?"

"এই দেখ! এ মেয়ের কেবল সত্যবন্দী করিয়ে নেবার ফন্দী!"

"হবেই তো! যেমন নাম রেখেছ।"

একেবারে যাবার সময়, রামকালী সহসা বেনিয়ানের পকেট থেকে দুখানি পাকানো কাগজ বার করে বলেন, "এই নাও, এই দুটি জিনিস রাখো।"

"কী এ?"

সত্য হাত পাতে না, চমকে তাকায়।

রামকালী বলেন, "একখানি তোমার জন্মপত্রিকা। আমার কাছে ছিল এযাবৎ—"

"ও আমি নিয়ে কি করব বাবা?"

"থাক! থাকা ভাল। আর এইটা—", রামকালী একটু থামেন, "দেশের বিষয়-আশয় যা কিছু বংশের ছেলেদেরই থাকল! ত্রিবেণীতে আলাদা কিছু লাখরাজ জমি ছিল, সেটা তোমার নামে—"

"না বাবা না", সত্য কেঁদে ওঠে, "ও আমি চাই না। আমি তোমার মেয়ে-সন্তান, শুধু স্নেহের অধিকারী—"

"তা এটুকু সেই স্নেহেরই চিহ্ন ধরে নাও।"

"বাবা গো, চিহ্ন দিয়ে স্নেহ বুঝবো তোমার? না বাবা দরকার নেই আমার।"

সত্য হাতও পাতে না, চোখের আঁচলও নামায় না।

এত কান্না বোধ করি সারা জীবনে কাঁদে নি সত্য। মা মরতেও নয়!

রামকালী মুখটা ফিরিয়ে আত্মস্থ করে নেন নিজেকে, তার পর নবকুমারের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, "রাখো!"

নবকুমার সত্যর এই বাড়াবাড়িতে চাঞ্চল্য বোধ করছিল।

ভাবছিল, "ছেলে নেই, মেয়ের তো সবই পাবার কথা। বলে মহারাণী

ভিক্টোরিয়া রাজ্যটাই পেলেন। সে সব কিছুই না, মুষ্টিভিক্ষের উপহার, তাও মেয়ে নিচ্ছেন না। অতএব নবকুমারের হাত বাড়াতে দেরি হয় না।

রামকালী পলাকিতে ওঠেন।

আপাততঃ পালকিতেই চড়লেন। কলকাতার বিশিষ্ট কয়েকটি দেবস্থান দেখবেন, তার পর নৌকোয় উঠবেন। রেলটা পছন্দ করেন না রামকালী। বলেন, "তেমন তাড়া না থাকলে দরকার কি?"

পালকিটা যতদূর দেখা যায়, দরজায় দাঁড়িয়ে দেখে সত্য। তার পর বাড়ির মধ্যে ঢুকে এসে বসে পড়ে। অনেকক্ষণ পরে চোখ মুছে নিশ্বাস ফেলে বলে, "নেহাত নিরুপায় যদি না হতাম, ঠিক আমি বাবার সঙ্গে চলে যেতাম!"

নবকুমার বলে, "তা নিরুপায় আর কি? ক'টা দিন নয় সুহাস চালিয়ে দিত, গেলেই পারতে! যে দুদিন না কাশী যান উনি, থেকে আসতে! বললে না তো?"

সত্য আর একটা লজ্জা আর ক্ষোভ মেশানো নিশ্বাস ফেলে বলে, "সংসার চালানোর কথা নয়! অন্য কথা! শরীরের অবস্থাই মনে হচ্ছে আমার ভাল নয়! জানি না বুড়ো বয়সে আবার কপালে কী গেরো আছে—"

নবকুমার কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে সত্যর সেই লজ্জা-ক্ষুব্ধ বিপন্ন মুখের দিকে, খবরটা হৃদয়ঙ্গম করতে তার কিছুক্ষণ লাগে। তারপর অকস্মাৎ এক অপ্রত্যাশিত পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে সে।

ওঃ ভগবান!

এইবার তাহলে সত্যর পায়ে একটু ছেকল পড়বে! এই ছেকল পড়ার কথাটাই সব চেয়ে আগে মনে পড়ে নবকুমারের। আর তাতেই আহ্লাদ উথলে ওঠে। হঠাৎ সত্যর একটা হাত চেপে ধরে বলে, "সত্যি?"

আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সত্য বলে, "আহ্লাদে নাচবার কিছু নেই।"

উনচল্লিশ

ভরা দুপুর।

নৌকো মাঝগঙ্গায়।

দাঁড়টানার একটানা একটা শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। শুধু খানিক খানিক সময় অন্তর দাঁড়ি-মাঝিদের এক-একটা দুর্বোধ্য হুঙ্কার স্তব্ধ প্রকৃতিকে যেন চমকে চমকে দিচ্ছে।

নৌকোর আশেপাশে, দাঁড়ের ধাক্কায় ভেঙে পড়া জলের বৃত্তরেখা, দূরে ঢেউ খেলানো জলের রেশম চিকন গায়ে বাতাসের মৃদু কাঁপন।

সেই ঢেউ খেলানো ঘি-রঙা রেশমী ওড়নার গায়ে হীরেকুচি রোদের উজ্জ্বল সমারোহ।

রামকালী সেই সমারোহের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন।

ভরদুপুরের অচঞ্চল গঙ্গা. নৌকোর গতি মৃদু-মন্থর, তাই ভিতরে আলোড়ন নেই।

কিন্তু মনের ভিতরে ?

যে মন ওই স্তব্ধ দেহদুর্গের মধ্যে চিরদিন সমাহিত থেকেছে ?

না, আলোড়ন নয়, শুধু যেন সেই চিরসমাহিত মনটাকে আজ একটু মুক্তি দিয়ে ফেলেছেন রামকালী। ছেড়ে দিয়েছেন ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়াবার জন্যে।

এই আটষট্টি বছর ধরে যে দীর্ঘ প্রান্তরটা পার হয়ে এলেন রামকালী, সেই প্রান্তরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে সেই হঠাৎ ছাড়া পাওয়া মনটা।

এর আগে কোন দিন এমন করে স্মৃতি-রোমন্থন করেন নি রামকালী। আজ করছেন। হয়তো বা অজ্ঞাতসারেই করছেন।

আজ সংসারের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন রামকালী, পিঠ ফিরিয়েছেন তার দিকে। কিন্তু বিদায় গ্রহণের প্রাক্কালে কত ব্যবস্থা, কত হিসেবনিকেশ, কত নির্দেশ, কত বন্দোবস্ত!

গ্রামে যে টোলটি স্থাপন করেছেন, যে দুঃস্থ বিদ্যার্থী কজনের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করেছেন, একজন কবিরাজ বসিয়ে যে দাতব্য কবিরাজখানাটি প্রতিষ্ঠা করেছেন, গ্রীষ্মের দিনের জন্যে যে জলসত্রটি খুলেছেন, সেগুলি যাতে

বন্ধ হয়ে না যায়, তার জন্য উচিতমত নিষ্কর জমি দানপত্র করে দিয়ে আসতে হল। যে কজন দুঃস্থ পণ্ডিত বৃত্তি পেয়ে আসছিলেন, তাঁদের বৃত্তি বজায় রাখার জন্যও জমি ব্যবস্থা করতে হল। তাছাড়া বরাবর গ্রামের কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতা, অবীরা অসহায়া বিধবা, রুগ্ণ অপটু পুরুষের, অথবা মাতৃপিতৃহীন শিশুর একরকম আশ্রয়স্থল ছিলেন রামকালী।

দূর দূর জায়গা থেকেও লোক এসে হাত পেতেছে রামকালীর কাছে।

এসব লোক যাতে একেবারে না বঞ্চিত হয়, একেবারে না বিতাড়িত হয়, তার জন্যও রাসুকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, একখানা বড় তালুকের মাধ্যমে।

অবশ্য রাসু যদি নিয়ম বজায় না রাখে, রাসু যদি সে তালুকের উপস্বত্ব আত্মসাৎ করে, করবার কিছু নেই। কারণ এটা একটা অনিয়মিত ব্যাপার।

তবু রাসুকেই ভার দিয়ে আসতে হল। রাসু ছাড়া আর কে মানুষ হল? নেড়ুটার তো উদ্দেশই পাওয়া গেল না প্রায়। ঠিকানা না জানিয়ে দু'একটা চিঠি দিয়ে ছিল কবে কবে যেন। তাতেই জানা আছে, মরে নি বেঁচে আছে। রাসুর আর ভাইগুলো তো অমনিষ্যি। সেজকাকার দুই ছেলে কুচুটের রাজা। রাসুর বড় ছেলেটা বাবুর শিরোমণি হয়ে উঠছে। হচ্ছে সারদার দোষেই কতকটা।

সারদা যেন স্বামীর সঙ্গে রেষারেষি করে ছেলেকে 'বাবু' করে তুলতে বদ্ধপরিকর। সব কথায় বলে, 'ও পারবে না!'

ওই একটা মেয়ে! অদ্ভুত উল্টোপাল্টা!

রামকালী নিশ্বাস ফেলে ভাবলেন, ওর বিধাতা কি ওকে কতকগুলো উল্টোপাল্টা জিনিস দিয়েই তৈরী করেছিলেন, নাকি জীবনটা ওর উল্টোস্রোতের মুখে পড়ল বলেই?

রামকালী ওর হদিস পান না।

কখনো ওর ভারসহ কর্মনিষ্ঠা, ওর অসাধারণ নৈপুণ্য, ওর অগাধ সহিষ্ণুতা দেখে তাক লেগে যায়, কখনো ওর বিস্ময়কর নির্লিপ্ততা, দৃষ্টিকটু ঔদাসীন্য দেখে স্তব্ধ হতে হয়।

দুর্গোৎসবের সমস্ত ভার সারদা একা মাথায় তুলে নিতে ভয় পায় না, দিয়েও নিশ্চিন্ত হন রামকালী। কিন্তু এবারে হঠাৎ সারদা শান্ত ঘোষণায় জানিয়ে দিল, খুড়োঠাকুর যেন এ ভার আর কারো উপর ন্যস্ত করেন।

কেন?

'কেন'র কিছু নেই।

বাড়িতে তো আরো লোক আছে।

গ্রামের কজন বয়স্কা ব্রাহ্মণ-কন্যাকে ডেকে রামকালী জানিয়েছিলেন বড় বৌমার শরীর অসুস্থ, অতএব তাঁরা যদি—

তা তাঁরা এসেছিলেন, তুলেও দিয়েছিলেন পূজো।

কিন্তু অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট!

পুরোহিত পূজোয় বসে হাতের কাছে উপকরণগুলি ঠিকমত না পেয়ে রেগে আগুন।

তবু রামকালী যেন সারদার উপর রাগ করতে পারেন না। পারেন না অগ্রাহ্য করতে। অনুভব করেন, সারদার মধ্যে 'বস্তু' ছিল, কিন্তু ভাগ্যের প্রতিকূলতায় সেটা খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে।

ভাগ্যের প্রতিকূলতায়?

এইখানেই কোথায় যেন একটা খোঁচ। অনেকবার ভেবেছেন রামকালী, ভাগ্য ছাড়া আর কি? মানুষ তো নিমিত্ত মাত্র, কিন্তু সে বিশ্বাসে অটুট থাকতে পারেন নি।

যাক্, তবু সকলের যথাসাধ্য সুব্যবস্থা করে এসেছেন রামকালী, এখন যার যা নিয়তি। তথাপি অনেকগুলো মুখ যেন হতাশ দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছে রামকালীর দিকে। যেন বলছে…ফেলে চলে গেলে আমাদের?…সত্যি!… কই যাবে এ কথা তো বল নি কোনদিন? আমরা যে বড় নিশ্চিন্ত ছিলাম!

এই মুখগুলোর মধ্যে সারদার মুখটা বড় স্পষ্ট, সারদার চোখটা বড় তীব্র। হতাশা নয়, যেন সে দৃষ্টিতে অভিযোগ।

কিন্তু অনেক বছর আগে আর একবার যখন সংসার ত্যাগ করেছিলেন রামকালী?

তখন কি একবারও পিছনপানে তাকিয়েছিলেন? নাঃ! কী হালকা, কী বন্ধনহীন মন নিয়ে সেই যাওয়া!

বৈরাগ্যের কারণটা নিতান্তই স্থূল ছিল সত্যি, বাপের খড়ম থেকে সে বৈরাগ্যের উদ্ভব। রাগ দুঃখ অভিমান ক্ষোভ সব মিলিয়ে তীব্র একটা অনুভূতি যেন ঠেলে ঘরের বার করে দিয়েছিল সেই কিশোর বালককে, যাকে এখন যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন রামকালী।

ছেলেটা একখানা নৌকোর পাটাতনের মধ্যে ঢুকে বসে রইল সারাটা দিন, কেউ তেমন লক্ষ্য করল না, একসময় ছেড়ে দিল নৌকো। ছেলেটা রইল ঘাপটি মেরে।

তার পর অনেকক্ষণের পর ধরা পড়ল।

তখন নৌকো অনেক এগিয়েছে।

রামকালী দেখছেন, মাঝি-মাল্লারা জেরা করছে ছেলেটাকে। ছেলেটা স্বচ্ছন্দে উত্তর দিচ্ছে—তার কেউ কোথাও নেই, গরীব ব্রাহ্মণসন্তান, ভাড়া-টাড়া দিতে পারবে না, নৌকো যেখানে যাবে, সেখান পর্যন্ত যদি তাকে দয়া করে নিয়ে যায় তারা।

অবস্থা বুঝে মমতাবশতঃই হোক, অথবা দেবকান্তিরূপ দেখেই হোক, ছেলেটাকে তারা সমাদর করে নিয়ে গিয়েছিল মুকস্থদাবাদ অবধি।

সেখানে মিলে গেল গোবিন্দ গুপ্তর আশ্রয়।

সে যেন ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আশীর্বাদের মত।

সেই নিতান্ত কিশোর ছেলেটার মনে হয়েছিল, পৃথিবীটা এত বড়! ভগবান এত দয়ালু! অথবা ইনিই ভগবান? পুরাণ উপপুরাণের গল্পের মত ছদ্মবেশ ধরে রামকালীকে কৃপা করতে এসেছেন?

গঙ্গার ঘাটেই বসেছিল ছেলেটা।

কবিরাজ স্নানে এসেছিলেন।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, "চিনছি না তো তোমাকে? কাদের ছেলে বাবা?"

এখন ভেবে হাসি পাচ্ছে, রামকালী স্বচ্ছন্দে বলেছিলেন, "তোমার সে খোঁজে দারকার কি?"

"দরকার কিছু আছে বৈকি!" গোবিন্দ গুপ্ত একটু হেসে বলেছিলেন, "কাদের ছেলে, কেন একা ঘুরে বেড়াচ্ছ, রীত-চরিত্তিরই বা কেমন, এসব না জানলে চলবে কেন?"

"চলবে না?"

"না। ভিনগাঁয়ের ছেলেকে বিশ্বাস কি?"

পরে জেনেছিলেন রামকালী, ওটা একটা চালাকি। রাগিয়ে দিয়ে পরিচয় আদায়ের চেষ্টা। কিন্তু সেদিন সেই ছেলেটার সে কথা বোঝবার ক্ষমতা ছিল না। সে তাই ক্রুদ্ধগলায় বলে উঠেছিল, "বিশ্বাস করতে কে পারে

ধরেছে তোমায়? আমার ইচ্ছে আমি বসে আছি। ঘাট কি তোমার কেনা।"

সেই সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় ছেলেটার কথায় যে বেশ কৌতুক অনুভব করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। এবং ইচ্ছে করেই খানিকক্ষণ ধরে বাদ-বিতণ্ডা চালিয়েছিলেন মজা উপভোগ করতে।

তার পর কেমন করেই যেন সন্ধি হয়ে গেল। আর কেমন করেই যেন ছেলেটা আশ্রয় পেয়ে গেল তাঁর কাছে।

কিন্তু শুধুই কি আশ্রয়?

নিঃসন্তান দম্পতির হৃদয় উজার করা ভালবাসার অধিকারী হয় নি সেই মুখর ছেলেটা?

আস্তে আস্তে সেই মুখরতা চপলতা সব অন্তর্হিত হয়ে স্থির শান্ত মেধাবী একটি ছাত্রে পরিণত হল সে। আর শুধু স্নেহেরই নয়, তাঁদের যথাসর্বস্বেরই উত্তরাধিকারী হয়ে উঠল।

আশ্চর্য! তবু এক দিনের জন্যে নিজে হাতে রেঁধে খাওয়ান নি কবিরাজ-গৃহিণী। অন্য এক ব্রাহ্মণবাড়িতে খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

সমস্ত দৃশ্যগুলো যেন হঠাৎ চোখের উপর জলজ্বলিয়ে উঠছে।

রামকালী আবদার করছেন, জেদ করছেন, "আমি তো তোমাদের জাতেরই হয়ে গেছি" বলে যুক্তি খাড়া করছেন, কবিরাজ-গৃহিণী হাসিভরা মুখ আর চোখভরা জল নিয়ে বলছেন, "পাগলা ছেলে, তাই কখনো হয়?"

"তোমাদেরও তো পৈতে আছে—"

বলেছিলেন রামকালী।

গোবিন্দ গুপ্ত হেসেছিলেন, "আছে, তা সত্যি। তবে কি জানিস? সবেরই তো জাত থাকে? কেউটে গোখরো আর ঢোঁড়া বোড়া যেমন এক নয়, তেমনি তোর পৈতে আর আমার পৈতে এক নয়। তোকে তো আমার দত্তক নিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু নিই না। কখন কি অপরাধ ঘটে কে জানে।"

স্নেহের সঙ্গে শ্রদ্ধার এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ।

রামকালী প্রথমে বলেছিলেন, "আমার কেউ কোথাও নেই।"

তারপর ধীরে ধীরে সবই প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল।

গোবিন্দ গুপ্ত বলতেন, "দেখ, তোর মা-বাপকে খবর না দেওয়া আমার পক্ষে মহাপাপ হচ্ছে, তুই নিষেধ করিস না, আমি কোন প্রকারে খবর দিই।"

রামকালী বলতেন, "কেন ? আমি বুঝি তোমার চক্ষুশূল হচ্ছি এবার ? বেশ, পুণ্যির ভরা করে খবর দাও তুমি, দেখবে আবার পাখী ফুড়ুৎ !"

কবিরাজ-গৃহিণী ঝাট্ ঝাট করে শিউরে উঠতেন। বলতেন, "তুমিই বা পাপ-পাপ করে ব্যস্ত হচ্ছ কেন বাপু ? ওর মা-বাপ, ও বুঝবে। ছেলের প্রাণ যদি 'মা' বলে না কাঁদে, বুঝতে হবে মায়ের প্রাণে কোথাও ঘাটতি আছে।"

"মায়ের প্রাণে কি ঘাটতি থাকে বড়বৌ ?"

কবিরাজ বলতেন সহাস্যে।

রামকালী চড়ে উঠতেন। বলতেন, "আছে। খুব আছে। আমাকে মা দু-চক্ষে দেখতে পারে না। নইলে পিসি যখন শাসন করে, তখন ইচ্ছে করে করে আমার নামে আরো লাগায় ?"

"সে বোধ হয় ননদের ভয়ে—"

"ইঃ, ভারী আমার ভয় ! মায়ার চেয়ে ভয় বড় হল !"

পরে অনেক সময় ভেবেছেন রামকালী, সত্যি, মার জন্যে তো একটুও মন কেমন করত না তাঁর। বরং কবিরাজ-গৃহিণী যখন অসুখে পড়তেন, আর শেষে যখন মারা পড়লেন, লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদে কেঁদে শিরঃপীড়া জন্মে গিয়েছিল।

কেন এমন হয়েছিল ?

রামকালী নিষ্ঠুর ?

না তার মা-বাপই স্নেহহীন ?

বাপের সম্পর্কে এক কথায় রায় দিয়ে দিলেও মায়ের সম্পর্কে সে রায় দিতে একটু বাধতো। হয়তো বিবেকেই বাধতো।

কিন্তু জীবনের এই শেষপ্রান্তে এসে যখন জীবনটাকে ওই ফেলে আসা গঙ্গার স্রোতের মতই সম্পূর্ণ আর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, তখন রামকালী নিশ্বাস ফেলে ভাবলেন, ভালবাসা জীবনে সেই একবারই লাভ করেছিলেন।

সেই এক প্রৌঢ় দম্পতির কাছে।

সারা জীবনে অনেক পেয়েছেন রামকালী, শ্রদ্ধা সমীহ ভয় ভক্তি, ভালবাসা পান নি। সবাই তাঁকে দূরে রেখেছে, দূরে থেকে প্রণাম জানিয়েছে।

রামকালীর নিজেরই দোষ।

দূরত্বের গণ্ডি নিজেই রচনা করেছেন তিনি। ইচ্ছে করে নয়, স্বভাবে।

কোনদিন কি ভাবতে পেরেছেন তিনি, গ্রামের কোনো কাজেকর্মে তিনি ব্রাহ্মণ-ভোজনের সারিতে পাত পেতে বসেছেন? ভাবতে পেরেছেন তিনি কোথাও 'দান' নিচ্ছেন?...কারো চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে বসে গালগল্প করছেন? তাস-পাশা খেলছেন?

ভাবলে হাসি পাবে কি, ভাবতেই পারেন নি।

অথচ গ্রামের অনেক কুলীন সন্তানই এমনি সাধারণের ভূমিকায় জীবন কাটাচ্ছেন।

কৌলীন্যটার সত্যকার বাস তবে কোথায়?

কিন্তু আজ সংসারকে পরিত্যাগ করে যাবার সময় হঠাৎ মনে হচ্ছে রামকালীর, সারা জীবন বিজয়ীর ভূমিকা নিয়ে কাটালাম, কিন্তু সত্যি কি বিজয়ী হতে পেরেছি?

তা হলে কেন মনে হচ্ছে, ভয়ানক একটা লোকসানকে টেনে এনেছেন তিনি সারাজীবন ধরে?

লোকসানটা কী? পরাভবটা কোথায়?

লোকসানের কথা ভাবতে অপ্রাসঙ্গিক একটা কথা মনে এল রামকালীর। কিংবা অপ্রাসঙ্গিক নয়।

সত্য বড় আক্ষেপ করে বলেছিল, "এই খেদ রয়ে গেল বাবা, তোমায় এক দিন রেঁধে খাওয়াতে পারলাম না!"

আচ্ছা কতটুকু ক্ষতি হত রামকালীর, যদি সত্যর এই খেদটুকু না রাখতেন? নিয়মের সেই সামান্যতম হানির লোকসানটাই কী মস্ত একটা লোকসান হত?

রামকালী তাঁর জীবনে যে বস্তুকে পরম মূল্য দিয়ে এসেছেন, সত্যিই কি সেটাই মূল্যের শেষকথা?

যদি তাই হয়, তবে কেন বারবার ভুবনেশ্বরী অদ্ভুত এক বিজয়িনীর হাসি হেসে চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়?

কেন বলে, "জীবনে তো অনেক পেলে, পাওয়ার গৌরবে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখ নি, কিন্তু আসল ঘরটাই যে ফাঁকা পড়ে রইল তোমার, সে হিসেব করেছ কোন দিন? কর্তব্যই করলে চিরকাল, ভালবাসতে পারলে কাউকে?"

মনের মধ্যে ডুব দিয়েছেন রামকালী।

ভালবাসা? কার জন্যে সঞ্চিত থেকেছে?

সত্যর মুখ ছাড়া আর কোনও মুখ চোখে ভেসে উঠছে না।

আর সব যেন 'জীবে'র প্রতি করুণা।

সত্য আছে হৃদয়ের নিভৃতে অনেকখানি জায়গা দখল করে। কিন্তু সেটুকু কি সত্যকে কোন দিন জানতে দিয়েছেন রামকালী? জানানো দুর্বলতা ভেবে অনবরত বালি চাপা দিয়ে আসেন নি কি?

হঠাৎ 'দুর্গা দুর্গা' করে উঠলেন রামকালী। ছেড়ে দেওয়া মনকে যেন বেঁধে ফেললেন। বললেন, "ওহে মুঙ্গেরে পৌঁছবে কখন নাগাদ?"

মাঝি বলল, "আজ্ঞে কর্তা, এই তো এসে পড়লাম বলে—"

"আচ্ছা ভাল! কষ্টহারিণীর ঘাটে নৌকো বাঁধবে।"

চল্লিশ

সাধন সরল পিসির কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে নি, তবু সবই প্রকাশ হয়ে পড়ল। প্রকাশ হয়ে পড়ল সত্যর দীনতা, আর তার ভাইপোদের মিথ্যা কথা।

কাঁচা-পাকা চুল; বেঁটে খাটো শক্ত সমর্থ চেহারার যে ভদ্রলোকটির বাসা খুঁজে খুঁজে সেদিন পিসির দেওয়া চিঠিখানা পেশ করে এসেছিল ওরা, সেই ভদ্রলোক তার পরের রবিবারেই সকালে এদের এখানে এসে হাজির হলেন।

এ হেন সম্ভাবনার কথা স্বপ্নেও মনে আসে নি ওদের। অবশ্য সেদিন ত্রস্ত শঙ্কিত পলায়নপর ছেলে দুটোকে প্রায় জোর করে ধরে দাঁড় করিয়ে তাদের নাম কি, দেশ কোথায়, কলকাতার বাসা কোন্ রাস্তায়, ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ জেনে নিয়েছিলেন ভদ্রলোক, তথাপি সেটাকে নিছক কৌতূহল

ছাড়া কিছু ভাবে নি এরা দুই ভাই। সন্দেহমাত্র করে নি, ভদ্রলোক দু-দিন না যেতেই "কৈ গো খোকারা," বলে এসে হানা দেবেন।

এ যে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল ওদের।

সভয়ে পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল দু'ভাই, তার পর সরল নিঃশব্দে দুটো হাত উল্টে এমন একটা বেপরোয়া ভঙ্গী করল, যার অর্থ দাঁড়ায়—"তা আমাদের কী দোষ? আমরা তো ওনাকে আসতে বলি নি, পিসি বারণ করে দিয়েছিল তাই না—"

কিন্তু—

এটাও বিনা শব্দে শুধু চোখের ইশারায় উচ্চারিত হল, কিন্তু আমরা সেদিন মিছে কথা বলেছি। মা যখন বলল, ইস্কুল থেকে ফিরতে দেরি কেন, তখন বলেছি ইস্কুলে বল খেলা ছিল।

কিন্তু এত সব ভাববিনিময় মুহূর্তেই ঘটল, কারণ ইত্যবসরেই ভদ্রলোক বাড়ির চৌকাঠ ডিঙিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে বাজখাঁই গলায় পুনঃ প্রশ্ন করেছেন, "খোকারা বাড়ি নেই নাকি?" এবং সত্যবতী মাথার কাপড় টেনে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে স্পষ্ট গলায় উচ্চারণ করেছে, "তুড়, দেখ তো কে। জিজ্ঞেস কর কাকে চান।"

তুড়ুকে আর কষ্ট করে জিজ্ঞেস করতে হল না, যাঁর কানে যাবার স্বচ্ছন্দেই গেল। আর তিনি সহাস্যে এগিয়ে এসে উত্তর দিলেন, "ননদাই গো ননদাই, আপনি হচ্ছেন শ্যালাজ ঠাকরুন।"

শুনে সত্যবতী হাঁ!

এইমাত্র নবকুমার বাজারে গেল, আর এখন এই ঝামেলা! কে জানে লোকটা কে! কোন বদবুদ্ধি লোক, না বাসা ভুল করে—সেই কথাটাই বলে সত্যবতী, ছেলেদের মাধ্যম মাত্র করে, "তুড়ু, বল আপনি বোধ হয় বাসা ভুল করেছেন—"

"বাসা ভুল!"

ভদ্রলোক হেসে উঠলেন, "মুকুন্দ মুখুয্যে এত কাঁচা ছেলে নয় যে উচিতমত তল্লাস না করে কারুর অন্দরে ঢুকে পড়বে। দস্তুরমত পাড়ার লোককে শুধিয়ে সঠিক জেনে তবে ঢুকেছি। বলি তুমি বারুইপুরের নীলাম্বর বাঁড়ুয্যের ব্যাটা নবকুমার বাঁড়ুয্যের পরিবার নয়? অস্বীকার কর?"

বলে আপন রসিকতায় হেঁ হেঁ করে টেনে টেনে হাসতে থাকেন।

কথার ভাষা এবং ভঙ্গিমা এমনি অমার্জিত যে, রাগে আপাদমস্তক জ্বলে যায় সত্যবতীর। নিঃসন্দেহ যে কোন বদলোক, নামটা পরিচয়টা সংগ্রহ করে বাড়ি ঢুকে পড়ে ভয় দেখাতে চায়।

চাক। সত্য বামনীকে চেনে না।

দৃঢ় আর বিরক্তস্বরে বলে ওঠে সত্যবতী, "তুড়ু, বল পাড়া-পড়শীকে শুধিয়ে কারুর নাম পরিচয় জানা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। আমরা ও নামে কাউকে চিনি না, উনি যেতে পারেন।"

কিন্তু মুকুন্দ মুখুয্যে এত সহজে অপমানিত হন না। হাস্যকণ্ঠ বজায় রেখেই বলেন, "চেন না তা সত্যি। জানার সুযোগ আর ঘটল কই? তোমার ননদ ঠাকরুণ তো আমাকে ত্যাগ দিয়ে নিশ্চিন্দ আছেন। তা এতদিন পরে বিস্মরণ রাজার স্মরণ হল কেন, সেই কথা শুধোতেই আসা। কিন্তু খোকারা, তোমরা একেবারে চুপটি মেরে মুখটি সেলাই করে বসে আছ যে? সেদিন অত আলাপ পরিচয় হল, চিঠি পৌঁছে দিলে, আর আজ যেন চিনতেই পারছ না। মাকে বুঝি বল নি? তাই উনি 'সোবে' করছেন লোকটা গুণ্ডা বদমাশ!"

এতক্ষণ তাই-ই ভবছিল বটে সত্যবতী, কিন্তু ভদ্রলোকের শেষ কথাটায় যেন অকূল সমুদ্রে পড়ে।

এসব কি কথা!

বিন্দুবিসর্গও তো বুঝতে পারছে না সত্যবতী। নিজের ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। সেখানে স্পষ্ট অপরাধীর ছাপ! কী এ?

লোকটা কি বারুইপুরের কেউ?

তুড়ু খোকা যখন দেশে গিয়েছিল তখন দেখেছে, এখন চিনতে পারছে না? কিন্তু "চিঠি" কিসের? ভগবান জানেন বাবা! একেই তো শ্বশুরবাড়িতে সত্যর নাম জাঁহাবাজ বৌ, আবার এককাঠি বাড়ল বোধ হয় সে বদনাম। ছেলে দুটো যেভাবে শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে, তাতে সন্দেহ নেই, ঘটেছে কিছু।

কিন্তু তথাপি মুখে হারে না সত্য। দৃঢ় হলেও একটু নরম স্বরে বলে, "খোকা, বল বাড়ির পুরুষজন এখন বাড়ি নেই, আপনি একটু ঘুরে আসুন। যা বলবার তাঁকেই বলবেন।"

মুকুন্দ মুখুয্যে এবার একটু গম্ভীর হন। বলেন, "বলবার আমার কিছুই ছিল না। তবে আপনার ননদ ঠাকরুন শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী হঠাৎ তাঁর ত্যাগ দেওয়া স্বামীকে একখানা পত্তর কেন দিলেন, তারই তল্লাস করতে—"

"ঠাকুরঝি পত্র দিয়েছেন! আপনাকে! মানে আপনি—"

"যাক এতক্ষণে চিনলে? বাবাঃ, কোথায় ভেবেছিলাম শ্যালার বাড়িতে এসে একটু জামাই-আদর পাব, তা নয়—"

"কিন্তু ঠাকুরঝি চিঠি লিখেছেন!" সত্য আরক্ত মুখে বলে, "আমার বিশ্বাস হচ্ছে না—অসম্ভব।"

মুকুন্দ মুখুয্যে কথাটার অন্য অর্থ ধরেন। বলেন, "আহা, নিজে হাতে কি আর লিখেছে? কাউকে ধরে লিখিয়েছে নিশ্চয়। এই তো তোমার এই খোকারাই দিয়ে এল পরশুদিনকে—"

"আমার খোকারা? পরশুদিনকে।"

সত্যবতীও বিচলিত হয়।

বিচলিত স্বরে বলে, "তুড়ু! খোকা!"

তুড়ু-খোকার নত বদন, যে বদনে অপরাধের কালিমা।

সত্য যেন একটু অসহায়তা অনুভব করে, আর এই প্রথম বোধ করি নবকুমারের অনুপস্থিতিতে কাতরতা বোধ করে। মুকুন্দ মুখুয্যের চোখে সত্যর এই বিচলিত ভাবটা ধরা পড়তে দেরি হয় না। এবং ব্যাপারটা অনুধাবন করতেও দেরি হয় না। ছেলেমানুষদের যা হোক বুঝিয়ে চিঠিটা সৌদামিনী চুপিচুপিই পাঠিয়েছে। আগে এটা বুঝলে মুকুন্দ মুখুয্যে অন্যভাবে নিজেকে উপস্থাপিত করতেন। ছেলে দুটো থতমত খেয়ে যাচ্ছে, যাবেই তো, মা জননীটি যে থাণ্ডারনী তা তো বোঝাই যাচ্ছে। বাবাঃ, যেন পুলিসের ধমক।

কিন্তু মুকুন্দও পুলিসের বাবা।

আটঘাটটি বেঁধে তবে এসেছে। চিঠিটা সঙ্গে এনেছে। তবে ভদ্রলোকের ধারণায় একটু ভুল ছিল। ভেবেছিলেন সৌদামিনী নিশ্চয় কলকাতায় ভাইয়ের বাসায় এসেছে, আর ভাইপোদের সেটুকু চেপে যেতে বলেছে। নইলে সাতজন্মে যে কখনো কোন বার্তা দিল না, সে কেন হঠাৎ…কিন্তু ধারণাটা ভুল তা তো বোঝাই যাচ্ছে। সৌদামিনী এখানে নেই।

সত্যি, তবে কেন হঠাৎ—?

সে চিন্তা যাক। ফতুয়ার পকেট থেকে সৌদামিনীর সেই গোপনতম

দুর্বলতার ইতিহাসটুকু বার করে মেলে ধরেন মুকুন্দ মুখুয্যে দাওয়ার ধারে মেজেয়। আর দেখে এক মুহূর্তেই চিনে ফেলে সত্য—হাতের লেখাটা তারই বড় ছেলের। অর্থাৎ তুড়ুকে দিয়েই লিখিয়েছে সৌদামিনী।

সমস্ত ঘটনাটা স্পষ্ট হয়ে যেতে দেরি হয় না আর। দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শুধু নিজের ছেলেদের এই দুর্বোধ্য আচরণটা অন্ধকারেই থেকে যায়। সত্যবতীকে বিন্দুবিসর্গ না জানিয়ে এত সব কাণ্ড করবার সাহস কি করে হল ওদের?

পড়ে থাকা চিঠিখানাতে চোখ ফেলামাত্রই পাঠোদ্ধার হয়ে গেছে, কারণ অক্ষরের ছাঁদ আর তার প্রতিটি টান, প্রতিটি বাঁক তো সত্যবতীর মুখস্থ।

না, প্রেমপত্র নয়, ভাইপোকে দিয়ে লেখানোয় আপত্তির কিছু নেই। সৌদামিনী লিখেছে—

পরমপূজনীয় শ্রীচরণকমলেষু—

বহুকালাবধি আপনার কোনো সংবাদাদি জানি না, আপনিও সংবাদ নেন না অধীনা জীবিত কি মৃত। আমার কথা থাক, আপনার সংবাদ পাইতে ইচ্ছা হয়। আমার ভ্রাতা নবকুমার কলিকাতায় বাসা করিয়া আছে, তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে জানিতে পারি। ইহারা নবকুমার ভাইজীবনের পুত্র সাধনকুমার ও সরলকুমার। পত্রদানের ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন।

অধিক কি লিখিব। ভগবানের নিকট নিয়ত আপনার কুশল প্রার্থনা করি।

শতকোটি প্রণামান্তে

চরণের দাসী

শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী।

পাঠোদ্ধার করে যেন স্তব্ধ হয়ে যায় সত্য। এই সৌদামিনী দেবী কোন্ সৌদামিনী? সেই তাদের সদুদি? সেই সদুদি নিয়ত ভগবানের কাছে সেই লোকটার কুশল প্রার্থনা করে? এই বেঁটে-খাটো খাটমুগুরে গড়নের আধবুড়ো লোকটার!

এও কি সম্ভব?

সৌদামিনী বিধবা নয় এইটুকু মাত্র জানা যেত ভাত খেতে বসার সময়। হেঁসেলের ভাতটা নিয়ে বসত সে মামীর সঙ্গে, ভাই-বৌয়ের সঙ্গে, মাছের ভাগটা নিয়ে। এই যা।

তা ছাড়া আর কখনো কোনদিন কোনো সময় তো টের পাওয়া যেত না সত্নর স্বামী আছে। আশ্চর্য! আশ্চর্য! মানুষ কী অদ্ভুত জীব গো! শুধু মনে থাকাই নয়, স্বামীর সংবাদের জন্য উতলা হয় সে! এতই হয় যে মান-মর্যাদা জলাঞ্জলি দিয়ে "চরণের দাসী" স্বাক্ষরিত চিঠি পাঠায়!

এ কী দীনতা!

এ কী দুর্বলতা!

বয়সকালে চিরদিন স্থির থেকে এখন এই ভাঁটা-পড়া বয়সে এমনই অস্থির হল যে মান-অপমান জ্ঞান হারাল?

সৌদামিনীর এই পদস্খলন যেন সত্যবতীর মাথাটা ধুলোয় লুটিয়ে দিল।

পদস্খলন!

হ্যাঁ, পদস্খলনই মনে হল সত্যবতীর। আর অকস্মাৎ তার বড় একটা যা না হয় তাই হল, দুই চোখ জলে ভরে উঠল।

তবু কষ্টে নিজেকে সামলে মাথার কাপড়টা আর একটু বাড়িয়ে সত্য বড় ননদাইয়ের পায়ের ধুলো নিয়ে শান্ত স্বরে বলে, "মনে কিছু করবেন না, চেনা-জানা তো নেই কখনো। দাওয়ায় উঠে বসুন। তিনি বাজারে গেছেন, এসে পড়বেন এখনই।"

গুরুজনদের সামনে "উনি" বলাটা নাকি অশোভন, তাই "তিনি" বলে সত্যবতী।

অবশ্য তাতে বুঝতে অসুবিধে হয় না সংসার করে ঝানু হয়ে যাওয়া মুকুন্দ মুখুয্যের। এতক্ষণে তিনি শালাবৌয়ের আচরণে প্রীত হন, এবং প্রণতাকে "থাক্ থাক্" করে সৌজন্য দেখিয়ে গর্বিত ভঙ্গীতে উঠে গিয়ে দাওয়ায় পাতা জলচৌকিতে জাঁকিয়ে বসেন।

সত্যবতীর চোখের ইশারায় ছেলেরাও তাদের নবলব্ধ পিসেমশাইকে প্রণাম করে এবং চোখের ইশারাতেই তামাক সেজে আনতে যায় সরল। যদিও নবকুমার তামাক খায় না, তবু তামাকের পাটটা বাড়িতে রেখেছে সত্যবতী অতিথি-অভ্যাগতের জন্য।

আপ্যায়ন করতে হবে বৈকি!

পিতৃঋণ মাতৃঋণ দেবঋণ গুরুঋণ তো অলক্ষ্য জগতের, আর তার শোধের কথা তো কথার কথা! আসলে কুটুম্বঋণের তুল্য ঋণ নেই, আর তার

শোধটা নিতান্তই প্রত্যক্ষ বাস্তব। দুর্লজ্ঘ্য নীতিকে লজ্ঘন করবে সত্য, লোকটা কুটুম্বনামের অযোগ্য বলে ?

তা পারে না।

এখন আর পারে না।

এ সেদিনের সেই কিশোরী সত্যবতী নয়, একদা যে শ্বশুরকে অপবিত্র জ্ঞান করে তার পুজোর গোছ করে দিতে অস্বীকৃত হয়েছিল। এ সত্যবতীর অনেক বাস্তববুদ্ধি হয়েছে। এখনকার সত্য জানে কতকগুলো ব্যাপারকে মনের সঙ্গে রফা করতে না পারলেও, বাইরে খানিকটা রফা করে নিতে হয়। নইলে অসামাজিকতা অভদ্রতা ইত্যাদির দায়ে পড়তে হয়। সংসার যখন করতে বসেছে, সামাজিকতার দায় পোহাতে হবে বৈকি।

তাই একটা নিশ্বাস ফেলে রান্নাঘরে ঢুকে উনুনে চাপানো হাঁড়িটা নামিয়ে রাখে। তারপর বড়ছেলেকে হাতের ইশারায় ঘরে ডেকে তার হাতে রসগোল্লা আনবার পয়সা দিয়ে ঘরের দরজার কাছে এসে বসে। যেখান থেকে সরাসরি না হলেও ননদাইকে অবলোকন করা যায়।

নবকুমার যতক্ষণ না ফিরছে, ততক্ষণ এই বন্ধন-যন্ত্রণা সইতেই হবে তাকে।

হুঁকোয় একটি সুখটান দিয়ে মুকুন্দ মুখুয্যে রাশভারী গলায় প্রশ্ন করেন, "কতদিন হল বাসা করে থাকা হয়েছে ?"

সত্য মৃদুস্বরে বলে, "অনেক দিন। সাত আট বছর।"

"বল কি ! তখন তো তুমি প্রায় কাঁচা যুবতী গো ! তা বুড়ো-বুড়ী যে মত দিল ? নাকি মরেছে তারা ?"

সত্যর ইচ্ছে হয় মুখের সামনে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বসে থাকে গুম্ হয়ে। কিন্তু করে না। সংক্ষেপে বলে, "আছেন। মত না দিলে চলবে কেন ? ছেলেদের লেখাপড়া—"

"হুঁ ! তা বটে, একালে তো আর পাঠশালে পড়া বিদ্যেয় চলবে না। তা মাত্তর ওই দুটিই নাকি ? কুচোকাচা দেখছি নে তো !"

এ কথার আর উত্তর কি দেবে সত্য, চুপ করেই থাকে। "আর হয় নি" এটা বলতেও বুঝি কোথায় কাঁটার মত একটু বাধে। অদৃশ্য সেই কাঁটাটা বুঝি আস্তে আস্তে অবয়ব নিচ্ছে এক নিভৃত অন্ধকারে।

মুকুন্দ কিন্তু নাছোড়, ফের বলেন, "বাপের সঙ্গে বেরিয়েছে বুঝি ?"

এ প্রশ্নের উত্তরটা সরলই দিয়ে ফেলে, "আমরা শুধু দুই ভাই।"

মুকুন্দ যে এর মধ্যে নিজের কী "ভাল" আবিষ্কার করেন কে জানে, সস্মিত মুখে বলেন, "তা ভাল! আপদের শান্তি! এ দিব্যি ঝাড়া হাত-পা হয়ে যাওয়া। এখন তীর্থ কর ধর্ম কর, দস্তিবিত্তি করে সংসার কর, কোনো বালাই নেই। বাবাঃ, আমার ঘরের এণ্ডি-গেণ্ডিগুলো দেখলে আমার মাথা কেমন করে। মানুষের ছাঁ তো নয়, যেন হাঁস-মুরগীর পাল।"

এবার বোধ করি সত্য বিরক্ত হতেও ভুলে যায়, চমৎকৃত হয়েই তাকিয়ে থাকে। বেটাছেলেতে যে এমন ধরনের কথা কইতে পারে এ তার জানা ছিল না। তার বাপের বাড়ির দেশে অনেককে দেখেছে সে, মেয়েলী বেটাছেলেও দেখেছে, দেখেছে নীলাম্বরকে, নবকুমারকে, সত্যর আদর্শ অনুযায়ী 'পুরুষ বেটাছেলে'র রূপ কোথাও দেখে নি সত্য, কিন্তু এ কী!

গ্রামের গাঁইয়ামির মধ্যেও এক ধরনের শোভন সভ্যতা আছে, এই শহুরে গেঁয়োটা এক কথায় বিশ্রী কুৎসিত।

অথচ দেখলে বোঝা যায় লোকটা এককালে 'সুপুরুষ' বলেই গণ্য হত। একটু বেঁটে বটে, তবে রংটি হর্তেলের মত, মুখাকৃতি দিব্য, কাঁচা-পাকা হলেও চুলে কেয়ারি আছে, আর সর্ব অবয়বে তোয়াজের চিহ্নটি পরিস্ফুট।

হাঁস-মুরগীর পালের সংসার হলেও, ভদ্রলোক নিজের তোয়াজটি ভালই বাগিয়ে নেন সন্দেহ নেই। সদুদির সতীনকে মনে মনে একপ্রকার ব্যঙ্গাত্মক তারিফ করে সত্য।

কিছুক্ষণ নীরবতা।

মুকুন্দ হুঁকো টানছেন, সত্য উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে সদরের দরজার দিকে তাকিয়ে আছে, আর বেচারা সরল মনে মনে কাঠ হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে উদ্যত বজ্রের নীচে প্রতীক্ষারতের মত। এই লোকটা চলে যাওয়ার পর যে তাদের বিচার হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি।

প্রতীক্ষার মুহূর্ত দীর্ঘ। সত্যর মনে হয় নবকুমার যেন কতকাল বাজারে গেছে! আর তুড়ুটাও কম দেরি করছে না। ময়রার দোকান তো এই কাছেই।

নীরবতা ভঙ্গ করলেন মুকুন্দ।

বলেন, "তা তোমার ননদ ঠাকরুনই বোধ হয় মামা-মামীর সেবা করছে?"

কণ্ঠে যেন একটু চাপা অসন্তোষ।

সত্য আস্তে বলে, "উনিই তো কাছে আছেন বরাবর।"

"তা থাকতেই হবে, বেটা বেটার-বৌ যখন উড়তে শিখেছে। কিন্তু স্বামীর সংসারের প্রতিও তো একটা কর্তব্য আছে? এই তো আমার ঘরে, সংসারটা একটা 'মানুষ' বিহনে ফুটোনৌকোর তুল্য। দ্বিতীয় পক্ষটি তো আমার হরঘড়ি আঁতুড়ঘরে ঢুকতে ওস্তাদ, বাচ্ছা-কাচ্ছাগুলোর হাড়ির হাল। এখন বড় গিন্নী এসে থাকলে সবদিকই রক্ষা হয়, আর তারও—"

বোধ করি নিতান্তই অসহ্য বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে, সত্য এতগুলো কথা বলবার অবকাশ দিয়েছিল লোকটাকে, কিন্তু স্তব্ধতার ঘোর কাটল। আর লোকটা যে সদ্য আগন্তুক, এবং হিসেবমত গুরুজন, সে কথা বিস্মৃত হয়ে মৃদু হলেও তীব্রস্বরে বলে উঠল, "আপনার অবিশ্যি সবদিক রক্ষে হয়, বিনি মাইনেয় রাঁধুনী-চাকরানী, ঘরুনী, সব পেয়ে যান, কিন্তু তাঁর কী উপকারটা হবে শুনি?"

মুকুন্দ মুখুয্যে ক্ষণকালের জন্য থতমত খেয়ে যান, কারণ এ হেন তীব্রতার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে, এ কল্পনা নিশ্চয়ই ছিল না তাঁর, তবে আত্মস্থ হতেও দেরি লাগে না। সেই আত্মস্থ ভঙ্গীতে মৃদুহাস্যের প্রলেপ লাগিয়ে বলেন, "শালাবাবুর আমার পরিবার ভাগ্যিটি তো দেখছি বেশ ভালই! একে রূপসী, তায় বিদুষী, নাটক নভেল পড়ার অব্যেস আছে বোধ হয়? তা জিজ্ঞেসই যদি করলে তো বলি, উপকারের কিছু না হোক পরকালের কাজটাও তো হবে? মামার ঘরে দাস্যবিত্তি করার চাইতে স্বামীর ঘরের দাস্যবিত্তি কিছু আর অপমান্যির নয়?"

সত্য উঠে দাঁড়ায়, ধীর স্বরের চেষ্টা করে বলে, "মেয়েমানুষের কোন্‌টা মান্যের আর কোন্‌টা অমান্যের সে জ্ঞান থাকলে আর এ কথা বলতে পারতেন না। তবে ঠাকুরঝি যে আপনাকে ত্যাগ দেয় নি, আপনিই ত্যাগ দিয়েছেন তাকে, জানা আছে আমার সে কথা। এখন সংসারে ঝিয়ের দরকার হয়েছে বলে, তার পরকালের চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামাতে এসেছেন—"

যতই ধীরভাবে বলতে চেষ্টা করুক, তবু উত্তেজনায় মুখটা লাল হয়ে ওঠে সত্যর। আর এ উত্তেজনা শুধু ওই চোখের চামড়াহীন বর্বরটার নির্লজ্জতাতেই নয়, সদুর নির্লজ্জতাতেও। এই হতচ্ছাড়া লোকটাকে এসব কথা বলার সুযোগটা তো সদুই দিয়েছে!

মুকুন্দ মুখুয্যে এর উত্তরে কী বলতেন অথবা সত্য কিভাবে কথা শেষ করত

কে জানে, বাধা পড়ল পিতা-পুত্রের আগমনে। সাধন এসেছে রসগোল্লা নিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে নবকুমারও। পথে বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় সমাচারটা জানিয়ে দিয়ে অবহিত করিয়ে এনেছে সাধন। বাবার দেখা পেয়ে যেন আপাততঃ বেঁচেছে বেচারা, সরাসর মার মুখোমুখি দাঁড়াতে অন্ততঃ কিছুটা বিলম্ব হবে।

নবকুমার অবশ্য গুরুজন এবং দুর্লভ কুটুম্বর সম্মান জানে। শশব্যস্তে হাতের জিনিস নামিয়ে হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে সস্মিত বচনে বলে, "কী ভাগ্য আমার, পায়ের ধুলো পড়ল এতদিন পরে! কতক্ষণ এসেছেন?"

সত্য ততক্ষণে রসগোল্লার ভাঁড় নিয়ে ঘরে ঢুকে গেছে। মুকুন্দ অন্তরাল-বর্তিনীর কর্ণগোচর হতে পারে এমন উদাত্ত স্বরে উত্তর দেন, "তা এসেছি অনেকক্ষণ। এতক্ষণ 'হাঁ' হয়ে বসে তোমার বিদুষী পরিবারের লেক্চার শুনছিলাম। কলকেতারই মেয়ে বুঝি? মেমের কাছে লেখাপড়া শেখা?"

লজ্জায় মাথাটা হেঁট হয়ে যায় নবকুমারের, মুখটা টকটকে হয়ে ওঠে। আর সত্যর প্রতি অপরিসীম ক্রোধে যেন হতবাক হয়ে যায়।

আস্পদ্দার কী একটা সীমা নেই? কথা বলতে জানে বলে যাকে যা ইচ্ছে বলবে? অতবড় বুড়ো ননদাই, তা-ও আবার চিরদিনের অদেখা, তার সঙ্গে তো কথা কইবারই কথা নয়, ঘোমটা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়বার কথা, তা নয় এমন কথা শুনিয়েছেন বসে বসে যে, এই উপহাসের জুতোটি খেতে হল নবকুমারকে!

ছি ছি।

কিন্তু এখন হচ্ছে মনের রাগ মনে চাপা, কিল খেয়ে কিল চুরি। জুতোটাকে বোনাইয়ের রসিকতা বলে ধরে নিয়ে হেঁ হেঁ করে হাসা।

সেই হাসিই হাসতে থাকে নবকুমার এবং সত্য নিঃশব্দে রসগোল্লার রেকাবি আর জলের গ্লাসটা নামিয়ে দিয়ে বাজারের ধামাটা তুলে নিয়ে ঘরে চলে গেলে বোনাই নিজেই যখন রেকাবিটি হাতে উঠিয়ে ব্যঙ্গহাস্যে বলেন, "জুতো মেরে গরুদান? তা মন্দ নয়। যাক! বামুন মুচি-বাড়িতেও লুচি খেতে ছোটে—", তখনও নবকুমার সেই হেঁ হেঁ হাসি হাসতে থাকে। বরং মাত্রাটা আরো বাড়িয়ে দেয়।

অতঃপর সত্য আর বেরোয় না।

ছেলে দুটো গুটি গুটি ঘরে ঢুকে বই নিয়ে পড়তে বসে।

নবকুমারের সঙ্গেই অনেকক্ষণ কথা চালান মুকুন্দ।

সুহাসিনী বাড়িতে নেই, রবিবার সকালে সে পাশেরই এক বড়লোকের বৌয়ের কাছে লেস্‌বোনা শিখতে যায়। বৌটির ছেলেমেয়ে নেই, বাড়িতে প্রচুর চাকর-দাসী, স্বামীটি রবিবার হলেই সকাল থেকে তাসের আড্ডায় চলে যায়, অতএব রবিবার সকালে তো বটেই, এমনিতেও বৌটির অফুরন্ত অবকাশ।

সুহাসিনীর স্কুলে যাবার পথে জানলা দিয়ে ডেকে ডেকে নিজেই আলাপ করেছিল বৌটি।

"ওই লোকটা থাকতে থাকতে সুহাস না ফিরলেই বাঁচি," রান্না করতে করতে ভাবল সত্য। ফিরলে তো ওরই চোখের সামনে দিয়ে ফিরবে? অতি বদ্‌ প্রকৃতির লোক। দেখলে নিশ্চয় ওই সুহাসের কথার সাতশ কৈফিয়ত চাইবে।

মানুষ যে কেন এমন অসভ্য হয়!

আস্তে আস্তে অন্য ভাবনায় চলে যায় সত্য, শুধু কি অসভ্যই হয়? হ্যাংলাও হয় না কি? নইলে সদু ওই বদ্‌লোকটাকে এখনো স্বামীজ্ঞান করে বসে থাকে? শুনেছে নবকুমারের কাছে ইতিহাস। নির্যাতনের জ্বালায় জ্বালায় চলে গিয়েছিল সদু, তার পর সেই নির্যাতক স্বামী ঘরে সতীন-কাঁটা পুঁতেছে, সে খবরও জানা। তবে? এত সত্ত্বেও কি চিরদিন মনে মনে ওর চরণের দাসী হয়ে থেকেছে সৌদামিনী? না ওটা একটা নিয়মরক্ষের 'পাঠ' মাত্র?

হয়তো এদিকে মামীর নির্যাতনে সাময়িকভাবে কোনোদিন ধৈর্যচ্যুত হয়েই সদু এ কাজটা করে বসেছে।

কিন্তু তাই কি?

এ তো মনে হচ্ছে বেশ পরিকল্পনার ব্যাপার। রাগের মাথায় কিছু করে ফেলা নয়। পাড়ার কোনো ছেলেপুলেকে দিয়ে লেখালে লোক জানাজানি হবার ভয়েই হয়তো এতদিন পারে নি। এখন নিজের ভাইপোদের দিয়ে—

সন্দেহ নেই কথাটা প্রকাশ করতে বারণ করেছে ছেলেদের। সদুর ওপর এ জন্যেও রাগ হয় সত্যর। পিসি হয়ে লুকোচুরি করার বিদ্যেটায় হাতেখড়ি দিলে তুমি!

এখন সত্য কি করে ওদের তিরস্কার করবে ?

সেটা কি ঠিক হবে ?

পিসিও তো গুরুজন। তার কাছে যখন কথা দিয়েছে! "সত্যরক্ষা" যে মানুষের জীবনের সারধর্ম এ কথা সত্যই শিখিয়েছে ছেলেদের।

কিন্তু যতই যা শেখাও, তুড়ুটা ঠিক তার বাপের ধাঁচে যাচ্ছে। মেরুদণ্ডহীন অসার। তবে নবকুমারের আবার তার ওপর মুখে তড়পানি আছে, এর সেটা নেই, এই যা! মৃদু ভালমানুষ ছেলেটা। কিন্তু ভালমানুষই কি প্রার্থনীয় ? ওই 'ভাল'টা বাদ দিয়ে যেটা হয়, সেটাই যে চায় সত্য।

সরলটা হয়তো একটু অন্যরকম হবে।

কিন্তু সে কোন্ রকম ?

সত্যবতীর মনের মধ্যে 'মানুষে'র যে ছাঁচ গঠিত আছে তার ধারে কাছে পৌঁছবে ?

নাঃ, সে আশা নেই সত্যর! লেখাপড়া শিখবে, রোজগারপত্র করবে, পাঁচজনে "ভাল" বলবে এই পর্যন্ত। তার বেশী নয়। বুঝে নিয়েছে সত্য। যদি তার বেশী হত, এতদিনে ধরা পড়ত সে দীপ্তি, সে ঔজ্জ্বল্য।

বরং সুহাসিনীর মধ্যে "বস্তু" দেখতে পায় সত্য, দেখতে পায় দীপ্তির চমক। যে সুহাসিনীর কৈশোরকাল পর্যন্ত কেটেছে এক কুশ্রী পরিস্থিতির মধ্যে। জীবনের বনেদে যার শুধুই শূন্যতা।

হয়তো সেই জন্যেই।

আলো আর অন্ধকারের পার্থক্যটা ওর কাছে তীব্র হয়ে ধরা পড়েছে। এদের কাছে সে তীব্রতা নেই। এরা তাই ঝাপসা ঝাপসা। চোদ্দ-পনের বছর বয়স হল, এখনো বোঝা যাচ্ছে না ওরা নিজেদের নিয়ে কিছু ভাবে কিনা, ভাবতে শিখেছে কিনা। কোনটা ভাল কোনটা মন্দ সেটা চিন্তা করে কিনা।

আশ্চর্য!

সত্যবতীর মনের মধ্যে যে ছাঁচ, সত্যবতীর গর্ভের ছাঁচ তার নাগাল পেল না!

ঈশ্বর জানেন এই সুদীর্ঘকাল পরে সত্যবতীর সত্তার মধ্যে আবার কোন্ ছাঁচ গঠিত হচ্ছে! প্রথমটা ভারী একটা বিপন্নতা বোধ করেছিল সত্য, বিপদ বলে মনে হয়েছিল ঘটনাটাকে, ক্রমশঃ মনটা কোমল হয়ে আসছে।

এমন কি মাঝে মাঝে ভাবতেও ইচ্ছে করছে পালা বদল হলে মন্দ হয় না, একটি মেয়ে হলে বেশ হয়।

আজ হঠাৎ মনে হল সত্যবতীর যদি তাই-ই হয়, কে বলতে পারে সে মেয়ে তার পিতামহীর আকৃতি আর প্রকৃতি নিয়ে অবতীর্ণ হবে কিনা।

হয়তো তাই হবে।

সত্যবতীর একাগ্র ইচ্ছার নিরন্তর তপস্যা কোনো কাজেই লাগবে না। মেয়েমানুষের এ এক অদ্ভুত নিরুপায়তা। নিজের রক্তমাংস মন বুদ্ধি আত্মা সব কিছু দিয়ে যাকে গড়ছি, জানি না সে কী হবে।

নিশ্বাস ফেলে ভাবল, শুনেছি শাস্তরে আছে নরাণাং মাতুলক্রমঃ। কিন্তু মাতুল না থাকলে? দাদামশাইয়ের আত্মজই তো মাতুল? তবে? দাদা-মশাইয়ের কথা শাস্ত্রে লেখে নি।

চিন্তায় ছেদ পড়ল।

বাইরে সেই বাজখাঁই গলা বেজে উঠল, "কই গো বাড়ির গিন্নী, অত লেকচার-টেকচার শুনিয়ে হঠাৎ একেবারে ডুব যে। অধম তাহলে এখন বিদায় নিচ্ছে। মাঝে মাঝে আসতে অনুমতি হবে তো?"

সত্য বাইরে বেরিয়ে এসে হেঁট হয়ে নমস্কার করে শান্তগলায় বলে, "আসবেন বৈ কি।"

কিন্তু এতে, ওই শান্ত বচনেতে কোনো কাজ হল না।

মুকুন্দ বিদায় নিতে নবকুমার "রে রে" করে পড়ল।

"বলি তোমার ব্যাপারটা কী? কী সব যাচ্ছেতাই কথা বলেছ মুখুয্যে-মশাইকে?"

সত্য বিরক্তভাবে বলে, "যাচ্ছেতাই আবার কি বলতে যাব?"

"তা যাচ্ছেতাই ছাড়া আবার কি? উনি কিছু যেচে আসেন নি? দিদি তল্লাস করেছিল তাই—"

কথা থামিয়ে দিয়ে সত্য বলে ওঠে, "সেই ঘেন্নাতেই গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল আমার।"

"তার মানে?"

"মানে ভেবো খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে। এখন চান কর গে।"

"থাম! বলি দোষটা কি করেছে দিদি? স্বামী তো বটে?"

"তা তো নিশ্চয় !"

"তবে ?" নবকুমার সোৎসাহে বলে, "মুখুয্যেমশাই যা বললেন, তাতে বুঝলাম ওঁর দুঃখুটা। আর যাই হোক লোকটা কপট নয়। বললেন, একসময় দোষ ঘটেছিল ঢের, কুসঙ্গে পড়ে নেশাভাঙ কুকর্ম কিছুই বাকী রাখে নি ভায়া, সতী-সাধ্বীকে লাঞ্ছনাও করেছি। কিন্তু পরে চৈতন্য হয়েছে।"

সত্য নিরীহ গলায় বলে, "হয়েছে বুঝি !"

"হয়েছে বৈকি ! এখন তো ওই তামাকটুকু ছাড়া আর কোনো নেশাই নেই। তাই বলছিলেন, কত ইচ্ছে হয়েছে গিয়ে ক্ষমা চাই, মামার পায়ে ধরে চেয়ে আনি, কিন্তু লজ্জায় পারি নি। তা তোমার দিদি যেকালে আগু বাড়িয়ে লজ্জাটা ভেঙে দিল, তাতে—"

"তা বেশ তো, সুখের কথা। দিদিকে আনিয়ে নিয়ে আবার নতুন করে গাঁটছড়া বেঁধে পাঠিয়ে দাও। দুই সতীনে সুখে সংসার করুক—," বলে একটু তীক্ষ্ণ হেসে সরে যাচ্ছিল সত্য, কিন্তু মুহূর্তে ঘটে গেল এক বিপর্যয়।

নবকুমার বোধ করি কিছু না ভেবেচিন্তেই ক্ষণপূর্বে শোনা একটি কথা যথাযথ উচ্চারণ করে বসল, "তা সে সতীন-জ্বালা আর বেশী দিন নয় ! শুনলাম নাকি এ পক্ষের সূতিকা ধরেছে। তবে ? সে কাঁটা আর কদিন ?"

মুহূর্তে যেন একটা বোমা ফেটে গেল। সত্যবতী উন্মাদের মত নিজের কপালে একটা থাবড়া মেরে চিৎকার করে উঠল, "চুপ করবে তুমি ? দয়া করে একটু চুপ করবে ? যদি তা না পারো তো যে করে পারো, আমায় জন্মের শোধ কালা করে দাও।"

একার সংসারে এতদিন ধরে অরুচি আর অক্ষিধেয় না খেয়ে খেয়ে ভিতরে ভিতরে দুর্বল হয়ে যাওয়া শরীরটা এই উত্তেজনার ভার বইতে পারল না। হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল।

ছেলে দুটো হাঁউমাউ করে জল আর পাখা আনতে ছুটল, নবকুমার ঘর থেকে একটা বালিশ এনে সত্যর লুটিয়ে পড়া মাথার তলায় গুঁজে দিতে বসল, আর এই সময় সুহাসিনী ও-বাড়ি থেকে এরে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আজ ভারী উৎফুল্ল হয়ে আসছিল সুহাস, কারণ তাঁর শিক্ষা-গুরু বৌটি-

বলেছেন, "তুমি যদি ভাই রাজী থাক, তো আমার মাস্টারী কর। বড়লোকের বাড়িতে কেবল খেয়েশুয়ে জীবনে যেন ঘেন্না ধরে গেছে। তোমায় দেখে মনে হয়, যদি তোমার মতন বই-টই পড়তে পারতাম, তা হলেও বা দিনটা কাটত। তা ইস্কুলে যাওয়া তো আর এ জীবনে হবে না, তবু তোমার কাছে যদি—"

মাস মাস আটটা করে টাকা দিতে চেয়েছে সে। সুহাস অবশ্য টাকার কথায় আপত্তি করেছিল, বলেছিল, "টাকা কেন ভাই? তুমি আমায় একটা বিদ্যে শেখাচ্ছ, আমি না হয় তার বদলে তোমাকে একটা—"

কিন্তু সে হাতে ধরে কাকুতি-মিনতি করেছে। বলেছে, "আমার শখের জন্যে টাকা খরচ করতে তো আমার বর সর্বদা রাজী। একদিন থিয়েটার নিয়ে যেতে পঁচিশ-তিরিশ টাকা খরচ করে, এও তো আমার একটা শখ? গুরুকে দক্ষিণে না দিলে বিদ্যে হয় না।"

সুহাস রাজী হয়ে এসেছে।

উৎফুল্ল হৃদয়ে সত্যর কাছে বলতে আসছিল, "দেখ পিসিমা, বড়লোক মাত্রেই খারাপ হয় না। তাদের মধ্যেও মহৎ আছে—" কিন্তু এসেই এই দৃশ্য।

তাড়াতাড়ি সবাইকে সরিয়ে দিয়ে সেবার ভারটা হাতে তুলে নিল সে। আর সেই প্রথম খবরটা জানল। আত্মগত ভাবেই বলে ফেলল নবকুমার, "শরীরটায় পদার্থ নেই দেখছি। বাচ্ছা-কাচ্ছা হবার আগে মেয়েছেলে মা-ঠাকুমার কাছে যায়, তা সে গুড়ে তো বালি। বারুইপুরেই পাঠিয়ে দিতে হবে দেখছি।"

কিছুটা সময় দিশেহারা হয়ে তাকাল সুহাস। তার পর নিজের ওপর ধিক্কারে অবাক হয়ে গেল। ছি ছি, এতবড় বুড়োমাগী মেয়ে সে এমনই অবোধ! একঘরে একসঙ্গে কিছু টের পায় নি? তুড়ু খোকার চাইতে তা হলে কোন তফাৎ নেই তার। পিসিমার যে শরীরের এমন অবস্থা হয়েছে, প্রথমে তো তারই বোঝা উচিত ছিল। যত্ন-আত্যিও করা উচিত ছিল।...

বুঝতে পারে নি।

সত্যর ছেলে দুটো এত বড় হয়ে গিয়েছে যে, এ ধরনের চিন্তা মাথাতেই আসে নি। তা শুধু লজ্জাই নয়, আজ সত্যর ওই চৈতন্যহীন পাংশু মুখের দিকে তাকিয়ে অজানা একটা ভয়েও বুকটা কেঁপে উঠল সুহাসের।

সুহাসের ভাঙা ভাগ্যে যদি তার এই আশ্রয়ের ভেলা ডুবে যায়? যদি সত্যর কিছু ঘটে?

অনেকদিন পরে ছেলেপুলে হলে তো বিপদ হতে পারে শুনেছে, বুকটা কেঁপে নিথর হয়ে এল সুহাসের। আর বোধ করি এই প্রথম উপলব্ধি করল সত্যকে কতটা ভালবাসে সে। শুধু আশ্রয়ের ভেলা বলেই নয়, 'মানুষ'টা বলেও প্রাণের আসনে বসিয়ে রেখেছে সুহাস সত্যকে প্রতি মুহূর্তের সংস্পর্শে।

মা-ঠাকুমা নেই বলে যত্ন পাবে না সত্য? সুহাসের কি বয়েস হয় নি সেবা করবার?

একচল্লিশ

অনুতাপ-দগ্ধ সুহাসের দৃঢ় সংকল্প অবশ্য কাজে লাগল না। কারণ মাত্র একটা বেলার বেশী বিছানায় শুয়ে থাকল না সত্যবতী। সুহাসের অনুনয়-বিনয় এবং নবকুমারের ব্যস্ত ভৎর্সনাকে উপেক্ষা করে উঠে পড়ল সে। বলল, "ঠিক হয়ে গেছি বাবা! তোমরা আর তিলকে তাল করো না।"

কিন্তু এই আকস্মিক দুর্বলতার ঘটনায় গভীর একটা চিন্তা দেখা দিল সত্যবতীর মনের মধ্যে। সে চিন্তা স্বামী-পুত্রের জন্য নয়, ওই অনাথা মেয়েটার জন্যেই। নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে সত্য, কিন্তু যদি সত্যর একটা কিছু ঘটে, ওর কি হবে? অবিশ্যি মরে এক্ষুণি যাবে সত্য, তা নয়, তবু বলা কি যায়! বুড়ো বয়সে আবার যখন কেঁচে-গণ্ডূষের পালা পড়ল, তখন ভয় আছে বৈকি! ছেলেদের জন্যে ভাবনা নেই, ওরা প্রায় মানুষ হয়ে এল, নবকুমারেরও মা-বাপ আছে এখনও, হয়ে যাবে কোন ব্যবস্থা, ওই মেয়েটারই অজল অস্থল অবস্থা। ওই রূপের ডালি মেয়েকে এলোকেশী নিশ্চয়ই সুচক্ষে দেখবেন না। তা ছাড়া শুধু দেখার প্রশ্নই তো নয়। এতদিন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিল সত্য এবং পরদিন নবকুমারের কাছে একটা অসমসাহসিক আবেদন করে বসল।

সত্য মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবকুমারেরও মাথা ঘুরে গিয়েছিল

এবং এই কদিন নিতান্তই বেচারার মত কিসে সত্যর সন্তোষ-বিধান হতে পারে তার চেষ্টা করছিল, কিন্তু সত্যর এই আবেদনে তার নতুন করে আবার মাথা ঘুরে গেল। অবাক হয়ে বলল, "মাস্টার মশাইয়ের বাড়ি যাবে তুমি! কেন? হঠাৎ এমন কি দরকার পড়ল?"

"আছে দরকার।"

"কিন্তু নিতাই শুনলে কি আস্ত রাখবে আমায়?"

"আস্ত রাখবে না?" সত্য মৃদু একটু ব্যঙ্গহাসি হেসে বলে, "একেবারে ভেঙেই ফেলবে?"

"তা প্রায় তাই। তা ছাড়া, মানে দরকারটা কি?"

"বললাম তো আছে দরকার।"

নবকুমার নম্রতা ভোলে, ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে ওঠে, "ওই বেধর্মী লোকটার সঙ্গে তোমার দরকারটাই বা কি তাই শুনি?"

বলে ফেলেই অবশ্য ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। কে জানে বাবা এ কথাতেও সত্য অজ্ঞান হয়ে যাবে কিনা। কিন্তু না, অজ্ঞান হয়ে যায় না সত্য, শুধু মিনিট-খানেক পাথরের চোখ নিয়ে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, "একটা পরামর্শ করব।"

"পরামর্শ! বাপ-পিতেমোর নাম গেল হিঁদে জোলার নাতি! জাতে-জ্ঞাতে পরামর্শর মানুষ মিলল না, পরামর্শ করতে যাবে ওই ধর্মখোয়ানো ইয়ের সঙ্গে?"

সত্য বোধ করি রাগবে না বলেই দৃঢ়সংকল্প, তাই স্থিরভাবে বলে, "জাতে-জ্ঞাতে 'মানুষ' আর পাচ্ছি কোথা? পাখী-পক্ষীর সঙ্গে তো আর পরামর্শ হয় না? যাক গে, তুমি যখন নিয়ে যেতে পারবে না, আমি নিজেই যে করে হোক—"

"নিজেই যে করে হোক!"

"তা ছাড়া?"

নবকুমার আরো ক্রুদ্ধগলায় বলে, "এই এক একবগ্‌গা গোঁ! যা ধরব, তা করবই। বেশ এতই যদি দরকার, তাঁকেই তবে ডেকে আনব গলবস্ত্র হয়ে গিয়ে।"

"না!"

"না?"

"না-ই তো! একদিন নিজের মুখে তুমি তাঁকে এ বাড়িতে আসতে বারণ করেছ—"

"করেছি, এবার গলবস্ত্র হয়ে সে অপরাধ ক্ষয় করব!"

"ক্ষয় হয় না এমন অপরাধও তো জগতে আছে গো? যাক্, তর্ক আমি করতে চাই না, তবে এ বাড়িতে আর পা ফেলতে বলব না তাঁকে, নিজেই গিয়ে যা পারব—"

"এই তোমার জন্য একদিন দেশত্যাগী হতে হবে আমায়!"

নবকুমার মুখের চেহারায় বিরক্তির চরম নমুনা দেখায়। কিন্তু সত্য নির্বিকার, বলে, "দেশত্যাগী হব বললেই কি হওয়া যায়? যায় না। যাক্ গে তুমি আর ও নিয়ে মাথা খারাপ করো না। আমিই ব্যবস্থা করে নেব। তবে জানানোটা হয়ে থাকল।"

মাথা খারাপ করতে বারণ করলেই কি আর নিজের দায়িত্ব ত্যাগ করতে পারে নবকুমার? মাথা সে খারাপ করছেই। শেষ অবধি ভেবে হদিস না পেয়ে হাল ছেড়ে দেয় সে, আর ইত্যবসরে সত্য স্বাধীন অভিযান চালায়। নিজেই রওনা হয় ভবতোষের বাড়ি।

পথের সঙ্গী?

আর কেউ নয় সুহাস!

হ্যাঁ, সুহাসের সঙ্গেই গিয়েছিল সত্য। সুহাস ঠিকানাটা শুনে বলেছিল, "ওমা, এ তো আমাদের ইস্কুলের কাছেই—"

"ঠিক আছে, তবে তোতে আমাতেই যাব—"

বলেছিল সত্য, আর বোধ করি মনের নিভৃত কোণে এটুকু গুপ্ত বাসনা ছিল, ভবতোষকে একবার 'কনে'টা দেখিয়ে দিতে। ঘটকালি যখন করবেন, তখন অন্তত মেয়ে কেমন তা যাতে বলতে পারেন।

এবার আর মাধ্যম নয়, সরাসরি নিজেই কথা!

ভবতোষ যেন হাঁ হয়ে গেলেন!

সত্য একটা অনাথ মেয়ে পুষেছে, এ তিনি জানতেন, কিন্তু সে মেয়ে যে এমন মেয়ে আর এত বড় মেয়ে তা তাঁর ধারণার বাইরে ছিল। বিহ্বল দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চোখ নামিয়ে নিয়ে বললেন, "এ মেয়ের আবার পাত্তরের ভাবনা বৌমা?"

"সে আপনি স্নেহ করে বলছেন। দিন তবে নাতনীর একটা ব্যবস্থা করে। আপনাদের সমাজে শুনেছি অনেক উদারমন ছেলে আছে যারা বিধবা বিয়ে করতে রাজী—"

বিধবা!

ভবতোষ থতমত খান, "বিধবা! এ মেয়ে যে লক্ষ্মী-প্রতিমা বৌমা, বিধবার মতন তো কোন লক্ষণ—"

সত্য সহসা বলে ওঠে, "তুই একবার পাশের ঘরে যা তো সুহাস, আমার একটু কাজ আছে।"

সত্যর এই দুঃসাহসিক স্পর্ধায় সুহাসও স্তম্ভিত হয়ে যায়। একেই তো এভাবে একটা পুরুষের বাসায় একা দুটো মেয়েছেলে আসাই ভয়ঙ্কর ঘটনা, তার ওপর কিনা "সুহাস তুই পাশের ঘরে যা!"

প্রায় হতভম্ব হয়েই চলে যায় সুহাস।

ভবতোষ হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন এই কূলকিনারাহীন দুঃসাহসের দিকে। আর সত্য নিষ্কম্প মৃদু স্বরে বলে, "এসেছি যখন, তখন আপনার কাছে ওর সব ইতিহাসই বলব!"

হ্যাঁ, সুহাসের সব ইতিহাসই বলেছিল সেদিন সত্য ভবতোষ মাস্টারের কাছে। সুহাসের জন্মের আগের বৃত্তান্ত থেকে শুরু করে পরিচয়ও বাদ দেয় নি। শঙ্করীর কুলত্যাগের পর রামকালীর স্পষ্ট স্বীকারোক্তির কথাটাও এসে পড়েছিল।

সব শুনে ভবতোষ গভীর একটা নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, "এখন বুঝতে পারছি বৌমা, কোথা থেকে এ ধাতু তুমি পেয়েছ। অমন বাপ তাই—কিন্তু কথা হচ্ছে বৌমা, এই আমার নতুন সমাজকে তুমি যে রকম উদার ভাবছ, ঠিক সে রকম নয়। এর মধ্যেও দলাদলি আছে রেষারেষি আছে, তা ছাড়াও—যে মেয়ের বংশ-পরিচয় নেই, সে মেয়েকে বিবাহ করার মত মনোবল-সম্পন্ন যুবক পাওয়া শক্ত!"

সত্য দৃঢ়স্বরে বলে, "শক্ত সহজ বুঝি না, চিরদিন জানি আমার কথা আপনি ফেলতে পারেন না, তাই জোর করতেই এসেছি। ওই মেয়েটার ব্যবস্থা আপনাকে করতেই হবে।"

ভবতোষ বিচলিত স্বরে বলেন, "আমি তোমার কথা ফেলতে পারব না, এ কথা তুমি জানলে কি করে বৌমা?"

সত্য মুখ তুলে পরিষ্কার এবং শান্তগলায় বলে, "এ কথা জানতে খুব বেশী কিছু লাগে না মাস্টার মশাই, আমি তো মাটি পাথর নই। কিন্তু সে কথা থাক, আপনি শুধু আমায় ভরসা দিন—"

ভবতোষ মৃদু একটু হাস্যের সঙ্গে বলেন, "চেষ্টা অবিশ্যি করব বৌমা, কিন্তু জোর করে তো বলতে পারছি না। যদি নিজেকে দিয়ে হত, তা হলে নয় আজন্মের ব্রত ঘুচিয়ে একবার তোমার সুন্দরী মেয়ের জন্যে বরসাজ সেজে নিতাম!"

সত্যও হেসে ফেলে। তারপর সকৌতুকে বলে, "তেমন ভাগ্য ওর থাকলে তো? আমি কিন্তু বলে যাচ্ছি সব ভার আপনার ওপর রইল!"

ভবতোষ আকুলতা করেন, ভবতোষ ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, বারবার বলতে থাকেন, "এ তুমি কি করলে বৌমা? আমাকে এভাবে সত্যবন্দী করে রাখলে—"

সত্য বিচলিত হয় না।

সত্য দৃঢ়স্বরে বলে, "আমি ঠিক জায়গাতেই ঠিক কথা বলেছি মাস্টার মশাই, এখন আপনি আছেন এই ভরসা।"

ভবতোষ আকাশ পাতাল ভাবতে থাকেন কোথায় সেই পাত্র যার হাতে ওই সোনার প্রতিমাটিকে দেওয়া যায়, আর যে ওর সমগ্র ইতিহাস শুনেও নিতে রাজী হয়।

ভেবে পান না।

একটা নিশ্বাস ফেলে বলেন, "এখন চট করে মাথায় আসছে না বৌমা, দেখি। কিন্তু একটা প্রশ্ন করি, এই যে তুমি এসেছ নবকুমার জানে?"

সত্য মাথা কাত করে। অর্থাৎ "হ্যাঁ।"

"জানে! তা ভাল। কিন্তু তোমার এই ব্রাহ্মবাড়ি আসায় এবং ওই মেয়েটির বিবাহ সম্বন্ধে যা প্রস্তাব করলে তাতে তার সম্মতি আছে তো?"

সত্য ঘাড় নাড়ে। অর্থাৎ "না।"

ভবতোষ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলেন, "তবে?"

"তবে আর কি? ওনার অমতেই করতে হবে।"

"কাজটা কি ভাল হবে বৌমা?"

সত্য মুখ তুলে বলে, "কিন্তু ওই মেয়েটার আখেরের কথা না ভেবে নিশ্চিন্দি হয়ে বসে থাকাই কি ভাল হবে মাস্টার মশাই? আমার ঘরে

সংসারে হয়তো একটু মনোমালিন্য হবে, হয়তো শ্বশুরবাড়ির মানুষেরা আমার মুখ দেখবে না, কিন্তু আমার সেই সামান্য লোকসানটা কি একটা মেয়ের জীবনটা বরবাদ হয়ে যাওয়ার থেকে বেশী লোকসানের হল ?"

ভবতোষ এক মুহূর্ত নির্নিমেষে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ ব্যাকুল রুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠেন, "সন্ধ্যে হয়ে আসছে বৌমা, তুমি বাড়ি যাও। তোমায় কথা দিচ্ছি। ওর বিয়ের ভার আমি নিলাম।"

সত্য আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে সন্ধ্যের চিহ্নমাত্র নেই। মাথাটা একটু নিচু করে বলে, "চিরটাকাল আপনার কাছে অন্যায় আবদার করে, আর পেয়ে, সাহস বেড়ে গেছে মাস্টার মশাই, আমায় মাপ করবেন।"

"মাপ ? তোমায় আর আমি কি মাপ করব বৌমা ? নিজেকে যদি মাপ করতে পারতাম ! সে যাক, মেয়েটি কোথায় গেল ?"

মেয়েটি ! তাই তো !

তার তো তদবধি আর কোন সাড়া নেই। সত্য ব্যস্তভাবে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে, আর এই প্রথম খেয়াল হয় অনেকক্ষণ ধরে সে এই তৃতীয় মানুষহীন ঘরে একজন পুরুষের সঙ্গে নিশ্চিন্তে কথা বলছে বসে বসে।

সুহাস কি বিরক্ত হল ?

পাশের ঘরে চলে যেতে বলেছে বলে অপমানিত হল ?

পাশের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল সত্য, কিন্তু কোথায় সুহাস ?

একা চলে গেল না তো ?

সহসা একটা আতঙ্কের বিদ্যুৎশিখা মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেন শিউরে উঠল সত্যবতীর ! নিশ্চয় তাই।

"কই ?"

প্রশ্ন করলেন ভবতোষ।

সত্য অস্ফুটে বলল, "কই দেখছি না তো ! একা চলে গেল না তো ?"

একা !

একা চলে যাবে !

ভবতোষ সন্দেহের সুরে বলেন, "তাই কখনো হয় ? ওই কোণের ঘরটায় আছে বোধ হয়—"

"কোণের ঘরে ? ওখানে কি আছে ?"

"কিছু না। শুধু কতকগুলো—"

কথা শেষ হয় না। মুখে একঝলক আলো মেখে সুহাস সেই কোণের ঘরটা থেকে ছুটে আসে, স্বভাব-বহির্ভূত উচ্ছ্বাসে বলে ওঠে, "পিসিমা পিসিমা, দেখবে এস কত বই। উঃ, আমার আর এখান থেকে যেতে ইচ্ছে করছে না।"

বিয়াল্লিশ

সময়ের বাড়া কারিগর নেই।

সময়ের "র‍্যাঁদা"র নিচেয় পড়ে সব অসমানই সমান হয়ে আসে, সব এবড়ো-খেবড়োই তেলা হয়ে যায়।

সকল সংসারের মত নিতাইয়ের সংসারেও এই লীলা চলছে বৈকি। প্রথক দিকে এক-একদিন এক-একটা ছুতোয় মনে হত, নিতাই বোধ করি এই দণ্ডে বৌকে দেশে রেখে আসবে, অথবা বৌ ভাবিনী সেই রাত্রেই আড়ায় দড়ি ঝুলিয়ে নিজে ঝুলে পড়বে। কিন্তু কার্যকালে তেমন কিছুই হল না।

ক্রমশই, বোধ করি নিজেদের অজ্ঞাতসারেই, ভাবিনী স্বাধীন সংসারের সংসার-রসে এবং নিতাই আর এক স্থূলরসে মজতে শুরু করল, অতঃপর দুজনেই পরস্পরের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠল।

অতএব খণ্ডপ্রলয়ের সেই অবস্থাটি কোন্ ফাঁকে ফিকে হতে হতে বিলীন হয়ে গেল, দেঁতো হাসি বাজার দখল করল।

এখন দেখা যাচ্ছে—নিতাইয়ের বৌ রুটি গড়তে শিখেছে, এবং নিতাই বৌকে ভয় করতে শিখেছে।

ভয় থেকেই আসে মনোরঞ্জন-চেষ্টা। ক্রমশই অনুধাবন করছে নিতাই সত্যবতীর নিন্দাবাদটি হচ্ছে বৌয়ের মনোরঞ্জনের একটি প্রশস্ত পথ, মনো-বৈকল্যের একটি প্রকৃষ্ট ওষুধ।

অতএব সেই প্রশস্ত আর প্রকৃষ্ট উপায়টিই বেছে নিয়েছে নিতাই। না নিয়ে করবেই বা কি? পরিবারের পরকলায় জগৎকে দেখতে না শিখলে যে জগৎ দুঃসহ হয়ে ওঠে। অন্ততঃ নিতাইদের মত নিতান্ত গৃহগতপ্রাণ গেরস্থ জীবদের। এদের ও ছাড়া উপায় নেই।

আগুনের মালসা কোলে করে তো আর ঘর করা যায় না? আগুনে জল ছিটোতেই হয়। তদ্গতপ্রাণ বশংবদ হয়ে পড়াই সেই শীতল জল।

নারীজাতি যতই অবলা কোমলা হোক্, স্বক্ষেত্রে সে বাঘিনী। আর ইচ্ছা পুরণের অভাব ঘটলে ফণাধরা নাগিনী হয়ে উঠতেও পিছপা নয়। শান্তিকামী পুরুষজাতি যতক্ষণ না এটা ধরতে পারে, সংঘর্ষ বাধে, যতক্ষণ মনে করে এটা মেনে নেব না, অবস্থা আয়ত্তে আনা অসম্ভব হয়। অথচ একবার বশ্যতা স্বীকার করলেই মিটে গেল গোল। কিসে তুষ্টি ধরতে পারলেই বিশ্বশান্তি।

অতএব এখন ভাবিনী যে কোন কারণেই মেজাজ গরম করুক অথবা বাক্যালাপ বন্ধ করুক, নিতাই এটা ওটা কথার ছলে স্বগতোক্তির স্বরে সত্যবতীর প্রসঙ্গ এনে ফেলে। যে প্রসঙ্গ আর যাই হোক প্রশস্তির পর্যায়ে পড়ে না।

দু-চারবার চেষ্টার পরই কার্যসিদ্ধি হয়, মৌনব্রতধারিণী ঝঙ্কার দিয়ে বলে ওঠে, "কেন, এখন আবার এসব কথা কেন? চিরদিনই তো শুনে আসছি তিনি গুণের গুণমণি! তাঁর পাদোদক জল খেতে পারলে তবে যদি আমাদের মত অধমদের উদ্ধার হয়!"

নিতাই সোৎসাহে কাজ এগোয়, "তা বলতে অবিশ্যি পার, এই মুখেই অনেক গুণগান করেছি বটে। কিন্তু এখন? এখন আর নয়। এখন আর তাঁকে চিনতে বাকী নেই। কি বলব তোমাকে, ওই 'বেহ্ম'টার সঙ্গে যা নটঘটি, দেখে দেখে চিত্তির চটে গেল। অবিশ্যি—", নিতাই মুখ কোঁচকায়, "সন্দেহ একটু আধটু বরাবরই ছিল, তবে সে সন্দেহকে আমল দিতাম না। বলি, না না ছিঃ! বামুনের ঘরের মেয়ে—কিন্তু এখন তো দেখছি চোখের চামড়াহীন বেপরোয়া! একলা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে তার বাড়ি গিয়ে গিয়ে—"

"তা তোমার বন্ধু কি কানা না বোবা?" ভাবিনী চিপ্‌টেন কাটে।

নিতাই মুচকে হেসে বলে, "স্ত্রৈণ পুরুষ শুধু কানা বোবা কেন, বোবা কালা কানা হাবা বুদ্ধু ভেড়া সব। ক্রমশই যে অবস্থা আমার ঘটছে আর কি!"

ভাবিনীর কালো কালো ডাবর ডাবর মুখে আহ্লাদ রসের হাসি উছলে ওঠে। সেও মুখ টিপে বলে, "আহা লো মরি মরি! তবু যদি না রাতদিন এই বাঁদী থরহরি কম্প হয়ে থাকত! ভেড়াপুরুষ কেমনধারা একবার দেখতে সাধ যায়।"

সেদিন নিতাই এই কথার পিঠে বলে ওঠে, "সাধ যায় তো চল না দেখবে। ও বাড়ি তো যেতেই চাও না।"

"পরের বাড়ি গিয়ে দেখে আর কি হবে?"

ভাবিনী "গুলি" চোখে কটাক্ষ হানে।

নিতাই বলে, "তা সকল বস্তুই কি আর ঘরেই মেলে গো? তবু দৃষ্টি সার্থক করবে তো চল। শুনলাম দেশ থেকে সদুদি এসেছে বৌয়ের আঁতুড় তুলতে। দেখা হবে—"

"সদুদি এসেছে?" ভাবিনী গালে হাত দিয়ে বলে, "আঁতুড় কলকাতাতেই উঠবে? গিন্নী দেশে যাবেন না? এ সময়েও শাউড়ীর ধার ধারবেন না?"

"তাই তো শুনছি। বলেছেন নাকি, কেন, কলকাতায় কি আর জন্মমৃত্যু হচ্ছে না?"

"তা ভাল!"

নিতাইয়ের বৌয়ের মুখে অন্ধকার নামে। সত্যবতীর "খবরটা" শুনে অবধি একটা আশা ছিল কিছুদিনের মতন অন্ততঃ ওই চক্ষুশূলটা চোখছাড়া হবে। আর সেই অবসরে ভাবিনী সত্যবতীর স্বামী-পুত্তুরকে নেমন্তন্ন-আমন্তন্নর ছলে খাইয়ে মাখিয়ে বশ করে ফেলে বরকে তাক্ লাগিয়ে দেবে।

তা না এই বার্তা!

বাসায় বসে আঁতুর তোলাবেন!

ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে ওঠে ভাবিনী, "তা ভেড়া বর তাতেই রাজী তো? মা বাপের মুখে চুনকালি দিয়ে বৌ আপনি স্বাধীন হয়ে বেটা-বেটি বিয়োবে—"

নিতাই চোখ মটকে বলে, "তা হোক! ও তো বাঁচল। পরিবারকে চোখ ছাড়া করতে হল না।"

কথাটা নিতাই অনুমানে বলল মাত্র। প্রকৃত ঘটনা কিন্তু তা নয়।

সত্যবতীর এ প্রস্তাবে নবকুমার শিউরেই উঠেছিল, এবং 'অসম্ভব' বলে উড়িয়েই দিয়েছিল।

"আঁতুড় পর্বের" মত একটা ভয়ঙ্কর পর্ব যে দেশের বাড়িতে গিয়ে না পড়লে মিটতে পারে, এ তার ধারণার বাইরে।

কিন্তু শেষ অবধি বরাবর যা হয় তাই হল। সত্যবতীর তীক্ষ্ণ যুক্তির বাণে নবকুমারের দ্বিধা লজ্জা ভয় সব টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

ভয়টা কিসের?

কলকাতায় জন্ম-মৃত্যু হচ্ছে না। ভূমিষ্ঠ শিশুর নাড়ি কাটা বাকী থাকছে?

লজ্জা?

লজ্জার অর্থ?

বুড়ো বয়সে যদি আবার কেঁচেগণ্ডূষে লজ্জা না হয় তো বাসায় আঁতুড় তোলাতেই লজ্জা?

অতএব?

দ্বিধার প্রশ্নটা অবান্তর।

নবকুমার অবশ্য এই 'বুড়ো বয়স' কথাটায় রেগে উঠেছিল। বলেছিল, "বুড়ো বয়স বুড়ো বয়স করছ কেবলই কেন বল তো? আমার ছোট মাসীর পৌত্তুরের উপনয়ন হয়ে যাবার পর আবার একটা মেয়ে হয়েছিল—"

সত্য জ্বলন্ত দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়েছিল একবার, তার পর সংক্ষেপে বলেছিল, "ওসব কথা থাক, এখানেই ব্যবস্থা করতে হবে সেই কথাটাই জানিয়ে রাখলাম।"

বলা বাহুল্য মাত্র এইটুকুতেই কাজ হয় নি।

নবকুমার বিস্তর হাত-পা আছড়েছিল, বিস্তর আক্ষেপ জানিয়ে বলেছিল, "আমি ও সবের কি জানি? এখানে কাউকে চিনি আমি? ব্যবস্থা করতে হবে বললেই হল?"

তার পর সত্যর একটি তীব্র মন্তব্যে সহসা চুপ করে গিয়েছিল। আর অতঃপর একদিন বুদ্ধি করে চুপি চুপি গিয়েছিল সদুর বরের কাছে। শুনেছিল তার গণ্ডা তিন-চার ছেলেমেয়ে। সেগুলো নাকি কলকাতাতেই জন্মেছে, অতএব লোকটা অভিজ্ঞ।

তা অভিজ্ঞ লোকটা দরাজ ভরসা দিয়ে আশ্বস্ত করল নবকুমারকে এবং সেই সঙ্গে সদুকে আনিয়ে নেবার পরামর্শটা দিল।

দিন তিনেক ছুটি নিয়ে বারুইপুরে গিয়ে সদুকে এনে ফেলল নবকুমার।

কিন্তু যত সহজে বলা হল, কাজটা কি তত সহজে হয়েছিল?

পাগল? তাই কি সম্ভব?

এলোকেশী একাধারে তাঁর রাঁধুনী পরিচর্যাকারিণী এবং নিঃসঙ্গ সংসারের সঙ্গিনী সদুকে কি এক কথায় ছাড়তে রাজী হয়েছিলেন?

হারামজাদী শতেকখোয়ারী হাড়বজ্জাত বৌটার নামে একশো গালাগালের ছড়া কেটে, বেয়াক্কেলে বেহায়া বৌয়ের দাসানুদাস ছেলেকে কি শুধু হাতে বিদায় করতে উদ্যত হন নি?

হয়েছিলেন।

কিন্তু ভেস্তে দিল স্বয়ং সদু!

সে বলে বসল, "আমি যাব।"

"তুই যাবি?" এলোকেশী গর্জে উঠেছিলেন, "আক্কেলখাকি, চোখের মাথাখাকি, নেমকহারাম লক্ষ্মীছাড়ি! তুই আমাদের একা ফেলে সেই হাড়হাবাতির পাদোদক খেতে যাবি?"

কিন্তু সদু অনমনীয়।

সদুর যে এত গোঁ আছে, এ কথা কে কবে জানত?

এ যেন আর এক সদু।

সামান্য দু-চারখানা কাপড়ের সম্বল নিয়ে সদু সদরে দাঁড়িয়ে প্রস্তুত।

আজন্ম অগঙ্গার দেশে মুখ থুবড়ে প্রাণ গেল সদুর, কালী-গঙ্গার দেশে যেতে পাবার এই সুযোগ ছাড়বে না।

তোমাদের কন্না? সে তো চিরকাল করে এল! সদুর কি ছুটি নেই? সদু যদি মরে? তোমরা কি না খেয়ে থাকবে?

কে সদুকে এই বিদ্রোহের শক্তি দিল ঈশ্বর জানেন।

"থ" হয়ে গেলেন এলোকেশী, হকচকিয়ে গেল নবকুমার।

নীলাম্বর বাঁড়ুয্যে ক্রুদ্ধগলায় বললেন, "যাচ্ছ যাও, কিন্তু আর কখনো এ ভিটেয় মাথা গলাতে এস না এই বলে রাখছি!"

সদু প্রণাম করে নম্রগলায় বলল, "আচ্ছা!"

দিশেহারা নবকুমার বলল, "ভয়ে আমার নাড়ি ছেড়ে আসছে সদুদি, থাক্ তোমায় যেতে হবে না। বৌয়ের যদি পরমায়ু থাকে বাঁচবে, আর যদি কপালে মৃত্যু থাকে—"

সৌদামিনী মৃদু হেসে বলল, "তোর বৌকে বাঁচাতে যাচ্ছি ভেবেছিস? মোটেও না। নিজের কপালটা ফের আর একবার যাচাই করতে ইচ্ছে হয়েছে, তাই যাচ্ছি।"

এ কথার মানে নবকুমার বুঝতে পারে নি। চোরের মত মা-বাপের সামনে থেকে পালিয়ে এসেছে।

এলোকেশী উচ্চকণ্ঠে ভগবানকে ডাক দিয়ে আদেশ করেছেন—"ভগবান, যে সর্বনাশী আজীবন আমার বুকে কুলকাঠের আংরা জেলে রেখে দগ্ধাল, আর বুড়ো বয়সে এই কোমরের বলটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে মজা দেখতে বসল, তুমি তার বিচার করো। যদি 'ন্যায়পরায়ণ' হও তো সর্বনাশীর যেন তেরাত্তির না পোহায়! তার ভরা ঘরে যেন দোর পড়ে, তার মুখের গেরাস যেন বাসি চুলোর ছাই হয়ে যায়, এহকালে পরকালে যেন তার গতি না হয়।"

সত্যবতীর আরো অনেক ভয়াবহ পরিণতির জন্য ন্যায়পরায়ণ ভগবানের কাছে আবেদন জানাতে থাকেন এলোকেশী স্বর করে ছন্দে গেঁথে।

না, কথাটাকে মিথ্যা ভাববার হেতু নেই, বাড়াবাড়ি ভাবলেও ভুল ভাবা হবে, সত্যবতীদের আমলে এলোকেশীরা নিতান্তই বিরল ছিল না।

আর আজই কি আছে?

নেই। শুধু হয়তো অভিশাপের বাণীগুলি সভ্য মার্জিত সূক্ষ্ম হয়েছে। তীব্র চিৎকারটা তীক্ষ্ণ মন্তব্যে পরিণত হয়েছে।

সে যাক, সত্যবতীর কানে এসব পৌঁছল না। শুধু বিনা নোটিশে হঠাৎ সদুর আবির্ভাবে প্রথমটা একটু বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল সে। তার পরই অবশ্য সামলে নিল। মৃদু হাসিমাখা মুখে বলল, "যাক ভালই হল। সংসারটা একজনের হাতে তুলে দেবার লোক হল। এবার নিশ্চিন্দি হয়ে মরে বাঁচব!"

সদু ভুরু কোঁচকাল, "কেন মরার কি হল? রাজ্যি সুদ্ধু মেয়েমানুষ মরছে?"

সত্যবতী হাসল। "কি জানি, এবার কেবলই মনে হচ্ছে মরে যাব। কালের ঘণ্টা কানে বাজছে যেন।"

তা যে ঘণ্টাই কানে বাজুক, মরে অবিশ্যি গেল না সত্যবতী। শুধু দীর্ঘকাল যমে-মানুষে টানাটানি চলল, শুধু সত্যবতীর সংসারে অনেক ওলট-পালট কাণ্ড ঘটে গেল, আর সত্যবতীর মনোজগতে অনেক বিপর্যয় ধাক্কা মেরে মেরে আরো দৃঢ় করে তুলল সত্যবতীকে।

এরই মাঝখানে সত্যবতীর নবজাত কন্যা কেবলমাত্র কান্নার জগৎ থেকে হাসির জগতে উঁকি দিতে শিখে ফেলল।

সাধন সরল দুই ভাই কাঁচের পুতুলের মত মেয়েটাকে 'গলার হার' করে তুলল, আর নবকুমারের মধ্যে দেখা দিল প্রবল একটি বাৎসল্য রসের ধারা। তবু তার যেন নববধূর লজ্জা।

যদিচ মেয়ে সন্তান কানাকড়ি মাত্র, তথাপি দেখতে ইচ্ছে করে, নাড়াচাড়া করতে ইচ্ছে করে। আর স্নেহের বস্তু বলে মিষ্ট একটি অনুভূতি আসে।

সাধন সরল তার অপরিণত বয়সের ফল। সে বয়সে বাৎসল্য রসের সৃষ্টি হয় নি। বরং সেই নবযৌবনের তীব্র আবেগের সময় ওদের আপদ বালাইয়ের মতই মনে হত।

এখন সেকাল নেই।

এখন সত্যবতী তো হাতছাড়াই। তবু এর সূত্রে যদি আবার একটু সরসতা আসে এই আশা। যমে-মানুষে টানাটানির লড়াইয়ে মানুষই জিতেছে, তাই মেয়েকে পয়মন্তও মনে হচ্ছে নবকুমারের।

মোটকথা সংসার বেশ ভালই চলছে নবকুমারের।

কিন্তু এ বাড়িতে সুহাস বলে যে একটা মেয়ে ছিল? সে কোথায় গেল? তাকে তো আর দেখা যায় না? সে কি তবে মারা গেছে? নাকি তার কুল-ত্যাগিনী মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কুলত্যাগই করেছে?

তা নবকুমার তা-ই বলেছে।

প্রায় কুলত্যাগের ধিক্কারই দিয়েছে তাকে। জীর্ণদেহ সত্যবতীর সামনে তীব্রকণ্ঠে সে ধিক্কার ঘোষণা করতেও দ্বিধা করে নি। বলেছে, "আর যেন ওটা এ বাড়ির ছায়া না মাড়ায়। কুলত্যাগে আর ধর্মত্যাগে তফাতটা কি? না-ই বা বিয়ে হত! হিঁদুর ঘরের মেয়ে, ঠাকুর-দেবতা পুজো পাঠ করে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যেত না? একটা বাপের বয়সী বুড়োর সঙ্গে—ছি ছি ছি!...বুঝলে তুড়ুর মা, আমড়া গাছে কখনো ন্যাংড়া ফলে না। এই যে তুমি এতদিন গাছের গোড়ায় জল ঢাললে, এত সার দিলে, ন্যাংড়া কি ফলল? আমড়ার ছানা আমড়াই হল।"

সত্যবতী হাত নেড়ে থামবার ইশারা করে পাশ ফিরেছিল।

এখন আর সত্য শয্যাগত নয়, তবু বেশীর ভাগ বিছানাতেই পড়ে থাকে। সদু এসে তার সংসারভার হাতে তুলে নেওয়ায় সত্য যেন অদ্ভুত একটা

মুক্তির স্বাদে মগ্ন হয়ে আছে। সদু যেই বলে, "থাক থাক বৌ, তুমি আবার কেন উঠে এলে রোগা মানুষ—" অমনি সত্য গিয়ে ঝুপ করে শুয়ে পড়ে। আগের মত তর্ক করে না, বলে না, এখন তো ভাল আছি। শুয়ে পড়ে—

আর বেশীক্ষণ শুয়ে থাকলেই সেই দিনের অভিনীত নাটকটার দৃশ্যগুলোই তার চোখের পর্দায় ছুটোছুটি করে বেড়ায়।

গোড়া থেকে সবটাই জানে সত্য।

সত্যর জ্ঞান চৈতন্য নেই ভেবে আঁতুড়ঘরের দোরে বসে সদু আর ভাবিনী সশব্দেই আলোচনাটা চালাচ্ছিল। কিন্তু অস্ফুট চৈতন্যের মধ্যেও সত্যর মাথার মধ্যে ওদের কথাগুলো যেন হাতুড়ির ধাক্কায় ধাক্কায় ঢুকে পড়তে লেগেছিল। অথচ ওদের নিষেধ করবার ক্ষমতা হয় না। না পারে হাত নাড়তে, না পারে কথা বলতে।

আর ভাবিনী হাতমুখ নেড়ে—হ্যাঁ ভাবিনীই বক্তা, সদু শ্রোতা। দেশে থাকতে ভাবিনীর সাধ্য ছিল না যে পাড়ার বয়স্কাদের সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু এখানে আলাদা, এখানে ভাবিনী 'একজন'। তাই হাতমুখ নেড়ে কথা বলতে বাধে না, "আর বলো না বামুন-ঠাকুরঝি, দেখে দেখে আমরা 'থ' হয়ে গেছি। ওই একটা বেজাতক বেজন্মা আইবুড়ো থুবড়ি মেয়েকে নিয়ে কী নাচানাচি! কী নাচানাচি!"

"জন্মের কথা কী বললে কায়েত-বৌ?"

শিউরে উঠেছিল সদু।

অথবা শিউরে উঠেছিল সদুর চিরদিনের সংস্কারে পুষ্ট রক্তকণিকা।

সদু যে ওই মেয়েটার হাতে খাচ্ছেদাচ্ছে গো!

সেই কথাই বলে ফেলে সদু।

"কে না খাচ্ছে?"

ভাবিনী ঠোঁট উল্টেছিল, "নারায়ণের ঘরের ভোগ রাঁধবার দরকার হলেও বোধ হয় গিন্নী ওই ভাইঝিটিকে এগিয়ে দেবেন—"

"ভাইঝি!"

সদু বলেছিল, "রোস দিকি, আমায় আগে বুঝতে দাও সবটা। এই তো শুনছিলাম বিধবা, আবার তুমি বলছ আইবুড়ো, একবার জন্মের খোঁটা শোনালে, আবার বলছ ভাইঝি, সব কেমন গোলমেলে ঠেকছে যে!"

'অচৈতন্য' সত্যবতীর কানে বিষের তীর বিঁধতে থাকে, "ভাইঝি আমি বলছি না গো, উনিই ওই পরিচয় রটিয়ে রেখেছেন। যে ভাজ বারো বছরে বিধবা, তার বাইশ বছর বয়সের গর্ভের ওই রত্ন! বোঝ! মা কুলে কলঙ্ক ঘটিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, মামাশ্বশুর—মানে গিয়ে তোমাদের বৌয়ের বাবা, নাকি ঢাকে কাঠি দিয়ে দশজন মান্যিগণ্যি লোককে ডেকে সেই বার্তা বড় গলা করে শোনালেন। আবার ইনি এতকাল পরে সেই আঁস্তাকুড়ের জঞ্জালকে মাথায় করে এনে ঘরের মধ্যে দেবীপিতিষ্ঠে করেছেন। কী বলব ভাই, তোমাদের বামুনের ঘরের রীতনীত দেখে আমরা হাঁ! বলছিলে বিধবা? বিধবা নয় গো, থুবড়ি, আইবুড়িই। কে ওই জাতজন্মহীন-ধ্বজাকে বে করবে যে বে হবে? মা মাগী লোকলজ্জায় আর মেয়ের কাছে ঘেন্না ঢাকতে বলে বেড়াত, পাঁচ বছরে বে, পাঁচ বছরেই বিধবা! ইনিও সেই কথাই চালিয়ে আসছেন। আবার শুনি নাকি বেহ্মবাড়িতে বে দেবে বলে বর খুঁজছে।"

সদু কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়ে বলে, "তা দিতেই পারে। মেয়ের ইস্কুলে পড়াচ্ছে যখন! বৌয়ের শরীরে অনেক গুণ ছিল, ওই বুকের পাটাতেই সব হয়ে গেল। অতিরিক্ত তেজ, অতিরিক্ত আসপদ্দা! নইলে কোন্ সংসারে কোন্ মেয়েমানুষের এ সাহস হয়, নদ্দমার পাঁক তুলে নিয়ে এসে পুজ্যি করে? শুনে আমি হাঁ হয়ে যাচ্ছি কায়েত-বৌ! রেখেছিস রেখেছিস, তার হাতে ভাত জল খাচ্ছিস কোন্ আক্কেলে? নবাটাও তো—"

"ওনার কথা আর তুলো না ঠাকুরঝি! উনি একেবারে কামরূপ কামিখ্যের ভেড়া। নচেৎ আর এতখানিটা হয়? উনি সুদ্ধু হা সুহাস যো সুহাস! এদিকে তো মুনির মন টলে এমন রূপ! ওই কি ভাল থাকবে নাকি? দেখো কোনদিন কি করে বসে! মিথ্যে বলব না ভাই, ওই ভয়ে তোমাদের ভাইকে আমি সাধ্যপক্ষে এ বাড়িতে একা আসতে দিই নে। পুরুষ হচ্ছে মাছির জাত, ফুল থেকে উঠে পাঁচড়ায় গিয়ে বসে। ওই ছুঁড়ি—"

সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে বুঝি বোবারও বোল্ ফোটে। তাই "অজ্ঞান অচৈতন্য" সত্যবতীর মুখ থেকে সহসা একটা ক্রুদ্ধ গর্জন বেরিয়ে আসে। যেন মুখ চেপে ধরা কোনও ক্রুদ্ধ জন্তুর আর্তনাদ!

এরা চমকে ওঠে।

"কি হল" বলে আঁতুড়ঘরের ঝিকে ডাক-পাড়াপাড়ি করতে থাকে এবং তার ঘণ্টা কয়েক পরেই সারা বাড়িতে অন্য একটা সোরগোল ওঠে।

প্রশ্ন আর বিস্ময়!

নেই?

কোথায় গেল?

শেষ কখন কে দেখেছে?

কে দেখেছে ঠিক কেউ মনে করতে পারে না। দেখছিল তো সর্বক্ষণ সবাই, হঠাৎ জলজ্যান্ত একটা মানুষ হাওয়া হয়ে যাবে?

অথচ তাই গেল।

সুহাসকে পাওয়া গেল না।

সত্য চোখ বুজলেই যেন সেদিনের সেই কথাগুলো শুনতে পায়। সদু আর ভাবিনীর সেই নিতান্ত সহজ অসতর্ক উক্তি।

তার পর পট পরিবর্তন হয়।

আর এক দৃশ্য চোখে ভাসে।

যা নিয়ে পরে বহু শ্লেষাত্মক কথা শুনতে হয়েছে সত্যকে। কিন্তু নাটকের সেই অঙ্কের উপর তো সত্যর কোনও হাত ছিল না। সেটা শুধু সত্যর চোখের সামনে ঘটেছিল।

আঁতুড়ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন ভবতোষ মাস্টার।

দরজার একটা পাল্লা ধরে ভাঙা গলায় আর্তনাদ করে উঠেছিলেন, "বৌমা!"

সত্য চমকে তাকিয়েছিল।

অবাক হয়ে চারিদিকে তাকিয়েছিল। এখানে উনি কেন! এ কী অঘটন? এমন উদ্‌ভ্রান্ত ভাবই বা কেন ওঁর? কী বলছেন এ সব?

বুঝতে সময় লেগেছিল।

লাগবারই কথা।

কে ভাবতে পেরেছিল, এ বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে আর জায়গা পেল না সুহাস, নিতে গেল ভবতোষ মাস্টারের বাড়ি। জীবনে যার বাড়িতে একবার মাত্র গিয়েছে, আর জীবনে যার সঙ্গে একবারও কথা বলে নি!

কিন্তু এবার গিয়ে কথা বলেছে।

অনেকগুলো কথা।

ভবতোষ তেমনি রুদ্ধকণ্ঠে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করেন, "বলে কিনা—আপনার বাড়িতে একটা ঝিয়েরও তো দরকার হয়! সেইভাবেই থাকব আমি। সব কাজ করব। আপনি তো উদারধর্মী, আপনার তো আমার হাতে খেতে ঘেন্না করবে না! শোন দিকি কথা—তোমার ওই দেবকন্যার মত মেয়ে, তার হাতে খেতে ঘেন্না করবে!"

সেদিন সত্যর বাকস্ফূর্তির শক্তি ছিল। সেদিন সত্য আস্তে আস্তে বলেছিল, "আপনি তো একথা বলছেন, লোকের যে ঘেন্না করে।"

"ঘেন্না করে?"

"করে বৈকি!" সত্যবতী বালিশ থেকে ঘাড়টা একটু তুলে ক্ষুব্ধ হেসে বলে, "করবে না কেন? আপনি তো ওর সবই জানেন মাস্টার মশাই, বিশ্বসুদ্ধ লোকই ওকে ঘেন্না করবে।"

"করতে পারে," ভবতোষ আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, "আমি তা হলে তোমার ওই বিশ্ব-সংসারের কেউ নই বৌমা!"

সত্য এক লহমা অপলকে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "জানি! আর সে মুখপুড়ীও এক নিমিষে সে কথা জেনে ফেলেছিল। তাই আগুনের ঝাপটা থেকে বাঁচতে ছুটে গিয়েছে আপনার কাছেই শরণ নিতে।"

"কিন্তু এক্ষেত্রে আমি কী করব?" ভবতোষ ব্যাকুল বিব্রত বিভ্রান্ত, "আমার বাসায় মেয়েছেলে বলতে কেউ নেই—"

"নাই বা থাকল—"

সত্য মৃদু হেসেছিল, "ও সব চালিয়ে নিতে পারবে!"

চালিয়ে নিতে পারবে?

ভবতোষ হতাশ স্বরে বলেন, "তুমিও কি তোমার ভাইঝির মত পাগল হয়ে গেলে বৌমা? তাকেও তো কিছুতেই বোঝ মানাতে পারলাম না। গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে শত সাধ্যসাধনা করলাম, সেই এক কথা, 'আপনার সব কাজ করে দেব, তার বদলে এককোণায় একটু থাকতে দিন, আর আপনার বইগুলো পড়তে দিন! আর কিছু চাই না আমি।' শোন পাগলামি!"

সত্য হঠাৎ গাঢ়স্বরে বলে, "পাগলামি কেন বলছেন মাস্টার মশাই, এর

থেকে ভাল আশ্রয় ও আর কোথায় পাবে? ওর জন্মের বিত্তান্ত শুনেও কে ওকে ছেদ্দা করবে, স্নেহমমতা করবে?"

ভবতোষ আরও ব্যাকুল হয়ে বলেন, "সে সব তো বুঝলাম, ওই জন্যেই পাত্র যোগাড় করে উঠতেও পারছি না। অথচ তুমি বলেছ সব কথা খুলে বলতে। কিন্তু একটা কথা তুমি বুঝছ না—"

ভবতোষ থামেন।

সত্য শান্তস্বরে বলে, "বলুন?"

"বলছি—" ভবতোষ কেসে বললেন, "আমার জন্যে ভাবি না, আমার তিনকুলে কে বা আছে, ওর জন্যেই বলছি—যতই আমি তিনকেলে বুড়ো হই, লোকনিন্দের তো কসুর হবে না তাতে! আমার বাসায় কী পরিচয়ে রাখব ওকে?"

সত্য একটু হেসে বলে, "দাসী পরিচয়েই রাখুন।"

"তুমি বোধ করি আমায় নিয়ে মজা দেখছ বৌমা!" ভবতোষের আক্ষেপটা যেন আছড়ে পড়ে।

আঁতুড়ের দরজায় এই দীর্ঘস্থায়ী দৃশ্য।

সত্ত্ব গালে হাত দিয়ে দালানে বসে, আর নবকুমার খাঁচার বাঘের মত ছট-ফট করছে। আর ধৈর্য থাকে না। নবকুমার এগিয়ে এসে বলে, "মাস্টার মশাই, বাইরে কি আপনার গাড়ি অপেক্ষা করছে? না একখানা ডাকতে পাঠাব?"

ভবতোষ বিমূঢ় দৃষ্টি মেলে তাঁর একদা ভক্তশিষ্যের মুখের দিকে তাকান, এবং সেই মুহূর্তে শুনতে পান সত্যবতীর ক্ষীণ কিন্তু স্পষ্ট স্বর, আদেশের সুরে উচ্চারিত হল, "থাক্, গাড়ির জন্যে কারুর ব্যস্ত হতে হবে না, মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে আমার এখনো দুটো দরকারি কথা আছে, আর সকলের একটু ওদিকে গেলে ভাল হয়।"

আর সকলের ওদিকে গেলে ভাল হয়!

এর চাইতে সত্য কেন একখানা থান ইঁট মারল না নবকুমারের মাথায়?

কিন্তু উপায় নেই। ডাক্তার বলে গেছে রুগীর বুক হালকা, রাগ দুঃখ কোন কিছুতেই যেন বেশী উত্তেজিত না হয়।

কাজে কাজেই মনের রাগ মনে চাপা।

হ্যাঁ, ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল, আঁতুড়ঘরে ডাক্তার আসা সত্ত্ব নবকুমার

সকলের জ্ঞানেই এই প্রথম। তা উপায় কি? সত্যই জোর করে আনিয়েছিল। বলেছিল, "যে কালের যে শাস্তর! তুই আর ইতস্ততঃ করিস নে নবু! কলকেতায় যখন বাসা করে আছিস, কলকেতার মতই হোক। বারুইপুরের সেই গর্তয় গিয়ে পড়লে তো মরেই যেত, এ যদি—"

তা সেই ডাক্তারের নির্দেশেই স্নান মাথাঘষা বন্ধ, কাজেই একুশে ষষ্ঠীও মুলতুবী। একুশ দিনের আঁতুড় একত্রিশ দিনে গিয়ে ঠেকেছে।

তা ছাড়া মুশকিলই কি কম?

বাড়ির লোকের সেবা-যত্নটা তো পাচ্ছে না! সেবা বলতে সেই হাঁড়ি দাই মাতঙ্গিনী। সেরে উঠবে কি করে?

অথচ আঁতুড়ের দরজাতেই এই সব কাণ্ড!

"চলে যেতে হবে! ওঃ!" বলে দুম্‌দুম্‌ করে চলে যায় নবকুমার।

ভবতোষ অপ্রতিভের একশেষ হয়ে বলেন, "আমি যাই বৌমা!"

"না!"

সত্য দৃঢ়স্বরে বলে, "কথা তো শেষ হয় নি। আপনি বললেন, আমি আপনাকে নিয়ে মজা দেখছি, এই কি একটা কথা?"

"কি করব বৌমা, দিশেহারা হয়ে যাচ্ছি বলেই—"

"কেন হবেন?" সত্য স্থির স্বরে বলে, "দিশে তো সামনেই রয়েছে। আপনি সেদিন ঠাট্টা করে বলেছিলেন, সুন্দরী নাতনীর জন্যে যদি আপনার মাথায় টোপর দিতে হয় তো দেবেন। সেই ঠাট্টাটিই সত্যি করে তুলুন।"

"বৌমা!"

"অস্থির হবেন না মাস্টার মশাই, আমি বলছি এই ভাল হবে।"

"এই ভাল হবে!"

"হ্যাঁ! আপনি আর দ্বিধা করবেন না। বিনা পরিচয়ে একটা মেয়েছেলের থাকায় নিন্দে, আপনিই পরিচয় দিয়ে দিন ওকে। পরিচয়ের মত পরিচয়।"

"তুমি কি আমাকে আমার চিরদিনের অপরাধের শাস্তি দিতে চাও বৌমা?"

ভবতোষের কণ্ঠে দৈন্যের সঙ্গে একটা জ্বালা ফুটে ওঠে বুঝি।

কিন্তু সত্যবতীর কণ্ঠে ফুটে ওঠে স্নিগ্ধ স্নেহের করুণা।

"ছি ছি, ওকথা বলছেন কেন মাস্টার মশাই? বরং বলুন এ আমার এত

কালের শিক্ষা-দিক্ষার গুরুদক্ষিণা। লেখাপড়া জানা বুদ্ধিমতী মেয়েরা আপনার প্রিয়, এ আমার জানা, সুহাস আপনার অপছন্দের হবে না।"

ভবতোষ ক্ষুব্ধ হাস্যে বলেন, "পছন্দ জিনিসটা শুধু বোটাছেলেরই একচেটে নয় বৌমা! সে এই জেঠার বয়সী বুড়োটাকে—"

"তাতে কি?"

সত্য সকৌতুক হাস্যে বলে, "মহাদেবও তো বুড়ো, তবু তো মেয়েরা তাঁকেই বর চেয়ে 'বত্ত' করে। সুহাস যদি সেকথা না জানত তো আপনার কাছেই ছুটে যেত না।"

আস্তে কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে আসে সত্যবতীর, "সুহাস আপনাকে ভক্তি করে, জেনে বুঝেই সে আপনার আশ্রয় নিতে গেছে। আপনিই শুধু বুঝতে পারছেন না। মেয়েমানুষ মুখ ফুটে আর কত বলবে?"

"কিন্তু আমি তো ভেবে কূল পাচ্ছি না বৌমা, হঠাৎ এমন কি নতুন ঘটনা ঘটল যে—সে অমন করে ছুটে গিয়ে—"

"বলব, সব বলব। আজ আর পারছি না।"

সত্য একটু ক্লান্ত হাসি হাসে।

তবু ভবতোষ কথা বলেন।

কাতর কণ্ঠে বলেন, "এই কি তোমার শেষ রায় বৌমা? এই শাস্তিই মাথায় তুলে নিতে হবে আমাকে?"

সত্য আবার একটু কৌতুকের হাসি হাসে, "এবার কিন্তু আমি রেগে যাব মাস্টার মশাই! আমার জামাই হওয়া বুঝি আপনার শাস্তি?"

ভবতোষ একটুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থেকে বলেন, "তবু আমি হয়তো কোনদিনই আমাকে ক্ষমা করতে পারব না বৌমা! মনে হবে—"

"ভুল ভেবে মনে কষ্ট করবেন না। এখন কি মনে হচ্ছে জানেন? মনে হচ্ছে—", শেষের কথাটা যেন নিজেকেই নিজে বলে সত্য, "মনে হচ্ছে, সুহাসকে বুঝি এমন মনের মত করে গড়তে চেষ্টা করেছি আপনার কথা ভেবেই। শুধু সে কথা নিজেই টের পাই নি এতদিন।"

তেতাল্লিশ

একেই বুঝি বলে "পরকীয়া ভাব"!

শোনা যায় ভগবানকে ভজবার এ একটা সহজ রাস্তা। মুখুয্যে মশাই এই পথটাই ধরেছেন। অবশ্য ভগবানের ধার ধারেন না মুখুয্যে মশাই, মানুষ নিয়েই কারবার তাঁর। তবে তাজ্জবের কথা এই, যে মানুষটাকে একদিন ঢিল-পাটকেলের মত লাথি মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, এখন তার আশেপাশেই ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছেন।

মুখুয্যে মশাই এখন নবকুমারের সংসারের প্রায় প্রতিদিনের অতিথি। বেশীর ভাগ সন্ধ্যার দিকটিতেই আসেন, সদুর যখন সাংসারিক কাজগুলো হালকা হয়ে আসে। হ্যাঁ, সত্যবতীর সংসারের সব কাজই স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে সদু, হয়তো বা ভগ্নশরীর সত্যর প্রতি মমতাবশে, হয়তো বা নিজস্ব অভ্যাসবশে, আর নয়তো বা এ সংসারে নিজের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ রাখবার বাসনায়। হয়তো মনে করে—নবকুমার যেন না ভাবে "আর কেন!" সত্যকে কুটোটি ভাঙতে দিলে, নবকুমারের সদুর সম্পর্কে সহজে আস্থা আসবে না।

তা মনের কথা মনই জানে। মোটের উপর সদু কলকাতাতেই রয়ে গেছে এখনো এবং এ সংসারের জুতো সেলাই থেকে চণ্ডী পাঠ সব করছে। তবু সন্ধ্যের দিকে বসে থাকবার সময় পায় সদু। একে তো এখানের এই শহুরে সংসারের কাজ তার কাছে তৃণসম, তা ছাড়া প্রবল এক উৎসাহে রাত্রের রান্নাটা সে বিকেলেই সেরে ফেলে।

সন্ধ্যার দিকে মুখুয্যে মশাই আসেন।

সদু মনে নবোঢ়ার লজ্জা আর মুখে নবোঢ়ার আভা নিয়ে ভাইপোদের চোখ বাঁচিয়ে তামাকে ফুঁ দিতে দিতে এসে কাছে দাঁড়ায়।

এ ঘরটা সেই কোণের দিকের ছোট্ট ঘরটা, যে ঘরে সুহাস থাকত। সুহাস তার সমস্ত ব্যবহারের জিনিসগুলি ফেলে চলে গেছে। সুহাসের স্মৃতি আঁকড়ে সে ঘর তার মত করে সাজিয়ে রেখে দেবে, এত ভাবপ্রবণতা এ সংসারের নতুন ব্যবস্থাপনায় নেই। সত্য তো ঢোকেই না এ ঘরে।

সদু এ ঘরটায় রাজ্যের আজেবাজে জিনিস এনে ঠেলে রেখেছিল, শুধু

সুহাসের শোবার চৌকিটায় একটা সভ্যভব্য শতরঞ্চ বিছানো আছে। আছে তাকিয়া।

মুখুয্যে মশাই প্রায় যেন চুপিচুপিই এসে সেই তাকিয়ায় কনুই ঠেসিয়ে সেই চৌকিটিতে বসেন, সত্য তামাক এনে হাতে দেয়।

মুখুয্যে মশাই একটু রহস্যঘন হাসি হেসে কলকে ধরা হাতটাও কাছে টেনে বলেন, "এখনো তোমার কনে-বৌয়ের লজ্জা গেল না। বসো না এখানে।"

বলা বাহুল্য "এখান"টা সেই স্বল্পপরিসর চৌকির সামান্যতম ফালিটুকু। ভারী ভারী মুখুয্যে মশাই তো প্রায় বাকী সব জায়গাটাই দখল করে আছেন। অতএব বসতে গেলে নিতান্ত ঘনিষ্ঠ হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

তবে সত্য পতিদেবতার এ অনুরোধটুকু রাখে না। "নাঃ এই বেশ বসছি।" বলে মাটিতেই বসে চৌকির সামনে।

খুব কি গল্প করে সত্য তার এতদিনের ফিরে পাওয়া বরের সঙ্গে?

নাঃ, তা করে না।

কথা কোথায়?

কথার বয়সই বা কোথায়?

অনেকক্ষণ ভুড়ভুড় করে তামাক টানতে থাকেন মুখুয্যে মশাই, তার পর একসময় হয়তো বললেন, "তার পর গরীবখানায় কবে যাচ্ছ বড়বৌ?"

সত্য এতক্ষণ বসে বসে হাতের নখ খুঁটছিল কি আঁচলের খুঁটটা আঙুলে জড়াচ্ছিল, এ প্রশ্নে সচকিত হয়ে নড়েচড়ে বসে বলে, "এখন আর ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরে কী হবে? জীবনটা তো বয়েই গেল।"

মুখুয্যে মশাই নিটোল বপুটি দুলিয়ে বেশ একটু হেসে নিয়ে বলেন, "ও কথা শুনছে কে গো বড়গিন্নী? গড়নে পেটনে এখনো তো ছুকরিটি আছ। বরং আমার বাড়ির ওটি একেবারে বুড়ীর বুড়ী তস্য বুড়ী হয়ে গেছে। মাথার সামনে কপালজোড়া টাক, দাঁতগুলো ঝুলে নড়নড় করছে, হাতে পায়ে হাজা, আর গড়ন? সে আর কী বলব তোমায়—" বিশ্রী একটা মুখভঙ্গী করে কথাটা শেষ করেন মুখুয্যে মশাই, "তাকাতে ঘেন্না করে। আমি তাই এখনো ঘরে রেখেছি, অন্য স্বামী হলে টান মেরে বাপের বাড়িতে ফেলে দিয়ে আসত।"

সত্য অবশ্য সতীনের সম্পর্কে স্বামীর এই অরুচিকর মন্তব্যে পুলকিত হয় না,

বরং বেজার ভাব দেখিয়ে বলে, "তা তো বলবেই এখন! তার শাঁস-মাস সব খেয়ে ছোবড়াটাকে টান মেরে ফেলে দেবার কথা তোমার মুখেই শোভা পায়। সাধে কি আর বলেছে পুরুষ প্রজাপতির জাত!"

মুখুয্যে এ অপবাদে লজ্জিত হন না। বরং ফ্যাক্ ফ্যাক্ করে হেসে বলেন, "তা সে দোষ তবে বিধাতার। তিনি যে জাতকে যেমন করে গড়েছেন। কিন্তু যাই বল বড়বৌ, আমিও তো এতগুলো ছেলেপেলের বাপ হয়েছি, তারপর তোমার গিয়ে দু-দুটো মেয়ের বে দিলাম, নাতির অন্নপ্রাশনে ঘটা করলাম, এ সংসারের যাবতীয় করণ-কারণ করে চলেছি, আর ওই শূয়োরের পাল পুষছি। টসকেছি একটু? রূপ-যৌবন রাখতে জানা চাই বুঝলে বড়বৌ?"

বলেই হাতটা বাড়িয়ে সত্যর গালে একটি টোকা মেরে বললেন, "তা তোমাকে সে কথা শোনানো চলে না। তুমিও জান। নচেৎ তুমিও কিছু এযাবৎ মামার সংসারে সোনার খাটে গা রূপোর খাটে পা দিয়ে বসে থাক নি! দাসীবিত্তি করতে করতে জীবন গেছে, তবু কেমন চেকনাইটি!"

সত্য কি এই স্তাবকতায় ভুলবে?

সত্য কি বলে উঠবে, "এই বুড়ো বয়সে তুমি আমার মনের দিকে না তাকিয়ে শরীরের চেক্নাইয়ের দিকে তাকাচ্ছ? লজ্জা করছে না?"

কিন্তু কি করেই বা বলবে?

সত্যর এই তুচ্ছ শরীরটার দিকেই বা কে কবে তাকিয়েছে? এই লোকটাই তো মারের চোটে ঘরছাড়া করেছে সত্যকে। তখন তো সত্যর বয়সকাল, কী অগাধ স্বাস্থ্য, আর রূপটাও ফেল্না ছিল না।

আর কত হাসি-খুশি স্বভাব ছিল।

সত্য তখন বুঝত না, হয়তো বা এখনো বোঝে না, সেই অগাধ স্বাস্থ্য আর রূপটাই অনিষ্টকারী হয়েছিল সত্যর। হাসিটাও। সংসারে তখন মেলাই লোক,—দ্যাওর, ভাসুর, বড় বড় ভাগ্নে,—তাদের চোখের সামনে থেকে সেই স্বাস্থ্য আর রূপ লুকিয়ে বেড়াবার কথা মাথায় আসত না সত্যর। তাই সত্যর দুর্দান্ত বরের মাথার রক্ত টগবগ করে ফুটত।

অতএব রাতদিন যে দেহটাকে হাতের মুঠোয় পিষতে ইচ্ছে করত ডাকাতটার, সেই দেহটাকেই সে ফুটবলের মত লাথিয়ে লাথিয়ে ঘরের বার করে দিত।

সত্থর যে রূপ আছে স্বাস্থ্য আছে, সে কথা সত্থ কারো মুখে কোনদিন শোনে নি।

তার পর গঙ্গায় কত জল বয়ে গেল, কত দিন রাত্রি মাস বছর পার হয়ে গেল, সত্থর "যৌবন" নামক বস্তুটা কোন খবর না দিয়েই বিদায় নিল, তবু মাজা মাজা গড়নের দেহটা সত্থর তেমন ভাঙে নি। এখন এক লালসাতুর লুব্ধ প্রৌঢ়ের দৃষ্টি পড়েছে সেদিকে।

এ দৃষ্টি স্বামীর দৃষ্টি নয়, পরপুরুষের দৃষ্টি! পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা পরস্ত্রীর মতই দেখছে আজ মুখুয্যে তার যৌবনে বিতাড়িতা স্ত্রীকে।

তবু বিহ্বল হচ্ছে সৌদামিনী।

জীবনে একবারও বিহ্বলতার স্বাদ উপভোগ করতেই হয়তো।

কিন্তু নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে না পারলে জুৎ কোথায় সত্থর বরের? সন্ধ্যাবেলা নবীন নায়কের ভঙ্গী নিয়ে এসে বসে গল্পগুজব কিছুদিন বেশ ভাল লাগছিল, এখন আর শুধু তাতে মন উঠছে না। তা ছাড়া ছোটবৌটার সত্যিই বুঝি মরণদশা ঘনিয়ে এসেছে।

সময় অসময়ে বড় মেয়েটা শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে ভাত-জল করত, কিন্তু সেও এখন আসন্নপ্রসবা। মেজটা তো এই বয়সেই মা-ষষ্ঠীর বরপুত্রী। তাদের এনে লাভ নেই।'

তাই সত্থর কাছে অনুনয়-বিনয় চলে।

সত্থ কিন্তু সহজে হ্যাঁ করে না।

বলে, "কেন এই তো বেশ! আসছ, বসছ, চোখের দেখা দেখছি—"

মুখুয্যে চোখ টিপে বলে, "শুধু চোখের দেখাতে কি পেট ভরে গো?"

"আর পেট ভরায় কাজ নেই।"

"তুমি তো বললে কাজ নেই। আমি যে এদিকে বছরভোর উপোসী! তা ছাড়া মাইরি বলছি বিশ্বাস কর, মাসের মধ্যে পাঁচদিন সত্যি পেটের উপোসে কাটে। লক্ষ্মীছাড়া মেয়েমানুষটা একবার যদি 'পারছি না' বলে শুলো তো, কার সাধ্যি ওঠায়। বাজার থেকে মুড়ি চিঁড়ে এনে ওই রাবণের পুরীর পেট ভরাতে হয়।"

সত্থ ভুরু কুঁচকে বলে, "আর নিজে?"

"নিজে? নিজের ওই বামুনের হোটেল আছে একটা পাড়ায়, সেই গতি। নগদ চার গণ্ডা পয়সা ফেলে—"

সত্থর মনটা কি দুলে ওঠে ?

মনে হয় কি, চিরজীবনই তো ভাতের হাঁড়ি নাড়লাম, কিন্তু সার্থকের ভাত রাঁধলাম কই ? ভাত বেড়ে স্বামী-পুত্রের পাতের সামনে ধরে দিতে পেলাম কবে ?

স্বামী-পুত্রের কোলে ভাতের থালা এগিয়ে দিতে পারলে আর—

পুত্র ? ও বাড়িতে যারা আছে, তারা কি সত্থর পুত্র ?

তা একরকম পুত্রই বৈকি। স্বামীরই সন্তান তো ! ব্রতকথায় আছে— "জ্ঞাতির ভাত হোক, সতীনের পুত হোক।"

মরলে সতীনের ছেলেও মুখে আগুন দেয়, গলায় "কাচা" নেয়। হ্যাঁ, এইসব চিন্তা সত্থর মাথার মধ্যে পাক দেয়, তবু সত্থ সহজে মুখে হারে না। বলে, "আমি এখন নবুর সংসার ভাসিয়ে দিয়ে কোন্ মুখে—"

"আহা-হা, ওর সংসার আবার ভাসাবে কী দুঃখে ? ওর কাণ্ডারী খুব ওস্তাদ। এ নেহাৎ তুমি আছ তাই ঘোড়া দেখে খোঁড়া হয়ে বসে আছে। তুমি চলে গেলে ঠিক সবই পারবে।"

তা সত্থ সে কথা বোঝে।

বোঝে বৌয়ের এই চুপচাপ বসে থাকা যতটা শরীরের দুর্বলতার জন্যে, তার থেকে বেশী মনের অবসন্নতা। সেই হতচ্ছাড়া ছুঁড়িটা যেন প্রাণের পুতুল ছিল ওর। সেটা গেছে। তা ছাড়া নবু কড়া দিব্যি দেওয়ায় সেখানে যেতে আসতেও পারছে না। যত শক্ত মেয়েমানুষই হোক, স্বামীর "মরা মুখ দেখার" দিব্যিটা তো আর ফেলতে পারে না ?

অমন যে একটা সোনার পুতুল মেয়ে হয়েছে, তাও যেন সাজাতে গোছাতে গা নেই। সত্থ চলে গেলে ঘাড়ে পড়লে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু সত্থ ?

বড় লজ্জা ! বড় লজ্জা !

নিজের কোটে বসে তামাক সেজে দেওয়া, পায়ে হাত বুলিয়ে দেওয়া এক, আর কেন্দ্রচ্যুত হয়ে সেই অজানা রাজ্যে গিয়ে পড়া আর। কেমন সেই সতীন, কেমন সেই ছেলেপুলে কে জানে।

তারা যদি সত্থকে সহ্য করতে না পারে ? আবার যদি স্বামীর ঘরে গিয়ে লাঞ্ছনা অপমান জোটে ?

সেদিন কথার পিঠে এ সন্দেহ প্রকাশ করে বসে সৌদামিনী, কিন্তু মুখুয্যের এক ফুঁয়ে উড়ে যায় সে দুশ্চিন্তা।

তিনি প্রবল স্বরে আশ্বাস দেন, "ছেলেমেয়ে? তারাই তো রোজ আমায় খেয়ে ফেলছে, 'বাবা বড়মাকে আনো, বড়মাকে আনো' বলে। আর তোমার সতীন? হুঁঃ রাতদিন তো নিজের মরণ ডাকছে। বলে, 'আনো একবার তোমার প্রথম পক্ষকে, তাঁর পায়ের ধুলোটা নিয়ে আর এই হতভাগাগুলোকে তাঁর হাতে তুলে দিয়ে মরে বাঁচি'।"

কেন কে জানে, সদুর চোখে হঠাৎ জল আসে। সে জল মুছে সদু রুদ্ধস্বরে বলে, "তোমরা পুরুষজাত বড় নিষ্ঠুর! এতদিন ঘর করছ, প্রাণে একটু মায়া নেই!"

"কি মুশকিল! মায়া কি করছি না? না করি নি? এযাবৎ কে তার এগারটা আঁতুড় তুলল, কে তার 'তাওত' করল? ওকে ঘরে আনার সময় থেকেই তো যে যার ভেন্ন। মা ছোট ছেলের সংসারে থেকেছে, তার পর মরেছে। আমি চিরদুঃখী। নইলে বিয়ে করা পরিবার তুমি, তবু তোমার ওপর জোর খাটাতে পারি না, ভিখিরির মতন দয়া ভিক্ষে করি।"

"থাক থাক, আর আমার পাপ বাড়াতে হবে না।" সদু বলে, "সতীন না হয় মরে বাঁচতে চায়, কিন্তু ছেলেপেলে সৎমাকে চায় কেন?"

"কেন আর? বুঝছ না?" মুখুয্যে কণ্ঠস্বর করুণ করেন, "একটু মাতৃ-স্নেহের আশায়। সময়ে দুটো ভাতজলের আশায়।"

তিল তিল জলে পাথর ক্ষয় হয়। আর এ তো আপনা থেকেই গলে থাকা বেলেমাটি। অবশেষে একদিন সদু মাথাটা নীচু করে ধরাগলায় বলে, "বেশ, বল নবুকে। আমি নিজমুখে বলতে পারব না।"

তা নবুরও বলতে বেধেছিল সত্যর কাছে। কোনরকমে থতমত খেয়ে বলে ফেলেছিল, "মুখুয্যে মশাই ত আমায় খেয়ে ফেলছেন!"

সত্য চোখ তুলে তাকিয়েছিল শুধু।

তাতেই প্রশ্ন।

নবকুমার অতঃপর তড়বড় করে মুখুয্যে মশাইয়ের সংসারের 'হাঁড়ির হালে'র বর্ণনা করে, কথা সমাপ্ত করেছিল একটি বিবেচনার কথা বলে।

"এমন অবস্থায় দিদিকে না পাঠানো আমাদের পক্ষে গর্হিত হবে না? মনে হবে না বড্ড যেন স্বার্থপরের মত আটকে রেখেছি দিদিকে—"

সত্য শান্তভাবে উত্তর দিয়েছেল, "আটকে রাখার কথা উঠছেই বা কেন? ওখানে যাবার জন্যেই তো কলকাতায় এসেছেন ঠাকুরঝি!"

ওখানে যাবার জন্যে!

নবকুমার হতবাক হয়ে গিয়েছিল। সত্যর অকৃতজ্ঞতাকে ছি-ছি করে ধিক্কার দিয়েছিল। ভেবেছিল, আর এই যে আঁতুড় তোলা, মুখে রক্ত তুলে সংসারের যাবতীয় খাটুনি খাটা, এসব কিছু না? দিদি আগে থেকে জানত মুখুয্যে মশাইয়ের সঙ্গে দেখা হবে? তিনি অত খোশামোদ করবেন ওকে?

কিন্তু মনের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে ওঠা এইসব কথাগুলো বলে উঠতে পারে নি নবকুমার। বলেছিল, "বেশ তবে তাই বলে দিই গে। জানি তোমার একটু কষ্ট হবে—"

"আমার কষ্ট!"

সত্য বলেছিল, "আমার যে কিসে কষ্ট হয় আর না হয়, সে বোধ যদি তোমার থাকত! যাক গে, যেতে দাও ওসব কথা, মুখুয্যে মশাইকে বলে দাও একটা ভাল দিন দেখতে।"

চুয়াল্লিশ

জগন্নাথের রথের চাকা গড়গড়িয়ে এগিয়ে চলে, কখনো বালির গাদায় বসে যায়। বসে যাওয়া রথের রশিতে টান দিতে এগিয়ে আসে লক্ষ মানুষের হাত। শ্রেণীহীন নির্বিচার।

মানুষের হাতে জগন্নাথের মুক্তি।

রূপকের রূপে দেবতার রূপ।

জগন্নাথের রথ যুগের প্রতীক। যুগের চাকার গতিও কখনো উদ্দাম, কখনো মন্থর। সেই মন্থরতার মুক্তিও মানুষের হাতে। জনগণেশের জাগরণে যুগের জাগরণ।

তবু বলতেই হবে যুগের দেবতা একটু শহর-ঘেঁষা। শহর দ্রুতছন্দে আবর্তিত হয়, গ্রাম ছায়াচ্ছন্ন উঠোনে পড়ে ঘুমোয়। "শহুরে হাওয়া" যখন

তার কাছে এসে পৌঁছয়, তখন শহর সে হাওয়াকে ত্যাগ করে আর এক নতুন হাওয়ার পিছনে ছুটছে।

কিন্তু শহর আর মফঃস্বল কি কেবলমাত্র মানচিত্রের বর্গমাইলের ওপর নির্ভরশীল? একই ঘরের মধ্যে বাস করে না কি শহর আর মফঃস্বল? জাগন্ত আর ঘুমন্ত? মানুষে মানুষে মনের গড়নে কি পার্থক্য নেই?

তা মনের গড়নেরও শহর মফঃস্বল আছে বৈকি। নইলে যুগচক্রের আবর্তনে সত্যবতী কেন এমন অধীর হয়, চঞ্চল হয়, আন্দোলিত হয়, আর নবকুমার কেন সে আবর্তন টেরও পায় না?

সত্যবতী তো ঘরে থাকে।

নবকুমার তো বাইরে ঘোরে।

নবকুমার বাইরে ঘোরে। অর্থাৎ নবকুমার বাজারে যায়, মুদির দোকানে যায়, নিতাইয়ের বাসায় তাস খেলতে যায়, সতুর বাড়িতে তত্ত্বতল্লাস করতে যায়। এই বহির্জগৎ নবকুমারের।

কিন্তু সত্যবতীই বা এমন কি করে?

সত্যবতীও তো কুটনো কোটে, বাটনা বাটে, রান্না করে, বড়ি দেয়, মুড়ি ভাজে, আচার বানায়। শুধু অবসরকালে বই পড়ে সত্যবতী। পড়ে পত্র-পত্রিকা।

এইটুকু জানলা।

খোলা জানলা।

এই জানলাখানি সত্যকে বহির্জগতের বার্তা বয়ে এনে দেয়।

এ জানলাখানি খোলা রাখার সহায়, ছোট ছেলে সরল। মায়ের সঙ্গে তার যত গল্প যত কথা। আর বই যোগাড়ের ব্যাপারে উৎসাহ ষোল আনা।

নবকুমার এ খবর রাখে না।

নবকুমার এক-একদিন তাসের আড্ডায় শোনা গল্প এনে উত্তেজিত ধিক্কার তোলে, "শুনেছ কেলেঙ্কারি? মেয়েমানুষে বিলেত যাচ্ছে! কিনা এম. এ. বি. এ. পাস করতে! বিদ্যের পাহাড়ের চূড়োয় ওঠা চাই!...কালে কালে কতই হবে!...শুনেছ কাণ্ড, পিরিলি বাড়ির কোন্ বৌ নাকি—"

সত্য বলে ওঠে, "থাম, চুপ কর।"

নবকুমার বিচলিত স্বরে বলে, "বাবাঃ! বুড়ো হয়ে গেলাম, জীবনে কখনো মন খুলে দুটো গল্প করতে পেলাম না।"

সত্য বলে, "কেন কয় না গল্প! তোমার নাগালের উপযুক্ত গল্প কয়! বাজারের দরদামের গল্প আছে, কায়েত-ঠাকুরপোর বৌ কী খাওয়াল তার গল্প আছে, আপিসের বড়বাবুর গল্প আছে……"

নবকুমার ক্রুদ্ধ গলায় বলে, "কেন দেশের দশের কথা বলা বুঝি আমায় বারণ?"

"বারণ নয়! বারণ কেন হবে? নিজে জেনে বুঝে কথা কও, তার মানে আছে, তুমি যে পরের মুখে ঝাল খাও!"

নবকুমার এবার অভিমানে ভারী হয়, "আমার জেনেও দরকার নেই, বুঝেও দরকার নেই। তুমি আর তোমার বিদ্বান ছেলেরা কথা কও গে।… আয় সুবর্ণ আমরা গল্প করি।"

সুবর্ণ? হ্যাঁ, সুবর্ণ!

সোনার পুতুলের মত মেয়েটাকে সুবর্ণলতা নামই তো মানায়। বছর চারেকের হয়ে উঠেছে মেয়েটা, বাপের ভারী সুয়ো হয়ে উঠেছে।

কথা কয় যেন পাখীর মত।

হাঁড়ি-কুড়ি নিয়ে রাঁধাবাড়া খেলতে শিখেছে ইতিমধ্যে। বলে, "এস বাবা ভাত খাও।" বলে, "মার মতন রান্না করতে পারি আমি। পারি না বাবা?"

নবকুমার সত্যকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, "তা পেরো মা! কিন্তু মার মতন রাগী হয়ো না যেন!"

এইভাবেই চলছিল দিন, কিছুটা মন্থর ছন্দে।

সেই মন্থরতার মাঝখানে হঠাৎ একটা আলোড়ন এল একদিন। সে আলোড়ন এল সত্যর 'ঘর পালানে বন্ধু' নেড়ুর মূর্তি ধরে। তা নেড়ু তার বন্ধুই, দাদা আর বলেছে কবে তাকে সত্য? ছ-মাসের নাকি বড় নেড়ু সত্যর থেকে। সে কথা মানে না সত্য। এখনও মানে না।

রুদ্ধকণ্ঠে শুধু বলে উঠল, "নেড়ু, তুই?"

নেড়ু হেসে উঠে বললো, "বিশ্বাস হচ্ছে না? নেড়ুর ভূত মনে হচ্ছে? তা সন্দেহ মোচন করতে চিমটি কেটে ত্যাখ্!"

"তা ভূত বললে অন্যায় হয় না—" সত্যর রুদ্ধকণ্ঠে এবার উচ্ছ্বাস আসে, "রংটা অন্ততঃ ভূতের মত করে তুলেছিল বাবা! হ্যাঁরে নেড়ু, তোর সেই বেলেরপানার মত রংটা কী করলি রে?"

নেড়ু হো হো করে হেসে ওঠে, "কী মনে হচ্ছে? বেচে খেয়েছি? তা মাঝে মাঝে যা অবস্থা যায়, 'চুল নখ হাত পা বেচে খাই' এমনই মতি হয়। রংটা বেচতে পারলে নিশ্চয় বেচতাম, বেচবার নয় এই যা। রোদে পুড়ে পুড়েই আর কি—"

নেড়ুর ওই কৌতুক কথা কটির মধ্যে থেকেই নেড়ুর অবস্থাটা স্পষ্ট ধরা পড়ে যায়, আর ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চোখে জল এসে যায় সত্যর।

কিন্তু সে জল চোখেই আটকে রেখে সত্য সেই অতীতকালের মতই ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, "খুব তো ব্যাখ্যানা করছিস অবস্থার, বলি হঠাৎ এমন নিরুদ্দেশ হবার শখ হল কেন বল্ দিকি? এমন হাঁড়ির হাল করে বেড়িয়ে লাভটা কি হচ্ছে তোর?"

নেড়ুর বহু অবস্থায় ছাপ পড়া কাঠ-কাঠ মুখটায় হঠাৎ একটা বিদ্যুৎদীপ্তি খেলে যায়। সেই বিদ্যুৎ-উদ্‌ভাসিত মুখে উত্তর দেয় নেড়ু, "লাভ? সে তোদের সংসারের কড়াক্রান্তির হিসেবে অবিশ্যি পড়বে না সত্য, সেটাকে বলতে পারিস 'অদৃশ্য বস্তু'। তবে হয়েছে বৈকি লাভ। ভগবানের রাজ্য এই পৃথিবীটা যে কেমন তার কিছুটা আস্বাদ লাভ হয়েছে।"

সত্য কি নেড়ুর এই উত্তরে চমকে ওঠে? সত্যর মুখটা কি হঠাৎ ছাইয়ের মত সাদাটে দেখায়? সহসা কি একটা বিরাট লোকসানের খবর দিয়ে গেল কেউ সত্যকে? সত্যর মুখে তাই দিশেহারা উদ্‌ভ্রান্তির ছায়া?

সত্যর তাই কথা বলতে মুহূর্ত কয়েক দেরি হয়। বুঝি বড় একটা নিশ্বাস চাপে সত্য।

পরে বলে, "পায়ে হেঁটে পৃথিবীর কতটা দেখবি শুনি?"

নেড়ু দু হাত উল্টে বিশেষ একটা ভঙ্গী করে বলে, "নাও ঠ্যালা! পৃথিবীর সব মাটি মাড়িয়ে মাড়িয়ে কি আর পৃথিবীটা দেখবার বায়না করেছি!··· আসল কথা চেনা জানা সংসারের চৌহদ্দিটার বাইরে পা বাড়াতে পারলেই আর এক জগৎ বুঝলি? তার মজাই আলাদা। সত্যি বটে তোরা সংসারী লোকেরা বলবি হাঁড়ির হাল, কিন্তু আমি বাবা বলবো তোফায় কাটাচ্ছি। 'ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্ট মন্দিরে', এ কি সোজা মজা? কোনদিন আহার জুটছে, কোনদিন জুটছে না, কোনদিন মাথার উপর আচ্ছাদন আছে, কোনদিন গাছতলা সার।···কখনো কারো কাছে এক ঘটি জল চাইলে সে ব্যাজার মুখ করে, কখনো কেউ মুখের চেহারাটা দেখেই ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ বলে

অনুরোধ উপরোধ করে ডেকে নিয়ে গিয়ে তোয়াজ করে খাওয়ায়। কত লীলাখেলা পৃথিবীর! কত ঢঙের মানুষ, কত সঙের বাজার!"

সত্য যেন হাঁ করে শুনতে থাকে নেড়ুর এই অভিনব অভিজ্ঞতার গল্প।··· আশ্চর্য! আশ্চর্য! সেই তার চিরকৃপার পাত্র বোকা নেড়ুটা হঠাৎ যেন সত্যর নাগালের বাইরে চলে গেছে।

সন্তর্পণে একটা নিশ্বাস ফেলে সত্য। আস্তে আস্তে বলে, "খুব ভাল লাগে না রে নেড়ু?"

নেড়ু তার রুক্ষ চুলগুলো মুঠোয় চেপে ধরে চাপতে চাপতে বলে, "ভাল লাগা মন্দ লাগা বুঝি না সত্য, একটা অন্যরকম জীবন, এই আর কি। কুমোরের চাকে গড়া হাঁড়ি-কলসীর মত একছাঁচের না হয়ে, নিজের হাতে গড়া যা হোক একটা গড়ন পাওয়া, এই হচ্ছে কথা। তোরা বলবি, বাউণ্ডুলে লক্ষ্মীছাড়া ভবঘুরে! বলবি, 'আহা কী কষ্ট'! আমি মনে মনে হাসবো। ভাববো এই বাউণ্ডুলে লক্ষ্মীছাড়া ভবঘুরে হয়ে ছাখো, বুঝবে তার রহস্য রস।"

সত্য আর একবার ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে "বলছিস তো খুব! বলি মেয়ে-মানুষে পারবে তোর মতন ভবঘুরে হতে? ব্যাটাছেলে হয়ে জন্মেছিস, তাই যা খুশি করবার সুখ পেয়েছিস। বাবাও তো বাড়ি-ছাড়া হয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন—"

নেড়ু আঙুল তুলে বলে, "ওই তো, ওই কথাই তো বলছি—গিয়েছিলেন তাই একটা মানুষের মতন মানুষ হতে পেরেছেন। গাঁয়ে পড়ে থাকলে আমার বাবাটির মতন হতেন!"

"এই নেড়ু, পিতৃনিন্দে করছিস?"

"নিন্দে-ফিন্দে বুঝিনে সত্য, আমার হচ্ছে হক্ কথা! যাক তুই কেমন আছিস বল্?"

সত্য ঈষৎ উদাস গলায় বলে, "আমার কথা ছেড়ে দে। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি—"

নেড়ু বলে ওঠে, "এই সেরেছে, তুইও যে দেখছি আক্ষেপ ধরতে শিখেছিস! আগে তো এমন ছিলি না! 'মেয়েমানুষ মানুষ নয়' একথা বললেই তো রেগে যেতিস—"

সত্য তেমনি গলায় বলে, "সে এখনো যাব। তবে তোকে দেখে যেন

আক্ষেপটার সৃষ্টি হচ্ছে ভাই! কোথায় ছিলি তুই, কী বা ছিলি! মিথ্যে বলব না, তোকে 'মাথামোটা' ভেবে একটু কৃপার চক্ষেই দেখতাম, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তোর মাথাটাই সব চেয়ে সরু। তাই তোকে ভক্তি-ছেদ্দার চোখে দেখছি।...যাক বেশী বলব না অহঙ্কার হবে। তবে এটা ঠিক, ভগবান যদি আমায় মেয়েমানুষ না গড়ে বেটাছেলে করে তৈরি করতেন, তোর মত ঘরই ছাড়তাম। যাক হই নি যখন, ভগবানের ভুলের খেসারত দিই বসে বসে। সে তো হল, কিন্তু...তুই কিভাবে আমার বাড়ির খোঁজ পেলি বল্ দিকি?"

হ্যাঁ, সেটাই কথা!

ঘরপালানে ছেলেটা এতদিন পরে হঠাৎ সত্যর বাড়ি এসে হাজির হল কী করে?

তা হল প্রায় দৈবের আনুকুল্যেই।

উত্তর প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়ে যা বোঝা গেল তা হচ্ছে এই—ঘুরতে ঘুরতে কলকাতায় এসেছে নেড়ু কিছুদিন হল। আর ওই ঘোরার সূত্রেই কালীতলায় এসে বসেছিল আজ সকালে, আর দৈবক্রমে সত্য গিয়েছিল সেই ঠাকুরতলায় পুজো দিতে।

যায় এমন সত্য।

বারব্রত থাকলেই যায়।

আজ অষ্টমীর উপোস ছিল, গিয়েছিল। নেড়ু দেখতে পায়। কিন্তু পথের মাঝখানে বা মন্দিরের চাতালে তো একটা বৌমানুষকে ডেকে কথা কওয়া যায় না, তাই নেড়ু একটু দূরে দূরে থেকে সত্যর সঙ্গে সঙ্গে এসে বাড়িটা বুঝে নিয়েছিল। সত্যর সঙ্গে পাড়ার একটি গিন্নী ছিলেন। তিনি বিদায় নিতেই নেড়ু এগিয়ে গিয়েছিল, এবং মহোৎসাহে কড়া নাড়া দিয়েছিল।

সত্য সেইমাত্র পড়শী গিন্নীকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে দরজায় খিল লাগিয়ে পিছন ফিরেছে, তখনো দাওয়ায় ওঠে নি। ভাবল সেই মহিলাই বোধ করি কিছু বলতে ভুলেছেন বা সত্যর সঙ্গে তাঁর কোনো বস্তু চলে এসেছে। নিশ্চিন্ত চিত্তেই তাই ফের খিলটা খুলেছিল সত্য, আর খুলেই থতমত খেয়ে দু-পা পিছিয়ে গিয়েছিল।...

কিন্তু পিছিয়ে গিয়েই কি তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল সত্য? তাই দেওয়াই তো উচিত ছিল? তা বলতেই হবে উচিত কাজ সত্য করে নি। সে যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়ে সামনের মূর্তিটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে থেকেছিল।

রুক্ষ ধূসর মাথাভর্তি চুল, তামাটে কালচে রং, শীর্ণ পেশীবহুল মুখ, আর রোগা পাকসিটে চেহারা!...দৈর্ঘ্যের তুলনায় প্রস্থটা নিতান্তই কম। আর ওই দৈর্ঘ্যের জন্যই পরনের ধুতিটা খাটো মনে হচ্ছে। গায়ের রং-জ্বলা গলাবন্ধ কোটটাও যেন মানুষটার নীচের দিকের অনেকখানি অংশকে বঞ্চিত করে সহসা থেমে পড়েছে।

হাতে একটা ক্যাম্বিসের পোর্টম্যাণ্টো, সেটাকে দোলাতে দোলাতে মৃদু মৃদু হাসছে লোকটা। হঠাৎ কেউ সত্যকে এই অবস্থায় দেখলে কী বলবে বা বলতে পারে, সে কথা স্মরণ মাত্র না করে হাঁ করে দাঁড়িয়েই থাকে সত্য। অতঃপর লোকটা হেসে উঠে বলে, "কী রে সত্য, চিনতে পারলি নে তা হলে?"

অথচ চিনে ফেলেছে তখন সত্য, ঠিক সেই মুহূর্তেই চিনে ফেলেছে। আর সেই আকস্মিকতার মুহূর্তে রুদ্ধকণ্ঠে উচ্চারণ করেছে, "নেডু, তুই!"

উঠে এসে দাওয়ায় গুছিয়ে বসে নেডু বলে, "যাক্, ভাগ্যিস যে চিনতে পারলি, চোর-ছ্যাচোড় বলে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলি নে, এই ঢের।"

সত্য তিরস্কারের সুরে বলে, "তা দিলেও তুই আমায় দোষ দিতে পারতিস না নেডু। চেহারাখানা যা বাগিয়েছিস চোর-ছ্যাচোড়ের অধম! তোকে দেখে আহ্লাদ করবো, না কাঁদবো তা বুঝছি না। বলে দিচ্ছি এখন থেকেই, সহজে তোর এখান থেকে যাওয়া হবে না, থাকবি আমার কাছে।"

নেডু হেসে ফেলে বলে, "তোর হাতের রান্না খেয়ে খেয়ে মোটা হবো?"

"হবিই তো! মিথ্যে নাকি?" সত্য সতেজে বলে, "কিছুকাল খেয়ে ঘুমিয়ে স্বাস্থ্য শরীর ভাল কর্। এই তালে চললে বেশীদিন আর পৃথিবী দেখে বেড়াতে হবে না।"

তা সত্যর কথাটা একেবারে অবহেলা করতে পারে নি নেডু। ছিল কয়েকটা দিন। ভারী খুশি খুশি মনেই ছিল। দুবেলা খেতে বসে রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হত, আর বলতো, "নাঃ, যতদূর বুঝছি বোনাই বাড়ি

থেকে আমাকে আর নড়তে দিবি না তুই সত্য। তোর এই সুক্ত, মোচার ঘণ্ট, এঁচড়ের ডালনা, মাছের ঝোলের বন্ধনেই বেঁধে রেখে দিবি।…" বলতো, "জামাইবাবুর আমার এখনো শরীরটি যে কী কারণে অমন নাড়ুগোপালটির মত রয়ে গেছে, তা বুঝতে পারছি।"…ছেলেদের ডেকে বলতো, "বুঝলে হে বাপধনেরা, তোমরা যে জননী রত্নটি পেয়েছ, লাখে একটি এমন মেলে না!"

সত্য মুগ্ধ বিগলিত চিত্তে ওর কথা শুনতো, চোটপাট উত্তর দিতেও ভুলে যেত মাঝে মাঝে।

বাড়ি ছেড়ে পথে পথে ঘুরে নেড়ুর কথার ধরনটা কী অদ্ভুত ভাবে বদলে গেছে! এ ভাষা এ সুর নিত্যানন্দপুরের নয়। বারুইপুরেই কি এমন সহজ কৌতুকের সুরের হালকা চালের কথা শুনেছে সত্য? অথবা কলকাতায়?

নাঃ। শোনে নি।

সত্যর দেখা মানুষরা সব যেন চোখের সামনে ভিড় করে আসে। কেউ চঞ্চল, কেউ গম্ভীর, কেউ ব্যস্ত, কেউ মন্থর। কেউ ভয়ঙ্কর, কেউবা হাস্যকর। এমন হাসিতে উজ্জ্বল কৌতুকে সহজ, অথচ ভারহীন নির্লিপ্ত, কই কোথায়?

নেড়ুর "কথা" শুনবে বলেই সত্য তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সেরে নিত, সত্যর ছেলেরা আগে আগে পড়া সেরে নিত।…হ্যাঁ, সত্যর ছেলেরাও সত্যর মতই মুগ্ধ বিমোহিত। নানান্ দেশ-বিদেশের গল্প ফাঁদতো নেড়ু, নানান অভিজ্ঞতার। রসিয়ে রসিয়ে গল্প করতো তার।…

"ট্যাঁকে নেই পয়সা, পেটে নেই ভাত। অথচ মুখে হারছি না বুঝলি? ধর্মশালার সেই লোকটাকে জোর গলায় বলছি—'আমি রাঁধছি না খাচ্ছি না তাতে তোমার কি হে বাপু? তোমার এই ধর্মশালায় এমন কোনো লেখাপড়া আছে যে রাঁধতেই হবে, খেতেই হবে?' লোকটা একেবারে গরুড়ের অবতার বুঝলি? হাত জোড় করে বলতো, 'আজ্ঞে লেখাপড়া কিছু নেই, তবে আপনি ব্রাহ্মণ সন্তান চোখের সামনে না খেয়ে পড়ে থাকবেন, দেখি কি করে? দেখছি তো আপনি রাঁধছেন না খাচ্ছেন না। বেরিয়ে গিয়ে পুরী-কচুরিও কিনে আনছেন না—' "

বললাম, "আমার ব্রত আছে।"

"তবু ব্যাটা নাছোড়বান্দা। বলে, 'কী ব্রত'?"

আরো গম্ভীর হয়ে বলি, "সে তুমি বুঝবে না।"

"তা এমন কি ব্রত যে ফল দুধ গঙ্গাজল এসব খেতে মানা?"

"আমি রাগ দেখিয়ে বলি, 'অত কৈফিয়ৎ তোমায় দিতে যাব কেন হে? ঠিক আছে, চলে যাচ্ছি অন্য ধর্মশালায়!' অথচ বুঝলি কিনা, মনে মনে ভাবছি, অত কথা না শুধিয়ে এনেই দে না বাবা ছড়াখানেক মর্তমান, গোটা কতক মিষ্টি পুরুষ্টু আম, সেরটাক মালাই, আর গণ্ডাআষ্টেক মণ্ডা—"

কথার মাঝখানেই হেসে লুটোপুটি খেত সাধন সরল। সরল হয়তো বা যোগও দিত—"গণ্ডাবারো চমচম, এক চ্যাঙারি গরম জিলিপি···"

"তা মন্দ বলিস নি," নেড়ু বলতো, "তখন মনে হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শেষ করি। অথচ হ্যাংলা বামুন হতে রাজী নই। তা বলবো কি, সত্যিই সেদিন এনে হাজির করলো লোকটা বড় লোটার এক লোটা ক্ষীরের মত ঘন গরম দুধ, আর ইয়া বড় বড় গোটাচারেক কদলী। বলে, 'এ খেলে তোমার ব্রত নষ্ট হবে না—' আমি বুঝলি কিনা, তাকে যেন কতই কৃপা করছি, এই ভাবে মেরে দিলাম সেগুলো। মারছি আর ভাবছি আরো চারটি কিছু আনলি না কেন বাবা?"

এরা হেসে ওঠে।

এ আসরে নবকুমারও এক-একদিন যোগ দিত। এই ভবঘুরে শালাটির প্রতি তারও বেশ একটু প্রীতির সঞ্চার হয়েছিল। চুপি চুপি সত্যকে বলতো, "কায়দা করে আটকে ফেলে একটা কনেটনে যোগাড় করে বিয়ে দিয়ে ফেল না? তখন দেখবে বাছাধন কেমন বাউণ্ডুলে হয়ে বেড়ায়!"

সত্য বলতো, "থাক গে, বেড়াক না! একটা মানুষ না হয় জগৎ-ছাড়া হল! সবাইকে বিয়ে করে ঘর-সংসার করতেই হবে, এমন তো কিছু লেখা পড়া নেই?"

"আহা সন্নিসী হত তো সে এক কথা! এ যে না গেরুয়া, না সংসারী!"

"তা হোক।"

নবকুমার বলতো, "তবে আর কি বলবো!" আসরে গিয়ে বলতো, "তারপর শালাবাবু, কোন্ কোন্ তীর্থ করেছ বল?"

নেড়ু বলতো, "তীর্থ-টির্থ কিছু করি নি বাবা, তীর্থধর্ম নিয়ে মাথাও ঘামাই নি। তবে ভ্রমণ করতে গেলেই তীর্থ! পৃথিবীর যেখানে যত শোভা-সৌন্দর্যের জায়গা, সেখানেই তো মানুষ দিব্যি এক-একখানা তীর্থ বানিয়ে রেখেছে—"

সত্য প্রশ্ন করেছিল, "শেষ তুই কোথা থেকে ঘুরে এলি ?"

"কাশী! কাশী আগেও গিয়াছিলাম অবিশ্যি। প্রথম তো কাশীতেই যাই।"

"কাশী ? সম্প্রতি কাশী গিয়েছিলি তুই ?" সত্য রুদ্ধকণ্ঠে বলে, "বাবার সঙ্গে দেখা করেছিলি ?"

"বাবা! মানে মেজকাকা ?" নেড়ু আশ্চর্য হয়ে বলে, "কাশী গেছেন বুঝি ?"

"গেছেন কি রে নেড়ু! বরাবরের জন্যে গেছেন। বাবা কাশীবাসী হয়েছেন।"

"অ্যাঁ! সে কি!"

"তবে আর বলছি কি!"

নেড়ু এই একটিমাত্র প্রসঙ্গে গম্ভীর হয়। আস্তে নিশ্বাস ফেলে বলে, "জানি না তো! জানলে খুঁজে নিয়ে দেখা করবার চেষ্টা করতাম! নিত্যানন্দপুরে মেজকাকা নেই, এ যেন ভাবাই যায় না, না রে সত্য ?"

সত্য কথার জবাব দেয় না।

সত্য চোখ তোলে না। সুবর্ণকে কোলে চেপে বসে থাকে।

আবার কোনো একসময় পুণ্যির প্রসঙ্গ ওঠে।

একবেলার জন্যে শ্রীরামপুরে পুণ্যির বাড়িও গিয়েছিল নেড়ু। তা এক বেলার বেশী থাকতে পারে নি। পুণ্যি নাকি এমন গিন্নী হয়ে গেছে যে, দেখে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল নেড়ুর। যতটুকু সময় ছিল নেড়ু, ততটুকুই কেবল তাকে উপদেশ দিয়েছে আর ধিক্কার দিয়েছে পুণ্যি।

"জগৎটা কতই বদলে যাচ্ছে!" সত্য নিশ্বাস ফেলে বলে, "ছোটবেলার কথা তোর মনে পড়ে না নেড়ু ?"

"পড়ে। পড়বে না কেন ? তবে কি জানিস সত্য, একে তো তুই মা বাপের এক সন্তান, তায় আবার মেজকাকা মেজখুড়ীর মত বাপ-মা। তোর স্মৃতিতে আমার স্মৃতিতে তফাৎ আছে। চোদ্দটা ছেলেমেয়ের একটা আমি!"

"তা হলেই বা! তুই তো কোলের ছেলে!"

"দুর! দুর! মানুষ না হাঁস-মুরগী!"

এ ধরনের কথায় সত্য লজ্জিত হয়ে অন্য প্রসঙ্গ এনে ফেলতো। হয়তো পুণ্যির কথাই ফের তুলতো। সেই রকম রোগা আছে পুণ্যি, না মোটা হয়েছে? এখনো তেমনি চুলের রাশি আছে কিনা?

"চুল?"

নেড়ু হেসে উঠেছে। "এই এতো বড় একখানি টাক! তার ওপর এতোখানি সিঁদুর লেপা। অবিকল সেজঠাকুমা! আমি বললাম, 'মা শেতলা, গড় করি! আর নয়'।"

সত্য হেসে ফেলে বলে, "সেইতো বোকা-হাবা ছিলি তুই নেড়ু, এত কথা শিখলি কি করে?"

নেড়ু বলে, "হাওয়ায় বাতাসে! যত মানুষ দেখবি, তত বুদ্ধি বাড়বে।"

খুবই স্ফূর্তিতে ছিল নেড়ু।

আর সত্যি বলতে, দিন দশ-বারোতেই যেন চেহারা ফিরে যাচ্ছিল। রং ফিরছিল, গড়ন ফিরছিল। হয়তো মাস দেড় দুই থাকলে দশাসই হয়ে উঠতো রোগা লম্বা নেড়ু। কিন্তু থাকলো না। হঠাৎ বলে উঠলো, "আর নয় রে সত্য, তোর এখানে শেকড় গজিয়ে যাচ্ছে, এবার পলায়ন দিই।"

সত্য চমকে উঠেছিল।

সত্য বসে পড়েছিল।

"চলে যাবি?"

"এই দ্যাখো, চলে যাবো না তো কি, বোনাই-বাড়িতে মৌরসীপাট্টা নিয়ে বাস করতে এসেছি? না, না, আর একদিনও না।"

সত্যর কাকুতি-মিনতি, সত্যর ছেলেদের দর-দস্তুর, আর নবকুমারের অনুরোধ-উপরোধ, সব ঠেলে ক্যাম্বিশের ব্যাগটা গুছিয়ে নিয়ে পা বাড়ালো নেড়ু।...শুধু যাত্রাকালে বললো, "দে বাবা তোর ওই নাড়কেল নাড়ু, দিয়ে দে পুঁটলিখানেক। পচবার মাল নয়। চলবে বেশ কিছুদিন। যখনি খাবো, তোদের মনে পড়বে।"

তা শুধুই নারকেল নাড়ু নয়, চোখের জল মুছতে মুছতে একবেলার মধ্যেই অনেক কিছু বানিয়ে ফেলেছিল সত্য।...

তিলের নাড়ু, ক্ষীরের ছাঁচ, মুগের বরফি, কুচো গজা, মুড়কির মোয়া!